৫ম বর্ষ]　　বৈশাখ, ১৩২২　　[১ম সংখ্যা

বীরভূমি

মাসিক পত্রিকা।

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক সম্পাদিত।

সূচীপত্র।

মূল্য বার্ষিক ডাকমাশুল সহ ২৲ দুই টাকা মাত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ আনা।

১৫ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা এই ঠিকানায় প্রবন্ধ ও টাকাকড়ি সম্পাদকের নিকট প্রেরিতব্য।

৫ম বর্ষ] বৈশাখ, ১৩২২ [১ম সংখ্যা

বীরভূমি

মাসিক পত্রিকা।

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক সম্পাদিত।

সূচীপত্র।

মূল্য বার্ষিক ডাকমাশুল সহ ২৲ দুই টাকা মাত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।৵ আনা।

১৫ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা এই ঠিকানায় প্রবন্ধ ও টাকাকড়ি সম্পাদকের নিকট প্রেরিতব্য।

নূতন পুস্তক—জাতীয় সাধনায়-নূতন পথ।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক, ভাগবতরত্ন, বি, এ, প্রণীত

নবযুগের সাধনা।

এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ অতি অল্পদিনে নিঃশেষিত হয়, দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। প্রথম সংস্করণে এই গ্রন্থ ১৮ পেজি ডবল ক্রাউন ৭ফর্ম্মা মাত্র ছিল। এবারে ৫৩ ফর্ম্মা হইয়াছে। এই গ্রন্থখানির সমস্ত লাভ গ্রন্থকার 'দেবালয়' সমিতিকে দান করিয়াছেন। গ্রন্থখানিতে ১৬।১৭ খানি হাফ টোন্ চিত্র আছে ; মূল্য কাগজে বাঁধা দেড় টাকা, কাপড়ে বাঁধা ২৲ টাকা। এই গ্রন্থের মূল্য অর্দ্ধেক 'দেবালয়' সমিতির কার্য্যে ব্যয়িত হইবে—আর অর্দ্ধেক এই গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের জন্য ব্যাঙ্কে রক্ষিত হইবে।

দেশের সকল শিক্ষিত ব্যক্তিরই এই গ্রন্থখানি পাঠ করা উচিত। দেশে বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই চিত্ত যে-সমস্ত সমস্যায় দ্বারা আলোড়িত, কর্ত্তব্যবুদ্ধি আমাদিগকে যাহা কিছু করিবার জন্য আহ্বান করিতেছে, এই গ্রন্থে তাহার অধিকাংশগুলিরই প্রকৃত মীমাংসা ঐতিহাসিকভাবে প্রদান করা হইয়াছে। সেবাব্রত শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনের অনেক কথা এই গ্রন্থে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা উপন্যাস অপেক্ষাও কৌতুকাবহ ; শ্রীভগবানের করুণায় সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হওয়া কিরূপ তাহা জানিয়া যাঁহারা সবল ও জীবনযুদ্ধে কৃতকর্ম্মা হইতে চাহেন, তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিলে জীবনের পথ চিনিতে পারিবেন। জীবনের এমন পথ নাই, যাহা এই গ্রন্থে বিচারিত হয় নাই। "দেবালয় সমিতি" কি, এবং ইহার দ্বারা দেশের কি কার্য্য হইতেছে, কেবল আমাদের নহে, বর্ত্তমান জগতের যুগধর্ম্ম কি, এ কালের সাধনা কি, তাহার পরিচয়ও এই গ্রন্থে আছে।

শ্রীসতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, এম,এ, বি,এল, সম্পাদক, দেবালয় সমিতি।

২১০।৩।২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এই ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

১লা আষাঢ় ১৩২২ বাং।

শ্রীশ্রীমৎ রাধারমণ চরণদাস দেব।

বীরভূমি, ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা।
বৈশাখ, ১৩২২।

নদীয়ার প্রেমধর্ম্ম।*

আজ আমাদের নিদাঘ-বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হইল। গত বৎসর ঠিক এই দিনে একটা সুনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া আমরা এই স্থানে একত্র হইয়াছিলাম। এই অনুষ্ঠানটির উদ্দেশ্য কি, এবং গতবৎসর আমাদের কার্য্য কতটুকু সফল হইল, তাহা আমরা সাধারণ্যে প্রচার করি নাই। আমাদের মত এই যে, গত বৎসর ভগবানের কৃপায় আমরা আশাতীতরূপ কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছি। গতবৎসর যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এ বৎসরেও কেহ কেহ আসিবেন। কিন্তু আজ এখনও পর্য্যন্ত তাঁহাদের মধ্যে কেহ আসেন নাই। আপনারা সকলে নূতন, কাজেই নিদাঘ-বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যটা কি, মোটামুটি তাহা আপনাদের বলা প্রয়োজন। কিন্তু নিদাঘ-বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য বুঝিতে হইলে, পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে কেন্দ্র করিয়া এই নবদ্বীপ ধামে যে আন্দোলনের বিপুল তরঙ্গ উত্থিত হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষকে এক নবচেতনায় জাগাইয়া দিয়াছিল, সেই আন্দোলনের স্বরূপ ও তাহার ইতিহাস কিছু কিছু আলোচনা করা দরকার। এই আলোচনার পর আমাদের এই রাধারমণ সেবাশ্রমকে সম্মুখে ধরিয়া যে একটি নবজাগ্রত ভাব দেশের মধ্যে আপনাকে প্রসারিত করিবার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করিতেছে সেই ভাবটিও আপনাদের জানা দরকার। এই দুইটি কথা জানিলেই আমাদের এই নিদাঘ-বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যটা কি তাহা আপনারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক। একজন যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তককে বুঝিতে হইলে প্রথমে দেখিতে হয় তিনি কি জন্য আসিয়াছিলেন এবং তিনি কি নূতন কথা বলিলেন। এই ভাবে না দেখিলে কোন ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তককে বা মহা-

---

* নবদ্বীপ নিদাঘ-বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের প্রথম অভিভাষণ ২৫শে বৈশাখ নবদ্বীপ রাধারমণ সেবাশ্রমে বিবৃত।

পুরুষকে বা অবতারকে বুঝিতে পারা যায় না। আমাদের দেশে ঠিক এইভাবে চৈতন্যমহাপ্রভুকে বুঝিবার জন্য আমাদের সময়ে খুব বেশী চেষ্টা হইয়াছে কি না সন্দেহ। এবিষয়ে আমার নিজের তের চৌদ্দ বৎসরের আলোচনার যাহা ফল তাহা আপনাদের নিকট, একদিনে নহে, ক্রমে ক্রমে এই একমাসের মধ্যে, উপস্থাপিত করিব। আপনারা উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছেন, ভবিষ্যতের দেশ আপনাদের মুখের প্রতি কাতরনেত্রে চাহিয়া আছে, আপনারা এ বিষয়ে আলোচনা করিবেন—ইহাই আমার কামনা। আমি আপনাদের কিছু শিখাইব বলিয়া মনে করি না। একটি অতি প্রয়োজনীয় সাধনার ক্ষেত্রে আপনাদিগকে আজ বিনীতভাবে নিমন্ত্রণ করিতেছি মাত্র।

পূর্ব্বে বলা হইল যে প্রত্যেক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বা অবতার বা মানবের ইতিহাসের প্রত্যেক ভাগবতীলীলা যে দেশে বা যে যুগেই হউক না কেন, কতকগুলি নূতন কথা মানবের নিকট আনিয়া উপস্থিত করে। নূতন কিছু না আনিলে সেই লীলার বা সেই আবির্ভাবের সার্থকতা থাকে না। নূতন কথা বলিলে আপনারা ভাবিবেন না—যে কথাটি একেবারেই নূতন। আরও স্থূলভাবে এই কথাটি বুঝিতে গিয়া আপনারা হয়তঃ জিজ্ঞাসা করিবেন যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও তাঁহার অনুবর্ত্তীগণ কি বেদবহির্ভূত কোন কথা বলিয়াছেন? ইহার উত্তরে আমি বলি—না। তিনি বেদবহির্ভূত কোন কথা বলেন নাই। তাহা হইলে প্রশ্ন হইতে পারে যে তিনি নূতন কথা বলিলেন কি করিয়া? ইহার উত্তরে সনাতনধর্ম্ম ও যুগধর্ম্ম—এই দুইটি জিনিষ কি তাহা জানা দরকার—এবং বেদ কি তাহাও জানা দরকার।

সনাতনধর্ম্ম ও যুগধর্ম্ম।

বৈদিকধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্ম। কেবল বৈদিক ধর্ম্মই বা বলি কেন—একটু উদারভাবে শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা করিলে বলিতে হয় সকল ধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্ম। যাঁহারা revelation মানেন—তাঁহারা সকলেই প্রায় প্রকাশ্যভাবে ইহা স্বীকার করেন। যাঁহারা revelation মানেন না, তাঁহারাও ধৈর্য্যের সহিত আলোচনা করিলে প্রকৃত ধর্ম্ম যে সনাতন ইহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। সনাতনধর্ম্ম কল্পতরুর মত। বেদকে আমাদের দেশে অব্যয় অশ্বত্থ বলিয়া প্রাচীনেরা বর্ণনা করিয়াছেন। কল্পতরুর নিকট প্রার্থনা করিলে যেমন প্রার্থনানুরূপ বস্তু পাওয়া যায়—সনাতনধর্ম্মও তেমনি। সনাতন-

ধর্ম্মে সকল প্রকার মত ও সকল প্রকার পথ—যাহা কিছু কখনও মানবহৃদয়ের অনুরাগ পাইয়াছে বা পাইতে পারে—তৎসমস্তই আছে। মানবজাতির ইতিহাসসমূহ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে এক এক সময়ে ঐ সনাতন ধর্ম্মেরই বুক হইতে একটা তত্ত্ব বা সত্যকে বাহির করিয়া আনিয়া সম্মুখে ধরিতে হয়। ভাগবতী লীলা বা মহাপুরুষের আবির্ভাবের দ্বারা এই কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। এই প্রকারে একটি বিশেষ সত্য যখন বাহিরে আসিয়া উজ্জ্বলভাবে সকলের পুরোদেশে দাঁড়ায় তখন অন্যান্য সত্যগুলি যে ধ্বংস হইয়া যায়—তাহা ঠিক নহে। অধিকারীভেদে তাহাদের উপযোগীতা থাকে এবং তাঁহারা পশ্চাতে থাকিয়া পুরোবর্ত্তী সত্যের মধ্যে সার্থকতা বা পরিণতি প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারে যে সত্যটি সম্মুখে আসিয়া সকলের উপর মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়—তাহারই নাম যুগধর্ম্ম। সুতরাং বুঝিতে পারিতেছেন যে যুগধর্ম্ম সনাতনধর্ম্ম-বহির্ভূত একটা কিছু নয়,—প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহা, কতকটা নূতন আকারে, পুরাতন সত্যের পুনরুদ্‌ঘোষণা (re-proclamation of a forgotten truth) মাত্র। কথাটা আমাদের দেশের মধ্য দিয়া একটু আলোচনা করা যাউক।

বুদ্ধদেবকে অনেকে সনাতনধর্ম্মের বিদ্রোহী সন্তান বলেন। তিনি যে একেবারে বিদ্রোহী নহেন বা তাঁহার সময়ে বিদ্রোহীরূপে প্রতীত হন নাই, এমন কথা আমি বলি না। আমি বলি এই যে তিনি বিদ্রোহী হইলেও—সন্তান। বৈষ্ণবেরা বুদ্ধদেবকে ভাল চক্ষে দেখেন নাই - ইহা সত্য। কিন্তু বুদ্ধদেব যে বিষ্ণুর অবতার একথাও স্বীকার করিয়াছেন। কয়েকবৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভার বাৎসরিক অধিবেশনে আমাকে খুব জোরে একটা কথার প্রতিবাদ করিতে হইয়াছিল। অনেক ভাল লোকে আক্ষেপ করিয়া বলেন যে বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম তাঁহার নিজের দেশে নাই—সিংহল, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ, চীন, জাপান—এই সমস্ত বিদেশে গিয়া সেই ধর্ম্মকে আশ্রয় লইতে হইয়াছে। আমি সেবারে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম, বুদ্ধদেবের দেশ হইতে চলিয়া যায় নাই। চট্টগ্রাম অঞ্চলে অনেক বৌদ্ধের বাস আছে বলিয়া যে আমি ঐ কথা বলিয়াছিলাম—তাহা নহে। আমি বলিয়াছিলাম যে মানুষের যেমন দেহ আছে আর আত্মা আছে, দেহ বদলাইয়া যায়, কিন্তু আত্মা থাকে—ধর্ম্মেরও তেমনি দেহ আছে ও আত্মা আছে। বৌদ্ধধর্ম্মের ভারতবর্ষে—একেবারে

দেহান্তর না হইলেও কতকটা দেহান্তর ঘটিয়াছে। সেই জন্য স্থূলদৃষ্টিতে হিন্দুস্থানে বৌদ্ধপ্রভাব ধরা পড়ে না। কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে অন্তর্মুখী হইয়া ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে বুদ্ধদেবের ধর্ম্মের যে আত্মা তাহা চৈতন্যদেবের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের মধ্যে পরিণতি বা সার্থকতা লাভ করিয়াছে। বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম বা চৈতন্যদেবের ধর্ম্ম আমাদের দেশে আছে বলিলাম বলিয়া আপনারা যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে বুদ্ধদেবের বা চৈতন্যদেবের ধর্ম্ম কোথায় আছে—দেখাইয়া দিন, তাহা হইলে আমাকে একটু বিপন্ন হইতে হইবে। তাহার উত্তরে আমি বলিব যে খ্রীষ্টানধর্ম্ম ইয়োরোপে আছে—এ কথা তো আপনারা বলেন। যেভাবে খৃষ্টানধর্ম্ম ইয়োরোপে আছে, চৈতন্যের ধর্ম্ম বা বুদ্ধদেবের ধর্ম্মও সেই ভাবে আমাদের দেশে আছে। বুদ্ধদেব ঈশ্বরবাদ পশ্চাতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। পুরুষকারের উপর জোর দিয়াছিলেন। কর্ম্ম বলিতে তখন লোকে যাহা বুঝিত—তিনি তাহার প্রতিবাদ করিয়া কর্ম্মের অন্যরূপ অর্থ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব এখানে যুগধর্ম্ম-প্রচারক। তাঁহার সময়ে যাহা প্রয়োজন ছিল তিনি তাহাই করিয়াছিলেন। কতকটা নূতন মূর্ত্তিতে যে বিস্মৃত সত্যের পুনঃপ্রচার ভারতবর্ষের জন্য ও জগতের জন্য সে সময়ে দরকার হইয়াছিল, তিনি তাহাই প্রচার করিয়াছিলেন। আচার্য্য শঙ্কর আর একজন যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তক। অদ্বৈতজ্ঞান ও সন্ন্যাসের আদর্শ তিনি সম্মুখে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছিলেন। অন্যান্য সত্যগুলি সেই সময়ে কিছু মলিন হইয়া পশ্চাতে পড়িয়াছিল। আচার্য্য শঙ্করের গ্রন্থে দেখিবেন যে সমুচ্চয়-বাদ বা জ্ঞানকর্ম্মের সমন্বয় তিনি কিছুতেই স্বীকার করেন নাই। মূল শাস্ত্রের বা বেদান্তের প্রস্থানত্রয়ের মধ্যে অর্থাৎ উপনিষদের, উত্তর মীমাংসার ও ভগবদ্গীতার যে যে স্থান পড়িয়া সমুচ্চয়বাদই উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, আচার্য্য শঙ্কর অশেষ চেষ্টা করিয়া দেখাইয়াছেন যে সমুচ্চয়বাদ প্রতিপাদন করা অর্থ নহে। কিন্তু বৈষ্ণব আচার্য্যেরা শঙ্করের সন্ন্যাসের মন্ত্রও লইয়াছেন, এমন কি অনেকে শঙ্করের প্রবর্ত্তিত দশনামী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, অথচ পরিণামবাদ, সমুচ্চয়বাদ ও লীলাবাদ প্রচার করিতেছেন।

এই প্রকারে শ্রীচৈতন্যদেব প্রেমকে পঞ্চম পুরুষার্থ বলিয়া প্রতিষ্ঠা করেন এবং মোক্ষাভিসন্ধি পরিহার করিয়া প্রেমসম্পদে ধনী হইবার জন্য মানবকে মাতাইয়া তোলেন। অবশ্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এ মতের প্রবর্ত্তক নহেন।

কিন্তু তাঁহার প্রবর্ত্তিত যুগধর্ম্ম—এই প্রেম। এই প্রেমের সাধন সম্বন্ধে তিনি যে সব নূতন কথা বলিয়াছেন, তাহা আমরা ক্রমশঃ আলোচনা করিব, আমাদের ইতিহাসের সাহায্যে সনাতনধর্ম্ম ও যুগধর্ম্মের সম্বন্ধ কি তাহার উদাহরণ দিয়া আমি এইটুকু প্রতিপাদন করিতে চাই যে নূতন কথা বলিয়াছেন বলিয়া শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম বেদ-বহির্ভূত নহে, পরন্তু বেদের মর্ম্মস্থলে যে সমস্ত গুপ্তসত্য এতদিন প্রচ্ছন্নভাবে ছিল, মাত্র দুই একজন ভাগ্যবান সাধু—যাহার সন্ধান পাইয়াছিলেন, সেই সত্য তিনি সাধারণের উপযোগী করিয়া জগতকে উপহার প্রদান করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণলীলায় বেদান্তসাধনার শেষ লক্ষ্য রহিয়াছে এবং এই শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য লীলাই প্রেম-সাধনার আশ্রয়, এই সকল গূঢ় ও নূতন কথা তিনি কিরূপে প্রচার করিয়াছেন তাহাও আমরা ক্রমশঃ আলোচনা করিব। আপাততঃ আমি আপনাদিগকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস শুনাইতেছি, আপনারা গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া এই ইতিহাসকে পূর্ণাবয়ব ও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করিয়া তুলিবেন—ইহাই আমার প্রার্থনা।

শ্রীকৃষ্ণ-লীলা ও শ্রীচৈতন্য-লীলায় বিদ্রোহ-বীজ।

যাবতীয় যুগধর্ম্মের ন্যায় শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর ধর্ম্ম পঞ্চদশ শতাব্দীতে আমাদের দেশে একটা খুব বড় রকমের বিদ্রোহ সৃষ্টি করিয়াছিল। আপনারা জানেন যে শ্রীচৈতন্যদেবের অনুবর্ত্তী শিষ্যগণ বলেন এই চৈতন্যলীলা একটি নূতন বা স্বতন্ত্রলীলা নহে, ইহা শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণলীলার উপসংহার বা দ্বিতীয় অধ্যায়। শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণলীলার তাৎপর্য্যের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলার মর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। আপনারা কি কখনও ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণলীলার প্রথম অংশটা একটা প্রকাণ্ড বিদ্রোহ ? বিস্তৃতভাবে সকল কথা এখন বলিবার সময় হইবে না। মোটামুটি কয়টা কথা ভাবিয়া দেখুন। শ্রীকৃষ্ণ আসিলেন। সকল বেদ, সৃষ্টির প্রথম প্রত্যুষ হইতে যাঁহার আগমনী গাহিতেছে, যাজ্ঞিকের যজ্ঞধূম যাঁহার চরণ লক্ষ্য করিয়া কত যুগযুগান্তর নীলাকাশে ব্যাপ্ত হইয়াছে, যোগীগণ যাঁহার জন্য অবর্ণনীয় ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন, পরিব্রাজকেরা দুর্গম তীর্থে তীর্থে যাঁহার চরণরেণু স্পর্শ করিবার জন্য সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়া জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন—সেই পরমার্থধন আজ উপস্থিত ! আজ মানবের

সৌভাগ্যের সীমা নাই! ভগবান আসিলেন, কিন্তু কোথায় আসিলেন? বহু অর্থব্যয় করিয়া ধনবান রাজচক্রবর্ত্তীগণ সুশোভিত উচ্চশির মন্দিরে সেবাপূজার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, চারিদিকে ঋষিদিগের শত শত তপোবন প্রতিসন্ধ্যায় ও প্রতিপ্রভাতে উদাত্ত গম্ভীর সামমন্ত্র-ঝঙ্কারে মুখরিত হইতেছে, যাজ্ঞিকের যজ্ঞধূম বৃক্ষপত্রকে কজ্জল-মণ্ডিত করিয়াছে—কত আবাহন, কত সম্ভাষণ, কত আয়োজন মানবের, পরমারাধ্য তিনি আসিলেন, কিন্তু কোথায় তিনি আসিলেন? বর্ষার অন্ধকারময়ী রাত্রি, গগন ঘনঘটাচ্ছন্ন, মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছে, যোগমায়া বিশ্বচরাচরকে নিদ্রায় অচেতন করিয়াছেন, দ্বারে দ্বারে—প্রহরীর দল অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া নিদ্রায় অচেতন, পূজারীরা দেবমন্দিরে সন্ধ্যারতি সমাপন করিয়া ভোগের সামগ্রীগুলি বাঁধিয়া লইয়া মন্দিরের দীপাবলী নিভাইয়া দিয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া নিজ নিজ গৃহে চলিয়া গিয়াছে—এমন সময় কারাগারের কক্ষে আসিয়া হরি উপস্থিত! যেখানে আমরা ঘৃণার সহিত অপরাধী দস্যু-তস্করদিগকে বন্দী করিয়া নির্য্যাতনে জর্জ্জরিত করি—সেই স্থানে হরি আসিয়া উপস্থিত!

এই তো বিদ্রোহের সূচনা! তাহার পর ভাবিয়া দেখুন, ভগবানের অন্তরঙ্গ হইলেন কাহারা? ব্রাহ্মণেরা নহেন, পণ্ডিতেরা নহেন, রাজর্ষিরা নহেন, ব্রহ্মা ইন্দ্র বরুণাদি দেববৃন্দ নহেন, অধিক কি শুক সনন্দ সনাতন নারদ, নহেন। গোপগোপী আর গাভী! দ্বিজপত্নীগণের নিকট অন্নভিক্ষার লীলা আপনারা জানেন। সেখানে এই বিদ্রোহের কথা—বড় স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। দ্বিজপত্নীগণ যখন কৃষ্ণকে পাইলেন, তখন নিষ্ঠাবান শাস্ত্রবিদ্ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। কৃষ্ণলীলার মধ্যে যে এত বড় একটা বিদ্রোহের তীক্ষ্ণধার অসি লুকাইয়া রহিয়াছে—অনেকদিন ব্যবহার করিয়া মরিচা ধরাইয়া ফেলিয়া আমরা তাহা ভুলিয়া গিয়াছি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু চারিশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার অনুবর্ত্তীগণ যে বিদ্রোহের বাদ্য বাজাইয়াছিলেন তাহার ধ্বনি এখনও আমাদের কর্ণে কিছু কিছু বাজিতেছে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সংকীর্ত্তনের পিতা। আজ হরিনাম-সংকীর্ত্তনে দেশ পাগল হইয়া উঠিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু কত বড় প্রতিবাদের মধ্য দিয়া এই সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, আমরা তাহা একরূপ ভুলিয়া গিয়াছি। ১৪৩০ শকাব্দায় প্রকাশ্য-ভাবে সমারোহের সহিত এই নদীয়ার

রাজপথে "নদের বাজারে" বন্যার মত সংকীর্ত্তনের সম্প্রদায় বাহির হইয়াছিল। সেই সংকীর্ত্তনে "শান্তিপুর ডুবুডুবু, নদে ভেসে যায়"। শ্রীবাস পণ্ডিতের ঘরের ভিতর দ্বার বন্ধ করিয়া একদল লোক এই ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে রাত্রিকালে উচ্চৈঃস্বরে হরিকীর্ত্তন করিতেন। এই দলের অধিকাংশই যুবক। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীধরের ন্যায় বয়স্ক দুই একজন লোক এই দলে ছিলেন। আবার এই দলের অধিকাংশ লোকই "শ্রীহট্টিয়া"। নবদ্বীপের নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-সমাজ ইহাদের কার্য্যে উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কত প্রকারের আপত্তিই তাঁহারা তুলিলেন! একবার বলিলেন—"নামকীর্ত্তনই যদি করিবে গর্দ্দভের ন্যায় চীৎকার করিয়া কর কেন?" কেহ বলিলেন, "ইহারা মাদক-সেবীর দল।" কেহ বলিলেন, "ইহাদের এই শাস্ত্র-বিগর্হিত আচরণের দ্বারা দুর্ভিক্ষ ও মহামারী হইয়া দেশ উৎসন্ন হইয়া যাইবে।" কেহ কেহ এমন কি রাজদ্বারে অভিযোগ পর্য্যন্ত করিলেন! কত ভীতি প্রদর্শন, কত নিন্দা, কত তিরস্কার সহ্য করিয়া এই সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল। পর্ব্বতের উচ্চশৃঙ্গ সমূহ হইতে ক্ষীণ জলধারাগুলি নিম্নের এক রুদ্ধ পর্ব্বতগুহায় যেমন কিছুকাল ধীরে ধীরে সঞ্চিত হয় ও কল কল ছল ছল রবে হৃদয়ের আনন্দ-আবেগ ব্যক্ত করে, তাহার পর এক শুভ মুহূর্ত্তে কোন ঊর্দ্ধ রাজ্য হইতে এক বিশাল তুষারস্তূপ গড়াইতে গড়াইতে আসিয়া দ্বার ভাঙ্গিয়া সেই গুহার মধ্যে প্রবেশ করে; অমনি রুদ্ধ জলরাশি মুক্ত বায়ুর হিল্লোলের মধ্যে উচ্ছল আবেগে দিগ্‌দিগন্তর প্লাবিত করিয়া কত গ্রাম, কত জনপদ ভাসাইয়া দিয়া, কত মরুভূমি শ্যামল শস্য-সম্পদে আকীর্ণ করিয়া সাগরের দিকে ছুটিয়া যায়, সেইরূপ গয়াক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবৃত্ত কৃষ্ণ-প্রেমবিভোর নিমাই পণ্ডিত আসিয়া শ্রীবাসের রুদ্ধ গৃহের সংকীর্ত্তন-মণ্ডলীতে লাফাইয়া পড়িলেন। শ্রীবাসের রুদ্ধগৃহ সেই বিপুল তুফানের বেগ ধরিতে পারিল না। প্রথমে নদীয়ার রাজপথে, শেষে দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে শত-ধারায় সহস্র-ধারায় সেই বেগ ছুটিয়া চলিল। এখনও তাহার গতির বিরাম নাই। সে প্রেমের মধুর হিল্লোলে একদিন সমস্ত জগৎ ভাসিবে তাহারও সূচনা দেখা যাইতেছে।

কতদিক দিয়াই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মত যে বিদ্রোহের বার্ত্তা আনিয়া আমাদের নিস্পন্দ জাতিকে জাগাইয়া তুলিয়াছিল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তিনি যে নবযুগের প্রবর্ত্তনা করিয়াছিলেন, এখনও সেই যুগ চলিতেছে। তাঁহার পতাকা বহন করিয়া আমরা এখনও ঠিক চলিতে

পারিতেছি না। কিন্তু আমাদের এই চারিশত বৎসরের যত আন্দোলন সমস্তই সেই পতাকা তুলিয়া ধরিবার জন্য। পঞ্চদশ শতাব্দীর বিদ্রোহের কথা ভাবিতে গেলে যবন হরিদাসকে স্মরণ করিতে হয়। শান্তিপুরের সুবৃহৎ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সমাজের একরূপ নেতা শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য সুকুলীন ব্রাহ্মণের প্রাপ্য শ্রাদ্ধ-পাত্র যবন হরিদাসের হস্তে দান করিলেন। এ বড় কম বিদ্রোহ নহে! শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য যদি প্রাচীন সমাজ ছাড়িয়া দিয়া এক অভিনব সমাজ সংগঠন করিতেন তাহা হইলে হয়ত এই বিদ্রোহের গুরুত্ব তত অধিক হইত না। কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই। ছয় গোস্বামীর মধ্যে একজন কায়স্থ। নরহরি সরকার, নরোত্তম ঠাকুর, উদ্ধরণ দত্ত, শ্যামানন্দ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ নহেন। রায় রামানন্দ শূদ্র। ঝড়ুঠাকুর ভূঁইমালি। আর কত বলিব! কত বড় বিদ্রোহ! আপনারা তৎকালীন গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া ও ধীর ভাবে চিন্তা করিয়া উপলব্ধি করুন।

এইবার **বৈষ্ণব ধর্ম্মের ইতিহাস** সংক্ষেপে বলিতেছি। অতি অল্পসংখ্যক পরিবার ব্যতীত উচ্চ বর্ণের লোকে এই মত গ্রহণ করেন নাই। অধিক কি অনাদর ও উপেক্ষা করিয়াছিলেন। উদ্ধরণ দত্ত ঠাকুরের সহিত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মিলন এই মত-প্রচারের একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। উদ্ধরণ দত্ত ঠাকুরকে পাওয়ায় শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সপ্তগ্রামের সুবর্ণ বণিক সমাজকে বৈষ্ণবমতে দীক্ষিত করিলেন। এই একটী অতি মঙ্গলকর কার্য্য হইল। কারণ এই সুবর্ণবণিক জাতি বৈশ্য জাতি এবং সদাচারপরায়ণ জাতি। ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে বল্লালসেনের সহিত কোন বিরোধের জন্য ইহাদিগকে সামাজিক হিসাবে ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রেম শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া একটী সামাজিক অবিচারের প্রতিবাদ করিল। এই প্রতিবাদ যে সঙ্গে সঙ্গে সফল হইয়াছিল, তাহা নহে। সফল হয় নাই বলিয়া বুঝিতে পারা যাইতেছে যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম্ম-মত, কত তীব্র প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়া এই চারি শত বৎসর কাল আমা-দিগকে সত্য ও মঙ্গলের দিকে আকর্ষণ করিতেছে।

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর নিকট বিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বিরের দীক্ষাগ্রহণ বৈষ্ণব ইতিহাসের আর একটী ঘটনা। বিষ্ণুপুরের রাজবাড়ীর সাহায্যে পশ্চিম-বঙ্গে এই প্রেমধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে প্রসার লাভ করিতে লাগিল। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর উত্তরবঙ্গে খেতরী গ্রামে সংসারে থাকিয়াও তীব্র বৈরাগ্যের মধ্যে জীবন

কাটাইতে লাগিলেন। তিনি ন্যায্যপ্রাপ্য বৃহৎ রাজ্য স্বেচ্ছায় ও সানন্দে পরিত্যাগ করিয়া দীনের ন্যায় দিন যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রভাবে উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজে এই মত প্রচারিত হইতে লাগিল।

শ্যামানন্দের দ্বারা উৎকলে প্রচার চলিতে লাগিল। বীরচন্দ্র প্রভু ঢাকা মণিপুর ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানে মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিলেন। বাহিরে চারিদিকে যে সময়ে এই মত প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছিল, তখন নবদ্বীপে ইহার প্রভাব ম্লান হইতেছিল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময় নবদ্বীপে চারিটী আন্দোলন হয়। রঘুনন্দনের স্মৃতির আন্দোলন, রঘুনাথের ন্যায়ের আন্দোলন, আগম-বাগীশের তন্ত্রের আন্দোলন, আর শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রেমভক্তির আন্দোলন। স্মৃতি, ন্যায় ও তন্ত্র এই তিনটীর পরস্পর যতই বৈষম্য থাকুক, প্রেম-ভক্তির আন্দোলনের বিরুদ্ধ ইহারা একতাবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, ফলে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে নবদ্বীপ এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে এই মত বহুদিন ভাল করিয়া মাথা তুলিতে পারে নাই। কিন্তু সত্যের গতি রুদ্ধ হইবার নহে। যাঁহারা আপনা-দিগকে সমাজের নেতা বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহাদের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও মহাপ্রভুর সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থপাঠ করিয়া এই প্রেমধর্ম্মের আন্দোলন সম্বন্ধে একটি খুব আবশ্যকীয় কথা জানিতে পারা যায়। আমরা গর্ব্ব করিয়া বলিয়া থাকি এবং কথাটাও সত্য যে আমাদের দেশের সাধারণ জনশ্রেণী (Mass) অন্যান্য দেশের অনুরূপ শ্রেণীর লোক অপেক্ষা চরিত্রবান, সংযমী, ধর্ম্মভীরু ও মিতব্যয়ী। আমাদের দেশের গ্রামে গ্রামে দেবালয়, বাড়ী বাড়ী ঠাকুর-পূজা, পুণ্যকর্ম্মের প্রবাহ অবিশ্রান্তভাবে প্রতিনিয়ত বহিয়া যাইতেছে। এই অবস্থাটা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের প্রচারের দ্বারাই সাধিত হইয়াছে! বৈষ্ণব কবিতায় আছে "ভাষায় লিখিত হলে, বুঝিবে লোক সকলে, কবে ইচ্ছা পুরাবেন প্রভু" এই আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ আমাদের যাবতীয় শাস্ত্র বঙ্গ-ভাষায় প্রচার করিয়া সাধারণ লোকের মধ্যে ধর্ম্মমূলক শিক্ষা-প্রচারের কার্য্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম-প্রচারের ফলেই আরব্ধ হয়।

বাঙ্গালা সাহিত্যের সৃষ্টি ও পুষ্টি প্রথমতঃ বৈষ্ণব আন্দোলনের দ্বারাই হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুবর্ত্তীগণ এক অভিনব দৃষ্টিতে হিন্দুসমাজ ও [illegible] করিয়াছিলেন। এই কলিযুগে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক

ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিতে আরম্ভ হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ক্ষত্রিয় বীরগণ প্রায় ধ্বংস হইয়া যান। যে কয়জন ছিলেন যদুবংশধ্বংসের ফলে তাহারও ধ্বংস ঘটে। কলিযুগ আরম্ভ হইতে হইতেই ভারতবর্ষের রুদ্ধদ্বার খুলিয়া গেল। হূন, শক, পার্সি, গ্রীক প্রভৃতি আসিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করতঃ ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন করিতে আরম্ভ করে। মধ্যে মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতির ন্যায় এক একজন বিক্রমশালী রাজার প্রতাপে মুক্তদ্বার কিছু দিনের জন্য কিয়ৎ-পরিমাণে রুদ্ধ হইত বটে কিন্তু স্থায়িরূপে আর সে দ্বার রুদ্ধ করা গেল না। ভারতবর্ষের বুকে যেটুকু ক্ষাত্রশক্তি ছিল পৃথ্বিরাজ ও জয়চন্দ্রের সময় তাহা বিনাশপ্রাপ্ত হইলে এক নূতন ধর্ম্ম ও এক নূতন সমাজের সাম্যময় আদর্শের বিজয়-দুন্দুভি বাজাইতে বাজাইতে নববলে বলীয়ান মুসলমান আসিয়া ভারতবর্ষে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিল। হিন্দুসমাজের নেতৃবৃন্দ যাহাদিগকে ঘৃণা করিতেন তাহারা দলে দলে মুসলমান হইতে লাগিল।

মুসলমান আগমনের তিনশত বৎসর পরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব। তখন হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে আর তত শত্রুতা নাই। কিন্তু মুসলমান প্রভাবের নিকট হিন্দু প্রতিদিন মলিন হইয়া যাইতেছিল। নানক কবীর রামানন্দ প্রভৃতি যে ভাবের আভাস দেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুতেও সেই ভাবের উদ্দীপনা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ে পর্ত্তুগীজেরা ভারতবর্ষে আসিয়াছে। মহাপ্রভু দেখিতে পাইলেন অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর সকল দেশের ও সকল ধর্ম্মের লোক একত্র মিলিত হইবে। এই ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতা ও সামাজিক আদর্শের ঘাতপ্রতিঘাত হিন্দুস্থানকে সহ্য করিতে হইবে। সেই সংঘর্ষে হিন্দু যে কি করিয়া বাঁচিবে তাহা সে জানে না, সে কেবল বর্জ্জনের দ্বারা, জটিল তর্কের দ্বারা, প্রাণশূন্য ব্যর্থ আড়ম্বরের দ্বারা, মোহাবিষ্ট-ভাবে আত্মপ্রসাদ ভোগ করিতেছিল। এইরূপ দুর্দ্দশার অন্ধকার অমানিশার মধ্যে প্রেম-সুধাকর শ্রীগৌরাঙ্গ আসিয়া সমুদিত হইলেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুবর্ত্তীগণ আমাদের জাতিবিভাগের বাহিরেও হিন্দু থাকিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিলেন।

"জাত" হারাইলেই সে কালে মুসলমান হইতে হইত এবং "জাত" জিনিসটা মোটেই ঘাতসহ ছিল না। আর সাম্যবাদী মুসলমান আমাদের "জাত" মারিয়া কৌতুক করিতে ভাল বাসিত। একবার "জাতের" বাহিরে গেলে হিন্দুসমাজে তাহার আর দাঁড়াইবার ঠাঁই ছিল না। কাজেই বাধ্য হইয়া

তাহাকে মুসলমান হইতে হইত। এমন করিয়া কত লোক মুসলমান হইয়াছে গণনা করা যায় না।

প্রেমধর্ম্ম প্রচারিত হওয়ার পর ধীরে ধীরে বৈষ্ণব বা বৈরাগী বলিয়া একটী স্বতন্ত্র "জাত" গড়িয়া উঠিল। ইহাদিগকে জাতি না বলাই ভাল, "বর্ণ-বহির্ভূত হিন্দু" এইটীই তাহাদের ঠিক নাম।

ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতা প্রভৃতির দ্বারা অভিভূতচিত্ত ব্যক্তিগণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম্মের প্রসার বৃদ্ধি দেখিয়া বৈষ্ণব হইতে লাগিল। এই প্রবাহে বাউল, দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া কর্ত্তাভজা প্রভৃতি দলের সৃষ্টি হইতে লাগিল।

এইবার বৈষ্ণবসমাজের গৃহবিবাদের ইতিহাস সমালোচনা করা যাউক। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময়, এক উদ্দীপনার সময়। সে সময়ে এবং তাহার পরেও কায়স্থ বৈদ্য আদি বর্ণের লোকেও ব্রাহ্মণকে দীক্ষা দিয়া শিষ্য করিতে লাগিলেন। উদ্দীপনার সময় সকলই সম্ভব। কিন্তু উদ্দীপনা স্থায়ী হয় না। যেই উদ্দীপনার সময় চলিয়া গেল, হিসাবনিকাশের সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণেরা, যাঁহারা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভাবিলেন—কি আশ্চর্য্য! গুরুগিরি-ব্যবসায় অন্য বর্ণের লোক কেন করিবে? এই সমস্ত ব্রাহ্মণেরা ঠিক আনুষ্ঠানিক বৈষ্ণব হইতে পারেন নাই। তাঁহারা শিষ্যদিগের জন্য পরাহে একাদশীর ব্যবস্থা করিলেন বটে কিন্তু নিজেরা স্মৃতির শাসনের ভয়ে তাহার অনুষ্ঠান করিতে পারিলেন না। পুরুষেরা কেহ কেহ পারিলেন বটে, কিন্তু বিধবাদিগের জন্য পরাহের ব্যবস্থা করিতে সাহস করিলেন না।

রঘুনন্দনের প্রভাব অত্যন্ত অধিক। এই প্রভাবের নিকট গোস্বামীগণ পরাস্ত হইয়া দুদিক বজায়ের পথ আশ্রয় করিলেন। বৈষ্ণবের নিকট বৈষ্ণব হইয়া হরিভক্তি-বিলাসের বচন উদ্ধার করেন। আর স্মার্ত্তের নিকট স্মার্ত্ত হইয়া রঘুনন্দনের বচন উদ্ধার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা এই ভাবে চলিলেন, একেবারে স্রোতে ভাসিতে পারিলেন না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে নবদ্বীপ ও তৎনিকটবর্ত্তী স্থান-সমূহে বৈষ্ণবধর্ম্ম দীর্ঘকাল ভাল করিয়া মাথা তুলিতে পারে নাই। স্মৃতি ন্যায় ও তন্ত্র ইহাদের নিজেদের মধ্যে যতই বিরোধ থাকুক না কেন এই প্রেম-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সময় তাহারা একতাবদ্ধ হইল। কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ী হইতে বৈষ্ণব-সমাজের উপর মাঝে মাঝে

অত্যাচার হইয়াছে। নবদ্বীপে অনেক বৈষ্ণবের অনেক নির্য্যাতন হইয়াছে। রাসের দিন নবদ্বীপে যে রাসকালীর পূজা হয় সম্ভবতঃ বৈষ্ণবদিগের বিরুদ্ধাচরণের জন্যই ইহার সৃষ্টি। এই প্রকারে সংঘর্ষ চলিতে লাগিল। ক্রমে দেশে ইংরাজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হইল। খৃষ্টান মিসনারীরা আসিয়া উপস্থিত হইল; রাজা রামমোহন রায়ের উদ্ভব, ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার, মুদ্রা-যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি হইল, কালে দেশের অবস্থা একেবারে বদলাইয়া গেল। বর্ত্তমান সময়ে বৈষ্ণবধর্ম্মের যে পুনরুত্থান হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই পুনরুত্থানের ইতিহাসও শিক্ষাপ্রদ। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে থিওসফিক্যাল সোসাইটি ও আর্য্যসমাজের চেষ্টায় হিন্দু ধর্ম্মের যে পুনরুত্থান হয়, তাহা পঞ্চদশ শতাব্দিতে নবদ্বীপের আন্দোলনের মত স্মার স্মৃতি তন্ত্র ন্যায়ও ভক্তি এই চারিটী পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। বৈষ্ণব ধর্ম্মের পুনরুত্থানের সহিত ব্রাহ্ম-সমাজের সম্বন্ধ আছে। সাধু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কেবল বাক্যময় উপাসনায় ধর্ম্মজীবনের শুষ্কতা অনুভব করিয়া ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া সংকীর্ত্তনের প্রবর্ত্তন করিলেন। শিক্ষিত বাঙ্গালীর উপর কেশবচন্দ্রের প্রভাব একসময়ে খুব অধিক ছিল। কলিকাতা সহরের রাজপথে বিশ্ববিখ্যাত-কীর্ত্তি কেশবচন্দ্র যেদিন নগরসংকীর্ত্তনে বাহির হইয়া "হরি হরি" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন সেদিন সকলে বুঝিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু আমাদের জাতীয় সাধনার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। শিশিরকুমার ঘোষ সম্বন্ধে তাঁহার বাৎসরিক শ্রাদ্ধের দিন আমি একটী কথা বলিয়াছিলাম, দুঃখের বিষয় সংবাদ পত্রের বিবরণীতে তাহা প্রচারিত হয় নাই। শিশিরকুমারের অনুবর্ত্তীগণ তাঁহাকে কি ভাবে বুঝিতেছেন তাহা নির্ণয় করা যায় না। আমি সেদিন বলিয়াছিলাম যে St. Francis of Assisiর সহিত যিশুখৃষ্টের যে সম্বন্ধ শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত শিশির বাবুর কতকটা সেইরূপ সম্বন্ধ। শিশির বাবু হৃদয়ের মধ্যে দেশকে পাইতে চাহিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার জীবনের মূল প্রেরণা ছিল। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য তিনি নানাপথে পর্য্যটন করিয়াছেন। সর্ব্বশেষে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রেম-আন্দোলনের সহিত পরিচিত হইয়া তিনি সফলকাম হইলেন। এই শিশিরকুমার একদিন উৎসাহী ব্রাহ্ম ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের চেষ্টার মধ্যে তিনি দেশকে পান নাই। রাজনীতিক আন্দো-

কাটের সঙ্গ লইয়াছিলেন, অলৌকিক তত্ত্ব জানিবার জন্য। এই অলৌকিকের প্রতি তাহার আগ্রহাতিশয় চিরদিনই ছিল। হিন্দুশাস্ত্রে তিনি যে সুপণ্ডিত ছিলেন তাহা মোটেই নহে। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পতাকা তাঁহার হাতে পড়িয়াছিল। বৈষ্ণব ধর্ম্মের এই পুনরুত্থানের আলোচনায় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও শিশিরকুমার ঘোষ এই দুই জনের নাম বিশেষরূপে স্মরণীয়। ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্য হইতে আরও তিনজন লোক এই পুনরুত্থানে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। কালীনাথ দত্ত, জগদীশ্বর গুপ্ত ও চিরঞ্জীব শর্ম্মা।

বাংলা সাহিত্যের প্রতি শিক্ষিত বাঙ্গালীর অনুরাগ বৈষ্ণবধর্ম্মের পুনরুত্থানের একটী প্রধান কারণ। বৈষ্ণবকবিতা ও কাব্য বড়ই মধুর ও উচ্চ বস্তু। ইহার আলোচনা আমাদের জাতিকে ক্রমে ক্রমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণ-মূলে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে সমাজ দেহের যে সমস্ত বৈষম্যব্যাধি আমাদিগকে নিপীড়িত করিতেছে, সে সমুদয়ের চিকিৎসা-চেষ্টাও বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি এই নব-জাগ্রত অনুরাগের অন্যতম কারণ।

বৈষ্ণবধর্ম্মের পুনরুত্থান আলোচনায় কেবল ভাবের দিক দিয়া অগ্রসর হইলেও চলিবে না। একটু বস্তুর দিকেও দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক। উচ্চবর্ণের যে সমস্ত লোক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত এই প্রেমধর্ম্মকে বাধা দিয়া-ছিলেন—কাল-চক্রের আবর্ত্তনে তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা বড়ই খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। যে সমস্ত ব্যবসায়ী জাতি শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে স্বীকার করেন, তাঁহাদের অবস্থা সচ্ছল। ইহার ফলে দেখিতে পাই শত শত স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণের সন্তান ও অনেক প্রতিষ্ঠাকামী ইংরাজীনবিস—বৈষ্ণবধর্ম্মের অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছেন। ইহার নাম অর্থনৈতিক কারণ, এ কারণটীও উপেক্ষণীয় নহে। আমরা বৈষ্ণবধর্ম্মের পুনরুত্থানের ইতিহাস আলোচনায় যে সমস্ত নাম উল্লেখ করিয়াছি, তাহা ছাড়া নবদ্বীপ হরিসভার প্রতিষ্ঠাতা ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ও রাই উন্মাদিনীর লেখক কৃষ্ণকমল গোস্বামীর নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। ইহা ছাড়া গ্রন্থ প্রচারাদি কার্য্যের দ্বারা অনেকেই এই বিভাগের উন্নতির সাহায্য করিয়াছেন।

বৈষ্ণবধর্ম্মের ইতিহাস ও আমাদের সেবাশ্রম—এই দুইটী বিষয়ের সহিত বেশ করিয়া পরিচয় হইলে আমাদের নিদাঘ-বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য কি তাহা বুঝিতে পারা যাইবে, একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এখন আমাদের

এই নবদ্বীপধাম বঙ্গের বৈষ্ণব-আন্দোলনের কেন্দ্র। প্রতিদিন নবদ্বীপের লোকসংখ্যা বাড়িতেছে এবং উত্তরোত্তর বাড়িয়াই যাইবে। বাঙ্গালী তীর্থের জন্ত বহুদিন পশ্চিম ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে, এখন সে নিজের দেশেই তীর্থ-দর্শনের অভিলাষী। বাঙ্গালীর নবজাগ্রত আত্মগৌরববোধের সঙ্গেও শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের বিস্তৃতি ও নবদ্বীপের আয়তন-বৃদ্ধির ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। কাশীধামে যেমন হিন্দুস্থানের সকল প্রদেশের লোক একত্তাবদ্ধ হইয়াছে, দেখিতে দেখিতে নবদ্বীপে সেইরূপ বঙ্গদেশ উৎকল ও আসামের সকল জেলার লোকই সম্মিলিত হইল। আর কিছুদিন পরে নবদ্বীপ কাশীর মতই বৃহৎ সহর হইবে। কিন্তু কাশীধামের সহিত নবদ্বীপের একটী বিশেষ প্রভেদ আছে। কাশীতে মা অন্নপূর্ণা বিরাজ করিতেছেন, শত শত অন্নসত্র আছে, যথায় বহু দরিদ্রের অন্নসংস্থান হয়। কাশীতে বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরের ভিতর উঠানে প্রোথিত টাকা মারাইয়া যাইতে হয়। আর নবদ্বীপের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ ভিখারী; সেকালে ভক্তহৃদয়ের প্রেম ভিক্ষা করিয়াছিলেন, একালে দুই আনা চারি আনা করিয়া ভেট আদায় করিতেছেন! লোকে এজন্ত সেবাইতদিগকেই দোষ দেয়, কিন্তু তাঁহারা অধিকাংশই দরিদ্র, সুতরাং মন্দির চলিবে কি করিয়া ইহাও অবশ্ত ভাবিবার কথা। তবে যাঁহারা বহু টাকা মূলধন নিযুক্ত করিয়া, বৃহৎ মন্দির করিয়া ব্যবসায় করিবার জন্ত নবদ্বীপে আসিয়াছেন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু পূর্ব্ব হইতে যে সমস্ত মন্দির আছে সেগুলি কি করিয়া রক্ষা হয়, ইহা ভাবিবার কথা। তীর্থ-স্থানে দরিদ্র ব্যক্তি আসিবেই, নবদ্বীপেও প্রত্যহ বহু দরিদ্রের সমাগম হয়, কিন্তু দরিদ্রকে একমুষ্টি অন্ন দিবার একটি স্থানও নবদ্বীপে নাই। তবে কি নবদ্বীপের বৈষ্ণবসমাজ বদান্য নহে? যথেষ্ট দান আছে, কিন্তু তাহার সমস্তটাই তৈলসিক্ত মস্তকে তৈলদান মাত্র! মুষ্টি-ভিক্ষা দেওয়া হয়, যাহাদের গায়ে জোর আছে, জনতা ভেদ করিয়া সম্মুখে গিয়া তাহারাই সেই ভিক্ষা পায়। যাহার পায়ের জোর আছে, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া তাহারা নিজেদের মাদক সেবনের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াও অর্থ সঞ্চয় করে। দান আছে বলিয়া অবশ্ত বেশী কিছু যে আছে তাহা নহে। সাধারণ দরিদ্রের জন্ত ত কিছুই নাই! যেটুকু আছে তাহা আলস্তকে প্রশ্রয় দান করিয়া জাতির জীবনপ্রবাহে বিষক্রিয়া করিতেছে! ইংরাজী-নবিশ বাবুরা, যাঁহারা ভাললোক, তাঁহারা সভা সমিতি করেন, বই লেখেন, খবরের কাগজ লেখেন, মনে করেন দেশে জ্ঞান ও ধর্ম্ম বিস্তার করিতেছি।

তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে তাঁহাদের এই প্রভাব সমাজ জীবনের কেবলমাত্র উপরের পর্দায় অবস্থিত; এবং উহা অতি অল্পসংখ্যক লোকের হৃদয় স্পর্শ করিয়া পশ্চিমের দিকে উড়িয়া চলিয়া যায়। বঙ্গালী হিন্দুর সমাজ-জীবনের নবদ্বীপই রাজধানী। বাঙ্গালা দেশকে আমরা যদি জানিতাম,কল্পনার মরীচিকার পশ্চাতে আমাদের জাতির উদ্যম যদি মোহাচ্ছন্নচিত্তে ভ্রাম্যমান না হইত, তাহা হইলে সাধনা ও চিন্তার রক্তধারা যেখান হইতে বাহির হইয়া সমুদয় হিন্দু-বঙ্গের পল্লীসমাজের মধ্যে প্রতিদিন ক্রিয়া করিতেছে, সেই নবদ্বীপ আমাদের জাতীয় সাধনার একটী প্রধান ক্ষেত্র হইয়া পড়িত। আজকাল ইংরাজী-নবিশদের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি অনেকের অনুরাগ হইয়াছে, কিন্তু এই অনুরাগের পশ্চাতে লোক ঠকাইয়া পয়সা রোজগারের চেষ্টাই বড়, সত্যের উপাসনা নয়। আমি আজ ক্ষীণ-কণ্ঠে দেশকে সাবধান হইতে বলিতেছি। ইংরাজী পড়িয়া আমরা উকিল হই। বৈষ্ণব সমাজেরও উকীল আছেন। প্রকাশ্য সংবাদপত্রে ব্যভিচারের পক্ষ-সমর্থন করিয়া হীন-চরিত্র জালিয়াতকে সাধু সাজাইয়া উদরান্ন সংগ্রহের জন্য যাহারা ছুটিয়াছে, হে আমার দেশ, তুমি কি এখনও তাহাদের চিনিতে পার নাই? অথবা চিনিতে পারিয়াও প্রকাশ্য-ভাবে তাহাদিগকে ঘৃণা করিবার সাহস তোমার হইতেছে না?

বৈষ্ণব শাস্ত্র আলোচনা করিল দেখা যাইবে যে জনসেবার আদর্শ তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু মেলার সময় নবদ্বীপে যখন বহু যাত্রীর সমাগম হয়, বিসূচিকা রোগগ্রস্ত হইয়া শত শত দরিদ্র ব্যক্তি পথিপার্শ্বে ভূমিশয্যায় শুইয়া যখন জল জল করিয়া রোদন করে, সঙ্গীগণ সঙ্গের অর্থ অপহরণ করিয়া আপনাদের বাঁচাইবার জন্য যখন পলাইয়া যায়, তখন সাধু বৈষ্ণবগণ বাড়ীর সদর দরজায় খিল দিয়া উচ্চ সংকীর্ত্তনে নাচিয়া ক্ষুধা বাড়াইয়া, ধর্ম্মভীরু ধনীর অর্থে অনুষ্ঠিত মহোৎসবের মহার্ঘ্য খাদ্যে রসনার তৃপ্তিসাধন করেন। এ দৃশ্য দেখিলে কে বলিবে ভদ্র মানবসমাজে আমাদের স্থান আছে? কে বলিবে জগতের নিকট পদানত হইয়া কুক্কুর বিড়ালের ন্যায় ঘৃণিত জীবন যাপন করা ব্যতীত অন্যরূপ কোনও সৌভাগ্যের আমরা অধিকারী? হে আমার দেশ! তুমি আর লক্ষ করিও না। তোমার প্রধান তীর্থ নবদ্বীপে তোমার পরিচয় পাইয়াছি। এতদিন এত যাত্রী নবদ্বীপে যাতায়াত করে, কিন্তু এই শোচনীয় অবস্থার প্রতি কাহারও দৃষ্টি পড়ে নাই। শ্রীশ্রীমৎ রাধারমণ

চরণ দাস বাবাজী মহাশয় নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন অনেকগুলি সংস্কারের আকাঙ্খা তাঁহার সাধু-জীবনে জাগিয়াছিল। তাঁহারই একজন প্রিয় শিষ্য শ্রীমৎ নিত্যানন্দ দাস নবদ্বীপে শ্রীশ্রীরাধারমণ-সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ভগবানের প্রতি চাহিয়া এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়, সেবকগণকে উপদেশ দেওয়া হয়, বৃহৎ কার্য্য করিব এ দুরাশা পোষণ করিতে মানবের অধিকার নাই। নিজের সর্ব্বস্ব, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত, যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝি, তাহার জন্য পরিত্যাগ করিতে হইবে, ইহাই প্রকৃত সাধনা। সাধু নিত্যানন্দ দাস ঠিক তাহাই করিয়া গিয়াছেন। সেবাশ্রমের কার্য্য ও ইতিহাস সম্বন্ধে আজ আর কিছু বলিব না। কার্য্য আপনাদিগের সম্মুখে পড়িয়া আছে। আপনারা নবদ্বীপের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিবেন, সেবাশ্রমের কার্য্য দেখিবেন, কিছু কিছু বৈষ্ণব-গ্রন্থ আলোচনা করিবেন এবং এই ভাবে একমাস কাটাইয়া বাড়ী গিয়া সে সম্বন্ধে চিন্তা করিবেন। এইজন্যই আমরা আপনাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া এখানে আনিয়াছি। আমরা অত্যন্ত দরিদ্র আপনারা তাহা জানেন। দরিদ্র্যকে যাঁহারা ঘৃণা করেন তাহারা রাজা মহারাজার নিমন্ত্রণে ভূরি-ভোজনে আপ্যায়িত হইয়াছেন। আমার দরিদ্র, দেশের দরিদ্রেরা নিত্য যাহা যায়, তাহাই খাইয়া, আমাদের দরিদ্র দেশের দরিদ্রেরা যেভাবে থাকে সেই-ভাবে থাকিয়া একটী মাসকাল প্রকৃত দেশের সহিত একাত্মতা বোধ করাই-বার জন্য আপনাদিগকে ডাকিয়া আনিয়াছি। আজকাল এই দুর্ভিক্ষের দিনে ধনীর দুয়ারে ভূরিভোজনের অপব্যয়ে যেরূপ জনতা, তাহাতে এত দরিদ্র হইয়াও আমরা কি জন্য আপনাদিগকে ডাকিয়াছি তাহাও বলা দরকার।

কেবল আমাদের দেশে বলিলেও ঠিক হইবে না, সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়াই একটা নূতন ভাব আসিতেছে। এই ভাবটাই যুগধর্ম্ম। জনসেবাই এই ভাব। আমাদের দেশ, বিশেষ করিয়া দেশের যুবকগণ এই ভাবের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন। এই ভাবেরও একটা সংক্রামকতা আছে। সকল ধর্ম্মের ন্যায় এই ধর্ম্মেরও একটা ধর্ম্মাভাস ও ছলধর্ম্ম আছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যুবক-গণের চিত্তে যে একটা নব-জাগরণ আসিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই জাগরণটাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি এইজন্য আপনাদিগকে আহ্বান করিতে সাহসী হইয়াছি। আমাদের কার্য্য সবে আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। আমাদের অনেক লোকের দরকার। অনেক লোক ছাড়া

বীরভূমি—বৈশাখ ১৩২২

নবদ্বীপ নিদাঘ বিদ্যালয় (১ম বর্ষ)

কিছুই হইবে না। প্রথমে চিন্তারাজ্যের মধ্যে সাহিত্যসৃষ্টি ও সাহিত্য-প্রচারের দ্বারা একটা আন্দোলন হওয়া চাই! আমাদের সামান্যরূপে এ চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। আমেরিকা দেশে যাইয়া হিন্দুধর্ম্মের মহত্ব বা বেদান্ত-দর্শনের গভীরতা প্রচারের দ্বারা দুই চারিজন ব্যক্তি যশস্বী হইলে আমাদের যাহা প্রকৃত দুর্গতি, তাহার অবসান হইবে না। দেশের মধ্যে এত বেশী কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে, যে শত শত শক্তিশালী কর্ম্মীর এই মুহূর্ত্তেই প্রয়োজন, আমাদের একজন তামিল ভাষা পড়িতেছে, একজন গুজ-রাটি ভাষা পড়িতেছে। এই প্রকারে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের লোক লইয়া এই নবদ্বীপে আমরা একটী ভ্রাতৃমণ্ডলী (Brotherhood) করিতে চাই। যাহা করিতে চাই অর্থাৎ যাহা এখনও হয় নাই, কেবল তাহারই কথা বলিলাম। যাহা হইয়াছে এবং হইতেছে সে সম্বন্ধে কোন কথা বলার দরকার নাই।

আজ সকল দেশের ও সকল যুগের সাধুবৃন্দের চরণরেণু আমাদের মস্তকোপরি বর্ষিত হউক। প্রেমের বন্যায় আমাদের সকলের হৃদয় ভাসিয়া যাউক, সংকীর্ণতার গণ্ডি ভাঙ্গিয়া আনন্দের ও মিলনের গান গাহিতে গাহিতে জীবনের ব্রত উদ্‌যাপনের নিমিত্ত আমরা অগ্রসর হই।

বিশ্বসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান।

মহাকবি রবীন্দ্রনাথ আজ বিশ্ববিখ্যাত। প্রাচ্যের ন্যায় প্রতীচ্যও তাঁহার প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বরণ করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার গান ও কবিতা ক্রমেই দেশদেশান্তরের লোকের হৃদয় জয় করিতেছে। এমন সৌভাগ্য সকল কবির অদৃষ্টে ঘটে না। তাই স্বভাবতঃই দেশবিদেশের অনেক পণ্ডিত ও মনীষী ব্যক্তি তাঁহার প্রতিভার মূলতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন ও করিতে-ছেন। ১৯১৪ সালের মার্চ্চ মাসের টাইমসের Literary supplementএ একজন ইংরাজ লেখক এইরূপ একটা চেষ্টার পরিচয় দিয়াছেন। তাহাতে একটু নূতনত্ব আছে। তিনি বলেন, প্রতীচ্যদেশে রবীন্দ্রনাথের এই যে যশো-বিস্তার হইয়াছে, ইহা সম্ভবতঃ ক্ষণিক, কেন না ইহা প্রতীচ্যবাসীর খেয়ালের উপরে প্রতিষ্ঠিত,—ইহা যে কোন মুহূর্ত্তে লোপ পাইতে পারে। তবে এই খেয়ালের একটা ভিত্তি আছে। তাহার অনুসন্ধান করিতে যাইয়া লেখক বলিয়াছেন যে প্রাচ্যের রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্য ও গানে নূতনভাবে খৃষ্টান-

ধর্ম্মের সত্যগুলিই প্রচার করিতেছেন। উপনিষদের আবরণে খৃষ্টানী মতবাদই তাঁহার লেখায় ফুটিয়া বাহির হইতেছে। ইহাতে খৃষ্টান ইউরোপ যেমন তাহার নিজের ধর্ম্ম ও সভ্যতাকে নূতন আলোকে দেখিতে পাইয়া মুগ্ধ হইতেছে—অন্যদিকে ভারতের—কবির নিজের দেশে, নিজের সমাজে, খৃষ্টানী সভ্যতা প্রচারের ইহা একটা যন্ত্রস্বরূপ হইবে মনে করিয়া ততোধিক আনন্দিত হইতেছে। ইহাই লেখকের মতে প্রতীচ্যে রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তা ও যশোবিস্তারের কারণ। দেখিতেছি, আমাদের দেশের কোন কোন প্রসিদ্ধ লেখক একটু আদরের সঙ্গেই ইংরাজ-লেখকের মতকে বরণ করিয়া লইতেছেন। যেন ইহার জন্যই তাঁহারা অপেক্ষা করিয়াছিলেন। এতদিন রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মর্ম্ম ও প্রতিভা যেন আমাদের জানা ছিল না, হঠাৎ একজন অখ্যাতনামা ইংরাজ লেখকের এই অপূর্ব্ব আবিষ্কারে তাহা জানিতে পারিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

কিন্তু কথাটা কি একটু তলাইয়া দেখা উচিত। চিলে কান লইয়া গেল, এই কথা শুনিয়াই চিলের পশ্চাতে দৌড়ান অপেক্ষা কানটা বাস্তবিকই কাটিয়া লইয়া গেল কিনা, তাহাই প্রথমতঃ দেখা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা এতদিন ধরিয়া এই বঙ্গদেশ ও সমাজের মধ্যেই বিকাশপ্রাপ্ত হইতেছিল ; এ দেশের লোক এতদিন ধরিয়া তাঁহার কবিতা ও গান শুনিয়া আসিতেছিল। এতকাল আমরা রবীন্দ্রনাথের খ্রীষ্টানীভাবের প্রভাব বুঝিতে পারিলাম না, আর আজ হঠাৎ সেটা একজন ইংরাজের কথায় ধরা পড়িয়া গেল ইহা বাস্তবিকই একটু বিস্ময়ের কথা।

কোন একটা বিশেষ মত-বাদ আশ্রয় করিয়া বা কোন একটা তত্ত্বব্যাখ্যা বা প্রচারের জন্য জগতে অনেক কবিতা লেখা হইয়াছে সত্য ; কিন্তু সেগুলি বাস্তবিক পক্ষে কবিতা নহে। কবিতার ভাষায় লেখা হইলেও সেগুলি বিশেষ মতবাদ বা তত্ত্ব বা ধর্ম্মবিশেষের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ছাড়া আর কিছু নহে। জীর্ণ কীটদষ্ট বস্তুর উপরে সুন্দর রংএর প্রলেপ দিলেও যেমন তাহার নিজের স্বরূপ দূর হয় না, 'থিওরি' বিশেষের ব্যাখ্যার উপরে কবিতার প্রলেপ দিলেও তাহা কবিতা হইয়া উঠে না। খাঁটী কবিতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিষ। তাহা কবির অন্তরসৌন্দর্য্যের মধ্যে জন্মলাভ করিয়া শতদলের ন্যায় বিকশিত হইয়া উঠে। কবিচিত্তের এই নিভৃত অন্তঃপুরে রস ও সৌন্দর্য্যের খেলাই বসিয়া থাকে ; তত্ত্ব ব্যাখ্যা ও 'থিওরির' এখানে অধিকার নাই। খাঁটি শিল্পী

যেমন মতবিশেষ প্রচারের জন্য আপনার শিল্প গড়েন না, কবিও তেমনি কোন ব্যাখ্যার ওকালতী লইয়া—সাহিত্যের দরবারে বক্তৃতা করিতে আসেন না। যেখানেই শিল্প আপনার অধিকার ছাড়িয়া মতকে প্রচার করিতে গিয়াছে, সেইখানেই তাহার শিল্পত্ব যেমন লোপ পাইয়াছে, কবিতাও তেমনই আপনার মহিমার গণ্ডী ছাড়িয়া বক্তৃতা করিতে যখনই সুরু করিয়াছে, তখনই তাহার আসল জিনিষটী হারাইয়া বসিয়াছে। আমাদের এই সমাজব্যাপারে যেমন শ্রমবিভাগের নিয়ম আছে, সাহিত্যেও তেমনই। এখানে নীতি, ধর্ম্ম, বা "থিওরি" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার ভার তত্ত্ববিদ্যা, দর্শন বা ধর্ম্মবিজ্ঞানের উপর। কবিতার উপর সে ভার নাই। তাহার কাজ শুধু আনন্দ ও সৌন্দর্য্য লইয়া—বীণা-যন্ত্রের তার বাঁধিয়া শ্রোতৃবর্গের হৃদয় স্পর্শ করিতেই সে ব্যস্ত।

কিন্তু ধর্ম্ম বা মতকে প্রচার করা কবিতার কাজ না হইলেও, ধর্ম্ম ও মতকে ঠেলিয়া ফেলাও কবিতার সাধ্য নহে। মানুষের ব্যক্তিত্বের যতই বড়াই করি না কেন, যে দেশ ও বংশে সে জন্মগ্রহণ করে, সেই দেশ ও বংশের জীবনের ধারা যেমন তাহার ব্যক্তিত্বের মধ্যে ফুটিয়া উঠে; প্রতিভাও তেমনি, যে ধর্ম্ম, সমাজ ও সভ্যতার মধ্যে বিকাশ পায়, তাহারই ভাবের ধারা তাহাকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলে; বিভিন্ন দেশের কবি ও গায়ক এক মূল সৌন্দর্য্য ও রসের সাধক হইলেও যে ধর্ম্ম ও সভ্যতার মধ্যে যে ভাবের পরিবেষ্টনীতে কবির জীবন বর্দ্ধিত হয়, তাহারই বর্ণ ও গন্ধে তাঁহার কবিত্ব উজ্জ্বল ও সরস হইয়া উঠে। সুতরাং কবি মুখ্যতঃ কোন ধর্ম্ম সভ্যতা বা ভাবকে প্রচার না করিলেও যে ধর্ম্ম, সভ্যতা বা ভাবের মধ্যে তাঁহার প্রতিভার জন্ম ও পরিপুষ্টি তাহার "ছাপ" তাঁহার কাব্যে থাকিবেই। সেই ধর্ম্ম ও সভ্যতা লইয়া তিনি বক্তৃতা করেন না বটে—কিন্তু তাহাদের সত্য ও ভাবের ধারা তাঁহার প্রতিভার কনকরশ্মিতে মনোহর হইয়া লোকের অন্তঃস্থল স্পর্শ করে।

যাঁহারা প্রকৃত কবি তাঁহাদের কাব্যে এইরূপ বিশেষ বিশেষ সত্য ও ভাবের ধারা পরিস্ফুট হইয়া উঠে—বিশ্বের চিরন্তন সত্যগুলি এইরূপে তাঁহাদের সৌন্দর্য্যের তুলিকায় সজীব হইয়া দেখা দেয়।

এই বিশ্বজগতের দিকে চাহিলে একটা খুব স্পষ্ট সত্য আমাদের চোখে পড়িয়া যায়। এই সৃষ্টিচক্রের মধ্যে জড়জগতে প্রাণীজগতে সর্ব্বত্র একটা প্রবল নীতি কার্য্য করিতেছে;—তাহাকে বলা যায় দ্বন্দ্ব। অণুপরমাণুর পরস্পরের প্রতি ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায়, সৌরজগতের বিচিত্র গতিতে এই দ্বন্দ্ব-

নীতিই আত্মপ্রকাশ করিতেছে। উদ্ভিদনামধারী প্রাণী (১) হইতে অতি ক্ষুদ্র চক্ষুর অগোচর কীট-পতঙ্গের মধ্য দিয়া উচ্চতর মানব সমাজ পর্য্যন্ত পরস্পরের প্রতিযোগিতায় জীবনযুদ্ধের প্রয়োজনীয়তায় সেই দ্বন্দ্বনীতিরই খেলা চলিতেছে। প্রাণীতে প্রাণীতে অহরহ যে হিংসার আক্রোশ, যে ভীষণ যুদ্ধ-বিগ্রহ হত্যাকাণ্ডের অভিনয় দেখিতেছি—ইহাতে সেই মৃত্যুরূপী সর্ব্বগ্রাসী বিরাটেরই লীলা। তিনিই দ্বন্দ্বরূপে বিক্ষেপণী শক্তির দ্বারা বস্তুসমূহকে পরস্পর হইতে বিশেষ করিয়া বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া পরিণত করিয়া তুলিতেছেন।

কিন্তু এই দ্বন্দ্ব ব্যতীত বিশ্বরচনায় আর একটি প্রবলতর শক্তি কাজ করিতেছে তাহাকে বলা যায় প্রেম। আমরা আমাদের ছোট কথায়—ঘরো ভাষায়—আমাদের দৈনন্দিন জীবনের মাপকাটীতে প্রেমের একটা সঙ্কীর্ণ অর্থ করিয়া লইয়াছি। কিন্তু এই সঙ্কীর্ণ প্রেমও যে মহান্ ভাবের একটা সামান্য আভাস মাত্র সেই সনাতন বিশ্ব নীতিকেই আমরা প্রেম বলিতে বুঝাইতেছি। এই প্রেম—জড় ও অজড়ে, স্থাবরে ও জঙ্গমে, চেতনে ও উদ্ভিদে বিশ্বচক্রের সকল স্থলেই কার্য্য করিতেছে। কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডের সুব্যবস্থিততায়, গ্রহউপগ্রহের আকর্ষণে, একদিকে ইহার বিকাশ হইতেছে ; অন্যদিকে সান্তের সঙ্গে অনন্তের মিলনে, বিরাটের সঙ্গে সসীম মানবের নিত্যলীলায় তাহা ফুটিয়া উঠিতেছে ;—আবার প্রাণীজগতে পরস্পরের মধ্যে বিচিত্র সমাজবন্ধন-ব্যাপারে সেই একই নীতি নানামূর্ত্তিতে পরিপুষ্ট হইতেছে।

দ্বন্দ্ব ও প্রেম এই দুই নীতিই বিশ্বচক্রের সর্ব্বত্র কার্য্য করিতেছে—এই দুইয়ের সংঘর্ষেই বিশ্বজগতের বিকাশ হইতেছে। দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়াই প্রেম আত্মপ্রকাশ করিতেছে। যেমন অন্ধকার না হইলে আলোর স্ফূর্ত্তি পায় না, অন্ধকারকে পশ্চাতে রাখিয়াই আলোক তাহার রশ্মি বিকীর্ণ করিয়া দেয়, প্রেমও তেমনই দ্বন্দ্বকে পশ্চাতে রাখিয়া দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়াই আপনাকে বিকাশ করে। যে পরিমাণে দ্বন্দ্বকে সে জয় করিতে পারে সেই পরিমাণেই প্রেম সার্থকতা লাভ করে। বিশ্বজগতের সর্ব্বত্র প্রেম সমানভাবে আত্ম-প্রকাশ করিতে পারে নাই। কোথাও বা দ্বন্দ্বেরই অতিমাত্র প্রাবল্য কোথাও

---

(১) যাহার "প্রাণ" আছে সেই প্রাণী। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র প্রমাণ করিয়াছেন যে যাহাদিগকে আমরা উদ্ভিদ বলি তাহাদেরও 'প্রাণ আছে, ইতি লেখক।

বা প্রেমের ক্ষীণরশ্মি দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া ঈষৎ ফুটিয়া উঠিতেছে। উদ্ভিদাদি নিম্নস্তরের প্রাণীতে ও পশুজগতে দ্বন্দ্বেরই সম্যক প্রাবল্য দেখা যায়। প্রাচীন অসভ্য ও অর্দ্ধসভ্য বা বর্ব্বর মানবসমাজেও এই দ্বন্দ্বের লীলা বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। আর এখনও এই তথাকথিত "সভ্যযুগে" পৃথিবীর অধিকাংশ মানব সমাজেই সেই দ্বন্দ্বনীতিরই সমধিক প্রভাব দেখিতেছি। সেই হিংসা, সেই প্রতিযোগিতা, সেই নিষ্ঠুর জীবনসংগ্রাম, সেই শৃগাল কুক্কুরের ন্যায় পরস্পরের মুখের অন্ন কাড়াকাড়ি! কিন্তু এই দ্বন্দ্বপ্রধান সভ্যতাই মানব সমাজের উচ্চাবস্থা নহে। যতদিন মানবসমাজে দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া প্রেমের বিকাশ না হইবে, পঙ্কের মধ্য হইতে যেমন পদ্ম ফুটিয়া উঠে, তেমনই প্রেমের মহিমা জাগিয়া না উঠিবে, ততদিন মানবসমাজের পূর্ণপরিণতি হইবে না। যুগে যুগে মানব-সমাজে এই চেষ্টাই হইয়াছে। যুগে যুগে অন্তর্দর্শী মহাপুরুষগণ আসিয়া এই বাণী প্রচার করিয়াছেন, মহাপ্রাণ কবিরা এই গানই গাহিয়াছেন।

যে সকল কবিরা মানবজাতিকে এই প্রেমের গান শুনাইতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য। দ্বন্দ্বপ্রধান সভ্যতার মধ্যে, হিংসার সংহারলীলার তাণ্ডব-নৃত্যের রণবাদ্য তো অনেকেই বাজাইয়াছেন; যুদ্ধের সঙ্গীতে মানুষের রাক্ষসবৃত্তিকে জাগাইয়া রক্তপাতের সাহায্য তো অনেকেই করিয়াছেন। কিন্তু এই ভৈরব কোলাহলের মধ্যে যে সকল কবি আত্মস্থ হইয়া একান্তে শান্তির বীণায় প্রেমের কোমল ঝঙ্কার তুলিয়াছেন তাঁহারাই মানবজাতির প্রকৃত বন্ধু।

আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথ সেই ভাগ্যবান্ প্রেমের গায়কগণের মধ্যে প্রধান একজন। বিশ্বের এই প্রেমনীতিই রবীন্দ্রনাথ চিরজীবন প্রচার করিয়া আসিয়াছেন;—সেই মহান্ ভাবের ধারাই তাঁহার কাব্যে ও গানে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আর তাহা হইতেই অমৃতের ধারা আনিয়া তিনি সমাজ ও সংসারের বিরোধক্ষত বক্ষে ঢালিয়া দিতেছেন। এই প্রেমের পথই মানবের মুক্তির পথ। ইহাতেই ভাইএ ভাইএ ভালবাসা গাঢ় হইয়া উঠে, মানবে মানবে প্রীতি বাড়িয়া যায়,—হিংসার শোণিতক্ষত প্রণয়ের স্নিগ্ধ প্রলেপে মধুর হইয়া উঠে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে কলহ বিগ্রহে, বাণিজ্যের কর্কশ কোলাহলে, নরঘাতী সংহারাস্ত্রের পরিবর্দ্ধনে মুক্তির রাজ্যে পৌঁছান যায় না। তাই যতই বিজ্ঞানবলে মানুষ

প্রকৃতির রহস্য ভেদ করুক না কেন, তাহার অতৃপ্তি কিছুতেই যাইতেছে না। যতই ব্যক্তিত্বের বিকাশ হইতেছে সামাজিক সমস্যা ততই জটিল হইয়া উঠিতেছে। আধুনিক সভ্যতার শিখরারূঢ় প্রতীচ্য দেশ সমূহে এই অশান্তি ও অতৃপ্তি ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। যে জিনিষটী পাইলে এই সকল দ্বন্দ্বের সমাধান হয় তাহারই জন্য তাহারা আজ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ প্রতীচ্য দেশের নিকট সেই মুক্তির পথটীর আভাস দিয়াছেন, সকল শান্তির নিদান সেই প্রেমমন্ত্রের গান তাহাদিগকে শুনাইয়াছেন। প্রতীচ্য আজ সেই জন্য রবীন্দ্রনাথকে এমন করিয়া বুঝিতে পারিয়াছে; তাঁহার গানে প্রতীচ্য দেশময় তাই আজ এমন একটা আনন্দের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। শিশু যেমন নিজের আকাঙ্ক্ষা-অভাব না বুঝিতে পারিলেও, মাতা তাহার অন্তর বুঝিয়া তাহার আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটীই তাহাকে যোগাইয়া দেন, কবিও তেমনই মানুষের অব্যক্ত আশার বস্তুকে আকার দিয়া তাহার আনন্দের মাত্রা পূর্ণ করিয়া তুলেন। প্রতীচ্য রবীন্দ্রনাথের নিকট অব্যক্ত আশার বস্তুকে পাইয়াছে, সেই অপূর্ব্বশ্রুত আনন্দের গান শুনিয়াছে বলিয়াই তাঁহাকে এমন সমাদর করিয়া বরণ করিয়া লইয়াছে। আর এই যে স্বার্থযুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত, পরস্পরের সংহারে সতত চেষ্টমান, পশুধর্ম্মী মানুষকে সনাতন মুক্তির পথের আভাস দেওয়া,—তাহাকে প্রেমের অমরসঙ্গীত এমন মধুর করিয়া শুনানো ইহাই বিশ্বমানবের জন্য রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠদান; বর্ত্তমান ও চিরন্তন মানবসমাজের কল্যাণ-কল্পে রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার ইহাই অক্ষয়কৃতিত্ব।

বহুকাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষই প্রথম এই মুক্তির পথের সন্ধান পাইয়াছিল। তাহার শান্ত, নির্ম্মল তপোবন হইতে যে "সামরব" উঠিয়াছিল, তাহার মধ্যেই প্রেমের সঙ্গীত প্রথম গীত হইয়াছিল। সর্ব্বদর্শী ঋষিরা যখন বলিয়াছিলেন —"রসো বৈ সঃ", "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে", তখন তাঁহারা বিশ্বময় চেতনে ও জড়ে—সর্ব্বত্র প্রেমের লীলাই অনুভব করিয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের ভীষণ সংহারলীলার মধ্যে দাঁড়াইয়া এই সনাতন প্রেমের বাণীই প্রচার করিয়াছিলেন। যে সর্ব্বত্যাগী রাজপুত্র আজ পৃথিবীর অর্দ্ধ মানবসমাজের হৃদয়ের রাজা, তিনি অহিংসা ও বিশ্বমৈত্রীর মধ্য দিয়া এই চির-নূতন প্রেমের সাধনার পথই দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্মের মধ্যেই,

হইয়াছিল। "বাঙ্গলার জল, বাঙ্গলার বায়ু", আর তাহারই মধ্যে পরিপুষ্ট বাঙ্গালীর সরস কোমল হৃদয়ই এই প্রেমের ধর্ম্মকে বিশেষরূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। তাই এই "সুজলা সুফলা, শস্যশ্যামলা" বাঙ্গালা দেশেই মহাপ্রেমের অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইয়া প্রেমের প্রবল বন্যায় সমস্ত ভারত ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। দুর্ল্লভ, অতুলনীয় প্রেমের আদর্শ নিজজীবনে মূর্ত্তিমান করিয়া দেখাইয়া লোক-সমাজকে তিনি মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন।

সেই সচ্চিদানন্দ প্রেমময় আপনার প্রেম-সাগরে আপনিই আনন্দে ভাসিতেছেন। এই বিশ্বজগত—চেতন ও জড়—সকলই তাঁহার অনন্ত প্রেম-প্রবাহের মধ্যে আনন্দে মগ্ন রহিয়াছে। যে সেই আনন্দসাগরে ডুবিতে পারিবে—আপনার সর্ব্বস্ব সেই মহাপ্রেমের মধ্যে বিলাইয়া দিতে পারিবে—সহজ কথায় সেই নিখিল-রসামৃতমূর্ত্তি প্রেমময়কে যে আপনার প্রেমের মধ্যে লাভ করিতে পারিবে, এই জীব ও জগত তাহার প্রেমের মধ্যে আপনিই ধরা দিবে। বিশ্বমৈত্রী তখন তাহার কাছে সহজ হইয়া আসিবে—সর্ব্বভূতহিত তাহার অন্তরে আপনিই ফুটিয়া উঠিবে। ধূর্জ্জটীর জটার মধ্য হইতে ভগীরথ যখন গঙ্গাকে বাহির করিতে পারিয়াছিলেন, তখনই যেমন তাহার পবিত্র ধারায় বসুন্ধরা ভাসিয়া গিয়াছিল, সে সকল-প্রেইমের উৎসকে লাভ করিতে পারিলে তেমনই দ্যুলোক, ভূলোক, বিশ্বচরাচর ভাসিয়া যায়। প্রেমিক প্রেমময় ভগবান্‌কে পাইয়াই সর্ব্বভূতহিত ও বিশ্বমৈত্রী আপনার অন্তরে সহজেই বিকাশিত হইতে দেখে। ইহাই বৈষ্ণবধর্ম্মের মূলতত্ত্ব, বৈষ্ণবের মহান্ প্রেমধর্ম্ম।

আর বৈষ্ণবধর্ম্ম এই প্রেমসাধনার যে পথ আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা অতীব মধুর ও জগতে অপূর্ব্ব। জ্ঞানের দিক দিয়া—বিশ্বরহস্যের দিক দিয়া সেই পরমপুরুষ বিরাট ও দুর্জ্ঞেয় হইলেও প্রেমের দিক দিয়া তিনি মানবহৃদয়ের অতি নিকটতম ও সুলভ। কেননা—যে প্রেমে তিনি আপনই আনন্দে ভাসিতেছেন, বিশ্বজগত যে প্রেমে মগ্ন হইয়া রহিয়াছে—মানবহৃদয়েও সেই প্রেমেরই লীলা। তাঁহাকে পাইতে হইলে একটা অপূর্ব্ব, নূতন কিছু করিতে হইবে না। যে প্রেমের মধ্য দিয়া আমি আপনার নিজজনকে ভালবাসি,আপনার অতি নিকটতম বস্তুকে পাই, সেই প্রেম দিয়াই তাঁহাকেও পাওয়া যায়। এই যে ভগবানকে নিজজনের মত প্রীতি—আপনার বস্তুর ন্যায় ভালবাসা, ইহাই হইতেছে বৈষ্ণবধর্ম্মের আবিষ্কৃত অপূর্ব্ব নূতন পন্থা। ইহা একদিকে যেমন মানবের পক্ষে সহজ ও সরল, অন্যদিকে তেমনই গভীর ও রহস্যময়। সংসারে আমাদের নিজজনের

প্রতি যে ভালবাসা, তাহা বহুবৈচিত্র্যময় ও নানা মূর্ত্তিতে দেখা দেয়। মোটা-মুটি ইহার মধ্যে পাঁচটী ধারা লক্ষ্য করা যায়। আর ভালবাসার সেই পঞ্চ-ধারাকেই বৈষ্ণবেরা কহিয়াছেন—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস। প্রেমের এই পঞ্চধারা দিয়াই ভাগবানকে পাওয়া যাইতে পারে। তবে পূর্ব্ব পূর্ব্বটী হইতে পর পরটী উচ্চতর ও গভীরতর। আর এই হিসাবে কান্ত বা মধুর ভাবই ভগবৎ-প্রেম-সাধনার চরম সীমা। বাস্তবিক আমরা সংসারেও তাহাই দেখি। কান্ত বা মধুর ভাব যেমন বিচিত্ররসময়, গাঢ়, গভীর ও হৃদয়োন্মাদক, আর কোন ভাবের সঙ্গে তাহার তুলনাই হইতে পারে না। বোধ হয় এক বাৎসল্যভাব কতকটা উহার সমীপবর্ত্তী হইতে পারে। কিন্তু যে রহস্যময়, অনির্ব্বচনীয় একাত্মবোধ কান্তভাবের প্রধান বিশেষত্ব, বাৎসল্য-রসে তাহার অস্তিত্ব নাই বলিলেই হয়। ভগবানকে যদি ভালবাসিতে হয়, তবে এমন গাঢ় করিয়া, গভীর করিয়া, প্রাণ ঢালিয়া আর কিরূপে ভাল-বাসা যাইতে পারে? বৈষ্ণবধর্ম্ম বিশেষ করিয়া এই কান্তভাবেরই শিক্ষা দিয়াছে; শ্রীগৌরাঙ্গ নিজের জীবনে এই মধুর ভাবকেই বিশেষ করিয়া ফুটা-ইয়া তুলিয়াছিলেন। পৃথিবীর কোন ধর্ম্ম বা কোন মানবসমাজে ভগবৎ প্রেমের এই চরমসীমা দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ইহা বৈষ্ণবধর্ম্মের—বিশেষ করিয়া বাঙ্গালার বৈষ্ণব ধর্ম্মেরই নিজের পন্থা। যে বাহির হইতে দেখিবে সে হয়ত ইহা ভাল করিয়া না বুঝিয়া লঘুতার সহিত উড়াইয়া দিতে পারে। কিন্তু যে ইহার ভিতরে প্রবেশ করিবে আর ছাড়িতে পারিবে না; যে এই অমৃতের এক কণিকার আস্বাদ পাইবে সেই মত্ত হইয়া উঠিবে।

সাধক বৈষ্ণব কবিরা এই মহাপ্রেমের আস্বাদ পাইয়াছিলেন। তাই তাঁহারা সকল ভুলিয়া সেই নিখিল সৌন্দর্য্যের সার, অসীম প্রেমসাগরের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ-দাস প্রভৃতি বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবিরা যে গান গাহিয়াছেন, তাহা সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের—রসতত্ত্বের শেষসীমা। এপর্য্যন্ত মানবের দৃষ্টি ততদুর পৌঁছায় নাই। কবিত্ব হিসাবেই বল, শিল্প হিসাবেই বল, আর রসের প্রগাঢ়তা হিসাবেই বল, তাঁহাদের কাব্য জগতে অতুলনীয়। কান্তভাবের চরমসাধনা তাঁহারাই বুঝিয়াছিলেন। প্রেমময় ভগবানকে সখারূপে পাইয়া তাঁহারাই বিশ্বজগতকে আপনাদের প্রেমালিঙ্গনের মধ্যে বাঁধিতে পারিয়াছিলেন যদি কখনও আজি-কার বর্ব্বর মানবজাতি হিংসাদ্বেষ ভুলিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে,

তবেই এ গান তাহারা যথার্থ বুঝিতে পারিবে ; যে অমৃত তাঁহাদের অফুরন্ত ভাণ্ডারে বৈষ্ণব কবিরা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার আস্বাদ পাইবার তখনই তাহারা অধিকারী হইবে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যে প্রেমের বিকাশ হইয়াছে, যে ভালবাসার গান তিনি গাহিয়াছেন, তাহাতে এই বৈষ্ণবী প্রেমের প্রভাব আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই। রবীন্দ্রনাথ হয়ত বৈষ্ণব নহেন বা বৈষ্ণবধর্ম্মের তত্ত্বও হয়ত তিনি স্বীকার করেন না। কিন্তু শিক্ষার গুণেই হউক বা পারিপার্শ্বিক প্রভাবের গুণেই হউক বা নিজের অন্তরাত্মার স্বাভাবিক প্রবণতার ফলেই হউক, বাঙ্গালীর নিজস্ব সম্পদ্—বাঙ্গালীর মর্ম্মকথা বৈষ্ণব প্রেমের ছাপ তাঁহার হৃদয়ে যেন বসিয়া গিয়াছে—তাঁহার কাব্যে ও গানে সেই ভাবই ফুটিয়া উঠিতেছে। রবীন্দ্রনাথ "ভানুসিংহের পদাবলী" গাহিয়া আপনার বৈষ্ণবভাবকে, হয়ত নিজের অজ্ঞাতসারেই, ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আর আজ এই প্রৌঢ় বয়সে, সাঁজের "খেয়ার," সারাজীবনের "নৈবেদ্য" লইয়া চির-সুন্দরের পায়ে যে "গীতাঞ্জলি" দিতেছেন,—যে "গীতিমাল্য" তাঁহারই গলায় দিবার জন্য গাঁথিতেছেন, তাহাতে মধুর বৈষ্ণব-সাধনার রসলীলাই ব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে। সেই যে অরূপের সঙ্গে রূপের মিলন—সসীমের মধ্যে অসীমের প্রকাশ, বিশ্বময় নিখিলরসামৃতমূর্ত্তির সেই যে উপভোগ—সেত বৈষ্ণবেরই কথা। আর সেই কান্তভাবের বিচিত্র রসময় গভীর রহস্য, আপনার প্রিয়তমের মত ভগবানকে প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসা—উহাও ত বৈষ্ণবেরই নিজস্ব জিনিষ। "খেয়া", "নৈবেদ্য", "গীতাঞ্জলি" ও "গীতিমাল্যে" এই মধুর রসের মধুর প্রবাহ যিনিই ইচ্ছা করিবেন তিনিই অনুভব করিতে পারিবেন। দেখিবেন আমাদের প্রৌঢ় কবি 'নববধূ' সাজিয়া প্রথম প্রণয়ের আবেগে প্রিয়তমকে কেমন আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন ; বাসর সজ্জা করিয়া সারানিশি প্রাণনাথের জন্য কেমন প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছেন, "কর্ম্মঅন্তে সন্ধ্যাবেলায়" তাঁহার সঙ্গসুখ লাভ করিবার জন্য কেমন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন ; সখারূপে, বন্ধুরূপে প্রিয়রূপে তাঁহাকে পাইবার জন্য কবির চিত্ত কেমন উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে।

যৌবনেও রবীন্দ্রনাথ প্রেমের কবি ছিলেন। নরনারীর যে বিচিত্র প্রেম মানবহৃদয়ের চিরগভীর রহস্য ; যুগে যুগে যে রহস্য উদ্ঘাটনে কবি ও শিল্পীরা প্রাণমন সমর্পণ করিয়াছেন—সেই চির-গভীর, চির-নূতন প্রেমের গান তিনি অনেক গাহিয়াছেন ; অফুরন্ত মালা গাঁথিয়া কাননের পথে তিনি অনেক

ছড়াইয়াছেন। কিন্তু নদী সরিৎ স্রোতস্বিনী যেমন সকলই যাইয়া সেই অনন্তসাগরেই মিশে, তেমনই কবির সকল প্রেম আজ এক মহাপ্রেমে পরিণত। যে মালা গাঁথিয়াছিলেন, যে গান গাহিয়াছিলেন, তাহার কিছুই ব্যর্থ যায় নাই। সকলই সেই চিরসুন্দর, চিরপ্রেমময়ের নিকটই পৌঁছিয়াছে। বৈষ্ণবকবিরাও এই পথে সাধনায় বাহির হইয়াছিলেন। এই জগতের যত সৌন্দর্য্য, যত মাধুরী আমাদের হৃদয়স্পর্শ করে, তাহাতে সেই চিরসুন্দর বঁধুরই লীলা। চারিদিকে এই সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের মধ্য দিয়া তো সেই পরম সুন্দরকেই চেনা যায়। আর যখন তাঁহাকে চেনা যায়, তখনই সব সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য সত্য হয়,—নূতন আলোকে, নূতন সঙ্গীতে হৃদয় ভরিয়া উঠে। সখার মধ্যে, কান্তের মধ্যে, প্রিয়ের মধ্যে যে প্রেম আপনার পরিতৃপ্তি খুঁজিয়াছে, সকল প্রেমের উৎসকে পাইয়া সেই প্রেমের পরিতৃপ্তি হয়। তাই নূতন করিয়া সখারূপে, বন্ধুরূপে, কান্তরূপে আবার তাঁহাকে হৃদয়ের মধ্যে পাই; প্রণয়সঙ্গীতে সকল ভুবন ভরিয়া উঠে—রসমাধুর্য্যে চরাচর মগ্ন হইয়া যায়। এই মধুরভাব, এই অনির্ব্বচনীয় রসই "খেয়া", "গীতাঞ্জলি" ও "গীতিমাল্যে"—ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

আর এই যে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া, প্রাণ ঢালিয়া ভগবানকে ভালবাসা, ইহার সঙ্গেই বিশ্বমৈত্রী, মানবপ্রেম ও সর্ব্বভূতহিত আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়। ইউরোপ নীতির বক্তৃতা করিয়া, সমাজহিতের যুক্তি আঁটিয়া, যতই এই বিশ্বমৈত্রী ও মানবপ্রেমকে ধরিতে চাহিতেছে, ততই তাহারা বিশ্বপ্রেমের পরিবর্ত্তে বিশ্বব্যাপী কলহেরই সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছে; শান্তির পরিবর্ত্তে জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষই তীব্র হইয়া উঠিতেছে। যত দিন না সে বৈষ্ণবের এই প্রাণ-ঢালা, হৃদয়গলা প্রেম না পাইতেছে; চিরসুন্দরের নিখিল-রসামৃত মূর্ত্তি তাহার অন্তরে না ফুটিয়া উঠিতেছে, ততদিন তাহার শান্তি নাই, "বিশ্বমৈত্রী" ও "মানব-প্রেম" ততদিন কেবল কথার কথাই থাকিবে। প্রতীচ্য ইহা অন্তরে অন্তরে বুঝিয়াছে; এই প্রেমলাভের জন্য তাহার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে অজ্ঞাতসারে ব্যাকুলতা জাগিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তাহারা তাহাদের হৃদয়ের অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্তরূপে দেখিয়াছে, তাহাদের সেই আশার বস্তু, প্রার্থিত জিনিষটী পাইয়াছে। তাই রবীন্দ্রনাথ প্রতীচ্যের হৃদয় এত দ্রুত জয় করিয়াছেন, প্রতীচ্যে তাঁহার খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা এত বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে।

নূতন করিয়া খৃষ্টানী সভ্যতা প্রচার করিয়া নহে; খৃষ্টানী সভ্যতায় যাহা নাই, সেই জিনিষটার আভাস দিয়াছেন বলিয়াই প্রতীচ্যে তাঁহার এত সমাদর হইয়াছে।

যুগে যুগে মানব-সমাজের অভিব্যক্তিতে নানাদেশ ও নানাজাতি সভ্যতার ভাণ্ডারে নানা বস্তু দান করিয়াছে। বিশ্বমানবের গতিপথে যখনই কোন জটীল সমস্যার উদয় হইয়াছে, তখনই কোন না কোন দেশ বা জাতি তাহার সমাধান করিয়া মানবকে উন্নতির পথে চালিত করিয়াছে। প্রাচীন যুগে গ্রীস ও ভারত জ্ঞান, রোম রাষ্ট্রনীতি ও সমাজবিধি মানবজাতিকে দান করিয়াছিল। আধুনিক কালে পাশ্চাত্য জাতিসমূহ নব নব বিজ্ঞান ও কর্ম্মপ্রচেষ্টার দ্বারা মানব সভ্যতার ভাণ্ডারকে পূর্ণ করিয়াছে। কিন্তু এই নবযুগে কর্ম্মের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে নূতন করিয়া আর এক বিরোধ-সমস্যা, জাতি-সমস্যা, মানবসমাজে মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে। বর্ব্বরযুগে আদিমসমাজে যে হিংসা জীবনযুদ্ধের তাড়নায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল, এই সভ্য জ্ঞানবিজ্ঞানের যুগে তাহাই আবার নূতন মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে। যতদিন এই বিরোধ-সমস্যার সমাধান না হইবে, ততদিন মানবজাতির কল্যাণ ও শান্তির আশা নাই। আর আধুনিক ভারতবর্ষ, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালার বৈষ্ণব সভ্যতা যে প্রেমের মন্ত্র প্রচার করিয়াছে, বোধ হয় একমাত্র তাহাতেই মানবজাতির মধ্যে সকল দ্বন্দ্বের সমাধান হইয়া কল্যাণ ও শান্তির প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যজগতে আধুনিক ভারতের সেই প্রেমমন্ত্রের গান শুনাইয়া বিশ্বমানবের কল্যাণ ও শান্তির জন্য মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন; এজন্য তিনি কেবলমাত্র যে ভারতেরই গৌরববর্দ্ধন করিয়াছেন তাহা নহে, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত সমগ্র মানবজাতির তিনি নমস্য।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

ধর্ম্মের পুনরুত্থান।

বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপে পৃথিবীর পরাক্রান্ত জাতিসমূহ নরহত্যার যে বিপুল আয়োজনে মাতিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে আপনা হইতেই এই কথা মনে হয় যে 'ধর্ম্ম' বলিয়া একটা জিনিস বোধ হয় পৃথিবীতে নাই। ধর্ম্ম মানুষকে ভগবানের কথা, ও আত্মার কথা শিক্ষা দেয় এবং স্বার্থপরতা ও দেহেন্দ্রিয়-

সর্ব্বস্বতার ক্ষুদ্র কূপ হইতে মানবকে বাহির করিয়া পরার্থপরতা, ত্যাগ ও সংযমের দিকে লইয়া যায়। কাজেই এই যুদ্ধের সময় কে বলিবে পৃথিবীতে 'ধর্ম্ম' আছে ?

কিন্তু আসল কথা কিছুদিন হইতে পৃথিবীতে ধর্ম্মের পুনরুত্থান হইতেছে ! হিন্দুস্থানের লোকেরা বলেন যে মধ্যে আমাদের দেশে ধর্ম্মভাব বড় মলিন হইয়াছিল, এখন আবার লেখাপড়া জানা লোকের হৃদয় ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে। কেবল যে হিন্দুস্থানের সম্বন্ধেই এই পুনরুত্থান সত্য, তাহা নহে। এক হিসাবে দেখিতে গেলে সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়াই ধর্ম্মের একটা পুনরুত্থান হইতেছে। হিন্দুস্থানে হিন্দুধর্ম্মের এই পুনরুত্থান, সমগ্র পৃথিবী-ব্যাপী মহাজাগরণের একটি তরঙ্গমাত্র, এটুকু আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত। নতুবা এই পুনরুত্থানের প্রকৃতি আমরা ঠিক বুঝিতে পারিব না।

'পুনরুত্থান' একটি প্রাকৃতিক ঘটনা। সর্ব্বত্রই ইহা পরিদৃষ্ট হয়। বৎসরের মধ্যে বসন্তকালে প্রকৃতিতে এই পুনরুত্থান দেখিতে পাওয়া যায়। শীতকালে তরুলতা পশুপক্ষী প্রভৃতির মধ্যে জীবনপ্রবাহ কেমন মন্দীভূত হইয়া পড়ে, বসন্ত আসিতে আসিতেই সেই জীবনপ্রবাহে একটা বেগ ও উল্লাস সঞ্চারিত হয়। মানুষের জীবনেও এই প্রকারের পুনরুত্থান আছে। যাঁহারা ব্যবসায় বাণিজ্য করেন তাঁহারা সর্ব্বদা এই পুনরুত্থানের সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ব্যবসায় বাণিজ্যে একবার বাজার মন্দ হইয়া যায়, আবার একবার খুব সুবিধা হয়, বণিকেরা সকল সময়েই এই সুবিধার প্রতীক্ষা করেন। স্বাধীনদেশে রাজনীতির প্রতি সকল সময়ে মানুষের তাদৃশ মনোযোগ থাকে না, হঠাৎ এই মনোযোগ খুব তীব্রভাবে জাগিয়া উঠে। যখন নূতন একজন প্রতিনিধির নির্ব্বাচন হয় তখন এইরূপ একটা জাগরণ আসিয়া থাকে। দেশাত্মবোধও সকল সময়ে মানবহৃদয়ে তুল্যরূপে কার্য্য করে না, এই সদ্বৃত্তির ক্রিয়া মানুষ অনেক সময়ে হৃদয় মধ্যে অনুভবই করে না। আবার এমন এক একটা সময় আসে যখন এই ভাবের ক্রিয়ায় হৃদয় একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠে। যেমন কোন বৃহৎ ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতির দিন অথবা যখন একটা সার্ব্বজনীন বিপদ আসিয়া দেশকে বিচলিত করে।

সাহিত্যের ইতিহাসে এই পুনরুত্থান দেখা যায়। গ্রীসদেশে পেরিক্লিয়ান্

যুগ, রোমে অগাষ্টান যুগ, ইংলণ্ডে এলিজেবেথিয়ান যুগ। আমাদের দেশে বৌদ্ধযুগ, কালিদাস ও শ্রীচৈতন্যের যুগও এই প্রকারের। এই সকল যুগে সাহিত্য যেন এক দীর্ঘকালব্যাপী শীতের মধ্য হইতে বসন্তের নবজাগরণ ও নিদাঘের তীব্র ও উজ্জ্বল গৌরবে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইউরোপের ইতিহাসে একটা যুগের নাম Renaissance (রিনেসান্স) ইহার অর্থ পুনর্জ্জন্ম বা পুনরুত্থান। প্রায় এক হাজার বৎসরকাল সমগ্র ইউরোপে বিদ্যার যে অধোগতি হইয়াছিল, সেই অধোগতির অবস্থা হইতে এই সময়ে বিদ্যা পুনরায় গৌরবের পথে আসিয়া দাঁড়াইল।

শিল্পের ইতিহাসেও পতন ও উত্থান আছে, সঙ্গীত, সদ্‌বাগ্মীতা, দার্শনিক গবেষণা সর্ব্বত্রই পুনরুত্থানের যুগ আসে সুতরাং ধর্ম্মজগতে পুনরুত্থানের যুগ থাকা একটা অসাধারণ কথা নহে। একটি সাধারণ নিয়মমাত্র।

এখন স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে, এই যে পুনরুত্থান ইহার তাৎপর্য্য কি? পৃথিবীর ধর্ম্মসাধনায় যখনই একটা নূতন হিল্লোল আসিয়াছে, তখনই একটা পুনরুত্থান হইয়াছে, এরূপ বলা যাইতে পারে।

ভারতবর্ষে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবকাল এই প্রকারের একটা পুনরুত্থান। রাজার ছেলে সিংহাসন হইতে নামিয়া নিতান্ত গরিবের সঙ্গে প্রাণের সহিত প্রেমে মিশিয়া গেলেন, পৃথিবীর ধর্ম্মসাধনায় এই এক সুবৃহৎ পুনরুত্থান। আরবদেশে মহম্মদের আবির্ভাবও এই প্রকারের একটা পুনরুত্থান। বাইবেলের পুরাতন গ্রন্থে যে সকল মহাপুরুষের কথা আছে, তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকের উদ্ভবই একটা পুনরুত্থানের প্রমাণ। এই সকল মহাপুরুষগণের প্রত্যেকেই তাঁহার চারিদিকে ধর্ম্মের ও নীতির যে অবস্থা দেখিয়াছিলেন তদপেক্ষা একটা উন্নততর ও মহত্তর জিনিস প্রচার করিয়াছিলেন। যদি তাহা না করিতেন তাহা হইলে তাঁহাদের প্রচারের কোন সার্থকতা থাকিত না। এই সকল মহাপুরুষগণের প্রচারের ফলে ইহুদীজাতি ক্রমে ক্রমে ন্যায়পরতা, দয়া, সত্য প্রভৃতির উচ্চ হইতে উচ্চতর আদর্শে আরোহণ করিয়াছে এবং ভগবানের স্বরূপ ও তাঁহার পূজা ও উপাসনা সম্বন্ধে ক্রমশঃ উচ্চতর মত ও আদর্শ প্রাপ্ত হইয়াছে।

যীশুখৃষ্ট আসিয়া যখন প্রচার করিলেন যে ভগবান স্বর্গস্থিত পিতা এবং সকল মানুষ ভ্রাতা তখন মানবের পুরোদেশে অকস্মাৎ একটা নূতন আলোকের ছটা আসিয়া উপস্থিত হইল। সুতরাং ইহাও একটা পুনরুত্থান।

যীশুখৃষ্টের সময়েই যে পাশ্চাত্যজগতে ধর্ম্মের পুনরুত্থান শেষ হইয়া গেল বা যীশুখৃষ্টই যে শেষ কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন তাহা নহে। খৃষ্টধর্ম্মের ইতিহাস আলোচনা করিলে বহু পুনরুত্থান, ও তৎসমুদয়ের মধ্য দিয়া ক্রমিক অগ্রবর্ত্তীতা পরিদৃষ্ট হইবে। "জার্ম্মান রিফর্ম্মেশন" * একটা কত বড় পুনরুত্থান!

এই সংস্কারের দ্বারাই খ্রীষ্টীয়জগতে এই কথাটী প্রতিষ্ঠিত হইল যে ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেল ব্যাখ্যা করিতে প্রত্যেকেরই আপন আপন স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন বিচারণা প্রয়োগ করিবার অধিকার আছে। কেবল বাইবেল ব্যাখ্যা নহে, ধর্ম্ম বিষয়ক সকল বিষয়ই কেবল অন্ধভাবে না বুঝিয়া মানিয়া লওয়ার জিনিস নহে, তাহাতে যুক্তিপ্রয়োগের অধিকার সকলেরই আছে।

ইংলণ্ড দেশে যখন "পিউরিটান্" ১ মতের উদ্ভব হইল তখনও এই

---

* খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে এই বিপুল ধর্ম্মান্দোলন আরম্ভ হয়। আমাদের দেশে সেই সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবকাল। ইউরোপের এই আন্দোলনের ফলে "প্রোটেষ্টাণ্ট" ও অন্যান্য 'ইভানজেলিক্যাল' সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। যাঁহারা বলেন যে খৃষ্টিয় ধর্ম্মগ্রন্থের চারিখানি সুসমাচারে সকলের অধিকার আছে এবং এই সুসমাচার চতুষ্টয়েই খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের যাহা শক্তি তাহা পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত এবং বিশ্বাসের দ্বারা সকলেই পরিত্রাণ পাইবে এজন্য কোন বিশেষভাবে নিযুক্ত ধর্ম্মযাজকের মধ্যস্থতা প্রয়োজন নহে, তাঁহাদিগকে 'ইভান্জেলিক্যাল' বলে। এই মতের দ্বারা রোমের যাজকমণ্ডলীর প্রভুতা নষ্ট করার চেষ্টা করা হয়, এবং কেবল তাঁহাদেরই হাতে স্বর্গের চাবি আছে তাঁহাদের কৃপা ছাড়া আর কোন প্রকারে পরিত্রাণ নাই এই যে মত ইহার তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। মার্টিন্ লুথার এই আন্দোলনের প্রধান ব্যক্তি। জার্ম্মান দেশেই এই আন্দোলন প্রথম আরব্ধ হয়।

১। রাজ্ঞী এলিজাবেথ, জেমস্ ও তাঁহাদের পরবর্ত্তী রাজন্য-বৃন্দের রাজ্যকালে অনেক লোক ইংলণ্ডের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মমণ্ডলী হইতে বিচ্ছিন্ন হয়েন। তাঁহারা এই কথা বলিতেন যে আমরা ঈশ্বরের যে পবিত্রবাক্য তাহাই স্বীকার করি, কিম্বদন্তীসমূহ ও মানুষ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত অনুষ্ঠানসমূহ আমরা মানিতে বাধ্য নই। এই সম্প্রদায়ের সহিত রাজনীতিরও সংশ্রব ছিল।

প্রকারের একটা পুনরুত্থান! এই মতাবলম্বীগণ দাবী করিলেন যে প্রত্যেক ধর্ম্মমণ্ডলী বা চার্চ্চ নিজেদের ধর্ম্মবিষয়ক কার্য্যাবলীর ব্যবস্থা নিজে নিজে করিবেন। তাহার পর যখন "কোয়েকার" * মতের আবির্ভাব হয়

* প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত একদল লোক মূল মণ্ডলী হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাহির হইয়া আইসে। এই দলকে কোয়েকার বলে। 'কোয়েক্' মানে কাঁপান। ইংলণ্ডের লাসেষ্টারসায়ারের অন্তঃপাতী ড্রেটন্ নগরের অধিবাসী জর্জ্জ ফক্স্ নামক একজন ভদ্রলোক এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। প্রায় ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে এই সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম প্রতিষ্ঠাতাগণ সাধারণ জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া ধর্ম্মসম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার সময় যখন খুব উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন তখন তাঁহাদের ঘাড় কাঁপিত এইজন্য উপহাস করিয়া এই সম্প্রদায়কে "কোয়েকার" এই আখ্যা দেওয়া হয়। তাঁহারা তাঁহাদের সমিতিকে "বন্ধুসমিতি" বলেন। মানিয়া লইতে হইবে এমন ধারা বেশী কথা তাঁহাদের নাই। নিষ্পাপ, পবিত্র ও নিষ্কাম জীবন, নৈতিক সদ্বৃত্তিগুলির অনুশীলন, পরস্পরকে সাহায্য করা, ভগবানকে ভালবাসা এইগুলি তাঁহাদের মতের প্রধান কথা। হৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাসগুলির প্রতি খুব সতর্কদৃষ্টি রাখা তাঁহাদের মতের একটি প্রধান বিশিষ্টতা, কারণ তাঁহারা বলেন যে এই হৃদয়োচ্ছ্বাসের মধ্যেই ভগবানের শক্তির Holy Spirit প্রকাশ হয়। হৃদয়ের মধ্যে ভগবানের এই কৃপা-শক্তির প্রকাশ হওয়া প্রয়োজন। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা উপাসনা-সভায় একত্র হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন, কেহ কোন কথা কন না। এই কৃপাশক্তির আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে অনেক সময়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যায়। এমনও হয় যে উপাসনায় কোনরূপ কথাই হয় না। উপাসকগণ একত্রে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া চলিয়া যায়। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা বিশ্বাস করেন যে ভগবানের কৃপা-শক্তি যখন অন্তরে জাগরণ আনিয়া দেয় কেবলমাত্র সেই সময়েই প্রকৃত পূজা হয়। এই জন্য সাধারণ উপাসনা-পদ্ধতি তাঁহারা গ্রহণ করেন না। তাঁহারা বলেন যে পূজার বা উপাসনার কালাকাল বিচার নাই, এই জন্য ধন্যবাদ দিবার জন্য (Thanksgiving) উপবাস করিবার জন্য বা নতিস্বীকার করিবার জন্য (Humiliation) তাঁহারা কোন নির্দ্দিষ্ট দিন মানেন না। হিন্দুদের দশ-সংস্কারের মত খৃষ্টানদের যে সমস্ত সংস্কার বা Sacraments আছে, তাঁহারা

তখনও এই প্রকারের এক পুনরুত্থান। এই মতাবলম্বীরা বলিলেন হৃদয়ের ধর্ম্মই ধর্ম্ম আত্মার ধর্ম্মই ধর্ম্ম কেবল কথার ধর্ম্ম কিছুই নয়। "মেথোডিষ্ট" * সম্প্রদায়ের উদ্ভবও এই প্রকারের একটা পুনরুত্থান। দরিদ্র ও সাধারণ লোককে ধর্ম্মধনে ধনী করার জন্যই এই মতের উদ্ভব। এই সকল মত যে মানবকে ধর্ম্মের পূর্ণাঙ্গ আদর্শ দিতে পারিয়াছিল তাহা হয়ত ঠিক নয়, কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকটিরই উদ্ভব এক পুনরুত্থানের বা নবজীবন সঞ্চারের প্রমাণ, প্রত্যেকটিই সাধকের জীবনে এক নবীনতা ও সবলতা আনয়ন করিয়া মানবকে মঙ্গলের অভিমুখে অগ্রবর্ত্তী করিয়াছে।

আমেরিকা দেশে যখন বিশ্বজনীনতা বা Universalism এর উদ্ভব হইল, তখন এই কথা প্রচার হইতে লাগিল যে মঙ্গলই চরমে অমঙ্গলকে পরাস্ত করিবে, অমস্ত পাপ ও যন্ত্রণার জন্য মানুষ সৃষ্ট হয় নাই, পবিত্রতা ও আনন্দের জন্যই মানবের সৃষ্টি। তাহার পর খ্রীষ্টীয় একত্ববাদ (unitarianism) ইহা দ্বারা ভগবানের পিতৃত্ব, মানবের ভ্রাতৃত্ব এবং মানবের স্বরূপের অমৃতত্ব বা ঈশ্বরত্ব খুব জোরে প্রচারিত হইতে লাগিল এবং একথাও বলা হইতে লাগিল যে ধর্ম্মবিষয়ে মানবকে স্বাধীনতা দেওয়া হউক, ধর্ম্মবিষয়ে স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করায় বিপদ নাই, বরং তাহাই উচিত ও নিরাপদ। এই বিশ্বজনীনতা ও একত্ববাদ ইহারাও পুনরুত্থান—ইহাদের প্রভাব ক্রমশঃ সমগ্র পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

বহুবর্ষ ধরিয়া প্রেসবিটেরিয়ান্, এপিস্কোপালিয়ান্, কন্‌গ্রিগেশনলিষ্ট ও অন্যান্য খৃষ্টীয়মণ্ডলী তাঁহাদের বিশ্বাসস্বীকৃতির Confessions of Faith কথাগুলি সংশোধন করিয়া এই স্বীকৃতির মধ্যে যে সমস্ত কথা ঠিক বর্ত্তমান সময়ের ভাবানুযায়ী নহে তাহা বর্জ্জন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এই সংশোধন চেষ্টায় অনেকেই ভীত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের ভীত

সে সমুদয় স্বীকার করেন না। বিবাহ যে ভগবানের ব্যবস্থা ইহা তাঁহারা মানেন, কিন্তু বিবাহে পুরোহিতের আবশ্যকতা মানেন না। তাঁহারা শপথ করেন না—এইজন্য ইংলণ্ডে আইন আছে যে তাঁহাদের শপথ করিতে হইবে না।

* জনওয়েস্‌লি কর্ত্তৃক এই সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে ওয়েস্‌লির জন্ম ও ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হয়। ইহাদের কার্য্যে শৃঙ্খলার কিছু বাড়াবাড়ি।

হইবার কোনই কারণ নাই। যাঁহারা সংশোধনচেষ্টার বিরোধী তাঁহারা ভুল করিতেছেন। ওয়েষ্টমিনিষ্টার স্বীকৃতি, উনচল্লিশ আর্টিকেল, এবং অন্যান্য মত সংশোধনের জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা অতি উচ্চদরের মহৎ ও সাধুপ্রকৃতির লোক। এই সংশোধনচেষ্টার মূলে ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে উচ্চতর ধারণা, উচ্চতর নৈতিক আদর্শের জন্য একটা আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে অর্থাৎ প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম্মকে একটা পবিত্রতর ও উন্নততর আদর্শে লইয়া যাইবার চেষ্টা রহিয়াছে।

উন্নততর সমালোচনা বা Higher Criticism এই নামে বর্ত্তমান সময়ে বাইবেল্ সম্বন্ধে যে সকল নূতন মত ও নূতন ধারণা প্রচারিত হইতেছে, অনেক ভাল খ্রীষ্টান তাহা আদৌ পসন্দ করেন না। তাঁহারা বলেন এই সব নূতন মতের দ্বারা অবিশ্বাস ও ধর্ম্মহীনতা বাড়িয়া যাইবে। কিন্তু কথাটা মোটেই সত্য নহে। সত্য, ন্যায় ও ধর্ম্মবুদ্ধির প্রেরণাতেই এই সব স্বাধীন মতের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার, সুতরাং ভগবানই ইহাদের প্রচারক। সুতরাং ভয় পাওয়ার বা সঙ্কুচিত হওয়ার কারণ নাই। উন্নততর ও মহত্তর একটা লক্ষ্যের দিকে এই সব আলোচনা মানবের চিন্তাপ্রবাহকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছে।

ক্রমবিকাশবাদ (The Doctrine of Evolution) প্রচারিত হওয়ায় বর্ত্তমান জগতের আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহের ধারণা এবং ভগবান কি ভাবে ব্রহ্মাণ্ডে কার্য্য করিতেছেন তদ্বিষয়ক ধারণা অনেক বদ্‌লাইয়া গিয়াছে এবং অনেক প্রসার ও পুষ্টিলাভ করিয়াছে। এখন দেখিতেছি যে আমরা এক অধঃপতিত বা শাপভ্রষ্ট জাতি নহি, আমরা উন্নতিশীল জাতি। ভগবানের সংকল্প যে সৃষ্টির প্রারম্ভেই বিফল হইয়া গিয়াছে এবং তাহার ফলে সমুদয় মানুষের দশভাগের নয়ভাগ অনন্ত নরকে পতিত হইয়াছে তাহা নহে, ভগবানের সংকল্প কখনই বিফল হয় নাই এবং বিফল হইবার নহে, সেই সঙ্কল্প শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ক্রমশঃ সফলতার দিকেই অগ্রসর হইতেছে—সমগ্র বিশ্বঘটনা এক সুবৃহৎ নাটকের অভিনয়—তাহার উদ্দেশ্য সমগ্র মানবজাতিকে উন্নত করা ও সত্যের আলোকে মণ্ডিত করা।

অধ্যাত্মচিন্তা এই নূতন যুগে যে অভিনব গভীরতা ও বিশালতা লাভ করিতেছে, তাহার একটি কারণ অন্যান্য দেশের অন্যান্য ধর্ম্ম ও সাধনার সহিত পরিচয়। ইহা পূর্ব্বে তেমন সম্ভব ছিল না, এখন ইহা অত্যন্ত

স্বাভাবিক হইয়াছে। এখন বুঝিতে পারা যাইতেছে যে অধ্যাত্ম-সাধনা ও সাধুতা কেবলমাত্র একটি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের একচেটিয়া সম্পত্তি নহে। সকল দেশেই ধর্ম্ম আছে, সকল দেশেই সাধু আছেন। ভগবদ্‌শক্তিতে প্রবুদ্ধ হওয়া এবং ভগবানের প্রত্যাদেশ পাওয়া কেবল একযুগের বা একজাতির একচেটিয়া নহে এবং কেবল একখানি ধর্ম্মগ্রন্থেই যে তাহা আছে তাহাও নহে। ঐশ শক্তি ও ঐশ প্রেম বিশ্বজনীন, সকল দেশের ও সকলযুগের একই ঈশ্বর।

ধর্ম্মবিষয়ে যাঁহাদের অনুরাগ আছে, উন্নতি ও বিস্তৃতির এই সমুদয় চিহ্ন দেখিয়া তাঁহারা নিশ্চয়ই অতিমাত্র উল্লসিত হইবেন। এই সমুদয় উন্নতির চিহ্নকে অবিশ্বাস করাই প্রকৃত সংশয়বাদ। এই সমুদয় দেখিয়া এইটুকুই মনে হয় যে ভগবান তাঁহার বিশ্বে রহিয়াছেন, তাঁহার সত্যের আলোক মলিন হয় নাই ক্রমশঃ অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া অগ্রবর্ত্তী হইতেছে, ধর্ম্ম-সাধনা সত্য ও জ্ঞানের সহিত অধিকতর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করিয়া পূর্ব্ব হইতে অধিকতর মঙ্গলজনক প্রভাব মানবসমাজে বিস্তার করিতেছে। এই সব অগ্রবর্ত্তীতার চিহ্ন দেখিয়াই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে ধর্ম্মের পুনরুত্থান হইতেছে এবং এই পুনরুত্থানের মধ্য দিয়া ধর্ম্ম ক্রমশঃ গভীর ও দূরপ্রসারী হইতেছে।

আর একদিকে ধর্ম্মের পুনরুত্থান হইতেছে তাহাও বেশ ধীরভাবে আলোচনা করা উচিত। ধর্ম্মের যে দিকটা মানবের দিকে প্রসারিত আমরা সেই দিকটার কথা বলিতেছি। যে সমস্ত আন্দোলন মানবে মানবে প্রেম, ও ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠা করে, সামাজিক জীবনের সংস্কার করে, রাজনীতিক অর্থনৈতিক ও নৈতিক সকল বিভাগে হস্তক্ষেপ করিয়া দীর্ঘকাল হইতে সঞ্চিত আবর্জ্জনারাশি দূর করিয়া দেয়, সেই সমস্ত আন্দোলনগুলিও ধর্ম্মের পুনরুত্থান আলোচনায় বিশেষভাবে বিবেচ্য। এ প্রকারের আন্দোলন বা সমবেত চেষ্টা যে কোন্ কালে কোন দেশে ছিল না তাহা নহে, তবে বর্ত্তমান সময়ে এই সমুদয় চেষ্টায় যে একটা নবজাগরণ আসিয়াছে তাহা এযুগের একটি গৌরবের বস্তু। এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা এই সমুদয় জনহিতকর কার্য্যকে ধর্ম্মের অঙ্গীভূত বলিয়া স্বীকার করেন না, তাঁহারা বলেন যে এ সমস্ত কার্য্য "সৎকার্য্য" এই পর্য্যন্ত, কিন্তু ধর্ম্ম নহে। এই সমস্ত কার্য্যকে ধর্ম্মের অঙ্গীভূত বলিয়া যাঁহারা বিবেচনা করেন না, ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহাদের

ধারণা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও বাহ্য, এমন কি শাস্ত্রবাক্যের উপরেও তাহার প্রতিষ্ঠা নাই। খ্রীষ্টানদের ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে "পিতৃহীন ও বিধবাকে তাহার শোকের সময় সান্ত্বনা দেওয়া" "প্রতিবাসীকে নিজের মত ভালবাসা" "ক্ষুধিতকে খাওয়ান" "নগ্নকে বস্ত্রদান" 'রোগীরসেবা' 'যাহারা কারাগারে আছে তাহাদের তত্ত্ব লওয়া' এই সমস্তই প্রকৃত ধর্ম্ম। কেবল খ্রীষ্টীয়শাস্ত্র কেন সকলশাস্ত্রেই এই প্রকারের কথা আছে। এই সকল কথা যদি শাস্ত্রসঙ্গত ও সত্য হয়, তাহা হইলে মানুষের মধ্যে জনসেবা, সমাজসংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে আগ্রহ জাগাইয়া দেওয়া প্রকৃত প্রস্তাবে সত্যের উপর দিয়া কার্য্যতঃ ধর্ম্মের পুনরুত্থানে সাহায্য করা।

সুতরাং দেখা যাইতেছে,যে জন হাউয়ার্ড একালে ধর্ম্মের পুনরুত্থানের একজন প্রকৃত সাধক। মানবের প্রতি প্রেম, ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ—এ দিকটা একেবারে যেন মলিন হইয়া গিয়াছিল, হাউয়ার্ড সে দিকে ধর্ম্মকে জাগাইয়া দিলেন। তিনি দেখিলেন একদল মানবমানবীর প্রতি সমাজের আদৌ কোনরূপ করুণদৃষ্টি নাই, তাহাদের সারিয়া উঠিবার কোনই আশা নাই। তিনি এই সমস্ত হতভাগ্যের প্রতি যে অবিচার ও অত্যাচার হয় তাহা প্রচার করিবার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিলেন। তাহাদের দুঃখের প্রতি মানবহৃদয় যাহাতে কারুণার্দ্র হয় সেজন্য তিনি চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ক্রীতদাসপ্রথা দূর করিবার জন্য ইংলণ্ডে ও আমেরিকার যুক্তরাজ্যে যে আন্দোলন হয়, তাহাতেও ধর্ম্মের এই কার্য্যকরী দিকের পুনরুত্থান দৃষ্ট হইতেছে। অতীতযুগে ক্রীতদাসপ্রথা ভাল বলিয়াই নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বে যুদ্ধের বন্দীগণকে মারিয়া ফেলা হইত। তাহার পর তাহাদের আর মারিয়া না ফেলিয়া ক্রীতদাস করিয়া রাখার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। ক্রমে জগতে প্রেম ও করুণার যে আদর্শ প্রচারিত হইল তাহার আলোকে আর ক্রীতদাসপ্রথাও রক্ষনীয় বলিয়া বিবেচিত হইল না। ঈশ্বর পিতা ও মানবে মানবে ভ্রাতা সুতরাং একজন মানুষ চিরকাল আর একজনকে কেমন করিয়া দাস করিয়া রাখিবে? সুতরাং ক্রীতদাসপ্রথা দূর করার জন্য এই যে আন্দোলন, ইহাও মানবতার দিক দিয়া ধর্ম্মের একটি পুনরুত্থান।

মিতাচারের জন্য—সুরাপানাদি নিবারণের জন্য যে সমস্ত আন্দোলন হইতেছে তাহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম্মেরই পুনরুত্থান পরিদৃষ্ট হইতেছে।

তাহার পর ইউরোপে শ্রমজীবিআন্দোলন ইহার মধ্যেও ধর্ম্মের

পুনরুত্থান। একটি প্রকাণ্ড তরঙ্গের মত এই আন্দোলন পৃথিবীকে প্লাবিত করিবার জন্য সবেগে সমুত্থিত হইতেছে। ইহার উদ্দেশ্য শ্রমজীবিদিগের প্রতি যে অত্যাচার হয় তাহার নিবারণ। শ্রমজীবিরাও মানুষ, তাহারা ন্যায্য পারিশ্রমিক পায় না, তাহাদের প্রতি অত্যাচার ও অবিচার হয়, এই সমস্ত দূর করিতে হইবে। সকলে ন্যায়পথে বিচরণ কর, এই আন্দোলন ইহাই বলিতেছে সুতরাং ইহাও এক পুনরুত্থান।

মানুষ পশুর প্রতি নিরন্তিশয় অত্যাচার করে। এই নির্দ্দয় অত্যাচার নিবারণকল্পে একদল লোক বদ্ধপরিকর হইয়াছে। তাহারা দেশে দেশে আন্দোলন করিয়া আইন পাশ করাইতেছে, পালিত পশুগণের প্রতি লোকে যাহাতে কারুণ্য প্রদর্শন করে সে জন্য লোকমত গঠন করিতেছে, ইহাও ধর্ম্মের পুনরুত্থান।

এই মানবতা ও ন্যায়পরতার ভাব যে ক্রমে ক্রমে প্রসারলাভ করিতেছে তাহার আরও অনেক উদাহরণ দিতে পারা যায়। যাহারা উন্মাদ রোগগ্রস্ত তাহাদের সুচিকিৎসা, অন্ধ, বধির মূক, ও দুর্ব্বল-মস্তিষ্ক ব্যক্তিদের শিক্ষার ব্যবস্থা, জেলখালাসীদের সাহায্যভাণ্ডার, নির্ধন, দুশ্চরিত্র ব্যক্তিদের সন্তানগণকে অসৎশিক্ষা, ও অপরিণত বয়সে অতিপরিশ্রমের হস্ত হইতে রক্ষা ও তাহারা যাহাতে ভাল লোক হইতে পারে এপ্রকারের শিক্ষার বিধান করা। শিল্প ও সংস্কার বিদ্যালয়, যেখানে শিল্প শিখাইয়া সত্যসত্যই স্থায়ীরূপে চরিত্রের সংস্কার করা যায়। ছেলেদের জন্য পৃথক বিচারালয়, অনাথাশ্রম, যে সব আশ্রয়হীন বালক সংবাদপত্র বিক্রয় করে, জুতা বুরুস করে তাহাদের আশ্রয়স্থান প্রতিষ্ঠা, আতুরাশ্রম, অক্ষমসৈন্য ও নাবিকদের আবাসস্থান, যুদ্ধে আহত সৈনিকদের চিকিৎসা ও সেবার জন্য রেড্‌ক্রস্ সমিতি, জাতিতে জাতিতে শান্তি ও সৌহার্দ্দ প্রতিষ্ঠার সমিতি, দরিদ্রদের জন্য হাঁসপাতাল ও চিকিৎসালয়। পেনি বাঁচাইয়া দরিদ্ররক্ষা, যৌথ-গৃহনির্ম্মাণ-ধনভাণ্ডার, পাঠাগার ও পুস্তকাগার, আরও কত আন্দোলন রহিয়াছে যাহাদ্বারা ন্যায়পরতা, প্রেম ও করুণা সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে। ধর্ম্ম এখন এই জগৎকেই ভগবানের রাজ্য করিতে চাহিতেছে, মানুষকে এখান হইতে বিমুখ করিয়া দূরবর্ত্তী স্বর্গে লইয়া যাইবার জন্য আহ্বান করিতেছে না। 'মানবে প্রেম' ইহাই যুগধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা সবে আরম্ভ হইয়াছে মাত্র. এখনও অনেক বাকি।

যাঁহারা ধর্ম্মাচরণ করিতেছেন, ধর্ম্মার্থে ব্যয় করিবার জন্য যেখানে অর্থ ও সম্পত্তি জমিয়া গিয়াছে, আচার্য্য গুরু বা সাধু বলিয়া যাঁহাদের প্রতিপত্তি আছে, তাঁহাদের দৃষ্টি এই বিশ্বব্যাপী যুগধর্ম্মের প্রতি পতিত হউক।

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের পর আমাদের দেশে শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রের সাহায্যে যে যুগধর্ম্ম প্রচার করা হয় এবং এই গ্রন্থ প্রচারিত হওয়ার চারিসহস্র বৎসর পরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যাহার তত্ত্ব সাধারণ জনসমাজে প্রচার করেন, প্রকৃত প্রস্তাবে বর্ত্তমান জগৎ এই পুনরুত্থানের মধ্য দিয়া সেই ধর্ম্মই অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে। যাহারা মূর্খ, নীচ ও পতিত তাঁহাদের করুণা করা, তাহাদের কল্যাণের জন্য পরিশ্রম করাই এই ধর্ম্মের প্রধান কথা।

এই যে নবভাব, যাহার মধ্য দিয়া বর্ত্তমান সময়ে সমগ্র পৃথিবীতে ধর্ম্মের পুনরুত্থান হইতেছে, তাহারই নাম মানবতার ভাব। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের সাহায্যে সর্ব্বপ্রথম আমাদের এই পৃথিবীতে "মানবতা"র তত্ত্ব প্রচার করেন। চারিশত বৎসর হইতে এই নবভাব জগতে কার্য্য করিতেছে, এইভাবেই এই কথাটি সত্য

"অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়॥" *

নাট্যসাহিত্যে দীনবন্ধু। (৪)

নবীন-তপস্বিনী।

নবীন-তপস্বিনী নীলদর্পণের তিন বৎসর পরে ১৮৬৩ খ্রীঃ অব্দে রচিত হইয়াছিল। এই নাটকের বিষয়টি গাম্ভীর্য্যমূলক হইলেও ইহাতে সর্ব্বপ্রথম দীনবন্ধুর অপূর্ব্ব হাস্যরসের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার আখ্যানবস্তু সামান্য ও বিশেষ জটিলতা-বিহীন। বড়রাণী ও ছোটরাণীর ব্যাপারটা বঙ্কিমবাবু সত্যঘটনা-মূলক বলিয়াছেন; তাহা হইতে পারে। কিন্তু এরূপ সপত্নী-ঈর্ষার গল্প সাহিত্যে নিতান্ত বিরল নহে; পরন্তু ইহাতে বৈচিত্র্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। বিজয়-কামিনীর "কোর্টসিপ" ও মিলন অনেকটা পুস্তকগত আদর্শের অনুযায়ী ও

নবীন তপস্বিনী, ১৮৬৩

---

* "দেবালয়" সমিতিতে কথিত বক্তৃতার মর্ম্ম।

নূতনত্ব-বর্জ্জিত। কিন্তু আখ্যানবস্তু সরল হইলেও, তাহাকে চিত্তাকর্ষক করাই নিপুণ গ্রন্থকারের বাহাদুরী; ইহাতে দীনবন্ধু কতদূর সমর্থ হইয়াছেন বলা যায় না। তবে এই নাটকের মূলগত romantic আখ্যানবস্তুর সহিত হোঁদল কুৎকুতের হাস্যকর প্রহসন জড়িত করাতে নাটকটি বেশ মনোরম হইয়াছে এবং হাস্য ও গম্ভীর বিষয়ের এই অপরূপ সংমিশ্রণই নবীনতপস্বিনীর বিশেষত্ব। কমলে কামিনী ও লীলাবতী এই দুই পরিণত রচনাতে এই বিশেষত্ব আরও পরিস্ফুট।

গাম্ভীর্য্য ও হাস্যরস

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি নীলদর্পণের কবি প্রধানতঃ বাস্তবজীবন ও বাস্তবজগতের চিত্রকর, যদিও তাঁহার আলেখ্য তাঁহার অসীম কল্পনা ও সহানুভূতির রসে অভিষিক্ত হইয়া বিচিত্র আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু নবীন-তপস্বিনীর চিত্রগুলি প্রধানতঃ কল্পনা-মূলক; বাস্তবজীবনের সহিত যে একেবারে সম্বন্ধ নাই তাহা নহে, তবে নিত্যদৃষ্ট পরিচিত বিষয়গুলি ভাবমণ্ডিত কল্পনার রেখাপাতে আরও সমুজ্জ্বল হইয়াছে। নীলদর্পণে দীনদুঃখীর কষ্টবহুল জীবনের জীবন্ত ছবি; কিন্তু নবীন-তপস্বিনী আমাদিগকে প্রাত্যহিক জীবন হইতে এক অপূর্ব্ব কল্পনালোকে লইয়া যায়; সেখানে কাহিনীগ্রথিত বড়রাণী ও ছোটরাণী এবং কাহিনী-বহির্ভূত একদিকে কবিকল্পনার রমণীয় সৃষ্টি ফুটন্ত মালতী ও মল্লিকা, অন্যদিকে জলধর-জগদম্বারূপ দুইটি অপূর্ব্ব জীবের সহিত সাক্ষাৎ হয়। নীলদর্পণের কবি জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চিত্রকরের ন্যায় চিত্র আঁকিয়াছেন; নবীন-তপস্বিনী অঙ্কণে তাঁহাকে অধিক পরিমাণে জীবনের অভিজ্ঞতার সহিত কল্পনারও আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

কল্পনা ও স্বভাবাঙ্কণ

এই বিশেষত্বের পার্থক্যে উভয় গ্রন্থের চরিত্র-অঙ্কণেও বেশ তারতম্য ঘটিয়াছে। এইজন্যই নীলদর্পণের চরিত্রগুলি এত সজীব ও চিত্তগ্রাহী হইয়াছে এবং নবীনতপস্বিনীর বিজয়কামিনী তেমন মনোহর হয় নাই। সমাজের যে সকল জীবন্তচিত্রের অভিজ্ঞতা দীনবন্ধুর ছিল ও যাহার সহিত তাঁহার সহানুভূতি ঘটিয়াছিল, সেই সকল জীবন্ত চিত্রের নকলে তিনি যে চিত্রগুলি আঁকিয়াছেন সেইগুলিই নিখুঁত হইয়াছে। তখনকার সমাজে যে সকল আদর্শ তত প্রচলিত ছিল না, যেগুলি তিনি কল্পনার সাহায্যে আঁকিয়াছেন, বঙ্কিম বাবু দেখাইয়াছেন, সেগুলিতে তিনি তেমন সিদ্ধহস্ত হইতে পারেন নাই। অবশ্য

কাল্পনিক বা পুস্তকগত আদর্শানুযায়ী চরিত্র

বঙ্কিম বাবুর এই উক্তিটির মর্ম্ম বিশেষভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন—"লীলাবতী বা কামিনী শ্রেণীর নায়িকা সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল না। ছিল না—কেন না কোন লীলাবতী বা কামিনী বঙ্গ-সমাজে ছিল না। হিন্দুর ঘরে ধেড়ে মেয়ে, কোর্টসিপের পাত্রী হইয়া, তিনি কোর্ট করিতেছেন, তাঁহাকে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া বসিয়া আছে, এমন মেয়ে বাঙ্গালা সমাজে ছিল না—কেবল আজকাল নাকি দুই একটা হইতেছে শুনিতেছি।" এখন আমাদের দেখিতে হইবে বঙ্কিম বাবু যে নূতন ধরণ ও প্রথাকে অবজ্ঞার সহিত "ধেড়ে মেয়ের কোর্টসিপ" ও "আজকাল দুএকটা শুনা যাইতেছে" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তাহা সে সময়ের পক্ষে কতদূর অপ্রচলিত ও অস্বাভাবিক। যখন দীনবন্ধুর নবীনতপস্বিনী রচিত হইয়াছে তখন যে নূতন শিক্ষার স্রোতে নূতন ভাব সমাজে ধীরে ধীরে প্রবেশ করে নাই এ কথা বলা যায় না। বরং তখন স্ত্রীশিক্ষা ও একটু বেশী বয়সে মেয়ের বিবাহ দিবার চেষ্টা বিশেষরূপে অনুভূত হইয়াছিল * এবং বঙ্কিমবাবু এস্থলে ও তাঁহার গ্রন্থাবলীর অন্যান্য স্থলে এই নূতন ভাব লইয়া বিদ্রূপ করিলেও তিনি স্বয়ং যে এই নূতনভাব হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারেন নাই তাহা তাঁহার গ্রন্থে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য বঙ্কিমবাবু যখন বিলাতী ছাঁচ ব্যবহার করিতেন তখন তাহাকে মাজিয়া ঘসিয়া স্বদেশী করিয়া লইতে ত্রুটি করিতেন না। কিন্তু দীনবন্ধু যে বিলাতী প্রেম বা বিলাতী কোর্টশিপ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতেন এ কথাও বলা যায় না। বরং যতদূর সম্ভব স্বদেশী ছাঁচে নূতন ভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র যখন বঙ্গসাহিত্যের আসরে নামিয়াছিলেন তখন ইংরাজীশিক্ষার স্রোত বঙ্গসমাজে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া একটা যুগান্তর উপস্থিত করিতেছিল। আমাদের সাহিত্য, সমাজ, ও ধর্ম্ম এই তিনদিকে আমাদের জাতীয় আদর্শ পাশ্চাত্য সভ্যতার নূতন আদর্শের সংঘর্ষে আসিয়া বিপর্য্যস্ত হইতেছিল। এই দুইটি বিপরীতগামী সভ্যতার সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া বঙ্কিমচন্দ্র দেখিলেন যে প্রাচীন আদর্শ বহুকালের সংস্কারাগত ও স্বতঃসিদ্ধ হইলেও তাহা নবীন আদর্শানুযায়ী জাতীয় অভ্যুত্থানের পক্ষে আদৌ কল্যাণকর নহে, কিন্তু তেমনি অন্যদিকে নূতন আদর্শ সম্পূর্ণ বিজাতীয় জিনিষ ও আমাদের সমাজ ও জাতীয় জীবনের সহিত সর্ব্বত্র খাপ খায় না। কিন্তু তিনি

তৎসম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর মত

---

* ঈশ্বরগুপ্তের বিদ্রূপ দ্রষ্টব্য।

আরও দেখিলেন যে এই নূতন সভ্যতা ও জ্ঞানের আদর্শও সর্ব্বতোভাবে না হউক কিয়ৎপরিমাণে গ্রহণ না করিলে সমাজের উন্নতি সম্ভব নহে। কিন্তু এই নূতন আদর্শ গ্রহণ করিলেও আমাদের জাতির নিজস্ব জিনিস যে টুকু, আমাদের দেশীয় সভ্যতার বিশেষত্ব, তাহা হারাইলেও চলিবে না। এইজন্য নূতন ও পুরাতন আদর্শের একটা সামঞ্জস্যই সেই সময়ের ও আধুনিক যুগের প্রধান সমস্যা।—সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু এই উভয়ের মধ্যেই দেখিতে পাই যে যখন তাঁহারা নূতন আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন, সেই নূতন ভাব বা আদর্শকে দেশের স্থান, কাল ও পাত্রের সহিত সামঞ্জস্য-বিশিষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যদি বঙ্কিমবাবু প্রেমের পূর্ব্বরাগ অঙ্কিত করিবার জন্য রাজপুত পরিবার বা লক্ষণসেনের যুগ অবলম্বন করিতে পারেন, তবে দীনবন্ধু তদ্বিকল্পে কেন যে কাহিনী প্রচলিত রাজারাণীর উপাখ্যান অবলম্বন করিবেন না তাহা বুঝা যায় না। নূতন ভাব ফুটাইবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে আধুনিক সামাজিক অবস্থার বিরোধী বলিয়া ইতিহাসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, দীনবন্ধু যেখানে কাহিনী বা উপাখ্যানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। দীনবন্ধুর সেখানে কাহিনী বা উপাখ্যানের আশ্রয় গ্রহণ অসমীচীন নহে। মালতী মল্লিকা অল্পাধিক পরিমাণে ইংরাজী ছাঁচে গঠিত বটে কিন্তু বিমলা বা আয়েসা কিছু খাঁটী স্বদেশী ছাঁচে নির্ম্মিত নহে। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়কে কেহ ইঙ্গবঙ্গ বলিবেন না; এ সম্বন্ধে তাঁহার মত নিম্নে উদ্ধৃত হইল—"এই উপাখ্যানের, নাটকরীতিতে বিস্তার ও সুকৌশল সহকারে বর্ণনা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার দুইটি অতি রমণীয় পদার্থ তন্মধ্যে বিন্যস্ত করিয়াছেন। সে দুইটির ছাঁচ বিলাত হইতে আনা হইয়াছে বলিয়া আমরা কোনও দোষ দিই না,—যে হেতু বিলাতীয়ের অনুরূপ দ্রব্য এ দেশে উত্তমরূপে নির্ম্মাণ করিয়া দেশীয়দিগের মন মোহিত করিতে পারিলে তাহাতে বাহাদুরীও আছে, দেশের উপকারও আছে। সেই দুইটি জিনিষ কি?—মল্লিকা আর মালতী।"* সুতরাং এখানে বুঝিতে হইবে যে ইংরাজী ভাব বা ধরণ গ্রহণ এই সকল পরিবর্ত্তনযুগের লেখকদিগের দোষের বিষয় নহে, পরন্তু দেখিতে হইবে যে এই নূতন ভাব কতটা আমাদের দেশের সামাজিক বা নৈতিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া গ্রহণীয় এবং তাহা কতটা সাহিত্যে সৌন্দর্য্য সৃষ্টির অনুকূল। এরূপ কথাও বলা যায় না যে

মালতী ও মল্লিকা

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব। নূতন সংস্করণ, পৃঃ ৩০০।

দীনবন্ধু বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায়, নূতন ভাব কাব্যকৌশলে সুন্দর ও স্বাভাবিক করিয়া গ্রহণ করেন নাই; তবে বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই এ বিষয়ে অধিকতর কুশলী। † কামিনীকে কোথাও হিন্দুর ঘরের মেয়ে ভিন্ন আর কিছু বোধ হয় না। হিন্দুর ঘরে (আধুনিক পর্দার আড়ালে নহে) এবং তাহার মত অবস্থায় স্বাভাবিক ভাবে যেরূপ ঘটিতে পারে, দীনবন্ধু তাহাই অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

কামিনী

নবীন তপস্বিনীর যৌনভাব, শান্ত স্বভাব, ও লজ্জা-নম্র মুখ প্রভৃতি সত্ত্বেও প্রগল্‌ভা নায়িকাজনোচিত "ধেড়ে মেয়ে" ইত্যাদি অবজ্ঞাজনক আখ্যা কতদূর সমীচীন তাহা পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন। আরও এখানে উল্লেখযোগ্য যে শিবমন্দিরে জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার ন্যায় বিজয়কামিনীর দর্শনমাত্র পরস্পর অনুরাগ-সঞ্চারের উদা-

সংস্কৃত নাটকে পূর্ব্বরাগ ও কোর্টসিপ.

হরণ সংস্কৃত নাটকে বিরল নহে ও সেকালে ইহা কিছু অনুচিত ছিল না। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে সংস্কৃত নাটকের রীতির অল্পাধিক অনুসরণ আমাদের নাট্যসাহিত্যের প্রথমাবস্থায় বিশেষরূপে দেখা যায়। সুতরাং এরূপ পুণ্ডরীক-মহাশ্বেতা বা দুষ্মন্ত-শকুন্তলাদির ন্যায় পূর্ব্বরাগের আদর্শ যে সম্পূর্ণ বিলাতী ধরণ তাহা বলা যায় না। নবীন-তপস্বিনীতে কোথাও এমন কোন কথা নাই যাহাতে বিজয়-কামিনীর মধ্যে হাল ইংরাজী ধরণের কোর্টসিপ চলিত এরূপ অনুমান করিতে পারা যায়।

তাহা হইলে বুঝা যায় যে বিজয় কামিনীর চরিত্রাঙ্কন বঙ্কিমবাবু যেরূপ অস্বাভাবিক বলিয়াছেন, তাহা সমর্থন করা যায় না। দীনবন্ধুর "কবিত্ব একেবারে নিষ্ফল" নহে; তবে এই টুকু বলা যায় যে বিজয়-কামিনীর কাহিনী অনেকটা মামুলী প্রথাগত কাব্যের নায়ক নায়িকার গল্পের মত বৈচিত্র্য-বর্জ্জিত ও দীনবন্ধুর অন্যান্য চিত্রের মত নহে। যেখানে দীনবন্ধু পুস্তকাগত আদর্শের আশ্রয় লইয়াছেন সেখানে তাঁহার রচনা মনোহর হয় নাই; তবে

এরূপ চরিত্র অস্বাভাবিক নহে, তবে বৈচিত্র্য-বিহীন

তাহা যে একেবারে অস্বাভাবিক হইয়াছে একথা বলা যায় না।

এরূপ কল্পনা-বহুল চরিত্র-সৃষ্টি সম্বন্ধে তাঁহার ক্ষমতা যে সীমাবদ্ধ,

---

† লীলাবতীর কথা পরে আলোচ্য।

বোধ হয় দীনবন্ধু এ কথা নিজেও বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই জন্য নবীন তপস্বিনীর গল্পভাগ গম্ভীর হইলেও হাস্যরসেরই প্রাধান্য দেখা যায়। এই নাটক রচনার পর দীনবন্ধু বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে হাস্যরসেই তাঁহার ক্ষমতার প্রসর এবং এ বিষয়ে তাঁহার দ্বিতীয় নাই। পাঠকগণ বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে নবীন-তপস্বিনীর প্রথম হইতেই মালতী-মল্লিকা ও জলধরের প্রবেশ ও হাস্যরসের সূত্রপাত, এবং বিজয়-কামিনী বা রাজা-রাণীর অপেক্ষা হোঁদলকুৎকুতের কাহিনী ও মাধবের হাস্য পরিহাসই গ্রন্থের বেশী ভাগ স্থান অধিকার করিয়া আছে। এখানে করুণ অপেক্ষা হাস্যরসই অধিকতর ব্যাপক।

নবীন তপস্বিনীতে হাস্যরসের প্রাধান্য

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে এরূপ করুণরসের সহিত হাস্যরস গ্রথিত করিয়া দেওয়াই হাস্যরসিকের শ্রেষ্ঠ গৌরব এবং পাঠকের মনে হাস্য ও কারুণ্য মিশ্রিত এক অভিনব ভাব জাগাইয়া দেওয়া এই শ্রেণীর নাটকের বিশেষত্ব। এইরূপ হাস্য ও করুণরসের সংমিশ্রণের দুইটি কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, জীবনে যেমন আমরা নিরবচ্ছিন্ন হাস্য বা নিরবচ্ছিন্ন অশ্রু ভালবাসি না, উপন্যাস নাটকেও সেইরূপ। জীবনটা একটানা নদীর স্রোত নহে; মানুষ চিরকাল গম্ভীর হইয়া থাকিতে পারে না। অত্যধিক গাম্ভীর্য্য কিছু কাজের নহে, বরং আরও হাস্যাস্পদ। অতি দুঃখের মধ্যেও হাসি পায়; তখন না হাসিলে দুঃখ আরও অসহ্য হইয়া উঠে। তাই উড্ সাহেবের সবুটপদাঘাতের পরও গোপীনাথের হাসি পাইল ও সে বলিয়া উঠিল—"বাপ! বেটা যেন আমার কলেজ ওউট্ বাবুদের গৌনপরা মাগ।" সেই জন্য একটানা গাম্ভীর্য্য বা করুণ রসের অভিব্যক্তির মধ্যে হাস্যরসের সুস্নিগ্ধ রেখাপাত নাটকের সৌন্দর্য্য আরও ফুটাইয়া তোলে। দ্বিতীয়তঃ হাস্য ও করুণ এই দুই পরস্পর বিরোধী রসের একত্র সমাবেশে করুণ রসের গাঢ়তা আরও বর্দ্ধিত হয়। সহসা উচ্চ বিষয়ের কল্পনার মধ্যে অকাল্পনিক বাস্তব জগতের হাসিখুসি, চিত্রের গাম্ভীর্য্য আরও বাড়াইয়া দেয়। নীলদর্পণের দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে যখন পাষণ্ড নির্দ্দয় নীলকরদিগের পাশবিক অত্যাচার ও নিরীহ অসহায় দরিদ্রের দুঃখ আমাদিগকে সংক্ষুব্ধ করিয়া তোলে, তখন

হাস্য ও করুণ রসের একত্র সমাবেশ

দেখিয়া আমরা নীলকরদিগের ভয়াবহ জগতের বীভৎসতা আরও স্পষ্ট অনুভব করিতে পারি। ম্যাকৃবেথের সুপ্রসিদ্ধ দৌবারিকের দৃশ্য (১ম অঙ্ক ২য় গর্ভাঙ্ক) এই হিসাবে বিশেষে কলানৈপুণ্যের পরিচায়ক।

অতএব দেখা যাইতেছে যে হাস্যকর ও গম্ভীর বিষয়ের নিপুণ সমাবেশ হাস্যরসিকের একটি বিশেষ কাব্যকৌশল। এই কাব্যকৌশল অনুসরণ করিয়া দীনবন্ধু নবীন-তপস্বিনীতে একদিকে রাজারাণীর উপাখ্যান অন্যদিকে জলধর-জগদম্বাসংবাদ চিত্রিত করিয়াছেন। কিন্তু গাম্ভীর্য্য ও কৌতুকের এরূপ একত্র সমাবেশ সত্ত্বেও নবীন তপস্বিনীতে একটি নৈপুণ্যের অভাব এই যে নাটকের মূলগত গম্ভীর বিষয়ের সহিত ইহার হাস্যরসাত্মক প্রসঙ্গের কোন বিশেষ সম্পর্ক নাই বলিলেও চলে। হোঁদলকুৎকুতের প্রেমের ব্যাপার ও বড়রাণী ছোটরাণীর গল্প দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক বিষয়। এই দুইটী শুধু পাশা-

কিন্তু নবীন-তপস্বিনীতে গম্ভীর বিষয় ও কৌতুক-প্রসঙ্গ পরস্পর সম্পর্ক বিহীন

পাশি রাখা হইয়াছে মাত্র, কমলেকামিনীতে বা লীলাবতীতে যেমন তাহারা পরস্পরের সহিত অঙ্গাঙ্গী-ভাবে মিশিয়া গিয়াছে এ স্থলে সেরূপ নহে। বলিতে গেলে নবীন-তপস্বিনীর মূলগত ভাবটি গম্ভীর বিষয়ক, কেবল কতক গুলি কৌতুককর দৃশ্য (Farcical Interludes) মধ্যে মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং তাহাদের গতি নাটকের মূলগতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। সেক্সপিয়ারের প্রথম রচনাগুলিতেও এইরূপ দেখা যায়। কাপিউলেৎ যখন মহাসমারোহে ভোজের উৎসবে উন্মত্ত, জুলিয়েৎ তখন উপরের ঘরে সংজ্ঞা-বিহীন মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছেন। কিন্তু পরবর্ত্তী নাটকগুলিতে সেক্সপিয়রের পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও অধিকতর নৈপুণ্য-ব্যঞ্জক। ম্যাকৃবেথের দৌবারিকের দৃশ্য পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে; হ্যামলেট্ ও শবখননকারী লিয়র ও তাঁহার বিদূষক প্রভৃতি দৃশ্যগুলিও উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে। নবীন-তপস্বিনীর জলধর-প্রসঙ্গ না থাকিলেও নাটকীয় আখ্যানবস্তুর হানি হয় না, তবে এখানে এইটুকু স্বীকার করিতে হইবে যে যদিও নবীন তপস্বিনীর দুইটি প্রসঙ্গ পরস্পর সম্পর্ক-বিহীন, তথাপি আখ্যান বস্তুর মধ্যে দীনবন্ধু যে হাসি ও অশ্রু শেষোক্তরূপে মিশাইয়া দিতে একেবারে চেষ্টা করেন নাই, তাহা বলা যায় না। কিন্তু তাহা ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই। নবীন তপস্বিনীর মধ্যেও তাহার পরিহাসোক্তি অনেক সময় লিয়রের বিদূষককে মনে করাইয়া

মাধবের চরিত্রে হাসি ও অশ্রুর সংমিশ্রন

দেয়। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল-রচিত সাজাহানের দিল্‌দার বা রাজারাণীর দেবদত্ত অধিকতর পরিস্ফুট

যাহৌক, নবীন-তপস্বিনীর হাস্যরসাত্মক চিত্র ও চরিত্র গুলি ইহার অন্যান্য চিত্র ও চরিত্র হইতে বেশী নিখুঁত ও চিত্তাকর্ষক। এই জন্য কেবল এই কৌতুকপ্রসঙ্গের উপর নির্ভর করিয়া 'কলিকাতা রিভিউ' এর সমালোচক (১৮৭১ খৃঃ ৫১ খণ্ড) নবীন তপস্বিনীকে দীনবন্ধুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিতে চাহেন। বাস্তবিক চরিত্র-সৃষ্টি হিসাবে নবীন-তপস্বিনীর মালতী মল্লিকা জলধর জগদম্বা বিদ্যাভূষণ ও মাধব অতুলনীয়। মাধব সংস্কৃত বিদূষকের আধুনিক ও উন্নত সংস্করণ। বিদ্যাভূষণের চরিত্র সুন্দর হইলেও নূতন ও মনোরম সৃষ্টি। যাঁহারা বলেন এই চারিটি চরিত্র সেক্‌স্‌পিয়রের 'উইণ্ডসরের রসিকা রমণী' (Merry Wives of Windsor) হইতে গৃহীত তাঁহারা যদি ফলষ্টাফের সহিত জলধর, মালতীর সহিত মিষ্ট্রেস্ ফোর্ড ও মল্লিকার সহিত মিষ্ট্রেস্ 'পেজ'এর তুলনা করেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন উভয় চিত্রের পার্থক্য কতদূর। শুধু গল্পের ছায়া মাত্র গৃহীত, অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে দীনবন্ধুর মৌলিকতা রহিয়াছে। আরও বলা যাইতে পারে যে এরূপ গল্প। মেরি ওয়াইভ্‌স্, এর বিশেষত্ব নহে, প্রাচীন সাহিত্যে ইহা এত প্রচলিত যে ইহা লেখকদিগের সাধারণ সম্পত্তি বলিলেও চলে। তার পর, চরিত্রাঙ্কণবৈচিত্র্যে দীনবন্ধু সেক্‌স্‌পিয়রকে আদৌ অনুসরণ করেন নাই। অবশ্য ফলষ্টাফের ন্যায় জলধরও নির্লজ্জ, আত্মশ্লাঘাপরায়ণ, কিন্তু ভিতরে ভিতরে কাপুরুষের একশেষ। যেমন বীরত্ব ঔদার্য্য প্রভৃতি ধীরোদাত্ত নায়কের লক্ষণ, তেমনি আত্মশ্লাঘা ও কাপুরুষতা কৌতুক-সৃষ্টির মেরুদণ্ড স্বরূপ। তথাপি জলধর, ফলষ্টাফ বা মলিয়ারের Tartuffe (তার্তুফ) অপেক্ষা অধিকতর হাস্যজনক সৃষ্টি। জলধরকে লইয়া মালতী মল্লিকার রহস্য, কেলিগৃহে জলধর-জগদম্বার সাক্ষাৎ ও জলধরের হোঁদলকুৎকুতের রূপধারণ ও শেষ শিক্ষা, সত্যসত্যই প্রথম শ্রেণীর লেখকের উপযুক্ত ও চিরকাল হাস্যরসের উৎস হইয়া থাকিবে। একথা বলা বাহুল্য যে মালতী ও মল্লিকা দীনবন্ধুর সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি এবং এ বিষয়ে তিনি কোন পুস্তকগত আদর্শ গ্রহণ করেন নাই ; এরূপ রসিকা, প্রমোদমানা, বিবেকবতী ও প্রত্যুৎপন্নমতি নারী চিত্র এক বিমলা ভিন্ন বঙ্গসাহিত্যে বিরল। সত্য সত্যই মালতী ও মল্লিকা ফুটন্ত মল্লিকা ও মালতীর ন্যায় মনোরম।

অন্যান্য হাস্যাত্মক চিত্র চরিত্র : তাহাদের মৌলিকতা

শ্রীসুশীলকুমার দে।

শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত।

রামানন্দ রায় সংবাদ

"প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর
রায় কহে স্বধর্ম্ম-ত্যাগ ভক্তি সাধ্যসার।"

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু, কৃষ্ণার্পিত কর্ম্মকে কর্ম্ম বলায় তাহা ভক্তি না হইলেও আরোপ-সিদ্ধা ভক্তির ন্যায় বর্ণন করায় বাহ্য বলিয়া, 'আগে কহ' বলিলেন। শ্রীরামানন্দ স্বধর্ম্ম-ত্যাগকে সাধ্য ভক্তি বলিয়া বর্ণনা করিলেন এবং একটি শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকের দ্বারা নিজের উক্তি সমর্থন করিলেন। তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে একাদশাধ্যায়ে দ্বাত্রিংশৎ শ্লোকে শ্রীউদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং,

"আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়া দিষ্টানপি স্বকান্
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ সচ সত্তমঃ"

আমা কর্ত্তৃক কথিত ধর্ম্মের গুণ ও দোষ অবগত হইয়া যিনি ধর্ম্ম-ত্যাগ করিয়া আমাকে ভজনা করেন, তিনিই সাধু-শ্রেষ্ঠ। যদিও প্রাকৃত বদ্ধ জীবকে উদ্ধারের পথে আনিবার জন্য আমি বেদে কর্ম্মোপদেশ করিয়াছি কিন্তু তাহা গুণ ও দোষ দ্বারায় জড়িত; গুণের দ্বারা স্বর্গ এবং দোষের দ্বারায় নরক ভোগ হয়। কিন্তু আমি কর্ম্মের অভ্যন্তরে সত্তা-রূপে থাকায় জীব আপনা হইতে ভোগ করিতে করিতে তাহার গুণ দোষ জানিতে পারে। মহাপাপী পাপাচরণ করিতে করিতে সেই পাপের পথে একদিন ধর্ম্মের উজ্জ্বল আলোক দেখিতে পায়। জীব ততদিন কর্ম্ম করে, যতদিন না তাহার গুণ দোষ জানিতে পারে। জানিতে পারিলে আর কর্ম্মাসক্ত হয় না। মায়া যেন আমাদিগকে কর্ম্ম-দ্বারা গুণ করিয়া সংসারাসক্ত করিতেছে, কিন্তু শ্রীহরিভক্তি-রূপ রসায়ন দ্বারা মায়ার গুণ খণ্ডিত হয়। সেই জন্য উদ্ধবকে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে বলিতেছেন, উদ্ধবের কর্ম্ম অগ্রে খণ্ডিত হইয়াছে তিনি অধিকারী হইয়াছেন, এই জন্য তাঁহার প্রতি অধিকারীভেদে ব্যবস্থা করিলেন।

ধর্ম্ম দ্বিবিধ স্ব ও পর। জীব কতদিন স্বধর্ম্মে থাকে? যতদিন না পরধর্ম্মে দীক্ষিত না হন। স্বধর্ম্ম আপনার সম্বন্ধে আর পরধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে। যতদিন অভিমান থাকে ততদিন তাহার স্বধর্ম্ম থাকে। কিন্তু অহঙ্কার ক্ষয় হইলে

আর স্বধর্ম্ম থাকে না, আত্মসমর্পণ করিলে আর স্বধর্ম্ম থাকে না। যে দেহ দিয়াছে তাহার ধর্ম্মও দেওয়া হইয়াছে।

কিন্তু আমরা যথার্থ আত্মসমর্পণ করিতে পারি না, সেই জন্য স্বধর্ম্ম-ত্যাগ সিদ্ধ হয় না। এক কথায় শ্রীকৃষ্ণের কৃপা না হইলে জীবের স্বধর্ম্ম যায় না, সেই জন্য জীবকে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে বলিলে, জীব কি করিয়া সে ধর্ম্ম ত্যাগ করিবে? কারণ স্বধর্ম্মের সঙ্গে জীবত্ব থাকে আর পরধর্ম্মে শ্রীকৃষ্ণের দাসত্ব সম্বন্ধ থাকে। সেই জন্য ইহা জীবের সাধ্যের অতীত বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু 'এহোবাহ্' বলিলেন। কারণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ॥"

হে অর্জ্জুন! যদি সকল ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমার একমাত্র শরণ লও, তাহা হইলে আমি তোমাকে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত করিব। ইহাতে শোক করিও না। 'যদি শরণ লও তবেই ত মুক্ত করিব, আর শরণ না লইলে মুক্ত করিব না' ইহাও কৃপার কথা নহে। আর জীবেরও সাধ্য নাই ধর্ম্ম ত্যাগ করে, সেই জন্য মহাপ্রভু 'বাহ্' কহিলেন। কারণ শ্রীব্রহ্ম-স্তবে আছে "ত্বামাত্মানং পরংমত্বা পরমাত্মানমেবচ"" মায়া আমাদিগকে পরম উপাদেয় আপনাকে পর করাইয়া দেহকে আপনার করাইয়া দিয়াছে। কাঞ্চন ত্যাগ করাইয়া, কাচ সংগ্রহ করাইতেছে, ভিতরে স্পর্শমণি আর বাহিরে দারিদ্র্য, সেইজন্য পরধর্ম্ম-যাজীকে ভগবান স্বধর্ম্মযাজন করিতে বলিলেও সে তাহা করে না। শ্রীগোপীরা কি ভগবদ্বাক্যে রাসমণ্ডল ত্যাগ করিয়া সংসার করিতে গিয়াছিলেন? তাহা ত যান নাই।

আমরা প্রাকৃত জগতে দেখিতে পাই, দুগ্ধকে যখন অম্ল সংযোগে দধি করা হয়, তখন সে অন্তর বাহির অম্লকে ভজনা করিয়া থাকে, সেইরূপ এই ধর্ম্ম যখন কৃষ্ণসম্বন্ধজারিত হয়, তখন ইহাও অন্তর বাহিরে এই বৃন্দাবনচাঁদ মধুর মুরলীবিলাসী বাঁকা শ্রীরাধার মদনমোহনকে স্ফুরিত করে।

ফলতঃ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইলে জ্ঞানের অস্তিত্ব থাকিবেই থাকিবে। আনন্দ আবার জ্ঞানসম্বন্ধশূন্য; সেই জন্য ভগবান্ শ্রীগৌরচন্দ্র ইহাকে 'বাহ্' করিলেন। স্বধর্ম্ম-ত্যাগ সাধ্যসার নহে, ইহা সাধন-সার বটে। সাধ্যসার শব্দের অর্থ, যাহা কিছু তত্ত্ব সাধনার দ্বারায় পাওয়া যায়। তাহা হইতে অধিক আর কিছু প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা জীবের থাকে না। স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিলে জীবত্ব পূর্ণতা পায়না; প্রেমেই পূর্ণত্ব লাভ করেন।

ভক্তি স্বতন্ত্র ও প্রবলা এবং "শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়" এই-প্রকারে শ্রীকবিরাজ গোস্বামী বর্ণনা করিয়াছেন। একটী মালতীলতার বীজ উর্ব্বর ক্ষেত্রে রোপন করিয়া জলাদি সিঞ্চন করুন, তাহা হইলে আপনার বৃক্ষ পুষ্পিত হইবে, আপনি কিন্তু তাহার ভিতরের কোন সংবাদ অবগত নহেন, কেবল বাহিরে পুষ্প উৎপত্তির অনুকূল ক্রিয়া করিতেছেন, যদি ঐ মালতীলতায় মল্লিকা পুষ্প উৎপন্ন করিতে পারেন, তবে তাহাকে সাধনা বলা যায়; ভিতরের ক্রিয়া ক্রম-বিকাশকে প্রকৃত সাধনা বলা যায় না, কেননা তাহাতে যে সাধ্য ভাব আছে সেইগুলি অনুক্রমে আসিতেছে মাত্র, ভক্তিও তদ্রূপ বিবেচনা করিয়া লইতে হইবে। আপনি আজ শৈশব, কল্য যৌবন, পরশ্বঃ বার্দ্ধক্যাবস্থায় উপনীত হইতেছেন। কেবল শরীররক্ষার অনুকূল ক্রিয়া করিতেছেন, আপনাকে কি বলিব যে আপনি সাধন করিয়া অবস্থান্তর পাইতেছেন? তাহা নহে, আপনার সাধ্যধর্ম্মগুলি অনুক্রমে বিকশিত হইতেছে, ঐ সাধ্যধর্ম্মের মূলে যিনি আছেন, তিনিই সাধনতত্ত্ব জানেন। কারণ আমরা যখন পার্থিব বস্তুরই সাধন তাঁহার কৃপা ভিন্ন করিতে পারি না, তখন অপার্থিব প্রেম-সাধন কি করিয়া করিব? পরধর্ম্মের এমনি বল যে তাহাতে নন্দনন্দনকে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করায়। বেদে বলেন, শ্রীভগবান্ আনন্দময়, এবং মনের অগ্রে গমন করেন। কিন্তু মা যশোদার দাম বন্ধনকালে, যষ্টীউত্তোলন সময়ে কাঁদিলেন কেন? আর মা যশোদাই বা তাঁহাকে কি করিয়া ধরিলেন? এসব বিষয় জ্ঞানের অতীত, ইহা যাঁহারা কৃপাবলে স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া পরধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়াছেন তাঁহারাই বলিতে পারেন।

"প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর
রায় কহে জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি সাধ্যসার।"

শ্রীমন্ মহাপ্রভু স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিলে জীবের আকাঙ্ক্ষা মিটেনা, এই জন্য বাহ্য কহায় শ্রীরামানন্দ রায় মহাশয়, পুনরায় একটি পয়ার সমর্থন করিলেন, তিনি বলিলেন জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তিই সাধ্যসার। একটি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্লোক উদ্ধার করিলেন, যথা

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি॥
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥

ব্রহ্মভূতঃ (সাক্ষাৎকৃতাষ্টগুণকাত্মস্বরূপঃ) প্রসন্নাত্মা (প্রসন্ন চিত্তঃ জনঃ) ন শোচতি, ন কাঙ্ক্ষতি সর্ব্বেষু ভূতেষু সমঃসন্ মৎ (মম)পরাং ভক্তিং লভতে।

সর্ব্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টি বশতঃ যাঁহাদের লোভাদি নাই এবং নির্ম্মলচিত্ত, তাঁহারা আমার ভক্তি লাভ করেন। কিন্তু তাহারত নিশ্চয়তা নাই! কাহারও ভাগ্যে ঘটে, কাহারো ভাগ্যে না ঘটিতেও পারে। এরূপ অবস্থায় সাধুসঙ্গ না হইলে কি করিয়া সেই নির্ম্মলা ভক্তির উদয় হয়? যদিও জল সর্ব্বত্র আছে কিন্তু পিপাসার সময় কেবল একটি জল খুঁড়িবার যন্ত্র দিলে পিপাসা মিটেনা; বায়ু সর্ব্বত্র আছে কিন্তু গ্রীষ্মকালে যেমন পাখা প্রভৃতির প্রয়োজন হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম সর্ব্বত্র থাকিলে কি হইবে, আমার হৃদয়ের ভালবাসা কাহাকে অর্পণ করিব? ভালবাসা অর্থাৎ প্রেম, প্রিয়সঙ্গী ভিন্ন পুষ্টি পায় না, আর প্রিয়ের দর্শনাদি ব্যতীত তাঁহার সম্পূর্ণতা সিদ্ধ হয় না, প্রেমে সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ দুইটী অবস্থার উদয় হয়। সম্ভোগে অনন্তসুখ, বিরহে অনন্ত দুঃখ প্রতীত করাইয়া দেয়।

মূলেই যদি প্রেমের আশ্রয়-বস্তু নিরাকার হইলেন, তবে কাহাকে আশ্রয় করিয়া সুখ উদগত হইবে? নির্ম্মল ভক্তিতে জ্ঞান ও কর্ম্ম নাই কিন্তু তাই বলিয়া যে মোটেই নাই তাহা নহে। জ্ঞান ও কর্ম্মের পূর্ণতা এই প্রেম ভক্তিতে আছে। তবে বৈষয়িক জ্ঞান কর্ম্ম নাই। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় জ্ঞানও কর্ম্মের দ্বারা পরিপূর্ণা। এ বিষয়ে শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু বলেন

> "অন্যাভিলাষিতা শূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্
> আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।"

যাহাতে কৃষ্ণাভিলাষ ভিন্ন অন্যাভিলাষ নাই এবং শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় জ্ঞান ও কর্ম্ম ব্যতীত অন্য জ্ঞান কর্ম্ম নাই এবং যাহাতে শাস্ত্রাদির অনুকূল বিধিতে গোবিন্দ ভজন করান তাহাই উত্তমা ভক্তি। শ্রীরামানন্দ রায় সাধক ভক্ত নহেন, তাঁহার সিদ্ধ দেহ, তিনি জ্ঞান-মিশ্রা বলিলেন। তিনি সামান্য জ্ঞানের কথা বলেন নাই। কিন্তু শ্রীমন্ মহাপ্রভু জীবের কলিকল্মষগুনের মহৌষধ সেই শ্রীরাধার প্রেমের বিষয় যাহা সর্ব্বসাধ্যশিরোমণি তাহা শ্রীরামানন্দ রায়ের বদন হইতে বাহির করিয়া এই তাপিত জগতকে বিতরণ করিতে চাহেন। এইজন্য ইহাকেও 'বাহ্য' বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।

সেই পতিত পাবন দয়াল গৌরহরি 'হরেকৃষ্ণ' নামে জগতকে পাগল করিয়াছেন। "হরেকৃষ্ণ" এই তারকব্রহ্ম নামের অভ্যন্তরে শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিরাজ করিতেছেন। ষোড়শ নাম ও দ্বাত্রিংশৎ অক্ষরে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নামের ভিতর এই হরেকৃষ্ণ ও রাম এই তিনটী নামের প্রথমতঃ

'হরে' শব্দে শ্রীরাধাঠাকুরাণী আর কৃষ্ণ ও রাম শব্দে শ্রীনন্দনন্দনকে লক্ষ্য করিতেছেন। আর শেষ 'হরে' শব্দ হরি শব্দের সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে।

শ্লোকাঃ যথা:—

বিজ্ঞাপ্য ভগবত্তত্ত্বং চিদ্ঘনানন্দ-বিগ্রহং।
হরত্যবিদ্যাং তৎকার্য্যমতো হরিরিতিস্মৃতঃ॥
হরতি শ্রীকৃষ্ণমনঃ কৃষ্ণাহ্লাদ-স্বরূপিনী।
অতো হরেত্যনেনৈব শ্রীরাধাপরিকীর্ত্তিতা॥
আনন্দৈক-সুখস্বামী শ্যামঃ কমললোচনঃ।
গোকুলানন্দনো নন্দনন্দনঃ কৃষ্ণ ঈর্য্যতে॥
বৈদগ্ধ্যসার সর্ব্বস্ব মূর্ত্তিং লীলাধিদেবতাম্।
রাধিকাং রময়েন্নিত্যং রাম ইত্যভিধীয়তে॥

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

যিনি চিদ্ঘনানন্দবিগ্রহ ভগবৎ-তত্ত্বকে অর্থাৎ আপনাকে জানাইয়া দিয়া জীবের অবিদ্যা ও তাহার কর্ম্ম রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ প্রভৃতিকে হরণ করেন, তাঁহাকে হরি বলা যায়। হরি শব্দের সম্বোধনে 'হরে' পদ নিষ্পন্ন হয়। হরণ বলিলে চুরি বুঝায়, তবে ভগবান কি আমাদের নিকট হইতে চুরি করেন? তাহার উত্তর এই আমরা মায়াবদ্ধ জীব, ভগবানকে ত ভুলিয়াছি ও ষোল আনা মন সংসারে দিয়াছি, সেইজন্য দয়াল ঠাকুর প্রথমতঃ আপনার সুধামাখা নাম দ্বারা আমাদের হৃদয় পূর্ণ করিয়া সংসারটী কাড়িয়া লন। বৃন্দাবন মদনমোহনের প্রেম-বিলাসিনীর প্রেমের সংসারের পথিক করিয়া দেন। যদি কাচ লইয়া কেহ স্পর্শমণি প্রদান করেন তাহা হইলে কি তাঁহার চুরি করা হয়? কখনই নহে। যেমন দুগ্ধ মাড়িয়া ক্ষীর করা হয়, সাধারণতঃ সেই ভাবে বুঝিতে হইবে, যেন আনন্দ ও সম্বিতের পূর্ণতা ও ঘন-অবস্থা এই মূর্ত্তিমান শ্রীবিগ্রহ। শেষের 'হরে হরে' শব্দের এই অর্থ।

ভগবান দেখিলেন জীব ত সংসার পাইয়া আমাকে ভুলিয়াছে। সে ভুলিলে আমি ত তাহাকে ভুলিতে পারি না, সেত মূর্খ, আমি বিজ্ঞ হইয়া তাহাকে কি করিয়া উপেক্ষা করিব? ভাল তাহার ত স্বধর্ম্ম আনন্দ-আস্বাদ, ভাল, আমি আনন্দ দিয়া তাহার দুঃখকে হরণ করিব। জীব ত আনন্দ না পাইয়া আনন্দের আশায় আশায় মরুভূমিতে ছুটাছুটি করিতেছে। সেখানে ত আনন্দ নাই।

আনন্দ সেই প্রেম-পাগলিনী বৃষভানু-রাজনন্দিনীর প্রেমের রাজ্যে চির-বিদ্য-মান আছে। বিকারী রোগী, জলকে উপাদেয় মনে করিলে, জল কি তাহার উপকার করে? কেবল শ্লেষ্মা বৃদ্ধি করিয়া জীবনান্ত করে মাত্র। আমাদেরও ঐ বিষয়ানন্দ তদ্রূপ। যিনি শ্রীকৃষ্ণের মনকে হরণ করেন তাঁহাকে 'হর' বলা যায়। তাহার স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ প্রত্যয়ে 'হরা' পদ হয়, পরে সম্বোধনে 'হরে' পদ সিদ্ধ হয়—অতএব 'হরে' শব্দে শ্রীরাধাকেই নির্দ্দেশ করিতেছেন। যথা বিদগ্ধ-মাধব নাটকে বলিতেছেন

অসৌবৃগভঙ্গীভিঃ কুসুমশরমঙ্গীকৃতশরং
সৃজন্তী দন্তীন্দ্রক্রমণকমনীয়ালসগতিঃ।
অদূরে রম্ভোরুস্মিহবদনবিম্বস্যাসুষমা
সমারম্ভা মস্তোরুহমধুরিমাণং দময়তি॥ ৭৪॥

"দীঘল নয়ন ভঙ্গী, করে শর বররঙ্গী, অঙ্গীকার করয়ে সৃজন।
মন্থরগমনী ধনি, রমণীর শিরোমণি, গজপতি করয়ে দমন।
ধনি ধনি এইরূপ অতি নিরুপমা।
বিজুরী ঝলকে অঙ্গ, লাবণি অমিয়া ভঙ্গ, যে কহয়ে, নহে কেহো সমা
রামরম্ভাগণ জিনি, উরুযুগ সুবলনী, উন্নত নিতম্ব মনোহরা।
উচ্চ কুচযুগ শোভা, মাঞ্জাহীন কেশরী লোভা, তাতে নব যৌবনের ভরা।
বদন কমল বন, দমন মাধুরীগণ, তাহাতে মধুর মৃদু হাস।
শোভা দেখি স্তব্ধ মন, হৈল কৃষ্ণ সেই ক্ষণ, দেখি যদুনন্দন উল্লাস॥"

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

সুবল বলিতেছেন, যথা কবি শশি-শেখরের পদাবলী

"তুঙ্গ মণি-মন্দিরে, ঘন বিজুরি সঞ্চরে
মেঘ-রুচি বসন পরিধানা।
যত যুবতী মণ্ডলী পন্থে ইহ পেখলি
কেহই নহে রাইক সমানা।

ধনিরে ধনি ধন্য তুয়া ভাগী,
রূপে গুণে সায়রী সৃজন ইহ নায়রী
অতয়ে তুঁহু উহারি অনুরাগী॥'

শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীমুখে বলিতেছেন, যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীবল্লভভট্ট-উদ্ধার প্রসঙ্গে

"কৃষ্ণনামের বহু অর্থ তাহা নাহি মানি॥
শ্যাম সুন্দর যশোদানন্দন এই মাত্র জানি॥"

রাম (রম্+ঘঞ্) যিনি হ্লাদিনী শ্রীরাধাকে রমণ করেন, তাঁহাকে রাম বলা যায়। হ্লাদিনীর প্রেমে বিভোর হইয়া যিনি তাঁহার দ্বারায় ভক্তের হৃদয়-রাজ্যের পুষ্টি সাধন করেন তাহাকে রাম বলা যায়।

ক্রমশঃ।—

শ্রীহরিদাস বিদ্যাবাগীশ—

সদাচারই সমাজ-সংরক্ষণের সুদৃঢ় প্রাচীর। *

আজ আমাদের বীরভূমি-বক্ষে বঙ্গীয়-ব্রাহ্মণ-মহা-সম্মিলনীর শুভাধিবেশন। ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্য ও নিরতিশয় আনন্দের বিষয়। আজ নানা দিগ্‌দেশ হইতে বৃহস্পতি-কল্প ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণমণ্ডলীর শুভাগমনে আমাদের বীরভূমি পবিত্র হইয়াছে এবং তাঁহাদের পবিত্র মূর্ত্তি-দর্শন, তাঁহাদের সৎসঙ্গ এবং তাঁহাদের সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন ও সর্ব্বার্থদ পদরজঃ লাভ করিয়া আমরা কৃতার্থ ও ধন্য হইয়াছি। কিন্তু এই মহা-সম্মিলনীর উদ্দেশ্য ভাবিয়া দেখিলে, চিন্তাশীল ব্যক্তি-মাত্রেই নিদারুণ ক্ষোভে অবসন্ন হইবেন সন্দেহ নাই। হায়, যাঁহারা সমাজের নিয়ামক, রক্ষক এবং পালক ছিলেন, কালবশে আজ তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার চেষ্টা ও আয়োজন হইতেছে। কেননা ব্রাহ্মণগণের স্বধর্ম্মচ্যুতিরূপ অধঃপতনই হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান দুরবস্থার কারণ। বিশাল হিন্দুসমাজের ব্রাহ্মণই মূল ভিত্তি। ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের উপরই হিন্দুসমাজ সুপ্রতিষ্ঠিত। সেই হিমাদ্রি-সদৃশ অটল অচল হিন্দুসমাজভিত্তি, কালবশে আজ টলটলায়মান। বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণগণ হিন্দুসমাজের শৃঙ্খলারক্ষা বা সমাজের শাসন-সংস্কার করিতে সমর্থ নহে। মৃত্তিকা-সংযোগশূন্য বৃক্ষমূল, যেমন বৃক্ষের সজীবতারক্ষা করিতে পারে না, বৈদিকমন্ত্রার্থ-জ্ঞানসংশ্রবশূন্য বৈদিক-কর্ম্মানুষ্ঠানবিহীন ব্রাহ্মণও সেইরূপ হিন্দুসমাজ-সংরক্ষণে অসমর্থ। এক্ষণে অধিকাংশ ব্রাহ্মণই বেদবিহিতজ্ঞান ও বৈদিক-কর্ম্মানুষ্ঠান-বিহীন হইয়াছেন।

---

* বীরভূমি বঙ্গীয়-ব্রাহ্মণ-সম্মিলনীতে পঠিত। ২১শে চৈত্র ১৩২১।

অহো! যে ব্রাহ্মণের অব্যর্থ অমোঘবাক্যে সুরপতি ইন্দ্র ভগাঙ্গ, জলনিধি সমুদ্রসলিল লবণাক্ত ও সুধানিধি চন্দ্র ক্ষয়গ্রস্ত হইয়াছেন; যে ব্রাহ্মণের কোপদৃষ্টিতে সুবিশাল সগরবংশ ভস্মে পরিণত হইয়াছে; যে ব্রাহ্মণ, ঐন্দ্রজালিকবৎ অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে, অপার মহোদধির অগাধ অনন্ত বারিরাশি গণ্ডূষে পান করিয়াছিলেন, অধিক কি যে ব্রাহ্মণ, পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ভগবানের বক্ষে সদর্পে পদাঘাত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; সেই স্বয়ং ও স্বতোরক্ষিত জগদ্বরেণ্য ব্রাহ্মণবংশধরগণ, বেদার্থজ্ঞানশূন্য ও বৈদিককর্ম্মানুষ্ঠান-বিহীন হওয়ায়, আজ আপনাকে রক্ষা করিতে অক্ষম, অপিচ অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইতেছেন। ইহা অপেক্ষা গভীর পরিতাপের বিষয় আর কি আছে! আমারা সাণ্ডিল্য, কশ্যপ, ভরদ্বাজ প্রভৃতির ন্যায় ত্রিকালদর্শী শুদ্ধসত্ব ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন দ্বিজগণের বংশধর হইয়া, শিক্ষা ও সৎসঙ্গের অভাবে, জাতীয় গুণ ক্রিয়া, স্বভাবধর্ম্ম, শক্তি-সামর্থ্য হারাইয়া পিশাচ-প্রকৃতি ও ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হইয়াছি। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ যে আর্য্যগণ, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এবং "অনোরণীয়াণ্ মহতো মহীয়ান্" দর্শন করিতেন, তাহা প্রত্যক্ষ করা দূরে থাকুক আমরা তাহা কল্পনার চক্ষে দেখিতেও সমর্থ নহি। আমাদের চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় এবং দেহ মনঃ প্রাণ সমস্তই বিকৃত হইয়াছে। আমাদের চক্ষু কেবল কামিনীর কামবিলাসময়ী কমনীয়তা দেখিয়া অহর্নিশি মুগ্ধ। আমাদের কর্ণ, এখন আর শাস্ত্রালোচনা ধর্ম্মতত্ত্বাদি সৎকথা শুনিতে চাহে না; পরনিন্দা, কুৎসা এবং সেই কামিনীকাঞ্চনের কথা শুনিতেই অধিক অনুরক্ত; শাস্ত্রকথা শ্রবণ অপেক্ষা বারবিলাসিনী-বদনবিচ্যুত বীভৎস সঙ্গীত শ্রবণ করিতেই শ্রবণ এখন সমধিক সোৎসুক। অগুরু চন্দন কুঙ্কুম কস্তূরী কর্পূরাদির কমনীয় পবিত্র গন্ধ, এক্ষণে আমাদের প্রীতিকর নহে। অটো, অডিকলন, ল্যাভেণ্ডার আদি অপবিত্র বিদেশীয় এবং যাবনিক নির্য্যাস প্রভৃতির গন্ধাঘ্রাণে আমরা অধিক লালায়িত। ঘৃত প্রভৃতি দেবভোগ্য পরম পুষ্টিকর সাত্বিক আহার্য্য এখন আমাদিগকে ভাল লাগে না। চপ্ কাট্‌লেট, কোর্ম্মা কাবাব, পলাণ্ডু, ডিম্ব প্রভৃতি ম্লেচ্ছাহার্য্য, আমাদের সবিশেষ রুচিকর ও নিত্যব্যবহার্য্য হইয়াছে, দুঃসহ গ্রীষ্মে, তিন চারিটি জামায় দেহাবৃত না করিলে, এখন আমাদের শরীরের উষ্ণতা রক্ষা হয় না। তাই বলিতেছি, আমাদের দেহেন্দ্রিয়, মন প্রাণ সমস্তই বিকৃত হইয়া গিয়াছে। যে আর্য্যগণ, শীতগ্রীষ্ম সকল সময়েই প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে যথারীতি প্রাতঃকৃত্য সমাধানপূর্ব্বক সন্ধ্যোপাসনা, ইষ্ট

পূজনাদি নিত্যানুষ্ঠান করিতেন ; সংযম নিয়মাদিসহ ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে যাগযজ্ঞ ব্রতোপবাসাদি কঠোর কর্ম্মানুষ্ঠান যাঁহাদের জীবনের নিত্য অনুষ্ঠেয় ছিল, যাঁহারা শাস্ত্রোক্তবিধানে প্রতিদিন পঞ্চযজ্ঞ সম্পন্ন করিতেন, সেই সত্য শৌচ সদাচার ও সরলতার মূর্ত্তি, তপস্তেজ ও জ্ঞানবিজ্ঞানের খনি এবং ক্ষমা ও আস্তিক্যের অবতার ব্রাহ্মণগণের বংশধর হইয়া, আমরা স্বজাতীয় আচার ব্যবহার, বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান ও ধর্ম্মানুশীলনাদি সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছি। আমাদের অনেকের শাস্ত্রজ্ঞান ও শাস্ত্রবাক্যে আদৌ বিশ্বাস নাই। এই শাস্ত্র-জ্ঞান-হীনতা ও শাস্ত্র-বিশ্বাসের অভাববশতঃ এবং আর্য্যাচার-বিহীন সংসর্গহেতু যথেচ্ছাচারিতার প্ররোচনায় আপাতমধুর অসঙ্কোচ ম্লেচ্ছাচার, আমাদের দেহেন্দ্রিয়, মন প্রাণ, অস্থিমজ্জা প্রভৃতিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আমাদের সকল সাত্ত্বিক ভাব নষ্ট করিয়া দিয়াছে। আমাদের আহার বিহার, আচার ব্যবহার, আলাপ সম্ভাষণ, বসন ভূষণ কোন কিছুই এখন ব্রাহ্মণত্বের পরিচায়ক নহে। বাহ্যিক আভ্যন্তরিক কোন ভাবধারা এখন আর আমাদিগকে সেই ধর্ম্মপ্রাণ ব্রহ্মতেজঃ-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ বলিয়া চিনিয়া লইবার উপায় নাই। শাস্ত্রবিধিমতে আমরা খাদ্যাখাদ্য, স্পৃশ্যাস্পৃশ্য, পবিত্রাপবিত্র এবং বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রভৃতি কোন কিছুই লক্ষ্য করি না। সংসারে কত স্বাস্থ্যকর সুস্বাদু সাত্ত্বিক আহার্য্য থাকিতে আমরা, অহিন্দুর প্রস্তুত অপবিত্র বিষকূট তুল্য বিস্কুট এবং পাপপূর্ণ পাপরোটি (পাঁউরুটি) সাধ করিয়া আগ্রহের সহিত ভোজন করি। অম্ল ও অজীর্ণ রোগের সুলভ ও উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং তৃষ্ণা নিবারণের অত্যুত্তম পানীয় "ডাবের জল" ত্যাগ করিয়া, নানা জাতির স্পৃষ্ট ও উচ্ছিষ্ট সোডাওয়াটার, লেমনেড পান করিয়া আমরা লোক-সমাজে বাহাদুরী দেখাইয়া থাকি। ইহাতে যে কেবল আমরা স্বধর্ম্ম ও জাতীয় গুণাদি হারাইতেছি তাহা নহে, অনেক সময় বিবিধ বৈদেশিক সংক্রামক রোগেও আক্রান্ত হইতেছি। আহার বিহারাদির ব্যভিচারই, ব্যাধিগ্রস্ত হইবার প্রধান কারণ। আয়ুর্ব্বেদ বলেন,

"আলাপাদ্ গাত্রসংস্পর্শান্নিশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ।
একশয্যাসনাচ্চৈব বস্ত্রমাল্যানুলেপণাৎ॥
কুষ্ঠং জ্বরশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এবচ।
ঔপসর্গিক রোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরং॥"

(কুষ্ঠ-নিদান)

এই জন্য ত্রিকালদর্শী আর্য্যঋষিগণ, খাদ্যাখাদ্য স্পৃশ্যাস্পৃশ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে

বিশেষরূপ বিধিনিষেধের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সেই জন্য আর্য্যশাস্ত্রে জাতি, ধর্ম্ম, গুণ, কর্ম্ম ও সম্প্রদায়ানুসারে পৃথক্‌ভাবে পঙ্‌ক্তিভেদে অবস্থান, উপবেশন ও আহারাদি করিবার বিধান আছে। কিন্তু আমরা এতই শাস্ত্রজ্ঞান-বিমূঢ় ও অজ্ঞানকলুষিত হইয়াছি যে, ঐ সকল বিধি নিষেধের উপকারিতা ও আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, ঐ সকল পরম মঙ্গলদায়ক শাস্ত্রা-দেশ, ভণ্ডামি ও অন্ধ বিশ্বাস বলিয়া ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিয়া থাকি। উপরন্তু অনেক স্থলে তাহার অপব্যবহার করিয়া আপনাকে ক্ষমতাশালী মনে করি। কেবল আহার্য্য বিষয়েই যে আমরা স্বেচ্ছাচারী ও ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হইয়াছি তাহা নহে, আমাদের বেশভূষা, হাবভাব, গমনোপবেশন, কথাবার্ত্তা প্রভৃতি সমস্তই ম্লেচ্ছভাবাপন্ন বা বিকৃত হইয়াছে। আমরা মস্তকের সকল অংশের চুল কাটিয়া, আলবর্ট টেড়ির অনুরোধে, বালকের বুলবুলির ন্যায় কপালে একগোছা চুল রাখিতে পারি, কিন্তু ঐরূপ একগোছা চুল, ব্রহ্মরন্ধ্রের পশ্চাতে রাখিলে উহা হিন্দুর চিহ্ন শিখা নামে অভিহিত হয় বলিয়া, সেরূপ চুল রাখিতে আমরা লজ্জায় মরিয়া যাই। আমাদের দুবেলা পেট পুরিয়া আহারের সংস্থান না থাকিলেও কিম্বা চক্রবৃদ্ধির সর্ব্বসংহারক ভীষণ চক্রের নিষ্পেষণে অস্থিপঞ্জর চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে চলিলেও, নেকটাই, সেফ্‌টিপিন্‌, কলার, বকলাস্‌ প্রভৃতি আরও কত অনাবশ্যক বিজাতীয় বেশভূষা গলায় বাঁধিয়া "সাহেব" বা "হঠাৎ বাবু" সাজিতে আমাদের লজ্জা হয় না; কিন্তু হিন্দুর চিহ্ন মালা, এবং দ্বিজের প্রধান চিহ্ন উর্দ্ধ পুণ্ড্রাদিধারণ করিতে আমাদের বিশেষ আপত্তি ও লজ্জা হইয়া থাকে। আমরা অস্পৃশ্য কুক্কুরকে স্নান করাইয়া কোলে করিয়া লালন করিতে পারি, কিন্তু যে গাভী হইতে সংসারে অশেষ উপকার হইতেছে, যাহার স্তন্যপান করিয়া এদেহ পরিপুষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে, যে গাভী যাগযজ্ঞাদি রক্ষার উপায়, সেই একান্ত-পূজ্যা, অবশ্য-পালনীয়া, মাতৃস্থানীয়া নিজের গাভীটি অনাহারে মৃতপ্রায় হইলেও তাহার মুখের নিকট এক মুষ্টি তৃণপ্রদান করিতে, আমাদের লজ্জা হয় ও উহা নিতান্ত হেয় কর্ম্ম মনে করি। এইরূপে এবং উদরান্ন-সংস্থানের জন্য বিবিধ হীনবৃত্তি অবলম্বন উপলক্ষে আর্য্যাচারহীন সংসর্গতায় আমরা বেদোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানে শিথিল-প্রযত্ন হইয়া ক্রমে এতদূর ব্যভিচারী হইয়াছি যে-আমাদের সদাচার ও বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য নাই। পুরাকালে রাজন্যবর্গ ব্রাহ্মণ-গণের প্রতিপালন ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিতেন, সুতরাং উদরান্নের

চিন্তা না থাকায়, ব্রাহ্মণগণও যজনাদি ষট্‌কর্ম্ম, নিত্য পঞ্চযজ্ঞ এবং যথারীতি বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। আমাদের ভারতীয় রাজন্যবর্গ এখন আর ব্রাহ্মণপালক নহেন, পরন্তু ব্রাহ্মণ প্রপীড়ক হইয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ রাজা মহারাজা প্রভৃতি ভূম্যধিকারি-গণ, ব্রাহ্মণের দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর বাজেয়াপ্ত পূর্ব্বক ষ্টেটের আয়-বৃদ্ধি করিয়া, স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও কার্য্যকুশলতার পরিচয় দিয়া থাকেন; আর সেই বিত্তবিহীন নিরন্ন ব্রাহ্মণগণের হাহাকারাগ্নিতে নিজবংশকে অজ্ঞাত-সারে আহুতি দিয়া পোষ্যপুত্র গ্রহণে বংশরক্ষার চেষ্টা করেন। এইরূপে নানা কারণে ব্রাহ্মণগণ নিরন্ন হওয়ায়, উদরান্ন-সংস্থানের জন্য স্বীয় সাত্ত্বিক বৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষি, বাণিজ্য, ওকালতী ও মোক্তারী, দোকানদারী, কেরানীগিরি, দফাদারী, দৌত্য এবং পাচকের কার্য্য প্রভৃতি হীনবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকানির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাই কেহ কেহ বিদ্বেষ-প্রণোদিত হইয়া বলিয়া থাকেন যে "এখন আর ব্রাহ্মণ কে আছে? ব্রাহ্মণ-গণের মধ্যে কেহ ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মী, কেহ বৈশ্যশূদ্র, কেহ ম্লেচ্ছ, কেহ বা চণ্ডালধর্ম্মী হইয়া রহিয়াছেন। ইহাদের কাহাকে রক্ষা করিলে ব্রাহ্মণরক্ষা করা হইবে?" আমরা ইহার প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছুক নহি। তবে এই মাত্র বলিতে চাই যে ব্রাহ্মণগণ বিবিধ হীন বৃত্তি অবলম্বন করিলেও ব্রাহ্মণরক্ষা অসম্ভব নহে। আর এখনই যে কেবল এইরূপ হীনবৃত্ত ব্রাহ্মণ হইয়াছে, পূর্ব্বে ছিল না, এমত নহে। অত্রি-সংহিতায় দশপ্রকার ব্রাহ্মণের উল্লেখ দেখিতে পাই, যথা;—

"দেবোমুনির্দ্বিজোরাজা বৈশ্যঃ শূদ্রো নিষাদকঃ।
পশু ম্লেচ্ছোঽপি চণ্ডালো বিপ্রাদশবিধাঃ স্মৃতাঃ॥"

পুরাকালে দেবমুনিদ্বিজধর্ম্মী শুদ্ধসত্ত্ব, এবং বৈশ্য শূদ্রম্লেচ্ছ ও চণ্ডালধর্ম্মী কদাচারী, সকলপ্রকার ব্রাহ্মণই ছিলেন। তবে কথা এই যে, পুরাকালে দেবদ্বিজমুনিধর্ম্মী ব্রাহ্মণের সংখ্যা অত্যধিক এবং পশুম্লেচ্ছচণ্ডালধর্ম্মী ব্রাহ্মণের সংখ্যা সমাজে অত্যল্প ছিল; এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রধর্ম্মী ব্রাহ্মণগণও সদা-চার-সম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু আজকাল পশুম্লেচ্ছচণ্ডালধর্ম্মী সদাচারবর্জ্জিত ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অত্যধিক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সদাচারই সমাজ-সংরক্ষণের পরিখাবেষ্টিত সুদৃঢ় প্রাচীর। আমরা এখন আর সেই সদাচারপ্রাচীরপরি-খার অন্তর্বর্ত্তী নহি। শিক্ষা ও সঙ্গদোষে তাহার বাহির হইয়া পড়িয়াছি, তাই আজ আমাদের হিন্দুসমাজের এই দুর্দ্দশা। আমরা সদাচারপূত যজন

যাজনাদি পরিত্যাগ করিয়া "প্রতিগ্রহ" মাত্র সার হইয়া সর্ব্বদা 'দেহি দেহি' রব করিতেছি এবং সমাজে লাঞ্ছিত ও অবজ্ঞাত হইতেছি। ব্রাহ্মণগণ আর ভূদেব-স্বরূপে সমাজে পূজ্য বা সম্মানার্হ নহেন, বরং হেয় এবং অবজ্ঞাত। এখন যাত্রা থিয়েটারের প্রহসন বা বীভৎসরসের অভিনয়ের পাত্র ব্রাহ্মণ। আমাদের এই বর্ত্তমান দুরবস্থা দেখিয়া, বেদিয়ার বানরের আক্ষেপোক্তিটী মনে পড়ে। বানর বলিয়াছিল :—

"কুদকে সাগর উতার গেঁই কোই শিখাওয়ে নীত।
কোই উখারে গিরি পেঁড় দরখৎ কোই কিয়া হ্যায় মিত॥
ক্যা কহেঙ্গে সীতানাথকো হাম্‌নে কিয়া চোরি।
ওহি বন্‌শ্‌ মে জনম হামারা বেদিয়া খিঁচে ডোরি॥"

যে ব্রাহ্মণের পদরেণুর কণাস্পর্শে সর্ব্বাপৎ নিবারিত হয়, সর্ব্বাভীষ্টলাভ হয় এবং যে ব্রাহ্মণের পদরজঃ অপার ভবসমুদ্রের সেতু স্বরূপ (১) আমরা যে সেই ব্রাহ্মণের বংশ।

"হরিতে অসাধ্য ব্যাধি, বৈদ্য নাহি পায় বিধি,
সে রোগের ঔষধি কেবল ব্রাহ্মণের পদরজঃ।"

আমরা যে সেই ব্রাহ্মণের স্বত্বাভিষিক্ত উত্তরাধিকারী। ইহা আমরা একবারও ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখি না। তাহা ভাবিয়া দেখিলে আর আমরা এমন কদাচারী হইতাম না এবং হিন্দুসমাজও আর এতদূর দুর্দ্দশাগ্রস্ত, এরূপ স্বেচ্ছাচারপ্রণোদিত এবং এই প্রকার কদাচারকলুষিত হইত না। কেন এমন হইলাম? কেন এমন হইল? ব্রাহ্মণের জাতীয়, সামাজিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সর্ব্ববিষয়েই এই প্রকার অধঃপতনের কারণ কি? ধীর-ভাবে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, শাস্ত্রজ্ঞানের অভাব, শাস্ত্রবাক্যে অবিশ্বাস এবং শাস্ত্রোক্তবিধানে উপনয়ন সংস্কার না হওয়াই ইহার প্রধান কারণ। বস্তুত দেখিতে গেলে, আমরা অনেকেই জাতিগত ব্রাহ্মণত্ব ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে ব্রাহ্মণত্বের দাবী করিবার যোগ্য নহি, কোন সূক্ষ্ম রূপে বিচার করিলে অতি অল্পস্থলেই শাস্ত্র বিধিমতে বিশুদ্ধভাবে উপনয়ন

---

(১) বিপদ্‌-ঘনধ্বান্ত-সহস্রভানবঃ।
সমীহিতার্থার্পণ-কামধেনবঃ।
অপার সংসারসমুদ্রসেতবঃ।
পুণাতু মাম্‌ ব্রাহ্মণপদরেণবঃ॥

সংস্কার হইয়া থাকে। অধিকাংশ স্থলেই তাহা ঘটে না। এই জন্য দ্বিজত্বলাভের পর ব্রাহ্মণগণের দ্বিজোচিত সাত্ত্বিকভাব এবং বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং আজকাল উপনয়নসংস্কারের পরও প্রকৃত দ্বিজত্ব লাভ ঘটে না। উপনয়ন-সংস্কারই ব্রহ্মণ্য-বিকাশের প্রথম ও প্রধান প্রক্রিয়া। উপনয়ন-ব্যাপারে সাবিত্রীগ্রহণ দ্বারা ব্রাহ্মণত্বসূচক তেজঃ-প্রভাবের উন্মেষ এবং ব্রাহ্মণোচিত স্বাভাবিক সাত্ত্বিক আচারানুষ্ঠান আরম্ভ হওয়া উচিত ও আবশ্যক। কিন্তু আজকাল অধিকাংশ স্থলেই উপনয়নের পরেও ব্রহ্মণ্যের উন্মেষণা ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় না। সুতরাং বলিতে হয় যে, জাতি ব্রাহ্মণ ভিন্ন আমাদের অন্য পরিচয় দিবার উপায় নাই। কিন্তু এখনও আমাদের সমাজে দেবমুনিদ্বিজলক্ষণান্বিত আদর্শ ব্রাহ্মণের একেবারে অভাব হয় নাই। এখনও গায়ত্রীনিষ্ঠ, সদাচারপরায়ণ, বেদবেদাঙ্গ পারদর্শী, ষট্‌কর্ম্মনিরত, ঋষিকল্প ব্রাহ্মণ হিন্দুসমাজ অলঙ্কৃত করিতেছেন। এখনও শ্রুতি স্মৃতির অনুশাসন সমাজ হইতে রহিত হইয়া যায় নাই। সুতরাং শাস্ত্রবিহিত বিশুদ্ধভাবে উপনয়ন-সংস্কারের অন্তরায় বা অভাবের কোনও কারণ দেখা যায় না। শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস হইলে শাস্ত্রবিহিত মতে উপনয়ন-সংস্কার সমাজে পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইতে পারে। ব্রাহ্মণরক্ষাকল্পে বিশুদ্ধভাবে উপনয়ন-সংস্কার সমাজে প্রবর্ত্তিত করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। দ্বিজগণ যাহাতে উপনয়ন-সংস্কারলব্ধ গায়ত্রীর মর্ম্মার্থ সম্যক্ অবগত হইয়া যথাবিধি সন্ধ্যোপাসনা ও ধর্ম্মানুশীলনপরায়ণ হয়েন এবং যাহাতে শৌচ, সদাচার, সত্যনিষ্ঠা, খাদ্যাখাদ্য ও স্পৃশ্যাস্পৃশ্য জ্ঞান সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, সেই চেষ্টা আয়োজন এক্ষণে সর্ব্বপ্রথম করণীয়, শৌচ-সদাচার-সহ সন্ধ্যোপাসনা-পরায়ণ হইলেই ক্রমে আবার দ্বিজোচিত প্রতিভাপ্রকাশ হইবে, সন্দেহ নাই। মনু বলেনঃ—

"সাবিত্রীমাত্রসারোঽপি বরং বিপ্রঃ সুযন্ত্রিতঃ"

অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ না হইয়া সত্যশৌচ ও সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ যদি কেবল গায়ত্রী-মাত্র সার করেন, তাহা হইলেও তিনি ব্রাহ্মণনামে অভিহিত হইবেন। যথাবিধি সন্ধ্যোপাসনাই ব্রহ্মণ্যলাভের প্রথম উপায়।

"সন্ধ্যামুপাসতে যেতু নিয়তং সংশিতব্রতাঃ।
বিধৌত-পাপাস্তে যান্তি ব্রহ্মলোকমনাময়ং॥"

শাস্ত্রবিশ্বাস ও সত্যসদাচার সহ কেবল যথাবিধি সন্ধ্যাগায়ত্রীপরায়ণ

হইলেই ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বপাপ মুক্ত হইয়া থাকেন এবং দেহান্তে ব্রহ্মলোক গমন করিতে পারেন। কেবল সন্ধ্যাগায়ত্রীর প্রকৃতজ্ঞান ও তাহার যথাবিধি অনুষ্ঠান হইতেই, ব্রাহ্মণ নিজের ব্রহ্মত্ব ও অন্য হইতে বিশিষ্টত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এই বিশিষ্টতাই ব্রাহ্মণের বিশেষত্ব। এই বিশেষত্ব হইতেই খাদ্যাখাদ্য স্পৃশ্যাস্পৃশ্য জ্ঞান এবং শৌচ সদাচারের উপকারিতা ও আবশ্যকীয়তার বোধ জন্মে এবং ক্রমে "শমদম তপঃ শৌচ ক্ষান্তিরার্জ্জবমেশ্চ। জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যা"দি স্বাভাবিক গুণলাভ করিয়া প্রকৃত ব্রাহ্মণ পদবীতে অধিরূঢ় হওয়া যায়। সর্ব্বমঙ্গলময়, গোব্রাহ্মণহিতকারী বাসুদেবচরণে প্রার্থনা এই যে, এই ব্রাহ্মণমহা-সম্মিলনীর শুভ উদ্দেশ্য যেন সফল হয়; যেন এই সম্মিলনীর শুভাধিবেশন-ফলে, আমরা আমাদের জাতীয় অধঃপতনের কারণ বুঝিতে পারিয়া, ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইতে চেষ্টা করি; এবং আমাদের গন্তব্যপথ চিনিয়া লইয়া কর্ত্তব্যানুসরণ করিয়া ধন্য হইতে পারি।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ভাগবত ধর্ম্ম।

সকল শাস্ত্র এবং সর্ব্ববিধ সাধনপথ বাসুদেবতত্ত্বে সমন্বয় প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের ইহাই প্রথম কথা। বর্ত্তমান যুগের যে যুগধর্ম্ম শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহা উপলব্ধি করিতে হইলে, বেদ, যজ্ঞ, যোগ, ক্রিয়া, জ্ঞান, তপস্যা, ধর্ম্ম ও গতি ইহারা সকলেই যে বাসুদেব পর অর্থাৎ সেই বাসুদেবই ইহাদের তাৎপর্য্যগোচর, এই সত্যটুকু দৃঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। এই তত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিলে লীলাশাস্ত্রের রহস্য কিছুতেই বুঝিতে পারা যাইবে না। বাসুদেবই মোক্ষপ্রদ পরম বস্তু। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

"বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ
বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ ॥
বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরস্তপঃ।
বাসুদেবপরো ধর্ম্মো বাসুদেবপরা গতিঃ ॥"

প্রথমতঃ ধর্ম্ম বেদবিহিত। বেদ শ্রীভগবানেরই বাণী এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিষয়ক যাবতীয় উপদেশ এই বেদেই আছে। যেমন শ্রীমদ্ভাগবত অন্যত্র বলিতেছেন।

"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥"

অর্থাৎ কালপ্রভাবে প্রলয়ে বেদসংজ্ঞিতা এই বাণী নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, আবার সৃষ্টির প্রারম্ভে এই বেদ আমি ব্রহ্মাকে বলি। এই বেদেই মদাত্মক ধর্ম্ম অর্থাৎ ভগবত ধর্ম্ম আছেন।

সাধারণ লোকে মনে করে যে বেদ যজ্ঞের উপদেশ। বৈদিক ধর্ম্ম কেবল যজ্ঞমূলক। এই সঙ্গে সঙ্গে আর এক কথাও প্রচলিত হইয়াছে যে যজ্ঞের ফল অদৃষ্ট। শ্রীমদ্ভাগবত বলিলেন বেদের তাৎপর্য্য বাসুদেব। যজ্ঞের কথা বেদে আছে সত্য, কিন্তু যজ্ঞের তাৎপর্য্যও তো বাসুদেব। এই কথাটুকু এক প্রকারের মতাবলম্বী ব্যক্তিগণকে বলিলেন।

তাহার পর অন্য মতাবলম্বীদিগের কথা বলিতেছেন। বৈদিক ধর্ম্ম উপদেশ করিয়াছেন, যোগই বৈদিক ধর্ম্ম। শ্রীমদ্ভাগবত বলিলেন যোগের তাৎপর্য্যও বাসুদেব। কেহ কেহ বলিতেছেন যোগের লক্ষ্য আসন প্রাণায়ামাদি ক্রিয়া। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন এই ক্রিয়াগুলি তো আর শুধু ক্রিয়ার জন্য নহে। ইহাদের তাৎপর্য্যও বাসুদেব। এই ক্রিয়াগুলিও বাসুদেবকে পাইবার উপায় মাত্র। বাসুদেবকে পাওয়া যায়, ইহাই এই সমস্ত ক্রিয়ার সার্থকতা।

কেহ কেহ বলেন বেদের তাৎপর্য্য জ্ঞান। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন, জ্ঞানের তাৎপর্য্যও বাসুদেব আর তপস্যার তাৎপর্য্যও তিনি। আর দান ব্রতাদি বিষয়ক যে ধর্ম্মশাস্ত্র অনেকে মনে করেন স্বর্গ প্রভৃতিই বুঝি ইহাদের চরম লক্ষ্য। কিন্তু তাহা নহে। কারণ এই টুকু চিন্তা করিতে হইবে যে স্বর্গ আমাদের লক্ষ্য হইল কেন, আমরা কি জন্য যাগযজ্ঞাদি করিয়া স্বর্গ পাইবার জন্য কামনা করি? ইহার উত্তরে আমাদিগকে নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে যে স্বর্গে আনন্দ আছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস এই জন্যই আমরা স্বর্গের জন্য এত লালায়িত। স্বর্গ যদ্যপি আনন্দের স্থান না হইয়া দুঃখের স্থান হইত তাহা হইলে কেহ স্বর্গ কামনা করিত না। এখন এই যে স্বর্গ ইহাই বা কি? এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী বলিতেছেন। "সাপি তদানন্দাংশ-

প্রকাশরূপত্বাৎ তৎপরৈব।" অর্থাৎ স্বর্গ সেই বাসুদেবের পরিপূর্ণ আনন্দের একাংশের প্রকাশক সুতরাং স্বর্গও বাসুদেব-পর। এই প্রকারে শ্রীমদ্ভাগবত বাসুদেব তত্ত্বকেই পরম ও চরম তত্ত্ব বলিয়া এই দুই শ্লোকে উল্লেখ করিয়া পরবর্ত্তী ৪টী শ্লোকে সেই বাসুদেব তত্ত্বের পরিচয় প্রদান করিবেন।

আমরা উল্লিখিত অংশটুকু আরও একটু বিশদরূপে আলোচনা করিয়া বাসুদেব-তত্ত্ব কি তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব এবং তাহার পর শ্রীমদ্ভাগবতের পরবর্ত্তী শ্লোক চারিটি আলোচিত হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র যেন মানবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদের প্রয়োজন কি ? নানা প্রকারের চিন্তার দ্বারা চালিত হইয়া নানা জনে নানারূপ কথা বলিবে। কেহ বলিবেন যাগ যজ্ঞাদি করাই প্রয়োজন। চিরদিন যজ্ঞাদি চলিয়া আসিতেছে, বেদে যজ্ঞের উপদেশ রহিয়াছে অতএব যজ্ঞই প্রয়োজন। কিন্তু যজ্ঞ যে কেন প্রয়োজন, আমাদের প্রকৃতির মধ্যে এমন কি অভাব আছে, যাহা দূর করিবার জন্য মানবজাতি দীর্ঘকাল এই যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতেছে, এ চিন্তা মনের মধ্যে জাগ্রত হইল না ; নিজের পানে চাহিলাম না, আত্মপ্রকৃতির মূলে সত্যের যে প্রতিষ্ঠা-ভূমি রহিয়াছে তাহার সন্ধান করিলাম না, লোকমুখে শুনিয়াছি সকলে বলিয়া থাকে অতএব বলিলাম যজ্ঞই প্রয়োজন। নতুবা বলিলাম যোগানুষ্ঠানই প্রয়োজন এবং এই প্রয়োজন-সাধনের জন্য আসন প্রাণায়ামাদি বিবিধ ক্রিয়ার প্রয়োজন। এই প্রকার উপদেশও লোক-মুখে শুনিয়াছি, এই শোনা কথার প্রতিধ্বনি করিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলাম যোগই প্রয়োজন। কিন্তু মানুষের প্রকৃতির মধ্যে এমন কি অভাব আছে যাহা দূর করিবার জন্য মানুষ চিরকাল যোগানুষ্ঠান করিতেছে ? মানুষের হৃদয়ের মধ্যে এমন কি কামনা আছে যাহা পূর্ণ করিবার জন্য মানুষ যোগ করিতেছে ? আমরা বহির্মুখ হইয়া কেবল শেখা কথার প্রতিধ্বনি করি, নিজের প্রতি চাহিয়া নিজের প্রকৃতির গভীর স্থলে যে সত্য লুকাইয়া রহিয়াছে তাহার অন্বেষণ করি না। এই কারণেই আমরা সত্যের শীতল ছায়ায় দাঁড়াইয়া জীবন জুড়াইতে পারি না, শাস্ত্র লইয়া সম্প্রদায় লইয়া কেবল দ্বন্দ্ব করিয়া নিজেদের সর্ব্বনাশ করি। আমাদের কি প্রয়োজন এই প্রশ্ন শুনিয়া আর একদল লোক বলিলেন জ্ঞানই প্রয়োজন, আর এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে হইলে তপস্যা করিতে হইবে। এ কথাও আমরা লোকের কাছে শুনিয়াছি। আর একদল লোক বলিলেন ধর্ম্মই প্রয়োজন। এখানে ধর্ম্ম বলিতে যজ্ঞ ছাড়া

ব্রত নিয়মাদিও বুঝাইল। শুধু তাই নয় শ্রীধর স্বামীর মতে, ধর্ম্মের লক্ষ্য যে স্বর্গ, সেই স্বর্গও বুঝাইল। এইবার কথাটা যেন কতকটা প্রকৃত আলোচনার রাজ্যে আসিল। এতক্ষণ কেবল মাত্র কতকগুলি ভিত্তিহীন, পরের মুখে শোনা, চিরকাল-প্রচলিত, শেখা কথার আবৃত্তির মধ্যে আমরা বিফলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম, এখন যেন কতকটা দাঁড়াইবার জায়গা পাওয়া গেল। এতক্ষণে প্রকৃত চিন্তা বা আলোচনা করিবার সম্ভাবনা হইল।

মানুষ তুমি স্বর্গ চাও! কেন স্বর্গ চাও? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে স্বর্গের যে ধারণা মানবজাতি দীর্ঘকাল হইতে পোষণ করিতেছে সেই ধারণাটি লইয়া আলোচনা করা আবশ্যক। স্বর্গ বলিতে আমরা কি বুঝি? শাস্ত্রে পাইতেছি—

"যন্নদুঃখেন সম্ভিন্নং নচ গ্রাস্তমনন্তরং।
অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎসুখং স্বপদাস্পদম্॥"

অর্থাৎ যাহা দুঃখের দ্বারা সম্ভিন্ন নহে, অর্থাৎ দুঃখ যাইয়া যাহার কখনই ব্যাঘাত করিতে পারে না, যাহার অনন্তর নাই অর্থাৎ যাহা কখনও ফুরাইয়া যায় না, যেসুখের লালসায় চালিত হইয়া নৈরাশ্য ও বিঘ্নের মধ্য দিয়া অনিশ্চিত ভাবে পরিশ্রম করিতে হয় না, এই প্রকারের সুখই স্বর্গ। এই প্রকারের একটা অবস্থা আমরা চাই। এইটিই আমাদের মূল লক্ষ্য।

পূর্ব্বে বলিয়াছি স্বর্গই প্রয়োজন, এই কথা বলিলে পর কথাটা ঠিক হোক্ বা না হোক্, অন্ততঃপক্ষে তত্ত্বের আলোচনা করা যাইতে পারে এমন একটা দাঁড়াইবার ভূমি পাওয়া গেল। আমরা বুঝিলাম আমরা আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি করিয়া আমাদের স্বরূপের যে সুখ সেই সুখ চাই। অর্থাৎ "সুখং মে ভূয়াৎ দুঃখং মা ভূৎ" ইহাই আমাদের সকলেরই কামনা।

বেদ এই সুখের উপায় বলিয়া দিতেছেন, এই জন্যই মানব বেদকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান করিয়াছে। যজ্ঞ এই সুখ আনিয়া দিবে বলিয়াছে, এই জন্য জীব যজ্ঞের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছে। যোগ এই আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি করিয়া স্বরূপের সুখে লইয়া যাইবে বলিয়াই মানুষ যোগ ও তৎসাধিকা বিবিধ ক্রিয়ার আশ্রয় লইয়াছে, জ্ঞানের দ্বারা এই আত্যন্তিক সুখ পাওয়া যায় বলিয়া তপস্যার দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ করিয়া মানুষ এই জ্ঞানের অন্বেষণ করিয়াছে।

এইবার সুখান্বেষণের এই ভিন্ন ভিন্ন উপায়গুলি সম্বন্ধে যদ্যপি বেশ

ধীর ভাবে চিন্তা করা যায় এবং সুখ কি তাহাও যদি বেশ সূক্ষ্মভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায় তাহা হইলে আমরা অধ্যাত্মসাধনার অনেকগুলি স্তর দেখিতে পাইব। বাসুদেব-তত্ত্বের উপাসনা কিরূপ অবস্থায় আমাদের দেশে বিশেষভাবে প্রচারিত হইল এইবার তাহার আলোচনা করিতেছি।

এখনও আমাদের দেশে অনেকে শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য বলিয়া থাকেন যে এই প্রত্যক্ষ জগৎ হইতে পৃথক এক চিন্ময় জগৎ আছে। এই কথাটি মোটেই সত্য নহে। প্রকৃত চিন্ময় জগৎ এই জগৎ, হইতে যে একেবারে পৃথক তাহা নহে অবশ্য তাই বলিয়া এ রকমও যেন কেহ মনে না করেন যে এই প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগৎই চিন্ময় জগৎ। সুতরাং এই প্রত্যক্ষ নশ্বর জগৎ ও অপ্রত্যক্ষ নিত্য জগৎ এতদুভয়ের মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ নিরূপণ করা বড়ই কঠিন। কিন্তু এটুকু নিরূপিত না হইলে আমরা লীলাতত্ত্বও বুঝিবনা, শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বও বুঝিব না এবং ফলে ভাগবতধর্ম্মের ভ্রান্ত ব্যাখ্যায় আমাদিগকে ডুবিয়া থাকিতে হইবে। এই বাসুদেবতত্ত্বের তাৎপর্য্যের মধ্যেই এই রহস্য আরম্ভ হইতেছে।

প্রথমে দুইটি জিনিস ধরিয়া লওয়া যাউক। একটি কার্য্য, আর একটি কারণ। এই প্রত্যক্ষ জগৎটা হইল কার্য্য। এখানে শান্তি পাওয়া যাইতেছে না, এখানে কেবল দুঃখ, কেবল যন্ত্রণা, এ কেবল মৃত্যুর মৃগয়া-কানন! কিন্তু আমি সুখ চাই, আমি অমৃত চাই; এই দুঃখের মধ্যে এই মরণের মধ্যে আমি আর থাকিতে পারিতেছি না। একজন বৈদিকঋষি বলিলেন "অপায় সোমমমৃতাভবামঃ" সোমপান করিয়া অমৃত হইয়াছি। আমরা যজ্ঞে সোম-পান করিতে লাগিলাম। বেশ অমৃতই হইলাম। কিন্তু কি প্রকারে অমৃত হইলাম? মরণকে একেবারে ত্যাগ করিয়া? তাহা ত হইতে পারে না। কারণ মরণ না থাকিলে অমৃত থাকে কি করিয়া?

এই তত্ত্বটুকু মানুষ যখন ভাবে না, তখন মানুষ প্রত্যক্ষকে পরিত্যাগ করিয়া অপ্রত্যক্ষে যাইবার জন্য লালায়িত হয়, কার্য্যকে বাদ দিয়া কারণকে ধরিতে চেষ্টা করে। দুঃখকে গ্রহণ না করিয়া যেন সুখকে পাইতে চায়। বিশ্বতত্ত্বের এই অতি সাধারণ সত্যটা সে বুঝিতে পারে না যে, যে দুঃখকে ভয় করিয়া কেবল তাহাকে এড়াইবার চেষ্টা করিয়াছে সে সুখ কি তাহা জানে না; পক্ষান্তরে আনন্দের সঙ্গে বীরের মত দুঃখকে যে

আলিঙ্গন করিতে পারে সুখ তাহারই। মরণকে ভয় করিয়া যে পলাইয়া পলাইয়া যায় সে কেবলই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, আর মরণকে যে সানন্দে বরণ করে মরণের মধ্য হইতেই অমৃত আসিয়া তাহাকে আপ্যায়িত করে।

আমাদের দেশ, কেবল আমাদের দেশ কেন, এক সময়ে সমগ্র পৃথিবীর লোকই—এই পৃথিবী, এই পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য দুঃখমৃত্যু ও শোকসঙ্কুল জগৎকে উপেক্ষা করিয়া ধার্ম্মিক হইয়া সুখ ও অমৃত খুঁজিতে গিয়াছিল। বাসুদেব উপাসনা সেই মতের এক অতি তীব্র প্রতিবাদ।

এক হিসাবে ইংরাজী শব্দের সাহায্যে এই বাসুদেব-উপাসনাকে A return to the Concrete বলা যায়। এই বাসুদেব উপাসনার প্রবর্ত্তনা হইতে আমরা নবযুগের আবির্ভাব The Birth of Modernity গণনা করিতে পারি। এইবার "বাসুদেব" বলিতে কি বুঝায় তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে, তাহা হইলে কথাটি আরও স্পষ্টরূপে প্রতীত হইবে।

"বাসুদেব" এই নামের ব্যুৎপত্তি বহু পুরাণেই দেখিতে পাওয়া যায়। সকলগুলিই একভাবের দ্যোতক। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে আছে—

"বাসঃ সর্ব্বনিবাসশ্চ বিশ্বানি যস্য লোমসু।
তস্য দেবঃ পরং ব্রহ্ম বাসুদেব ইতীরিতঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড ৮৭ অধ্যায়।

বিষ্ণু-পুরাণে প্রথম অংশে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে—

"সর্ব্বত্রাসৌ সমস্তঞ্চ বসত্যত্রেতি বৈ যতঃ।
ততঃ স বাসুদেবেতি বিদ্বদ্ভিঃ পরিপদ্যতে॥"

বিষ্ণুপুরাণে অন্যত্র অর্থাৎ ষষ্ঠ অংশে ৫ম অধ্যায়ে আছে—

সর্ব্বাণি তত্র ভূতানি বসন্তি পরমাত্মনি।
ভূতেষপি চ সর্ব্বাত্মা বাসুদেবস্ততঃ স্মৃতঃ॥

* * *

ভূতেষু বসতে সোঽন্তর্ব্বসত্যত্র চ তানি যৎ।
ধাতা বিধাতা জগতাং বাসুদেবস্ততঃ প্রভুঃ।'

এই ব্যুৎপত্তির বলে আমরা ভগবানকেই পাইতেছি। কিন্তু ভগবান কিরূপ, কিভাবে কোথায় আছেন।

পৌরাণিক বলিলেন তিনি সকলের বসতিস্থান, বহুবিশ্ব তাঁহার লোমে লোমে বিদ্যমান। তিনি পরমাত্মা সকল ভূত তাঁহাতে এবং তিনিও সকল

ভূতে। এই বাসুদেবই জগতের ধাতা ও বিধাতা। সুতরাং দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে বাসুদেব-উপাসনা নির্গুণ ব্রহ্মবাদ ও মায়াবাদের একটা প্রচলিত মতের তীব্র প্রতিবাদ। 'নির্গুণ ব্রহ্মবাদের প্রচলিত মত' বলিলাম, তাহার কারণ এই বাসুদেব নির্গুণ ও গুণাতীত ইহাও সকল পুরাণেই বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত খুব স্পষ্টরূপেই এ কথা বলিয়াছেন।

"১৩২১"

নির্ম্মল শান্তির পীঠে
ঢেলে দিতে অশান্তির ধার,
সভ্যতার নিকেতনে
এনে' দিতে ঘোর অত্যাচার,
বন্যাসম-রক্তস্রোতে
ভাসাইতে প্রতীচী প্রদেশে,
'তেরশ একুশ'। তুমি
এসেছিলে ভয়ঙ্কর বেশে।
জলে স্থলে শূন্যপথে—
বীরবৃন্দ মহান্ আহবে,
তোমার আদেশ ল'য়ে
হইয়াছে উপনীত সবে।
ব্যথিতের আর্ত্তনাদে
তাই আজ বিদীর্ণ গগন,
আহতের সমাগমে
পরিপূর্ণ শুশ্রূষা ভবন;
কত শত মাতাপিতা—
পুত্রহীন সংখ্যা কেবা করে?
পতিহীনা অভাগিনী
কত নারী আজি তোমা তরে!
শ্মশান সহস্র পল্লী
বিভীষণ অনল বর্ষণে
কম্পান্বিত ইয়োরোপ
বজ্রনদী কামান গর্জ্জনে।
বিরচিতে হে নিষ্ঠুর!
ধ্বংসকারী নব ইতিহাস
এসেছিলে, হেসেছিলে
পৈশাচিক ভীম অট্টহাস।

শ্রীমৃণালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

পঞ্চরাত্রে যথা
অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম-প্রহ্লাদোদ্ধব-
নারদৈঃ ॥
সেই প্রেম ভক্তি হয় দ্বিবিধ লক্ষণ।
ভাবোত্থ প্রেম আর প্রসাদোত্থ কন ॥
যথা
ভাবোত্থো হ্তি প্রসাদোত্থো শ্রীহরে-
রিতি স দ্বিধা ॥
তত্র ভাবোত্থঃ ॥
ভাব অন্তরঙ্গ অঙ্গসেবাদ্যনুসারে।
আরূঢ় উৎকর্ষ প্রেমভাবোত্থ কহি তারে
যথা।
রতিরেবান্তরঙ্গানামঙ্গানামনুসেবয়া।
আরূঢ়া পরমোৎকর্ষ ভাবোত্থ
পরিকীর্ত্তিতঃ ॥
বৈধ ভাবোত্থ যথা।
কভু হাসে কভু নাচে করয়ে রোদন।
কৃষ্ণ নাম লীলাগুণ করিয়া স্মরণ ॥
যখন যেমন কৃষ্ণের লীলা হয় স্মৃতি।
তৈছে তেমত রূপ প্রেমায় করে গতি ॥
নারদের কৃষ্ণোন্মাদ পুরাণে লিখন।
কভু মৌন কভু ধ্যান স্মরে নারায়ণ।
যথা একাদশে।
এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয় নাম কীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈরিত্যাদিঃ ॥

অথ রাগানুগাভাবোত্থঃ পাদ্মে।
ন পতিং কাময়েৎ কশ্চিৎ ব্রহ্মচর্য্যস্থিতা
সদা।
তামেব মূর্ত্তিং ধ্যায়ন্তী চন্দ্রকান্তির্ব্বরাননা॥
অর্থাদ্বিবর্ণতাভূৎ ॥
অথ হরেঃ রতি প্রসাদোত্থঃ ॥
স দ্বিধা মাহাত্ম্যজ্ঞান যুক্তঃ কেবলশ্চ ॥
তত্রমাহাত্ম্যজ্ঞান যুক্তস্তফলং মুক্ত্যাদি
প্রাপকং ॥
মাহাত্ম্যজ্ঞান যুক্ত প্রেমার ফলোদয়।
বৈধভক্তি ক্রমে সার্ষ্টি মুক্ত্যাদি নিশ্চয় ॥
কেবল প্রেমার ফল রাগানুগানুসারে।
ব্রজেন্দ্র নন্দন প্রাপ্তি হয় ব্রজপুরে ॥
যথা।
মহিমজ্ঞানযুক্তঃ স্যাদ্বিধিমার্গানু-
সারিনাং।
রাগানুগাশ্রিতানাস্তু প্রায়শঃ কেবলো
ভবেৎ ॥
প্রেম সাধন ক্রম আছে বহুমত।
তাহে পরিপাটি কহে শাস্ত্রের সম্মত ॥
শাস্ত্র শ্রবণ দ্বারে কোন ভাগ্যবান।
শ্রীকৃষ্ণ সাধনে শ্রদ্ধা হয় ত বিধান ॥
শ্রদ্ধা হয় শাস্ত্রার্থ বিশ্বাস জানি হয়।
ভজন রীতি শিক্ষা হেতু সাধুসঙ্গ করয় ॥
সাধুসঙ্গ হৈলে ঘুচয়ে দুষ্ট মতি।
তারপর জ্ঞাত হয় ভজনের রীতি ॥

ভজনের পরিপাটি তত্ত্বজাত হৈয়া।
অনর্থ নিবৃত্তি হয় নির্ম্মল হয় হিয়া॥
তবে নিষ্ঠা হয় চিত্তে স্বাভাবিকী জানি।
তাহাতে জন্মায় রুচি সাধনেত মানি॥
তবে আসক্তি হয় শ্রীকৃষ্ণ সহিতে।
সামান্যে যুবার যেন যুবতীর সাথে॥
তবে তার দেহে হয় ভাবের অঙ্কুর।
ভাব দয় হৈলে হয় প্রেম মহাশুর॥
যথা॥
আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজন-
ক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তি স্যাত্ততো নিষ্ঠা
রুচিস্ততঃ॥
তথাসক্তি স্ততোভাব স্ততপ্রেমাভ্যুদ-
ঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে
ভবেৎ ক্রমঃ॥
ধন্যস্যাঽয়ং নবঃ প্রেমা যস্যোন্মীলতি
চেতসি।
অন্তর্ব্বাণিভিরপ্যস্যমুদ্রাসুষ্ঠু সুদুর্গমা॥
অন্তর্ব্বাণিভিঃ শাস্ত্রবিদ্ভিঃ। মুদ্রা-
পরিপাটীতি॥
সেই প্রেম সাধ্যধন শ্রীনন্দনন্দন।
ধন্য ধন্য সেই প্রেমানন্দ মগ্নজন॥
কৃষ্ণানন্দ সুখমত্ত প্রেমভক্তি যার।
প্রেম সেবাক্রম এই সকলের সার॥
কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত জন সদত বিহ্বল।
আত্মসুখদুঃখহীন আনন্দে চঞ্চল॥
এই কৃষ্ণপ্রেমা যার জন্মায়ে হৃদয়ে।
তার ক্রিয়া অলৌকিক কেহ না বুঝয়ে॥
পঞ্চরাত্রে যথা।
ভাবোন্মত্ত হরেঃ কিঞ্চিন্নবেদ
সুখমাত্মনঃ॥
দুঃখঞ্চেতি মহেশানি পরমানন্দ
আপ্লুতঃ॥
সেই প্রেম ক্রমে ক্রমে বাড়ে ভক্ত-
দেহে।
স্নেহ মান প্রণয় রাগ অনুরাগ হয়ে॥
ভাব আর মহাভাব ইত্যাদি পর্য্যন্ত।
বাড়ি রস স্বাদু হয় কহিল নিতান্ত॥
শ্রীচৈতন্য পদাম্ভোজং প্রণম্য শিরসা
গুরুং।
প্রেম ভক্তে র্বিধানার্থো লিখিতোঽত্র
প্রযত্নতঃ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ গোপাল মহান্ত।
শ্রীপর্বিগোপালপদ ভাবিঞা একান্ত।
গোপাল চরণ প্রভু পদ অভিলাষ।
বর্ণিল কাতরে এ নয়নানন্দ দাস॥
ইতি শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি রসকদম্বে অষ্টম
প্রকরণং॥

নবম প্রকরণ।

ভক্তি-প্রিয়ং দাসপতিং ব্রজেশং
নন্দাত্মজং গোপসখং নমামি।
শ্রীবল্লবীকান্তং অনন্ত-বীর্য্যং রসাত্মকং
গোপকিশোর মূর্ত্তিং॥
জয় জয় রামকৃষ্ণ ব্রজরাজসুত।
শ্রীদামসুদাম দাম গোপগোপী যত॥
সেই কৃষ্ণরতি হয় রসনাম ক্রমে।
বিভাবাদি সামগ্রী একত্র মিলনে॥

ইক্ষুগুড় রসভেদে শর্করা উপজয়ে।
ছেনা মরিচ্যাদি যোগে মণ্ডানাম হয়ে॥
সামগ্রী সংযোগে গুড়বাঢ়ে আস্বাদন।
তৈছে রতি সামগ্রী যোগে রস নাম
হন॥
পঞ্চবিধ স্থায়ী রতি বিভাবাদি মিলনে।
ভক্তহৃদি সুখ করে রস অভিধানে॥
বিভাব অনুভাব সাত্ত্বিক ব্যভিচারী।
ভক্তি রসরূপ করে সামগ্রী এই চারি॥
বিভাবাদি যোগে রতিরস অভিধান॥
উত্তরোত্তর স্বাদু বাঢ়ি মহাভাব নাম।
যথা॥
অথাস্যাঃ কেশবরতের্লক্ষিতায়া-
নিগদ্যতে।
সামগ্রী পরিপোষেণ পরমারসরূপতা॥
বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভি-
চারিভিঃ।
স্বাদ্যত্বং হৃদিভক্তানামানীতা
শ্রবণাদিভিঃ॥
এষা কৃষ্ণরতি স্থায়ী ভাবোভক্তিরসো-
ভবেৎ।
প্রাক্তন সাধন যার সুদৃঢ় আছয়ে।
ঐহিক সদ্ভক্তিযুক্ত যেবাজন হয়ে॥
তাহার হৃদয়ে ভক্তিরস আস্বাদন।
ভাগবতানুরক্ত রসিক সঙ্গ জন॥
যথা
প্রাক্তন্যাধুনিকী চাস্তি যস্য সদ্ভক্তি-
বাসনা।
এষভক্তিরসাস্বাদস্তস্যৈব হৃদি জায়তে॥
ইত্যাদিঃ॥

অথ তত্র বিভাবাদি সামান্য লক্ষণং।
বিভাবা অনুভাবাশ্চ সাত্ত্বিকা ব্যভি-
চারিণঃ॥
তত্র বিভাবাঃ।
রতির আস্বাদন হেতু বিভাব দ্বিধা হন
আলম্বনাত্মক এক আর উদ্দীপন॥
তত্রজ্ঞেয়া বিভাবাস্তু রত্যাস্বাদনহেতবঃ
তে দ্বিধালম্বনা একে তথৈবোদ্দীপনাঃ
পরে॥
তত্র আলম্বনাঃ।
সেই আলম্বন হয় দ্বিধা ভেদ পুন।
বিষয় আশ্রয় এই তাহে কহে শুন॥
যাকে উদ্দেশ করি রতি প্রবর্ত্ত হন।
অতএব সর্ব্বরতির বিষয় কৃষ্ণ কন॥
রতির আধার আশ্রয় তারে কহে।
সেই ত আশ্রয় ভক্ত পঞ্চবিধ হয়ে॥
কৃষ্ণ আর কৃষ্ণভক্ত হয়ে আলম্বন।
বিষয় আশ্রয়ভেদে দ্বিবিধ বর্ণন॥
যথা—
কৃষ্ণশ্চ কৃষ্ণভক্তাশ্চ বুধৈরালম্বনামতাঃ।
রত্যাদিবিষয়ত্বেন তথাধারতয়াপি চ॥
তত্র শ্রীকৃষ্ণ আলম্বনো যথা।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণনায়ক শিরোমণি।
সর্ব্বমহাগুণ যাথে বিরাজিত জানি॥
সেই কৃষ্ণ স্বরূপে কভু অন্যরূপ হন।
সোহন্যরূপস্বরূপাভ্যাং আলম্বন কন॥
অন্যরূপো যথা।
ব্রহ্মমোহন শ্রীভাগবতে বিবরণ।
বৎস বালক ব্রহ্মা হরিল যখন॥
সেই কালে কৃষ্ণ হৈলা আপনে অন্যা-
কার।

বৎস বালকরূপ আপনে প্রচার ॥
বলদেব উক্তি তাহে কর অবধান।
যাহা দেখি বলদেব বিস্ময়কে পান ॥
যথা দশমে।
হন্ত মে কথমুদেতি সবৎসে বৎসপাল
পটলে রতিরত্র।
ইত্যানিশ্চিতমতি বলদেবো বিস্ময়-
স্তিমিত মূর্ত্তিরিবাসীৎ ॥
অথ স্বরূপং
সেই স্বরূপ কৃষ্ণ দ্বিধারূপ হন।
আবৃত স্বরূপ আর প্রকট স্বরূপ কন ॥
যথা—
আবৃতং প্রকটঞ্চেতি স্বরূপং কথিতং-
দ্বিধা ॥ আবৃত স্বরূপ যথা।
অন্যবেশাদিনাচ্ছন্নং স্বরূপংপ্রোক্তমাবৃতং॥
অথ প্রকট স্বরূপ
তমাল পল্লবদ্যুতি
ভুবনমোহন।
কম্বুগ্রীব মহাভুজ কমল নয়ন ॥
শ্রীবৎসাঙ্কপীতবাস কৌস্তুভধারণ।
ধ্বজবজ্রাঙ্কিত পদ বিবিধ ভূষণ॥
এইরূপ সৌন্দর্য্য সদা হরে মোর মন।
উদ্ধবের বাক্য এই প্রকটরূপ কন ॥
যথা।
অয়ং কম্বুগ্রীবঃ কমল
কমনীয়াক্ষিপটিমা।
তমালশ্যামাঙ্গ দ্যুতিরতিতরাং
ছত্রিতশিরাঃ ॥
দর শ্রীবৎসাঙ্কঃ স্ফুরদরিদরাদ্যঙ্কিত করঃ।
করোত্যুচ্চৈর্মোদং মম মধুরমূর্ত্তির্ম-
ধুরিপুঃ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণস্যগুণাঃ।
অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ ১ সর্ব্বসল্লক্ষণা-
ন্বিতঃ। ২
রুচির ৩ স্তেজসাযুক্তো৪ বলীয়ান্
৫.বয়সান্বিতঃ ৬ ॥
বিবিধা'দ্ভুতভাষাবিৎ ৭ সত্যবাক্যঃ ৮
প্রিয়ম্বদঃ ৯।
বাবদূকঃ ১০ সুপাণ্ডিত্যো ১১
বুদ্ধিমান্ ১২।
প্রতিভান্বিতঃ ১৩।
বিদগ্ধ ১৪ শ্চতুরো ১৫ দক্ষঃ ১৬
কৃতজ্ঞঃ ১৭ সুদৃঢ়ব্রতঃ। ১৮
দেশকাল সুপাত্রজ্ঞঃ ১৯ শাস্ত্র চক্ষু ২০
শুচি ২১ ব'শী ২২ ॥
স্থিরো ২৩ দান্তঃ ২৪ ক্ষমাশীলো ২৫
গম্ভীরো ২৬ ধৃতিমান্ ২৭ সমঃ ২৮।
বদান্যো ২৯ ধার্ম্মিকঃ ৩০ শূর ৩১
করুণো ৩২ মান্যমানকৃৎ ৩৩।
দক্ষিণো ৩৪ বিনয়ী ৩৫ হ্রীমান্ ৩৬
শরণাগতপালকঃ ৩৭।
সুখী ৩৮ ভক্তসুহৃৎ ৩৯ প্রেমবশ্য ৪০
সর্ব্বশুভঙ্করঃ ৪১।
প্রতাপী ৪২ কীর্ত্তিমান্ ৪৩ রক্তলোকঃ
৪৪ সাধুসমাশ্রয়ঃ ৪৫ ॥
নারীগণ মনোহারী ৪৬ সর্ব্বারাধ্যঃ
সমৃদ্ধিমান্ ৪৮।
বরীয়ান্ ৪৯ ঈশ্বর শ্চেতি ৫০
গুণাস্তস্যানুকীর্ত্তিতাঃ ॥
এই পঞ্চাশতগুণ পূর্ণ ভগবানে।
পরিপূর্ণ ভাবেত সদা বিরাজমানে ॥

সমুদ্রা ইব পঞ্চাশদ্দুর্বিগাহাহরেরমীতি
কোন জীবে এই গুণ বিন্দু বিন্দু রয়
সর্ব্বগুণ কৃষ্ণচন্দ্রে পরিপূর্ণ হয় ॥
যথা।
জীবেষ্বেতে বসন্তো ২পি বিন্দু
বিন্দুতয়া ক্বচিৎ।
পরিপূর্ণতয়া ভান্তিতত্রৈব পুরুষোত্তমে ॥
মুখ্যত্বে কহিল মাত্র দিগ্দরশন।
অবিচিন্ত্য কৃষ্ণগুণ কে করে গণন ॥
এবং পঞ্চম স্কন্ধে।
সত্যং শৌচং দয়াক্ষান্তি স্ত্যাগঃ সন্তোষ
আর্জ্জবং।
শমোদমস্তপঃ সাম্যং তিতিক্ষোপরতিঃ
শ্রুতং ॥
জ্ঞান বিরক্তিরৈশ্বর্য্যং পূর্ণ তেজো
বলং স্মৃতিঃ।
স্বাতন্ত্র্যং কৌশলং কান্তির্ধৈর্য্যং
মার্দ্দবমেবচ।
প্রাগল্‌ভ্যং প্রশ্রয়ঃ শীলং সহ ওজো
বলং ভগঃ ॥
ইত্যাদয়োপি অপরেবহবঃ সন্তি।
মহেশ্বরাদিগত পঞ্চ যেবাগুণ হয় ॥
সেই সব গুণ সদা কৃষ্ণচন্দ্রে রয় ॥
যথা।
অথ পঞ্চগুণা যে স্যুরংশেন
গিরিশাদিষু।
সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তঃ ১ সর্ব্বজ্ঞোহনিত্য
নূতনঃ ৩॥
সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গঃ ৪
সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ ৫।

লক্ষ্মীকান্তে পঞ্চমহাগুণ যেবা হয়ে।
সেহগুণ সদা জানি শ্রীকৃষ্ণেতে রহে ॥
যথা।
অবিচিন্ত্য মহাশক্তিঃ ১ কোটি ব্রহ্মাণ্ড-
বিগ্রহঃ ২।
অবতারাবলী বীজং ৩ হতারি
গতিদায়কঃ ৪ ॥
আত্মারামগণাকর্ষী৫ত্যমিকৃষ্ণে
কিলাদ্ভুতাঃ ৬ ॥
পঞ্চাশ গুণ আগে কহিল সাধারণ।
সদাস্বরূপাদি দশ বিশেষ কথন ॥
অসাধারণ গুণ নাহিক অন্যস্থানে।
বৃন্দাবনে সেই চারি শ্রীনন্দ নন্দনে ॥
সর্ব্বাদ্ভুত চমৎকার লীলার সাগর।
অতুল্য মধুর প্রেম মণ্ডিত কলেবর ॥
ত্রিজগতের মন করেন আকর্ষণ।
অসমানোর্দ্ধরূপ সে মুরলি বদন ॥
সেই কৃষ্ণেগুণ চারি দেখি পরচার।
বৃন্দাবনে রাসাদিক লীলার বিহার ॥ ১
প্রেম অনুরাগে প্রিয়ার অধীন হয়। ২
বেণুমাধরী ৩ রূপমাধুরী ৪ পুন কয় ॥
যথা।
লীলা ১ প্রেম্ণা প্রিয়াধিক্যং ২
মাধুর্য্যেবেণু ৩ রূপয়োঃ ॥ ৪
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য
চতুষ্টয়ং ॥
একুন হইলে এই চতুষষ্টিগুণ।
ইহার সোদাহরণ মূল গ্রন্থে শুন ॥
এবং গুণা চতুর্ভেদাশ্চতুষ্টিরুদাহৃতাঃ ॥
তত্র সুরম্যাঙ্গঃ ১।

শ্লাঘ্যাঙ্গ সন্নিবেশো যঃ সুরম্যাঙ্গঃ স কথ্যতে ॥
মুখং চন্দ্রাকারং ইত্যাদিঃ।
সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ।২
তত্র গুণোত্থং যথা।
রক্ততুঙ্গতাদিভির্যোগঃ গুণোত্থং ॥
পূর্ণভগবানে শুন অঙ্গসল্লক্ষণ।
নন্দগৃহে বৃদ্ধগোপ কহে কোনজন ॥
হের দেখ এই শিশুর বত্রিশ লক্ষণ।
সাধারণ জীবে নাহি রহে এতগুণ ॥
সপ্ত স্থলে রক্তবর্ণ দেখ বিদ্যমান।
নেত্রান্ত চরণতল ওষ্ঠাধর আন ॥
তালু জিহ্বা তথা নখ সপ্তরক্ত এই।
তার পর ছয় উচ্চ সবাকারে কই ॥
কক্ষ বক্ষ নখ নাসা কটিমুখ দেখি।
তুঙ্গ এই ষষ্ঠস্থান সামুদ্রকে লেখি ॥
বিস্তার তাহাতে তিন কর অবধান।
কটিললাট বক্ষ এই ত্রিবিধ স্থান ॥
পুন তিন খর্ব্ব অঙ্গ অপূর্ব্ব লক্ষণ।
মেহন জংঘা আর গ্রীবা খর্ব্ব হন।
পুন তিন অঙ্গ হয় অত্যন্ত গভীর।
নাভি সত্ত্ব স্বর এই লক্ষিত শরীর ॥
পঞ্চদীর্ঘ স্থান কৃষ্ণ শুন পরচার।
নাসা হনু ভুজনেত্র জানু দীর্ঘাকার ॥
পঞ্চসূক্ষ্ম স্থান তাহে দেখ বিদ্যমান।
ত্বক কেশ অঙ্গুলি দন্ত অঙ্গুলি পর্ব্ব আন
নন্দপ্রতি কোন গোপ করে নিবেদন।
বত্রিশ চিহ্নে সুলক্ষিত তোমার নন্দন ॥
যথা।
রাগঃ সপ্তসু হন্ত ষট্স্বপি শিশোরঙ্গেষলং তুঙ্গতা।
বিস্তারস্ত্রিষুখর্ব্বতা ত্রিষু তথা গম্ভীরতা চ ত্রিষু ॥
দৈর্ঘ্যং পঞ্চসু কিঞ্চ পঞ্চসু সখে সংপ্রেক্ষ্যতে সূক্ষ্মতা।
দ্বাত্রিংশদ্বরলক্ষণঃ কথমসৌ গোপেষু সম্ভাব্যতে ॥
অঙ্কোত্থলক্ষণ কৃষ্ণের করহ শ্রবণ।
রেখাময় করচরণাদিতে দরশন ॥
একদিন নন্দগোপ আনন্দে বসিঞা।
কৃষ্ণ অঙ্গ নিরখই সুদৃঢ় করিঞা ॥
রথাঙ্গাদি চিহ্ন দেখি চিন্তিত অন্তর।
ষোড়শ চিহ্নেতে অঙ্কিত কলেবর ॥
যথা ॥
করয়োঃ কমলং তথা রথাঙ্গং স্ফুটরেখাময়মাত্মজস্য পশ্য।
পদপল্লবয়োশ্চ বল্লবেন্দ্র ধ্বজবজ্রাঙ্কুশমীনপঙ্কজানি ॥
কোন অঙ্গে কোন চিহ্ন কর অবধান।
স্বয়ং ভগবানের চিহ্ন পাদ্মায় প্রমাণ ॥
ব্রহ্মা কহে নারদ প্রতি স্বয়ং লক্ষণে।
ষোড়শ চিহ্ন রহে পূর্ণ ভগবানে ॥
ধ্বজবজ্রপদ্মাঙ্কুশস্বস্তিক উর্দ্ধরেখা।
যবাকৃতি অষ্টকোণ দক্ষিণ পদে লেখা ॥
বামপদে সপ্ত চিহ্ন কৃষ্ণের করে স্থিতি।
ইন্দ্রচাপ ত্রিকোণ অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি ॥
কলস অম্বর আর মৎস্য চিহ্নাকার।
গোস্পদ চিহ্ন রহে বামপদে যার ॥
জম্বুফলাকৃতি চিহ্ন রহে কোন স্থানে।
এইত ষোড়শ চিহ্ন পূর্ণ ভগবানে ॥
দুই তিন চারি চিহ্ন রহে দেবান্তরে।

পাঁচ সাত চিহ্ন রহে অন্য অবতারে ॥
শাস্ত্রান্তরে কহে শঙ্খচক্র ছত্রাকারে।
এই সব চিহ্নেত পূর্ণরূপে অবতার।
যথা পাদ্মে।
ষোড়শৈবতু চিহ্নানি ময়া দৃষ্টানি তৎপদে।
দক্ষিণে চাষ্ট চিহ্নানি ইতরে সপ্ত এব চ ॥
ধ্বজঃ পদ্মং তথা বজ্রমঙ্কুশো যব। এব চ ॥
স্বস্তিকঞ্চোর্দ্ধরেখা চ অষ্টকোণং তথৈব চ ॥
দৃশ্যন্তে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ দক্ষিণে ভগবৎ পদে।
সপ্তান্যানি প্রবক্ষ্যামি সাম্প্রতং বৈষ্ণবোত্তম।
ইন্দ্রচাপং ত্রিকোণঞ্চ কলসং চার্দ্ধচন্দ্রকং।
অম্বরং মৎস্য চিহ্নঞ্চ গোষ্পদং সপ্তমং স্মৃতং।
অথ রুচিরং ।৩
সৌন্দর্য্যেণ দৃগানন্দকারী রুচির উচ্যতে ॥
অথ তেজসাযুক্তঃ ।৪
তেজোধাম প্রভাবশ্চ উচ্যতে দ্বিবিধং বুধৈঃ।
তত্র ধামঃ।
দীপ্তিরাশির্ভবেদ্ধাম ॥
তত্র প্রভাবঃ।
প্রভাবো দুষ্প্রধর্ষতা।

কৃষ্ণং বীক্ষ্য কংসমল্লসমূহঃ বিব্যথে যথা ॥
অথ বলীয়ান্ ৫।
প্রাণেন মহতা পূর্ণো বলীয়ানিতি কথ্যতে ॥
যথা। ক্রীড়া কন্দুকতাং যেন নীতো গোবর্দ্ধনো গিরিঃ ॥
অথ বয়সান্বিতঃ ।৬।
বয়সো বিবিধত্বেঽপি সর্ব্বভক্তি-রসাশ্রয় কিশোর এব ॥
অথ বিবিধাদ্ভুত ভাষাবিৎ। ৭।
নানাদেশ্য ভাষাসু সংস্কৃতাদিষু যস্তু কোবিদঃ ॥
অথ সত্যবাক্যঃ। ৮।
স্যান্নানৃতং বচোযস্য সত্যবাক্যঃ স ভণ্যতে ॥
অথ প্রিয়ম্বদঃ ॥ ৯।
জনে কৃতাপরাধেঽপি সান্ত্ববাদী প্রিয়ম্বদঃ ॥
বাবদূকঃ ॥ ১০ ॥
স দ্বিধা শ্রুতিপ্রেষ্ঠোক্তিস্তথা অখিল বাগ্‌গুণান্বিত বাকৃচি ॥
সুপাণ্ডিত্যঃ ॥ ১১ ॥
বিদ্বান্নীতিজ্ঞ ইত্যেষ সুপাণ্ডিত্যো দ্বিধামতঃ।
বিদ্বানখিল বিদ্যাবিন্নীতিজ্ঞস্ত যথার্হকৃৎ ॥
তত্র দ্বিতীয়ো যথা ॥
মৃত্যুস্তস্কর মণ্ডলে সুকৃতিনাং বৃন্দে বসন্তানিলঃ

কন্দর্পো রমণীষু দুর্গতিকুলে কল্যাণ-
কল্পদ্রুমঃ ॥
ইন্দুর্বন্ধুগণে বিপক্ষপটলে কালাগ্নি
রুদ্রাকৃতিঃ।
শান্তি স্বস্তিধুরন্ধরো ব্রজপুরীং নীত্যা
ব্রজেন্দ্রাত্মজঃ ॥

বুদ্ধিমান্ ॥ ১২ ॥
মেধাবী সূক্ষ্মধীশ্চেতি প্রোচ্যতে
বুদ্ধিমান্ দ্বিধা ॥

প্রতিভান্বিতঃ ॥ ১৩ ॥
সদ্যোনব নবোল্লেখি জ্ঞানং স্যাৎ
প্রতিভান্বিতঃ ॥

বিদগ্ধঃ ॥ ১৪ ॥
কলাবিলাসদিগ্ধাত্মা বিদগ্ধ ইতি-
কীর্ত্যতে ॥

চতুরঃ ॥ ১৫ ॥
চতুরো যুগপদ্ভূরি সমাধান কৃদুচ্যতে ॥

দক্ষঃ ॥ ১৬ ॥
দুষ্করে ক্ষিপ্রকারী যস্তং দক্ষং
পরিচক্ষতে ॥

কৃতজ্ঞঃ ॥ ১৭ ॥
কৃতজ্ঞঃ স্যাদভিজ্ঞো যঃ কৃতসেবাদি-
কর্ম্মণাং ॥

যথা ভারতে।
ঋণমেতৎ প্রবৃদ্ধং মে হৃদয়ান্
নাপসর্পতি।
যদ্গোবিন্দেতি চুক্রোশ কৃষ্ণা মাং
দূরবাসিনং ॥

সুদৃঢ়ব্রতঃ ॥১৮॥
প্রতিজ্ঞা নিয়মৌ যস্য সত্যৌ স ...

দেশকাল সুপাত্রজ্ঞঃ ॥১৯॥
দেশকাল সুপাত্রজ্ঞ স্তত্তদ্যোগ্য ক্রিয়া-
কৃতী ॥

শাস্ত্রচক্ষুঃ ॥২০॥
শাস্ত্রানুসারিকর্ম্মা যঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ স
কথ্যতে ॥

শুচিঃ ॥২১॥
পাবনশ্চ বিশুদ্ধশ্চ উচ্যতে দ্বিবিধঃশুচিঃ
পাবনঃ পাপনাশী স্যাৎ বিশুদ্ধস্ত্যক্ত
দূষণঃ ॥

বশী ॥২২॥
বশী জিতেন্দ্রিয়ঃ প্রোক্তঃ ॥

স্থিরঃ ॥২৩॥
আফলোদয়কৃৎ স্থিরঃ ॥

দান্তঃ ॥২৪॥
স দান্তো দুঃসহমপি যোগ্যং ক্লেশং
সহতে যঃ ॥

ক্ষমাশীলঃ ॥২৫॥
ক্ষমাশীলোঽপরাধানাং সহনঃ পরি-
কীর্ত্যতে ॥

যথা মাঘে ॥
প্রতিবাচমদত্ত কেশবঃ শপমানায়
নচেদি-ভূভৃতে।
অনুহুংকুরুতে ঘনধ্বনিং নহি গোমায়ু-
রুতানি কেশরী ॥

গম্ভীরঃ ॥২৬॥
দুর্ব্বিরোধাশয়ো যস্ত স গম্ভীর ইতীর্য্যতে

ধৃতিমান ॥২৭॥
পূর্ণস্পৃহশ্চ ধৃতিমান সুশান্তঃ ক্ষোভ-

৫ম বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২ [২য় সংখ্যা

বীরভূমি

মাসিকপত্রিকা।

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক সম্পাদিত।

সূচীপত্র।

মূল্য বার্ষিক ডাকমাশুল সহ ২৲ দুই টাকা মাত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵৹ তিন আনা।

১৫ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা এই ঠিকানায় প্রবন্ধ ও টাকাকড়ি সম্পাদকের নিকট প্রেরিতব্য।

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য।*

চারিশত তিরিশ বৎসর পূর্ব্বে এই শ্রীধাম নবদ্বীপে এক ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ঘরে একটি শিশুর জন্ম হয়। আটচল্লিশ বৎসর কাল তিনি এই জগতে সকল মানবের প্রত্যক্ষের মধ্যে ছিলেন। এই আটচল্লিশ বৎসরের মধ্যে তিনি চব্বিশ বৎসর গৃহী আর চব্বিশ বৎসর সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী হইয়া ছয় বৎসর ভারতবর্ষের প্রায় সমুদয় তীর্থে পর্য্যটন করিয়াছিলেন, আর আঠার বৎসর নীলাচলে শ্রীজগন্নাথধামে যাপন করিয়াছিলেন। এই শিশু প্রথম বয়সে নিমাই, গৌরাঙ্গ ও বিশ্বম্ভর নামে পরিচিত, আর সন্ন্যাসী হওয়ার পর ইঁহার নাম হইয়াছিল শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য। তাঁহার এই আটচল্লিশ বৎসরের ইতিহাস বিবিধ প্রাচীন বাঙ্গালা ও সংস্কৃত গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। একালে অনেকে জীবন-চরিতের ধরণে তাঁহার কথা প্রচার করিয়াছেন। আমরা অদ্য তাঁহারই সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিব। আমরা এই আলোচনায় তাঁহার ভক্ত ও সঙ্গীগণ তাঁহার সম্বন্ধে নিজ নিজ অনুভূতি আশ্রয় করিয়া যাহা বলিয়াছেন কেবলমাত্র তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিব। ভক্তবৃন্দের মত গ্রহণ করার পর আমরা প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধারণা গঠন করিয়া লইব। সে সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনার আবশ্যক নাই।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে প্রথম কথা, যাহা বেশ ধীর-ভাবে ভাবিয়া দেখা দরকার, তাহা এই যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রকট জীবনের ঘটনাবলীকে প্রাচীন কালের ভক্তগণ "লীলা" বলিয়াছেন। লীলা বলিতে কি বুঝায় তাহা আমরা পরে বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিব। উপস্থিত লীলা সম্বন্ধে কেবল দুই একটী কথা আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই।

আমরা বিশ্ব-ব্যাপারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সর্ব্বদাই দেখিতেছি যে বহু কর্ত্তা, বহু কর্ম্ম ও বহুক্রিয়া। এই যে বহু, তত্ত্ববিৎগণ বলেন ইহা আমা-

---

* নবদ্বীপ নিদাঘ-বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত কুলদা-প্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের দ্বিতীয় অভিভাষণ, ২৬শে বৈশাখ (১৩২২) তারিখে শ্রীশ্রীরাধারমণ সেবাশ্রমে বিবৃত।

দের 'মনে হওয়া মাত্র'। পারমার্থিক হিসাবে 'বহু' নাই। এক সমুদ্রের বুকে যেমন অসংখ্য তরঙ্গ উত্থিত হইয়া, কেহ ছোট কেহ বড় নানা দিকে ধাবিত হয়, অথচ এই বহু তরঙ্গের জীবনের ও ক্রীড়ার মধ্য দিয়া একই সাগর আপনার অসীমপ্রকাশ অভিব্যক্ত করে, সেইরূপ অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডে, অনন্ত কালে যাহা কিছু হইতেছে তৎসমুদয়ই এক পরম পুরুষের আত্ম-প্রকাশ-মাত্র। সমুদ্রের ঢেউগুলির মধ্যে কোনটী ছোট, কোনটী বড়, আবার কোনটি অত্যন্ত বড়। ছোট ঢেউগুলিকে দেখিলে সকল সময়ে তাহাকে সাগরের ঢেউ বলিয়া মনে নাও হইতে পারে। যদিও সেটি সাগরের ঢেউ কিন্তু এপ্রকারের ঢেউ পুকুরে বা নদীতে হওয়া অসম্ভব নহে অর্থাৎ এই ছোট ঢেউটীর বুকে সাগরের যাহা বিশেষ মহিমা তাহার প্রতিবিম্ব আমরা দেখিতে পাই না। কিন্তু মাঝে মাঝে সমুদ্রের বুকে এমন এক একটি ঢেউ উঠে, যাহা দেখিয়া ইহা সাগরের ঢেউ কি না সে সম্বন্ধে দর্শকের মনে আদৌ কোনরূপ সন্দেহ জাগিতে পারে না। এই ঢেউটী বিশেষ করিয়া সাগরের অর্থাৎ এই ঢেউটীর মধ্য দিয়া সাগরের মহিমা ও অনন্তত্ব প্রকটিত হয়। সাগরের আদ্যন্ত আমরা কেহই দেখি নাই। এই ঢেউটী আসিয়া সাগর কি, আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়া গেল। এই বড় ঢেউটীর মত বিশ্বের অগণ্য ঘটনাশ্রেণীর মধ্যে একটী একটী বিশেষ ঘটনা ঘটে, সেই ঘটনার মধ্যে আমরা বিশ্বের এই বহু কর্ত্তার মধ্যে যিনি একমাত্র কর্ত্তা, তাঁহাকে দেখিতে পাই, বিশ্বের এই বহু কর্ম্মের মধ্যে যাহা একটী কর্ম্ম—চরম ও পরম অভিপ্রায় তাহা বুঝিতে পারি। এই প্রকারের ঘটনাকে লীলা বলে।

শাস্ত্রে বলিয়াছেন,

"একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একংরূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তিধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাং॥"

কঠোপনিষৎ

বেদের এই মন্ত্রটীর অর্থ আলোচনা করিলে লীলার তৎপর্য্য আমরা বুঝিতে পারিব। এক পরমেশ্বর সকল ভূতের অন্তরাত্মা, সমুদয় সংসার তাঁহার বশে আছে তিনি আপনার এক সত্তাকে নানা প্রকার স্থাবর জঙ্গমাদি রূপে দেখাইতেছেন। তিনি আমাদের আত্মায় অবস্থিত। যে সকল ধীর ব্যক্তি-

তাঁহাকে সাক্ষাৎ অনুভব করেন, কেবল তাঁহাদেরই নিত্য সুখ হয়। অন্য ব্যক্তিগণ অর্থাৎ যাহারা বহির্দ্দৃষ্টি তাহাদের সে সুখ হয় না।

এই মন্ত্রটীর মধ্যে লীলাবাদের প্রায় সকল কথাই আছে। কঠোপনিষদের অন্যান্য অনেকগুলি মন্ত্রও এই লীলাবাদই প্রচার করিতেছে।

"অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥
বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপোবভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥

অর্থাৎ একই অগ্নি যেমন এই লোকে প্রবিষ্ট হইয়া কাষ্ঠাদি বস্তুর যে পৃথক পৃথক রূপ, সেই সেই রূপে দৃষ্ট হয়েন অর্থাৎ বক্রকাষ্ঠে বক্রের ন্যায়, আর চতুষ্কোণ কাষ্ঠে চতুষ্কোণের ন্যায় দৃষ্ট হয়েন, সেইরূপ এক আত্মা সকল দেহে প্রবিষ্ট হইয়া নানারূপে প্রকাশ পাইতেছেন এবং এই বহুরূপে প্রকাশ পাওয়া ছাড়াও তিনি বাহিরে আকাশের ন্যায় ব্যাপিয়া আছেন ; বায়ু যেমন এই লোকে প্রবেশ করিয়া পৃথক পৃথক স্থানের দ্বারা পৃথক পৃথক নামে প্রকাশ পাইতেছেন সেইরূপ একই আত্মা সকল দেহে প্রবিষ্ট হইয়া নানারূপে প্রকাশ পাইতেছেন, এই প্রকাশ ছাড়াও তিনি বাহিরে আকাশের ন্যায় ব্যাপিয়া আছেন।

লীলাতত্ত্ব সম্বন্ধে আজ আর বেশি কিছু বলিব না। শ্রীমদ্ভাগবতের সাহায্যে এ সম্বন্ধে ক্রমে ক্রমে আমাকে অনেক কথাই বলিতে হইবে। আজ আমার কেবল এই মাত্র বক্তব্য যে 'লীলা' ও আমরা যাহাকে ইতিহাস বা জীবন চরিত বলি তাহা, এক বস্তু নহে। লীলা, মানবের চিন্তারাজ্যের একটী স্বতন্ত্র বিভাগ। লীলা আলোচনার পদ্ধতি ইতিহাস বা জীবনচরিত আলোচনার পদ্ধতি হইতে স্বতন্ত্র। লীলাবাদীগণ বিশ্বতত্ত্বের কতকগুলি প্রাথমিক সত্য মানিয়া লইয়া আলোচনা রাজ্যে প্রবেশ করেন। মানবীয় চিন্তার যে বিভাগেই প্রবেশ করা যাউক, এই প্রকারের কতকগুলি প্রাথমিক বিষয় মানিয়া না লইলে অগ্রসর হওয়া যায় না, মানিয়া লইতে হয় বলিয়া যে অন্ধভাবে বিশ্বাস করিতে হয় এরূপ মনে করিবেন না। প্রথমটা মানিয়া লইতে

হয় বটে, কিন্তু ক্রমশঃ আলোচনার মধ্যে অগ্রসর হইতে হইতে তাহাদের সত্যতা-বিষয়ক হৃদয়ের প্রতীতি স্পষ্টতর মূর্ত্তি ধারণ করে। লীলাবাদের প্রথম কথা এই যে স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান পরমেশ্বর জগতের কারণ। যাহা হউক লীলবাদসম্বন্ধে আরও যাহা বলিবার আছে তাহা কল্য হইতে আরম্ভ করা যাইবে। কঠোপনিষদের যে তিনটি মন্ত্র বলা হইল সেই তিনটি গভীর চিন্তা দ্বারা আপনারা কিয়ৎপরিমাণে আয়ত্ত করিয়া রাখিবেন। অদ্য লীলাবাদের মধ্য দিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু সম্বন্ধে দু একটী কথা উত্থাপন করিতেছি। নদীয়ার নিমাই পণ্ডিত বিশ্ব-কল্যাণের ব্রত লইয়া যখন সন্ন্যাসী হইলেন, তখন তাঁহার নাম হইল "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"। শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্য বা প্রতীতি যাহা হইতে হয়, তিনিই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অর্থাৎ যাঁহাকে দেখিলে শ্রীকৃষ্ণকে দেখা হয়, যাঁহাকে ভাবিলে শ্রীকৃষ্ণকে ভাবা হয়, যাঁহাকে ডাকিলে শ্রীকৃষ্ণকে ডাকা হয়, যাঁহাকে বাদ দিলে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের নিকট একটী রহস্য, একটী নাম মাত্র হইয়া পড়েন এবং শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিত বা কথিত হইয়াছে তাহা কবি-কল্পনার সামগ্রী হইয়া পড়ে,তিনিই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। (Sree Krishna Realised) শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য সম্বন্ধে ইহাই প্রথম কথা। প্রাচীন শ্লোকে আছে—

> "প্রেমাণামদ্ভুতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ কস্য নাম্নাংমহিম্নঃ।
> কোবেত্তা কস্যবৃন্দাবনবিপিনমহামাধুরীষু প্রবেশঃ॥
> কোঽবা জানাতি রাধাম্ পরমরস-চমৎকার-মাধুর্য্যসীমা-।
> মেকশ্চৈতন্যচন্দ্র পরমকরুণয়া সর্ব্বমাবিশ্চকার॥

প্রাচীন বৈষ্ণব-কবি শ্রীপ্রেমানন্দ দাস এই শ্লোকটীর আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন—

> "এ মন! শচীর নন্দন বিনে।
> প্রেম বলি নাম অতি অদ্ভুত, শ্রুত হৈত কার কাণে॥
> শ্রীকৃষ্ণনামের, স-গুণ-মহিমা, কেবা জানাইত আর।
> বৃন্দাবিপিনের' মহা মধুরিমা প্রবেশ হইত কার॥
> কেবা জানাইত, রাধার মাধুর্য্য, রস যশ চমৎকার।
> তার অনুভব, সাত্ত্বিক বিকার, গোচর ছিল বা কার॥
> ব্রজে যে বিলাস, রাস মহারাস, প্রেম-পরকীয়া-তত্ত্ব।
> গোপীর মহিমা, ব্যভিচারী সীমা, কার অবগতি ছিল এত॥

ধন্য কলিধন্য, নিতাই চৈতন্য, পরম করুণা করি।
বিধি অগোচর, যে প্রেম বিকার, প্রকাশে জগত ভরি॥
উত্তম অধম, কিছু না বাছিল, যাচিয়ে দিলেক কোল।
কহে প্রেমানন্দ, এমন গৌরাঙ্গ অন্তরে ধরিয়া দোল॥

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভু সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে আমাদিগকে এই স্থান হইতেই আরম্ভ করিতে হইবে। তিনি শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্য অর্থাৎ (Realisation of Sree Krishna Incarnate) শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সাধারণ শক্তিতে অবোধ্য। শ্রীকৃষ্ণ বলিতে আমরা অবশ্য বৃন্দাবনের শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণকে বুঝিতেছি. ইনি প্রাচীন মতানুসারে পূর্ণতম এবং নবকিশোর নটবর। মথুরা ও দ্বারকায় এই শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতর, কুরুক্ষেত্রে পূর্ণ। শ্রীবৃন্দাবন ও শ্রীকৃষ্ণ, রহস্য। আমরা সাধারণতঃ যেভাবে চিন্তা ও আলোচনা করি, যদ্যপি সেই ভাবে বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণকে বুঝিতে যাই তাহা হইলে কৃতকার্য্য হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিয়াছেন, কেবল বৃন্দাবন ও কৃষ্ণ কেন, সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রই এক রহস্য। সাধারণ বুদ্ধিতে ইহার প্রকৃত মর্ম্ম পাওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ আসিয়া আমাদিগকে বৃন্দাবন-রহস্যের সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় ভাগবত শাস্ত্রের রহস্যও বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন। যেমন শ্রীচরিতামৃতকার বলিতেছেন—

"দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥
এক ভাগবত এই ভাগবত শাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরস পাত্র॥"

উদ্ধৃত অংশ হইতে পাওয়া যাইতেছে যে আমাদের হৃদয় স্বভাবতঃ অন্ধকারে আচ্ছন্ন। হৃদয়ের এই অন্ধকার দূরীভূত না হইলে—বৈষ্ণব শাস্ত্রে যাহাকে "প্রসন্নোজ্জ্বলচিত্ততা" বলে সেই অবস্থা না আসিলে শ্রীমদ্ভাগবতের ও শ্রীকৃষ্ণলীলার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যায় না। চিত্তের একটী বিশিষ্ট অবস্থা না হইলে ভাগবত বুঝিতে পারা যাইবে না, এ প্রকারের কথা বলিলে আপনারা ভীত হইবেন না: কারণ এই কথা কেবল ভাগবত কেন, সকল শাস্ত্র ও সকল তত্ত্ব সম্বন্ধেই বলা যাইতে পারে। যেমন জগতের এক একটী ভূতের ধর্ম্ম বুঝিতে হইলে, এক একটী ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন অর্থাৎ চক্ষু দ্বারাই আলোকের জ্ঞান হয় কাণের দ্বারা নহে,

নাসিকার দ্বারাই শব্দের জ্ঞান হয়, ত্বকের দ্বারা নহে, জিহ্বা দ্বারাই রসের জ্ঞান হয়, হস্তের দ্বারা নহে, সেইরূপ প্রসন্নোজ্জ্বল চিত্ত দ্বারা আনন্দের বা প্রেমের জ্ঞান হয়, মেধার দ্বারা বা বহু শাস্ত্রের পরিচয় দ্বারা নহে। উচ্চশ্রেণীর গীতিকাব্য কি সকলে বুঝিতে পারে? শ্রীমদ্ভাগবতকার বলিয়াছেন, ভাবুক ও রসিক হইয়া ভাগবতরস পান কর। এই রসিক ও ভাবুক হওয়া বলিতে প্রসন্নোজ্জ্বলচিত্ত হওয়া বুঝায়।

প্রসন্নোজ্জ্বলচিত্ততা কি সংক্ষেপে বলিতেছি। শ্রীরূপ গোস্বামী কৃত "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" গ্রন্থের শ্রীজীবগোস্বামীরচিত দুর্গম-সঙ্গমণী টীকায় এ বিষয়ের অল্প কথায় সুস্পষ্ট বর্ণনা আছে। সেখানে প্রসন্নত্ব বলিতে ইহাই বুঝাইয়াছেন যে এই প্রকারের চিত্ত, শুদ্ধ সত্ত্ব বিশেষের আবির্ভাবের যোগ্য। ঔজ্জ্বল্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন "তদাবির্ভাবাৎ সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্নত্বম্" এইবার চিত্তের এই অবস্থাটী কি, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের চিন্তার মধ্য দিয়া তাহা ধারণা করিতে চেষ্টা করা যাউক। এই জিনিষটাকে "Mystical states of consciousness বলে। মার্কিণ দেশের সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক William James, যাঁহার নাম আপনারা নিশ্চয়ই শুনিয়াছেন, তিনি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে এ বিষয়ে বর্ত্তমান কালের উপযোগী করিয়া অপক্ষপাতে বেশ সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন। তিনি এই অবস্থা সম্বন্ধে চারিটী লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

প্রথম কথা এই যে—এই অবস্থা কেমন, কথায় বুঝাইয়া বলা যায় না। যিনি বুঝিয়াছেন তিনিই বুঝিতে পারেন। এ যেন বোবার স্বপ্ন! সুতরাং ইহা একটী "ভাব" ঠিক "জ্ঞান' নহে "more like states of feeling than like states of Intellect" দ্বিতীয় কথা তিনি এই বলেন যে মানব-চৈতন্যের এই অবস্থা ভাবধর্ম্মী হইলেও জ্ঞানবিরোধী নহে। পরন্তু এই অবস্থার সত্যের সঙ্গে যেরূপ ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়, বিচারণার সময় যুক্তি, তর্ক ও উদাহরণের সাহায্যে সেরূপ ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় না।

"They are states of insight into depths of truth unplumbed by the discursive intellect. They are illuminations, revelations full of significance and importance all inarticulate though they remain and as a rule they carry with them, a curious sense of authority for after time."

এই অবস্থাই আমাদের প্রসন্নোজ্জ্বল-চিত্ততা।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন রসিক ও ভাবুক হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতরস পান করিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের লীলার তাৎপর্য্য যাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিলেন তাঁহারা বলিলেন শ্রীকৃষ্ণই রসরাজ আর শ্রীমতী রাধিকাই মহাভাব ; সুতরাং শ্রীরাধা কৃষ্ণের "যুগল পীরিতি" যাঁহাদের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে তাঁহারা এই ভাগবত-শাস্ত্রের লীলা আস্বাদন করিবার অধিকারী। যাহা হউক শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভু সম্বন্ধে প্রথম কথাটী আপনাদিগকে বলিলাম। "He is the interpreter of the Lila of Krishna which is a mistrey" অর্থাৎ তিনি শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-রহস্যের ব্যাখ্যাতা। "ব্যাখ্যাতা" এই কথা শুনিয়া সাধারণতঃ যাহা বোঝেন এখানে তাহা বুঝিবেন না। এখানে হৃদয় লইয়া কারবার। জেম্‌স্ সাহেব তাঁহার গ্রন্থে বলিয়াছেন যে এই উজ্জ্বল-চিত্ততা একজন অপরকে দিতে পারে না। অবশ্য একেবারেই যে পারেন না এমন কথা তিনি ঠিক বলেন নাই। কিন্তু এক জায়গায় লিখিয়াছেন It can not be imparted or transferred to another" আমরা কিন্তু ইহা স্বীকার করি না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কেবল যে ভাগবত-তত্ত্বই শিখাইয়া গিয়াছেন তাহা নহে। ভক্ত কি তাহাও আমরা পূর্ব্বে জানিতাম না। কেহ কেহ হয়ত জানিতেন, কিন্তু সাধারণভাবে সে কথা আমাদের দেশে প্রচারিত হয় নাই। তাঁহারই কৃপায় ভক্ত কি তাহাও ভাগ্যবান ব্যক্তিগণ বুঝিলেন।

"যাহারে দেখিলে মুখে আসে হরি নাম।
তাহারে জানিবে তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥"

ইহাই উত্তম ভক্তের লক্ষণ। তিনি জগতে শক্তি সঞ্চার করিতেছেন। সুতরাং চিত্তের এই উজ্জ্বলভাব ভক্ত কর্ত্তৃক অপরের হৃদয়ে সংক্রামিত হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্ত্তৃক তাহা খুব ব্যাপকভাবেই হইয়াছিল। সুতরাং তিনি শক্তি-সঞ্চার করিয়া কৃষ্ণ-লীলা-রস মানবকে পান করাইয়াছিলেন। আমরা শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব সম্বন্ধে ও বিশেষ করিয়া রাসলীলা সম্বন্ধে যখন আলোচনা করিব তখন এ বিষয়ে যাহা কিছু বক্তব্য সমস্তই শুনাইব। এখন কেবল উদাহরণ স্বরূপে একটি কথা বলিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ-লীলা সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলিলেন যে এই লীলা নিত্য। "নিত্য লীলাবাদ" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্ত্তৃক প্রথম প্রচারিত হয়। নিত্যলীলার অর্থ কি ? শ্রীকৃষ্ণের কথা, শ্রীবৃন্দাবনে গোচারণ, গোবর্দ্ধনধারণ,

বস্ত্রহরণ, রাস প্রভৃতি সম্বন্ধে আমরা নানা পুরাণে কাব্যে ও নাটকে পড়িয়াছি। এই লীলা সম্বন্ধে আমাদের যাহাই ধারণা হউক না কেন, ঘটনাগুলিকে যদি সত্য বলিয়া বিবেচনা করি অর্থাৎ রূপক বলিয়া যদি উড়াইয়া না দিই, তাহা হইলে এইরূপ মনে করি যে সাধারণ ঐতিহাসিক ঘটনার ন্যায় বৃন্দাবনের এই ঘটনাটীও এক সময়ে ঘটিয়াছিল। ইতিহাসের ঘটনাগুলি যেমন একটী নির্দ্দিষ্ট কালে সংঘটিত হয়, তাহার পর ফুরাইয়া যায়। একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে হয়, অন্য স্থানে হয় না, বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণলীলাও সেইরূপ একটী নির্দ্দিষ্ট কালে হইয়াছিল, তাহার পর ফুরাইয়া গিয়াছে। এখন আমরা অতীত কালের অন্যান্য ঘটনার মত তাহা পড়িতে পারি এবং তাহা হইতে একটী সাময়িক ভাব বা কিছু নৈতিক উপদেশ আহরণ করিতে পারি, কিন্তু ইহার অধিক আর কিছু হইবার উপায় নাই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে শিক্ষা দিলেন তাহার প্রেরণায় শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার "লঘু ভাগবতামৃত" নামক গ্রন্থে বলিলেন

"কৈরপি প্রেমবৈবশ্যভাগ্ ভির্ভাগবতোত্তমৈঃ।
অদ্যাপি দৃশ্যতে কৃষ্ণ ক্রীড়ন্ বৃন্দাবনান্তরে॥"

অর্থাৎ এখনও কৃষ্ণ-প্রেমে বিবশচিত্ত বহু বহু ভক্তশ্রেষ্ঠ কর্ত্তৃক বৃন্দাবনে ক্রীড়াকারী সেই কৃষ্ণ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ-লীলার নিত্যতার সঙ্গে সঙ্গে, তাহারই আনুসঙ্গিকরূপে (as a corollary thereof) এই লীলার সর্ব্বোত্তমতাও তিনি প্রচার করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে লীলা জিনিসটী কি তাহাও জানা গেল। তাঁহার এই শিক্ষা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার সংক্ষেপে বড়ই সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন

"কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাঁহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর, নরলীলার হয় অনুরূপ॥
কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন!
যে রূপের এক কণ, ডুবায় সব ত্রিভুবন, সর্ব্ব প্রাণী করে আকর্ষণ॥ ধ্রু॥
যোগমায়া চিচ্ছক্তি, শুদ্ধ-সত্ত্ব-পরিণতি, তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এই রূপ-রতন, ভক্তগণের গূঢ়ধন, প্রকট কৈলা নিত্যলীলা হৈতে॥
রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার, আস্বাদিতে মনে উঠে কাম॥
স্বসৌভাগ্য যার নাম, সৌন্দর্য্যাদি গুণগ্রাম, এইরূপ তার নিত্যধাম॥
ভূষণের ভূষণ অঙ্গ, তাহে ললিত ত্রিভঙ্গ, তার উপর ভ্রূধনু-নর্ত্তন।

তেরছ নেত্রান্ত-বাণ, তার দৃঢ় সন্ধান, বিন্ধে রাধা-গোপীগণ-মন ॥
কোটী ব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাঁহা যে স্বরূপগণ, তা-সভার বলে হরে মন ॥
'পতিব্রতা শিরোমণি' যারে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ ॥
চড়ি গোপী-মনোরথে, মন্মথের মন মথে, নাম ধরে মদনমোহন।
জিনি পঞ্চশর-দর্প, স্বয়ং নব কন্দর্প, রাস করে লঞা গোপীগণ ॥
নিজ-সম সখা-সঙ্গে, গোগণ-চারণ রঙ্গে, বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দ বিহার ॥
যাঁর বেণু-ধ্বনি শুনি, স্থাবর জঙ্গম প্রাণী, পুলক কম্প অশ্রু বহে ধার ॥
মুক্তা-হার বকপাঁতি, ইন্দ্রধনু পিঞ্ছ ততি, পীতাম্বর বিজুরী সঞ্চার।
কৃষ্ণ নবজলধর, জগৎ-শস্য-উপর, বরিষয়ে লীলামৃতধার ॥"

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের এই কথাগুলি হইতে আমরা এমন অনেকগুলি বিষয় পাইলাম, যাহা সর্ব্বপ্রথম জোরের সহিত শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু জগতে ঘোষণা করেন। লীলাসম্বন্ধে তিনি বলিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় সমুদয় ব্যাপারই ভক্তহৃদয়ের গূঢ় ধন। (Are Experienced by the mystics in the innermost recesses of their heart) ইহা স্বরূপতঃ নিত্য, বৃন্দাবনে যাহা দেখিতেছি তাহা সেই নিত্যের প্রকট-প্রকাশ। অতএব ইংরাজি ভাষায় বলিলে বলিতে হয়, লীলা The manifestation of the Eternal in time. লীলা হইলেই তাহাকে প্রকটাপ্রকট হইতে হইবে অর্থাৎ লীলা একই সময়ে ব্যক্ত ও অব্যক্ত, সসীম ও অসীম manifest and unmanifest লীলায় এই দুইটী দৃশ্যতঃ বিরোধী ধর্ম্ম (apparently Contradictory attributes) একই সময়ে বিদ্যমান। কথাটা আরও ভাল করিয়া বলিতেছি। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-লীলাকে সাধারণ ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত সমপর্য্যায়-ভুক্ত সত্য বলিয়া ধরিয়াছেন, তাঁহারা ভুল করিয়াছেন। আবার যাঁহারা কেবল রূপক বা আধ্যাত্মিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারাও ভুল করিয়াছেন। যাঁহারা চক্ষু মেলিয়া বাহিরে কৃষ্ণ খুঁজিতেছেন, তাঁহারা আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিতেছেন, আর যাঁহারা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া প্রত্যক্ষকে উপেক্ষা করিয়া ইন্দ্রিয়গ্রামকে পরিহার করিয়া ভিতরে চলিয়াছেন, তাঁহারাও শূন্যের দিকে ছুটিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু কর্ত্তৃক সাধনার যে পথ উপদিষ্ট হয়, সেই পথে আমরা দেখিতে পাই, অন্তর ও বাহিরকে এক করিয়া, প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষকে, নিত্য ও অনিত্যকে সামঞ্জস্য করিয়া, কৃষ্ণ তাঁহার বৃন্দাবনে দাঁড়াইয়া চরণে চরণ রাখিয়া ত্রিভঙ্গভঙ্গিমঠামে

অর্দ্ধনিমিলিতনয়নে মোহন মধুর-বাঁশির রবে "পুরুষ যোষিত কিবা স্থাবর জঙ্গম" সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছেন। কৃষ্ণপ্রেমে যেমন বিষ ও অমৃত একত্রে মিশিয়াছে, বৃন্দাবনেও তেমনই ভূমি চিন্তামণি ও জল অমৃত, গাভীগণ সুরভি ও বৃক্ষগণ কল্পতরু হইয়াছে। গমন সেখানে নৃত্য, কথা সেখানে গান, বংশী সেখানে প্রিয়-সখী। এসব রহস্যের কথা পরে আলোচনা করা যাইবে। কবি চণ্ডীদাস এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছিলেন—

"ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর॥
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি
বুঝিতে নারিনু নাথ তোমার পিরীতি॥

বেদে মানুষের চৈতন্যের চারিটী অবস্থা বলা হইয়াছে। বহিঃপ্রাজ্ঞ, অন্তঃপ্রাজ্ঞ, উভয়তঃ-প্রাজ্ঞ ও তুরীয়। এই উভয়তঃপ্রাজ্ঞ অবস্থাটীই লীলাআস্বাদনের অবস্থা অথবা বৃন্দাবনের দ্বার। ইহা যোগমায়া কর্ত্তৃক রক্ষিত, আর কৃষ্ণ-তত্ত্ব তুরীয় এবং

"কৃষ্ণ নাম, কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণলীলাবৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ॥"

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব আমরা যেভাবে আলোচনা করিবার চেষ্টা করি সেভাবে অগ্রসর হইলে আমরা সাধুগণের প্রকৃত অভিমতের সহিত কোনরূপ পরিচয় লাভ করিতে পারিব না। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্ত মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পথ আমাদের বর্ত্তমান সময়ের চিন্তার সম্মুখে এখনও ভাল করিয়া প্রসারিত হয় নাই। তবে ভরসা হয় যে, শীঘ্র আমরা এই পথ ধরিতে পারিব। একবার ধরিতে পারিলে মঙ্গল অনিবার্য্য। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যে কয়টী কথা বলা হইল, আপনারা চিন্তা করিবেন। এই "নিত্যলীলাবাদ" প্রচারের দ্বারা আমাদের বাস্তব জীবনে কি উপকার হইয়াছে, এইবার সে সম্বন্ধে দুএকটী কথা বলিতেছি। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশ কিরূপ অবস্থায় দাঁড়াইয়াছিল, আপনারা বোধ হয় তাহা ঠিক ধরিতে পারিবেন না। কারণ সে সময়ের প্রকৃত ইতিহাস এখনও আলোচনা হয় নাই। নিত্য-লীলাবাদ প্রচারের দ্বারায় সেই অবস্থা এক ঐন্দ্রজালিক শক্তির প্রভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কথাটা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখুন।

আমাদের এই যুগের নাম কলিযুগ। যাঁহারা সমাজের নেতা ও অভিভাবক,

যাঁহারা শাস্ত্রের মর্ম্মবেত্তা তাঁহারা আমাদিগকে বলিতেছিলেন, হে মানব, তোমার বড়ই দুরদৃষ্ট। এই ঘোর কলিকালে তুমি জন্মাইয়াছ, ইহা হইতেই সপ্রমাণ হইতেছে যে তুমি মহাপাপী, এ সংসার কারাগার, ইন্দ্রিয়গুলি আমাদের ভীষণ শত্রু, তুমি তোমার কর্ম্মবিপাকে যে মোহগর্ত্তে পড়িয়াছ তাহা হইতে তোমার পরিত্রাণ নাই। এই প্রকারের নৈরাশ্য ও অবসাদপূর্ণ কথা প্রচার করিয়া একটা দারুণভাব সকলের চিত্তে একেবারে বদ্ধমুল করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সাধারণ জনশ্রেণী অজ্ঞ অথচ সরলচিত্ত, সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণদের উপর খুব শ্রদ্ধা, কিন্তু নিজেদের সত্যাসত্য বিচারের শক্তি প্রায়ই ছিল না। একটি গল্প বলিতেছি, ইহা হইতে ব্যাপারটা বুঝিতে পারিবেন। বৈষ্ণবগ্রন্থে লেখা আছে, সুবুদ্ধি রায় একজন ব্রাহ্মণ, গৌড়ের বাদসাহ ছিলেন। সেই সময়ে হুসেন খাঁ নামক একজন মুসলমান তাঁহার কর্ম্মচারী ছিলেন। এই কর্ম্মচারী কর্ত্তব্যসাধনে ত্রুটী করিয়াছিল বলিয়া রাজা সুবুদ্ধি রায় তাহাকে চাবুক মারেন। এত জোরে চাবুক মারিয়াছিলেন যে তাহার পৃষ্ঠে একটী স্থায়ী দাগ থাকিয়া যায়। কালচক্রে সুবুদ্ধি রায়ের রাজ্য গেল আর হুসেন সা বাদসাহ হইলেন। হুসেন সা মহিষীর প্রেরণায় ও উত্তেজনায় প্রতিশোধ লইবার জন্য সুবুদ্ধি রায়ের "জাত" মারিয়া দেন। বেচারা সুবুদ্ধি রায়ের 'জাত' গেল। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ! জোর করিয়া মুসলমানেরা তাহার 'জাত' মারিয়া দিলে পর সে বেচারা,যেমন হইয়া থাকে সমাজে আর স্থান পাইল না। তখন সে নিরুপায় হইয়া প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থার জন্য ব্রাহ্মণদিগের শরণাপন্ন হয়। ব্রাহ্মণেরা ব্যবস্থা দিলেন যে তাঁহাকে জীবন ত্যাগ করিতে হইবে। এমন করিয়া আত্মহত্যা করার ব্যবস্থা দেওয়া যত সহজ কার্য্যে পালন করা তত সহজ নহে। কাজেই সুবুদ্ধি রায় অন্য কোন ব্যবস্থা হইতে পারে কি না, তাহা জানিবার জন্য কাশীধামের পণ্ডিতগণের শরণাপন্ন হইলেন। কাশীতে 'আপীল' করিয়াও সেই রায়ই বাহাল থাকিল। এই অবস্থায় সুবুদ্ধি রায় সংবাদ পাইলেন যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কাশী আসিতেছেন। নদীয়ার নিমাই পণ্ডিতের প্রতিভার কথা তিনি পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন, তাহার পর যৌবনকালেই তিনি যে সন্ন্যাসী হইয়াছেন সে সংবাদও সুবুদ্ধি রায় পাইয়াছেন, সহস্র সহস্র মানব সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া তাঁহার চরণ আশ্রয় করিয়াছেন, এ সংবাদও তাঁহার অপরিজ্ঞাত ছিল না। তিনি যখন শুনিলেন সেই মহাপ্রভু কাশী আসিতেছেন, তখন ভাবিলেন, যাহাই করি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য

মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কিছু করিব না, তিনি যেরূপ ব্যবস্থা দিবেন, তদনুযায়ী কার্য্য করিব। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আসিলেন, সুবুদ্ধি রায় বিনীত-ভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমুদয় কথা শুনিয়া তাহাকে বলিলেন—"এই ব্রহ্মাণ্ডের যিনি কর্ত্তা তিনি কি প্রতিশোধ-পরায়ণ? এই মনুষ্য-দেহের কি কোনই মর্য্যাদা নাই? ভগবান কি জীবকে ক্ষমা করেন না?" তাহার পর তিনি বলিলেন—আত্মহত্যা তমোধর্ম্ম অর্থাৎ যাহারা মূর্খ তাহারাই ধর্ম্মের নামে আত্মহত্যা করে। সুবুদ্ধি রায়! তোমার চিন্তা নাই—তুমি কেবল একবার ভগবানকে ডাকো, তোমার সমস্ত পাপ দূর হইয়া যাইবে। এখন হইতে তোমার জীবনের নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। তোমার দ্বারা শ্রীভগবানের অনেক কার্য্য হইবে, তুমি তাঁহার এই যুগ-ধর্ম্ম প্রেমপ্রচারের একজন সহায়ক হইবে অর্থাৎ মানবদেহের যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার্থকতা, তাহা তোমার অদৃষ্টে ঘটিবে। বিশ্বাস অবলম্বন কর, শ্রীভগবানকে করুণ বলিয়া হৃদয়ে গ্রহণ কর, তুমি অসহায় পাপী নও, তুমি ভাগ্যবান ও পুণ্যাত্মা, শ্রীভগবানের প্রেমলীলার সহায় হইবার জন্যই তুমি এই দুর্লভ মানব জন্ম পাইয়াছ। তুমি শ্রীভগবানের পরাপ্রকৃতি। শ্রীচৈতন্যচরিতা-মৃতে মধ্যলীলায় ২৫শ পরিচ্ছেদে এই কথা সংক্ষেপে নিম্নরূপে বর্ণিত আছে।

"পূর্ব্বে যবে সুবুদ্ধি রায় ছিলা গৌড়-অধিকারী।
হুসেন খাঁ সৈয়দ করে তাহার চাকুরী॥
দীঘী খোদাইতে তারে মন্‌সীব্ কৈল।
ছিদ্র পাঞা রায় তারে চাবুক মারিল॥
পাছে যবে হুসেন খাঁ গৌড়ের রাজা হৈল।
সুবুদ্ধি রায়েরে তেঁহো বহু বাড়াইল॥
তার স্ত্রী তার অঙ্গে দেখে মারণের চিহ্নে।
সুবুদ্ধি রায়ে মারিবারে কহে রাজা স্থানে॥
রাজা কহে—আমার পোষ্টা হয় পিতা।
তাহারে মারিব আমি ভাল নহে কথা॥
স্ত্রী কহে—জাতি লহ, যদি প্রাণে না মারিবে।
রাজা কহে—জাতি নিলে ইহোঁ নাহি জীবে॥
স্ত্রী মারিতে চাহে, রাজা সঙ্কটে পড়িলা।
করোয়ার পানি তার মুখে দেয়াইলা॥

তবে সুবুদ্ধি রায় সেই ছন্ম পাইয়া।
বারানসী আইলা সব বিষয় ছাড়িয়া॥
প্রায়শ্চিত্ত পুঁছিল তেঁহো পণ্ডিতের স্থানে।
তাঁরা কহেন তপ্ত ঘৃত খাইয়া ছাড় প্রাণে॥
কেহো কহে—এই নহে অল্প দোষ হয়।
শুনিয়া রহিলা রায় করিয়া সংশয়॥
তবে যদি মহাপ্রভু বারানসী আইলা।
তাঁরে মিলি রায় আপন বৃত্তান্ত কহিলা॥
প্রভু কহে—ইহাঁ হৈতে যাহ বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন॥
এক নামাভাসে তোমার পাপদোষ যাবে।
আর নাম হৈতে কৃষ্ণ চরণ পাইবে॥"

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার সুবুদ্ধি রায়ের পরবর্ত্তী জীবন বর্ণনা করিয়াছেন। একদিন যিনি রাজা ছিলেন, তিনি কাঠ কাটিয়া মথুরায় আসিয়া বিক্রয় করিয়াছেন। বিক্রয় করিয়া যাহা পাইতেন তাহা হইতে অতি সামান্য অংশ লইয়া নিজের দেহ ধারণোপযোগী খাদ্য গ্রহণ করিতেন, অবশিষ্ট অর্থে দুঃখীর সেবা করিতেন। সুবুদ্ধি রায়কে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণচরণ প্রাপ্ত হইবে—নিজের শ্রমলব্ধ অর্থে ভক্তির সহিত দুঃখীর সেবার মধ্য দিয়া তিনি দীর্ঘকাল শ্রীকৃষ্ণের চরণ সেবা করেন। তাহার পর শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীসনাতন গোস্বামী নিত্যলীলা প্রচারের জন্য যখন শ্রীবৃন্দাবনের বনভূমিতে আগমন করেন, তখন সুবুদ্ধি রায় তাঁহাদের সেবা করিয়া তাঁহাদের বিশ্বকল্যাণ-ব্রত উদ্‌যাপনের সহায় হইয়াছিলেন।

সুবুদ্ধি রায়ের এই উপাখ্যানের তাৎপর্য্য কি? মানুষ নিজেকে ভুলিয়া গিয়াছিল, জগৎকে মিথ্যা বলিত, কাজেই আপনার দেহ ও ইন্দ্রিয়কেও শত্রু বলিয়া বিবেচনা করিত এবং দেহকে নানারূপ ক্লেশ দেওয়া অথবা ইন্দ্রিয়-সমূহকে শক্তিহীন করিয়া ফেলাই ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করিত। মানুষ এইরূপ চিন্তা করিতে শিক্ষা করিয়াছিল যে ধার্ম্মিক হইতে হইলে এই প্রত্যক্ষকে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করিয়া এক কাল্পনিক অপ্রত্যক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে।

"নরলীলাই সর্ব্বোত্তম লীলা এবং নরবপুই কৃষ্ণের স্বরূপ" এই কথা জগতের

ইতিহাসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃকই সর্ব্বপ্রথম প্রচারিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ ইহা পূর্ব্বে দেখাইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু লোকে সে শিক্ষা ভুলিয়া গিয়াছিল। পার্থিব স্বত্ব ও সুবিধায় আত্মহারা মোহাচ্ছন্ন জীব বুঝিতে পারে নাই যে ভগবান সূর্য্যের প্রচণ্ডকর ও বর্ষার বারিধারা মাথায় করিয়া হাস্যমুখে রাখাল বালকের সঙ্গে গোচারণ করিতেছেন; কারণ মানুষ বিলাসীর উদ্বৃত্ত অর্থে গঠিত, মণি-মুক্তায় সুশোভিত মন্দিরের মধ্যে দম্ভের সহিত স্তূপীকৃত আড়ম্বরপূর্ণ পূজার সুবৃহৎ আয়োজনের মধ্যে এবং দুর্ব্বোধ্য মন্ত্র, অর্থহীন ও প্রাণশূন্য বিবিধ অনুষ্ঠানের মধ্যেই ভগবানকে খুঁজিতেছিল। শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা জগৎ ভুলিয়া গিয়াছিল, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পুনর্ব্বার সেই শিক্ষা জগৎকে প্রদান করিলেন। এই সময় হইতেই জগতে "মানবতার যুগ" প্রবর্ত্তিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ-লীলার মধ্যে এই রহস্য লুক্কায়িত আছে তাহা আমরা ধরিয়াও ধরিতে পারি নাই। যদি কৃষ্ণকে বুঝিতাম তাহা হইলে মানুষকে ঘৃণা করিতাম না। ভগবানকে পতিতপাবন বলিয়া ঘরে বসিয়া চক্ষু মুদিয়া কাঁদি আর বাড়ীর দুয়ারে শত শত অসহায়কে পতিত বলিয়া ঘৃণা করিয়া তাড়াইয়া দিই। হে কৃষ্ণ- উপাসক! মুহূর্ত্তের অসতর্কতায় যে পাপের পথে পড়িয়া গিয়াছে তুমি যদি তাহাকে তুলিয়া লইবার জন্য নিজের হাত বাড়াইতে না পার, পাছে আমি অপবিত্র হইয়া যাই বলিয়া তাহার পানে ফিরিয়াও না চাও তাহা হইলে ভগবানকে "তৃণচরানুগ" "ফণিফনার্পিত পদ," প্রভৃতি যে সমস্ত আখ্যা দিতেছ সে সমস্তের তাৎপর্য্য কি?

যাহা হউক, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিত্যলীলা, নরলীলার সর্ব্বোত্তমতা ও নরবপুই কৃষ্ণের স্বরূপ এই সমস্ত কথা প্রচার করিয়া আমাদের আধ্যাত্মিক চিন্তা-স্রোতের গতি একেবারে ফিরাইয়া দিলেন।

শ্রীরূপ গোস্বামী কৃত শ্রীচৈতন্যাষ্টকের প্রথম শ্লোকে আছে যে ব্রহ্মা শিব প্রভৃতি দেববৃন্দ মানবের রূপ ধারণ করিয়া প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর সর্ব্বদা উপাসনা করেন। মানবতার গৌরব এই কথায় বড়ই জোরের সহিত বিবৃত হইয়াছে।

মানুষ চিরকাল স্বর্গে দেবতাদের নিকট যাইবার জন্য কত যজ্ঞ, কত তপস্যা করিত। রাবণ রাজা মানবের এই আকাঙ্খা পূর্ণ করিবার জন্য পৃথিবী হইতে স্বর্গ পর্য্যন্ত একটা সিঁড়ি করিবার জন্য উপকরণাদি সংগ্রহও

করিতেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ শ্রীরাম লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় তাহার অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই। মানুষ এতদিন স্বর্গে যাইয়া দেবতাদের ভোগদেহ পাইবার জন্য ব্যস্ত ছিল, আর এই লীলায় দেবতারা তাঁহাদের ভোগদেহ ও সুখসুবিধার স্থান স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া মানবের কর্ম্মদেহ গ্রহণ করিয়া এই পৃথিবীতে আসিলেন। অতএব আর কে সুবিধা ভোগ করিবে? আর কে শ্রমবিমুখ হইবে? এই যে নব-সাধনা সুবুদ্ধি রায় ইহা পাইয়াছিলেন বলিয়াই কাঠ কাটিয়া দুঃখীর অন্নসংস্থান করিতেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে আর যাহা কিছু আমাদের শিখাইলেন সে সকল কথা পরে বিবেচ্য, এখন ভক্তেরা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ইঁহাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—তাহার দু একটি প্রধান বিষয় শ্রবণ করুন।

ভক্তেরা বলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই নন্দের নন্দন কৃষ্ণ। ইঁহার অঙ্গের যে কাঁচা সোণার মত রং ইহা শ্রীরাধার কান্তি। শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আজ শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে আবির্ভূত। ইনি শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মিলিতাঙ্গ। আবার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্ত ও ভগবান এতদুভয়ের সম্মিলন। এই উভয় কথার মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। এ সমস্ত কথার বিশদ আলোচনা করা হইবে।

ভক্তেরা বলেন শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের লীলা আর এই পঞ্চদশ শতাব্দীর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর এই লীলা এ দুইটি পৃথক লীলা নহে। একখানি গ্রন্থের দুইটি অধ্যায়। শ্রীকৃষ্ণলীলা আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে এই লীলায় ভক্তহৃদয় যেন কতকগুলি অভাবের দ্বারা পীড়িত হইল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলায় সেই অভাবগুলির পূরণ হইয়াছে; অর্থাৎ চৈতন্যলীলা কৃষ্ণলীলার পরিপূরক।

লীলাবাদের মধ্য দিয়া দেখিলে ব্যাপারটা এইরূপ মনে হইবে। বেদে বীজ আছে। বৃন্দাবনে সেই বীজ গাছ হইয়াছে, গাছে অমৃত ফল ধরিয়াছে। বেদে আছে "আনন্দং ব্রহ্মেতি" ইহাই বীজ—বৃক্ষ হইলেন "বৃন্দাবনে শ্রীনন্দনন্দন"। বেদে আছে—"রসোবৈসঃ" ইহাই বীজ, বৃক্ষ হইল বৃন্দাবনে রাসলীলা। বৃন্দাবনে গাছ হইল এবং গাছে ফল ধরিল। কিন্তু বৃন্দাবন—বন; সাধারণ লোকের পক্ষে একেবারে দুর্গম। বৃন্দাবন শ্রীরাধার তপস্যার স্থান।

"বৃন্দা যত্র তপস্তেপে তত্ত বৃন্দাবনং স্মৃতং"

বৃন্দা যেখানে তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই স্থানের নাম বৃন্দাবন। এই শ্লোকটি গৌতমীয় তন্ত্রের, তথা হইতে বহু বহু গোস্বামী-গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীমতী রাধিকার ষোলটি নামের মধ্যে বৃন্দা নাম একটি।

"রাধা ষোড়শ-নামস্তু বৃন্দানাম শ্রুতৌ স্মৃতম্।"

সুতরাং বৃন্দাবন—শ্রীরাধার তপস্যাক্ষেত্র। বংশীশিক্ষা নামক প্রাচীন গ্রন্থে আছে—

"বৃন্দা-শব্দে আনন্দাংশোদ্ভবা শ্রীরাধিকা।"
মহাভাবময়ী তিনি সর্ব্বরসালিকা॥
বনার্থে কহয়ে অতি রম্য গোপ্য স্থান।
যেখানেতে রাধা দেবীর সতত বিশ্রাম।"

সুতরাং বৃন্দাবন বড় গোপ্য স্থান। বৃন্দাবনের ভাব ও তত্ত্ব আমাদের একরূপ অপ্রাপ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নদীয়ার এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের লীলায় বৃন্দাবন আমাদের সাধনরাজ্যের ও যতদূর সম্ভব জ্ঞান-রাজ্যের বিষয়ীভূত হইয়াছে।

তাহা হইলে সম্পূর্ণ উদাহারণটি এই। বেদের বীজ বৃন্দাবনে বৃক্ষ হইল। বৃক্ষে অসংখ্য প্রেমফল ফলিল। কিন্তু এ যেন বড় লোকের সুরক্ষিত উদ্যান। যাহারা গরীব এ ফলে তাহাদেরই প্রয়োজন। কিন্তু বড়লোকের বাগানের মধ্যে কি ফল ফলিয়াছে গরীবেরা অনেকেই তাহা জানে না। যাহারা জানে তাহারা ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না, কারণ বড়লোকের বাগান বিশেষরূপে সুরক্ষিত। যাঁহারা আনন্দের আবেগে নানাবিধ সুখাদ্য রন্ধন করেন, তাহাদের কেবলমাত্র রন্ধন করিয়াই প্রাণের পরিতৃপ্তি হয় না, পাঁচজন লোককে ডাকিয়া আনিয়া না খাওয়ানো পর্য্যন্ত এই পরিশ্রম নিতান্ত বিফল বলিয়া মনে হয়, সেইরূপ এই বাগানের যিনি সর্ব্বস্ব ও কর্ত্তা, তিনি যেন একদিন মনে মনে ভাবিলেন আমি অনেক যত্নে সুদীর্ঘকাল পরিশ্রম করিয়া বাগান করিয়াছি ; আমার বাগানে আশানুরূপ ফলও ধরিয়াছে, কিন্তু নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যে আছে সকলে যদি এই ফল ভোজন না করিল তাহা হইলে আমার পরিশ্রম যে বিফল হইয়া গেল, এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি একদিন তাঁহার বাগানের ফল লইয়া নদীয়ার বাজারে বিপুল জনতার মধ্যে উপস্থিত হইলেন। সেখানে বিতরণ আরম্ভ হইল। কিছুদিন পরে দেখিলেন, এখনও সকলে আসিল না, তখন তিনি সাঙ্গোপাঙ্গসহ সেই ফল লইয়া

দ্বারে দ্বারে যাচিয়া যাচিয়া বিতরণের আশায় বাহিরে আসিলেন, ইহাই গৌরাঙ্গলীলা।

শ্রীকৃষ্ণলীলার সাহায্যেই শ্রীগৌরাঙ্গলীলা উপলব্ধি করিতে হইবে। এই উভয় লীলার সম্বন্ধ, কি প্রকারে আস্বাদিত হয় তাহার একটি উদাহরণ দিতেছি।

প্রথমতঃ আবির্ভাব। শ্রীকৃষ্ণ আসিলেন। মানুষ তাঁহাকে কত ডাকিয়াছে, তাঁহার জন্য কত মন্দির রচনা করিয়াছে! কিন্তু তিনি আসিলেন বর্ষার অন্ধকারময়ী রাত্রিতে, সকলে যখন নিদ্রাগত! কেহই তাঁহাকে অভ্যর্থনা করে নাই, চোখের জল দিয়াও কেহ সেই চিরদরিদ্রের চরণ ধোয়াইয়া দিবার আয়োজন করে নাই। তিনি কারাকক্ষে আসিলেন, কক্ষের দ্বার খোলাইলেন, তাঁহার উপদেশে বসুদেব তাঁহাকে কোলে করিয়া যমুনার পরপারে নন্দগোকুলের অভিমুখে চলিলেন। আমাদের নিপুণ প্রহরাগণ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া দ্বার রক্ষা করিতেছিল, কিন্তু তাহারা কেহই জাগিল না। তাঁহার চরণনখরের কিরণছটা প্রহরীগণের মস্তকে নিপতিত হইল কিন্তু তাহারা বিশ্বমনচোরকে ধরিতে পারিল না। জ্ঞানে সভ্যতায় উন্নতির শিখরারূঢ় মথুরায় তিনি আসিলেন কিন্তু সেখানে তাঁহার স্থান হইল না।

তিনি যে এই প্রকারে আসিলেন, তাহা কারাকক্ষে দেবকী বসুদেব ব্যতীত আর কেহই জানিতে পারিলেন না। যোগমায়া অন্যান্য সকলকে তখন ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়াছিলেন। সে আবার এমন ঘুম যে জাগিয়া উঠিয়া কেহ মনে করিয়া বলিতেও পারে নাই আমি ঘুমাইয়াছিলাম। মথুরা হইতে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে গেলেন, সেখান হইতে বৃন্দাবনে গেলেন। লীলা হইল। যখন লীলা হইল বাহিরের কেহ তাহা জানিল না। শেষে ক্রমে ক্রমে সে কথা প্রচার হইতে লাগিল। কেহ বুঝিলেন, কেহ বুঝিলেন না।

তাহার পর মানুষ প্রতিবৎসর জন্মাষ্টমীর দিন উপবাস করিয়া শ্রীব্যাসদেবের বর্ণিত ও শ্রীশুকদেবের কথিত এবং প্রকাণ্ড সভায় মৃত্যুকালে শ্রীমন্মহারাজ পরীক্ষিত কর্তৃক শ্রুত এই সুপবিত্র কথা শুনিতে লাগিলেন। এ বড় আনন্দের সংবাদ! কিন্তু ভগবানের করুণার দিকে চাহিলেই আনন্দ! আমাদের দিকে চাহিলে আনন্দ নাই কেবল দুঃখ! কারণ তিনি আসিলেন কিন্তু

আমরা করিলাম কি? আমরা তো জাগিয়া উঠিয়া অভ্যর্থনা করিতে পারি নাই!

এই দুঃখে পাঁচহাজার বৎসর কাটিয়া গেল। গঙ্গার দুঃখের সীমা নাই। তিনি বলেন আমি বিষ্ণুপাদোদ্ভবা, কলি-কলুষনাশিনী, পতিতপাবনী! কিন্তু নিত্যলীলা যখন প্রপঞ্চে প্রকট হইল তখন সে রূপের ছবি আমার বুকে পতিত হইল না। যমুনার কাল বুক ব্রজগোপী-ঘেরা কিশোরী কিশোরী রূপের মোহন মধুর ছবি পাইয়া, গোষ্ঠগত ব্রজেররাখালসঙ্গী "ব্রজেন্দ্র কুল দুগ্ধ-সিন্ধুর পূর্ণ ইন্দু"কে পাইয়া গর্ব্বে ফুলিয়া নাচিতে নাচিতে আমার কাছে আসিয়া প্রয়াগে সে কথা বলিয়া চলিয়া গেল। গঙ্গার বিষম দুঃখ!

এমনি করিয়া দীর্ঘ পঞ্চ সহস্র বৎসর কাটিয়া গেল! আবার তিনি আসিতেছেন! প্রেমলীলা সর্ব্বসাধারণকে আস্বাদন করাইবার জন্য সেই বৃন্দা-বিপিন-বিহারী, নবজলধরশ্যাম আজ শ্রীরাধার ভাবকান্তির পিঞ্জরের মধ্যে বদ্ধ হইয়া আসিতেছেন!

কিন্তু এবারে স্থান, মথুরার কংস-কারাগারের অন্ধকার কক্ষ নহে। এবারে নবদ্বীপ! বঙ্গের মস্তিষ্ক ও হৃদয় আজ সেখানে, সমগ্র ভারতের প্রতিভা ও সাধনা আজ সেখানে পুঞ্জীভূত হইয়াছে। যেখানে গঙ্গার ঘাটে লক্ষ ছাত্র স্নান করে, এবার সেই নবদ্বীপে আবির্ভাব। এবারে বর্ষাকালের আঁধার রাত্রি নহে। ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমার সন্ধ্যা। বঙ্গদেশে নববসন্ত সমাগমে যত তরু যত লতা নূতন পাতায় নূতন ফুলে ভরিয়া গিয়াছে। গাহিয়া গাহিয়া কোকিলের গলা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। জয়দেব, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির সাধনার মধ্য দিয়া বৃন্দাবনের বসন্তঋতু ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালা দেশেই আসিয়াছে, তাই আজ মলয়সমীরণ সুকুমার লবঙ্গলতাসংসর্গে পরম সুরভি হইয়াছে, কুঞ্জকুটির মধুকর-নিকরের ঝঙ্কার-মিশ্রিত কোকিল-কাকলীতে মুখরিত হইতেছে! ভ্রমরকুলে সমাচ্ছন্ন হওয়ায় বকুল-কলাপ নিরাকুল হইয়াছে। এই বসন্তের পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যায় বৃন্দাবনের সকল সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য আসিয়া নদীয়ায় উপস্থিত হইল। কেন্দুবিল্বের কবি অজয়ের বীচিমালার নৃত্যের মধ্যে যে উচ্ছ্বাস ঢালিয়াছিলেন, এতদিন অজয় যেন রাঢ়-দেশের নিভৃত পল্লীর মধ্যে তাহা লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, আজ পবিত্র কণ্টক-নগরীর মূল হইতে নদীয়া পর্য্যন্ত ভাগীরথীর বুকে সেই উচ্ছ্বাস বাজিয়া

"ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলন কোমল মলয়সমীরে।
মধুকর নিকরকরম্বিত কোকিল-কূজিত-কুঞ্জ-কুটিরে॥
বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে॥"

বসন্তের পূর্ণিমার সন্ধ্যায় চন্দ্রগ্রহণ! আমাদের পৃথিবীর কলঙ্কযুক্ত চাঁদ আকাশে উঠিয়াছিলেন। রাহু আসিয়া বলিল, ভাই আজ আর উঠিওনা আজ চাঁদের হাট—"সেই মন্ত্রময় সার্দ্ধ-চব্বিশ চাঁদ" আজ আসিতেছেন। সন্ধ্যায় চন্দ্রগ্রহণ! বালবৃদ্ধ যুবানারী, কেহই ঘরে নাই, হরিনামসঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে সকলে গঙ্গাস্নানে চলিয়াছেন! আজ বধির শ্রুতিশক্তি পাইয়াছে, অন্ধ চক্ষু পাইয়াছে, পঙ্গু চরণ পাইয়াছে। গঙ্গার বুকে মৃদুল মলয়ে তরঙ্গ-সমূহ জাগিয়া, কলকল ছলছলে যেন হরি হরি বলিয়া তারার ছবি বুকে লইয়া নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া চলিয়াছে, তটের চরণে আসিয়া মাথা লুটাইয়া লুটাইয়া আনন্দ-ভরা করুণ স্বরে যেন বলিতেছে, তট, তুমি কঠোর মৌন কেন? ভাঙ্গিয়া পড়, গলিয়া যাও, মিশিয়া যাও, চল আমাদের সঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে নাচিতে নাচিতে, গ্রামে গ্রামে এই আনন্দ বার্ত্তা কীর্ত্তন করিবে! এই সত্য জাগরণ।

আমরা যাহাকে জাগরণ বলি তাহা অবিদ্যায় দুঃস্বপ্ন দর্শন! হরিনামে হৃদয় যখন গলিয়া নাচিয়া উঠে, হরিনামে সকলের সঙ্গে যখন এক হইয়া যাই তখনই সত্য জাগরণ। আজ বসন্তের পূর্ণিমার সন্ধ্যায় সত্য-জাগরণের মধ্যে ভক্ত ব্রাহ্মণের গৃহে আসিয়া তিনি উপস্থিত হইলেন। জন্মাষ্টমী ও ফাল্গুনী পূর্ণিমা—মথুরা ও নবদ্বীপ। যাহা কারাকক্ষে নিভৃতে কেবলমাত্র দুই জনের জ্ঞাতসারে হইয়াছিল—আজ তাহা জগতের হইল। আজ বন ভাঙ্গিয়া দ্বীপ রচনা করা হইল। সাগরের মধ্যে এই নবদ্বীপ। উত্তালতরঙ্গময় সমুদ্রের বুকে যত জাহাজ সব ডুবিয়া গিয়াছে—এমন দুর্দ্দিনে এই নবদ্বীপ রচিত হইল! শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এই উভয়তত্ত্বের মধ্যে সম্বন্ধ এই প্রকারে অবধারণ করিতে হইবে।

আমাদের এই সোণার বাঙ্গালা দেশের শত শত ভক্ত কবি শ্রীচৈতন্যলীলার যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে এক সনাতন ও চিরনূতন হৃদয়স্পন্দন রহিয়াছে, সেই স্পন্দন আমাদের হৃদয় মধ্যে আবার জাগিয়া উঠুক, আমাদের সেই নূতন-আশা-ভরা অতীতের সঙ্গে আমাদের পারম্পর্য্যের সূত্র যেন ছিন্ন হইয়া না যায়। শ্রীচৈতন্যলীলা সম্বন্ধে কবি প্রেমানন্দের এই কথাগুলি স্মরণ করিবেন।

"এ মন গৌরাঙ্গ বিনে নাহি আর।
হেন অবতার, হবে কি হয়েছে, হেন প্রেম পরচার।
দুরমতি অতি, পতিত পাষণ্ডী, প্রাণে না মারিল কারে।
হরিনাম দিয়ে, হৃদয় শোধিল, যাচি গিয়া দ্বারে দ্বারে॥
ভববিরিঞ্চির, বাঞ্ছিত যে প্রেম, জগতে ফেলিল ঢালি।
কাঙ্গালে পাইয়ে, খাইল নাচিয়ে বাজাইয়ে করতালি॥
হাসিয়ে কাঁদিয়ে, প্রেম গড়াগড়ি, পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ।
চণ্ডালে ব্রাহ্মণে করে কোলাকুলি কবে বা ছিল এ রঙ্গ॥
ডাকিয়ে হাঁকিয়ে, খোল করতালে, গাহিয়ে ধাইয়ে ফিরে।
দেখিয়ে শমন, তরাস পাইয়ে, কপাট হানিল দ্বারে।
এ তিন ভুবন, আনন্দে ভরিল, উঠিল মঙ্গল সোর।
কহে প্রেমানন্দে, এমন গৌরাঙ্গে, রতি না জন্মিল তোর॥

শ্রীভগবানকে ঐশ্বর্য্য-নিলয় ও মহিমাময় বলিয়া লোকে জানিত, কারণ বাহির হইতেই ভগবানকে দেখা হইত। তাঁহার হৃদয়ের পরিচয় জগতের অপরিজ্ঞাত ছিল। নিখিল জগতের এই অনন্তকোটি জীব, ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যে স্বাধীন ও সবল মানবতার সঞ্চার করিয়া স্বকীয় প্রেমের খেলার চেতনাযুক্ত সঙ্গী করিবার জন্য শ্রীভগবানের হৃদয়-ব্যাকুলতা যেদিন প্রকাশিত হইল, সেদিন দেখা গেল যে ভগবান ভিখারী। শ্রীভগবানের এই ভিখারী-ভাবই শ্রীমদ্ভাগবতের কেন্দ্র ও প্রাণ। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণলীলা এই ভিখারীভাবের পূর্ণ-বিকাশ কিন্তু ইহার অভিনয় এতই গোপনে হইয়াছিল, যে এই লীলা সার্ব্বজনীন নহে।

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য লীলায় দেখিলাম, ভগবান ভিখারীর বেশে আমাদের দুয়ারে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার চোখে আর জল ধরিতেছে না, পতিতের জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে। নীরস মানবহৃদয়কে দম্ভ ও ক্ষুদ্র স্বার্থের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া প্রেমের উত্তাপে গলাইয়া সকলের সহিত মিশাইয়া দিবার জন্য তিনি পথের কাঙ্গাল হইয়া, আপনি মাতাইয়া জগৎ মাতাইতেছেন, আপনি কাঁদিয়া সকলকে কাঁদাইতেছেন, আসুন আমরাও তাঁহার পথে চলিতে শিক্ষা করি—এই পথেই আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় মঙ্গল।

ব্রহ্মচর্য্য

সংসারের মঙ্গল বা অমঙ্গল মানবের মনোবৃত্তির উপর বিন্যস্ত। মনোবৃত্তির গুণে এই মানুষ পারিজাত-কুসুম-সুরভিত স্বর্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; পক্ষান্তরে মনোবৃত্তির কলুষতায় এই মানুষ পূতিগন্ধসমাবিষ্ট—নরকের ঘৃণিত অস্পৃশ্য কীট। একদিন প্রশান্ত ও সমাহিতচেতা মহর্ষিগণ নিষ্কলঙ্ক মনোবৃত্তির পরিচালনার জন্য জগতের গভীর গবেষণাপূর্ণ ত্রৈকালিক অন্তঃস্তলতত্ত্ব পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ ং উপলব্ধি করিয়া সুদূরদর্শিতা পরিচয়ের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন, তাই আজ এই ঘোর তামসাচ্ছন্ন প্রবঞ্চনাপূর্ণ কলিযুগেও তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত জ্ঞানে শিরোধার্য্য করিয়া সন্দিহান ক্ষুদ্রাশয় মাদৃশ ব্যক্তিও অবনত-শিরে ও ভক্তিভরে দূর হইতে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতে বাধ্য হইয়াছে। চৈতন্য, যিশু, অশোক, বুদ্ধ, মহম্মদ প্রভৃতি পূজনীয় মহাপুরুষগণ যেই এক-সময় নিঃস্বার্থভাবে সার্ব্বজনীন সর্ব্বপ্রীতিবহ সৎকার্য্যের সমাবেশে বিভোর হইয়া অনন্যোপম স্ব স্ব চিত্তবৃত্তির স্বচ্ছতা দার্শনিকগণের হৃদয়দর্পণে প্রতি-বিম্বিত করিতে পারিয়াছিলেন, তাই আজ তাঁহাদিগকে সসম্মানে দেবতার চতুর্দ্দোলে বসাইয়া মানব অর্ঘ্যপুষ্পাঞ্জলি হস্তে উপাসনা করিবার জন্য ধ্যান-স্তিমিত নয়নে সেই রূপ হৃদয়াসনে বসাইয়া আত্মা চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করিতেছে। পক্ষান্তরে যাহাদিগের মনোবৃত্তি কলুষতাপূরিত, প্রবঞ্চনায়, প্রতারণায়, যাহারা সিদ্ধহস্ত, দয়াদাক্ষিণ্য ইন্দ্রিয় সংযমাদির পরিবর্ত্তে পরদার-সেবা, পরপীড়ন, পরদ্রব্যহরণ প্রভৃতির অনুষ্ঠানে যাহারা কামক্রোধ লোভাদি ষড়রিপুগণকে নিরন্তর পোষণ ও প্রশ্রয় দিতেছেন সেই জঘন্য অমানুষপ্রকৃতির কে অনুসরণ করিয়া থাকে? কে তাদৃশ নারকীয় পুরুষের ছায়াস্পর্শ করিয়া আত্মাকে অপবিত্র করিতে বাঞ্ছা করে? তবেই মানবের দেবত্ব বা দানবত্ব সংসারের মঙ্গল বা অমঙ্গল সকলই মনের বৃত্তির দ্বারা জগতে পরিচিত।

এখানে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল, বহির্জগতে পরিদৃশ্যমান সংগ্রাম ও বিপ্লবের ন্যায় আমাদের অন্তর্জগতেও তুমুল সংগ্রাম ও বিপ্লব আছে। আবার বাহ্য জগতে যেমন পরিলক্ষিত হয়, অসত্য সত্যকে, অধর্ম্ম ধর্ম্মকে, দানব দেবতাকে পরাস্ত করিয়া তাহার স্বায়ত্ত ভূমিতে কিছুদিন আধিপত্য স্থাপন করে, অবশেষে আবার সত্য, ধর্ম্ম ও দেবতারই জয় হয়, "যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ" এই মহাবাক্যই অবশেষে সুরক্ষিত হয়, অন্তর্জগতের অবস্থাও

এতদনুরূপ। ঐ যে পুরাণ-বর্ণিত বাহ্য জগতে দেবদানবের ঘোর যুদ্ধ পরিলক্ষিত হইয়াছে, যাহার বিস্তীর্ণ বর্ণনায় দুর্দ্দম দানবদল দোর্দ্দণ্ডপ্রভাবে দেবগণকে দণ্ডদান পূর্ব্বক সিংহাসন বিচ্যুত করিয়া তাহা স্বয়ং অধিকার করিয়াছেন, ঐ যে দেখিতেছেন হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু রাবণ কুম্ভকর্ণ শিশুপাল দন্তবক্র প্রভৃতি দৈত্যগণের প্রবল তাড়নায় সুরপতি সগণে নন্দনকানন পরিহার-পূর্ব্বক দূর হইতে সুদূর দেশান্তর পলায়ন করিয়াছেন, ঐ যে দেখিতেছেন মহিষাসুর রক্তবীজ, নিশুম্ভ শুম্ভ প্রভৃতি দৈত্যগণ অমরাবতী অধিকার করিয়া হাস্যবদনে ইন্দ্রাদি দিগীশবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া উপহাস করিয়াছে, আবার ঐ দেখুন তাহারাই পুনঃ মহাশক্তিকে পর্য্যন্ত তাড়িত ও জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছে, কিন্তু ঐ দিন চিরদিন থাকে নাই, আবার এরূপ একদিন আসিয়াছিল, যেদিন দেবগণের চেষ্টায় ঐশশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া মহাভয়ঙ্করী নরসিংহ মূর্ত্তি দেখাইয়া বিশাল-নখে ঐ হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থল বিদারণ পূর্ব্বক ত্রিজগৎ চমকিত ও প্রশান্ত করিয়াছিলেন। আবার এরূপ একদিন আসিয়াছিল যে দিন ভগবান্

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥

এই স্ববাক্য সংরক্ষণার্থ দাশরথিরূপে অবতীর্ণ হইয়া রাবণ কুম্ভকর্ণের সেই বিশাল স্বর্গপুরীবিনিন্দিত স্বর্ণপুরী ছারখার করিয়াছিলেন। আবার এমন দিন আসিয়াছিল যেদিন সুদর্শন চক্রের প্রখর ধারায় শিশুপাল দন্তবক্রের মুণ্ড বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, আবার একদিন দেবগণের

"যাদেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা"

এই প্রার্থনায় মহামায়া সিংহবাহিনী মহিষমর্দ্দিনী রূপে দৈত্যগণের প্রতি "গর্জ্জ গর্জ্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহং" বলিয়া দেবগণের প্রতি "মাভৈ মাভৈ বৎস" এই বাণী বর্ষণ করিয়াছিলেন। আবার একদিন "তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিরোভব" বলিয়া সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিনী সর্ব্বমঙ্গলা মহাশক্তি, মহাশক্তি-শেল তাড়নায় দৈত্যরাজকে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। আবার অমরাবতী হাসিয়াছিলেন, আবার ইন্দ্রানীর সহিত ইন্দ্র প্রস্ফুটিত কুসুমরাজিবিরাজিত নন্দনকাননে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, আবার জগতে মহাশান্তির সুশীতল ছায়ায় জীব নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা গিয়াছিল! সুতরাং দেবদানবের যুদ্ধে

প্রথমে দানবের জয় হইলেও তাহা চিরস্থায়ী হয় নাই, শেষে দেবগণই বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়া জগৎবাসীকে সঙ্কেত করিয়াছেন

"যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ"

একবার অন্তর্জ্জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখুন, পরিলক্ষিত হইবে সেখানেও এইরূপ দেবদানবেরর যুদ্ধ আছে, সেখানেও সত্যের জয় আছে, অসত্যের পরাজয় আছে, সেখানেও ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রকাণ্ড বিপ্লব ঘটিতেছে। যে ভারতসংসারে শম, দম, সত্য, অস্তেয়, প্রভৃতি দেবগণ মনোরাজ্যের অধীশ্বর হইয়া রাজ্যকে একদিন স্বর্গে পরিণত করিয়াছিল, যে ভারতসংসারে সংযম-বিবেকাদি বিবুধগণ "সস্ত্রীকোধর্ম্মমাচরেৎ" বিধিবাক্যের অধীন হইয়া সুনীতি সুবৃত্তি অহিংসা প্রভৃতি স্ব স্ব মনোরমা পত্নী সমভিব্যাহারে শুভ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া রাজ্যের ঘরে ঘরে মঙ্গল বিধান করিয়াছেন, যে রাজ্য একদিন সুগন্ধি ধূপ-ধূমে আমোদিত ছিল, যে রাজ্য একদিন জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকমালায় আলোকিত ছিল, যে ভারতীয় মনোরাজ্য একদিন সূক্ষ্মতায় অননুভবনীয় অথচ অনন্ত বিশালতাময় বিশ্বময়ের অবিধ্বংসিসুখাস্পদ বৈকুণ্ঠধামে আপনাকে মিশাইয়া আত্মহারা হইতে পারিত আর সেই ভাবের আবেশে 'তরতি শোকমাত্মবিৎ ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মৈবভবতীতি" অদ্বৈতবাদ সিদ্ধ করিতে পারিয়াছিল এখন আমাদের আর সে দিন নাই। এখন আমরা সুনীতির পরিবর্ত্তে সুরুচির অধীনতা স্বীকার করিয়া তাহার কথায়, তাহার প্ররোচনায় বিশ্বাস করিয়া, তাহার মোহে বিমোহিত ও তাহার অচিরপ্রভ সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ধ্রুবকে ঘোরবনে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ঘরে ঘরে উত্তানপাদ রাজা সাজিয়াছি। রাজসিংহাসন কামক্রোধাদি দৈত্যগণ অধিকার করিয়াছে; হিংসা, আসক্তি, কুবৃত্তি প্রভৃতি দানবীগণসহায়িত দানবদল আমাদিগের মনোরাজ্যের অধীশ্বর হইয়া পবিত্র রাজ্যকে পাপপঙ্কে নিমগ্ন করিয়া তুলিয়াছে নন্দনকানন উন্মূলিত ও পারিজাত উৎপাটিত হইয়াছে। রাজ্যেশ্বর শমদমাদিদেব-গণ দূরদেশান্তরে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, আলোকময় রাজ্য অন্ধতমসাচ্ছন্ন হইয়াছে, পাপের প্রলয়স্রোতে দেশ ভাসিয়াছে; তাই আমরা আজ শোক-মোহে আচ্ছন্ন, তাই ত্রিতাপ-তাপিত সংসার হাহাকারে পরিণত হইয়া শ্মশান চিত্রে চিত্রিত হইয়াছে।

ঐ যে ধূলিধূসরিতকায়া জননী, যিনি শৃগালী কুক্করীর ন্যায় বৎসরে বৎসরে সন্তান প্রসব করিয়া আবার একে একে সেইগুলি কালের করাল

কবলে তুলিয়া দিয়া আর্ত্তনাদে দিগন্ত কাঁপাইতেছেন, ঐ যে পিতা মাসিক সামান্য উপার্জ্জনে বহুসন্তানের মুখের আহার্য্য সংগ্রহে অক্ষম হইয়া ম্লান বদনে ছিন্নবস্ত্রে কোনরূপে অঙ্গ আবৃত করিয়া উদরান্নসংস্থানের জন্য ছুটাছুটী করিতেছেন, আবার রুগ্ন সন্তানের শিয়রে বসিয়া রোগ-পরিচর্য্যায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া অবশেষে শেষ জীবন পর্য্যন্ত নিঃসন্তান অবস্থায় পৈতৃক বাস-ভূমি মরুভূমিতে পর্য্যবসিত করিতেছেন, ঐ যে কন্যা বালবিধবা হইয়া হবিষ্যান্ন ভোজন ভূমিশয্যা দেবার্চ্চনা প্রভৃতি সৎকার্য্যের পরিবর্ত্তে তাম্বুল-রাগে অধর রঞ্জিত ও কুঞ্চিত কেশদাম তৈলচিক্কণ করিয়া দেবীর পরিবর্ত্তে পিশাচী সাজিয়া ভ্রূণ-হত্যার পাপ-প্রবাহে দেশ প্লাবিত করিতেছে, ঐ যে পুত্র ষোড়শ বর্ষে পুত্রের পিতা হইয়া স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য অর্থাকাঙ্ক্ষায় দাসত্ব শৃঙ্খলে হস্ত পদ গলদেশে আবদ্ধ হইয়া তোষামোদ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, ইহার কারণ কি ? কারণ ! আমাদিগের মনোরাজ্য দানবাধিকৃত, যাহার বলে আমরা কামাদি দৈত্যদল বিদলিত করিয়া শম দমাদি দেবগণকে রাজ্যাধিষ্ঠিত করিতে পারিব, সেই মহাশক্তির আরাধনা আমাদিগের নাই। আবার যদি ব্রহ্মার স্তবে মহামায়া আবির্ভূত হয়েন, আবার যদি মহাবিষ্ণু বীতনিদ্র হইয়া কামাদি দৈত্যগণকে বিধ্বস্ত করেন তবেই আবার আমাদিগের মনোরাজ্য দেবরাজ্যে পরিণত হইবে। এই মহাবিষ্ণুই আমার বর্ণনীয়

ব্রহ্মচর্য্য।

যে দিন হইতে ভারতবর্ষ ব্রহ্মচর্য্য হারাইয়াছে, নিবৃত্তিনিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তে যে দিন ভারতীয় আর্য্য সংসার ঘোরপ্রবৃত্তির দাস হইয়াছে সেই দিন হইতেই এই পবিত্র সংসারে রোগ শোক পরিতাপ ব্যসনাদি উপস্থিত হইয়া সংসার উৎসন্ন হইতে বসিয়াছে। সেই দিন হইতেই অকাল মৃত্যু অকাল জরা প্রভৃতি আকালিক উৎপাত উপস্থিত হইয়া সংসার ছারখার করিয়া তুলিয়াছে। সংসারকে রোগ শোকাদির হাত হইতে পরিত্রাণ করিতে হইলে, সংসারকে মঙ্গলময় করিতে হইলে আমাদের ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা আবশ্যক। ব্রহ্মার ন্যায় সদ্‌গুরুর অনুকম্পায় যদি আবার ব্রহ্মচর্য্যরূপ মহাবিষ্ণু জাগরিত হইয়া উঠেন তবেই আবার সংসার সুখের ভূমি হইবে।

যে ব্রহ্মচর্য্য সমস্ত সংসারের শুভানুধ্যায়ী, গৃহস্থমাত্রের মঙ্গল যাহার উপর বিন্যস্ত, বলা বাহুল্য সমস্ত বর্ণ ও বর্ণান্তরাল জাতি সে ব্রহ্মচর্য্যের

অধিকারী। সেই ব্রহ্মচর্য্যের ব্যাখ্যানাবসরে প্রথমেই বলা আবশ্যক, বর্ণনীয় ব্রহ্মচর্য্য দুই ভাগে বিভক্ত অসাধারণ ও সাধারণ, এই অসাধারণ ব্রহ্মচর্য্যই মুখ্য ব্রহ্মচর্য্য। ইহা আবার দুই ভাগে বিভক্ত—নৈষ্ঠিক ও উপকুর্ব্বাণ এবং সাধারণ ব্রহ্মচর্য্য গৌণ ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া অভিহিত। দ্বিজাতিগণ মুখ্য ব্রহ্মচর্য্যের অধিকারী। গৌণ ব্রহ্মচর্য্যে সর্ব্ব সাধারণের অধিকার।

যে শব্দের যেটি মুখ্য অর্থ তাহার অংশবিশেষাত্মক গুণ গ্রহণ করিয়া যে তাদৃশ শব্দ ব্যবহার হয়, সেইরূপ ব্যবহারকে কোন কোন মতে গৌণ ব্যবহার বলে। যেমন সর্ষপাদি তৈলে যে তৈল শব্দের ব্যবহার আছে উহা গৌণ ব্যবহার, কেননা তৈল শব্দের যোগার্থ গ্রহণ করিলে তিল হইতে যে স্নেহ পদার্থ নির্গত হয় তাহাকেই বুঝায়, সুতরাং তৈল শব্দের বাচ্য বা মুখ্যার্থ তিলের অন্তর্গত স্নেহপদার্থ। সর্ষপাদিতে যে তৈল শব্দের ব্যবহার হইতেছে তাহা মুখ্যার্থ নহে। কিন্তু 'তিলভবস্নেহ' এই শব্দের স্নেহ অংশ মাত্র গ্রহণ করিয়া সর্ষপাদিতেও তৈল শব্দ গৌণরূপে ব্যবহৃত হইতেছে এবং যেমন চান্দ্র সৌর সাবন প্রভৃতি নানা মাসের নানা কার্য্যে ব্যবহার আছে, সবগুলিই তাহার বাচ্যার্থ নহে একটি মুখ্য অপরগুলি গৌণ। ব্যাখ্যাকারেরা বলেন মাস বলিলে চান্দ্র মাসকেই বুঝায়, কেননা মাস্ শব্দের অর্থ চন্দ্র, সেই চন্দ্রের বৃদ্ধি ক্ষয় দ্বারা যে ত্রিশটি তিথি ঘটিত হয় সেই শুক্ল কৃষ্ণ পক্ষীয় ত্রিংশৎ তিথিই মাস শব্দের মুখ্যার্থ। কিন্তু ঐ ত্রিশ সংখ্যারূপ গুণ গ্রহণ করিয়া ত্রিশ সূর্য্যোদয় ত্রিশ নক্ষত্রোদয় দ্বারা সাবনাদিতে যে মাস পদ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা গৌণ ব্যবহার বলিতে হইবে। সেইরূপ ব্রহ্মচর্য্য শব্দের যে মুখ্যার্থ তাহা ধরিলে দ্বিজাতিগণই তাহার অধিকারী। কিন্তু ঐ ব্রহ্মচর্য্যের এমন কতকগুলি নিয়ম আছে যাহাতে সর্ব্ব সাধারণ অধিকারী হইতে পারে। সেই সকল নিয়ম আদান পূর্ব্বক যে ব্রহ্মচর্য্য শব্দের ব্যবহার আছে তাহাকে গৌণ ব্রহ্মচর্য্য বলা যায়। যেমন বিধবার ব্রহ্মচর্য্য গৌণ ব্রহ্মচর্য্য, কার্ত্তিক মাঘ ও বৈশাখ মাসে হবিষ্য ও ব্রহ্মচর্য্য করিবে এইরূপ শাস্ত্রে ব্রহ্মচর্য্য শব্দের ব্যবহার গৌণ ব্যবহার বলিতে হইবে।

ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোতণং বা বিষ্ণুবচনং
তুলামকরমেষেষু প্রাতঃস্নানং বিধীয়তে
হবিষ্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ মহাপাতক নাশনং—পদ্মপুরাণ

এখন ব্রহ্মচর্য্য কাহাকে বলে। মনীষিগণ যেমন দিবারাত্রিকে বিভাগ

করিয়া বিভক্ত কালাংশে উষঃশয্যাত্যাগ, প্রাতঃস্নান, পুষ্পচয়ন, বেদপাঠ, দেবার্চ্চনা, অতিথিসৎকার, পুরাণপ্রসঙ্গ প্রভৃতি কর্ত্তব্যকার্য্যকলাপের অনুষ্ঠান করা আদেশ করিয়াছেন, সেইরূপ আর্য্যজ্যোতিঃসম্পন্ন মহাপুরুষগণ সুদীর্ঘ জীবনকাল বিভাগ করিয়া বর্ণভেদে কতকগুলি এরূপ আশ্রম ও তদুচিত নিয়মের বিধান করিয়াছেন, যে নিয়মের বশবর্ত্তিতায় জীবন অতিবাহিত করিলে জীবন পরিপুষ্ট ও পরিপূর্ণ হয়। তাহার প্রাথমিক আশ্রমই ব্রহ্মচর্য্য। মহর্ষিগণের নির্দ্দেশ, আশ্রম চতুর্ব্বিধ—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ্য বা সন্ন্যাস। পরাশর ভাষ্যে বামন পুরাণ বলিয়াছেন।

চত্বার আশ্রমাশ্চৈব ব্রাহ্মণস্য প্রকীর্ত্তিতাঃ
গার্হস্থ্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ বানপ্রস্থং ত্রয়োমতাঃ।
ক্ষত্রিয়স্যাপি কথিতা আশ্রমাস্ত্রয় এবহি
ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ গার্হস্থ্যং আশ্রমদ্বিতয়ং বিশঃ
গার্হস্থ্যমুচিতস্ত্বেকং শূদ্রস্যক্ষণমাচরেৎ॥

ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চতুর্ব্বিধ আশ্রমের অধিকারী, ক্ষত্রিয় সন্ন্যাস ব্যতীত প্রথম তিনটী আশ্রমের অধিকারী, বৈশ্য প্রথম দুইটির অধিকারী, শূদ্রের কেবল গার্হস্থ্য, অন্য আশ্রম নাই। এই নিয়ম কলিযুগে ব্যবহৃত হইয়াছে। কেননা প্রমাণ আছে যুগান্তরে ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরও সন্ন্যাস-ধর্ম্ম ছিল।

ব্রহ্মচর্য্য, শব্দের অর্থ আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্রে হরদত্ত বলিয়াছেন, ব্রহ্মবেদ স্তদর্থং ব্রতং চরতীতি ব্রহ্মচারী তস্য ভাবঃ ব্রহ্মচর্য্যং, বেদ শিক্ষার উপযুক্ত নির্দ্দিষ্ট নিয়ম প্রতিপালন করাকে ব্রহ্মচর্য্য বলে। এই ব্রহ্মচর্য্যে দ্বিজাতি ভিন্ন শূদ্রের অধিকার নাই কেননা আপস্তম্বই বলিয়াছেন

উপেতস্যাচার্য্যকুলে ব্রহ্মচারিবাসঃ।

উপনীত হইয়া ব্রহ্মচারী আচার্য্য-গৃহে বাস করিবেন। দ্বিজাতিগণ ব্রহ্ম-চর্য্যের তাবৎ নিয়মের অধিকারী থাকিলেও ব্রহ্মচর্য্যের মধ্যে এরূপ নিয়ম কতকগুলি আছে, যাহাতে বর্ণনির্ব্বিশেষে সকলগৃহস্থই অধিকারী। সেই সকল নিয়মের বশবর্ত্তিতায় গৃহস্থমাত্রের গার্হস্থ্য আশ্রম পবিত্র ও মঙ্গলময় হইয়া থাকে। আশ্রমের ক্রমনির্দ্দেশে প্রতীতি হয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব আশ্রম পরবর্ত্তী আশ্রমের উপযোগী যেমন ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্যআশ্রমের মূলভিত্তি। ব্রহ্মচর্য্য, আশ্রম সমূহের গুরু।

আমি পূর্ব্বেই যে মুখ্য ব্রহ্মচর্য্যের অর্থাৎ অসাধারণ ব্রহ্মচর্য্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছি, তাহাতে যে নিয়মাবলী নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে তাহাতে দ্বিজাতিমাত্রগণ অধিকারী, বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্রে বলিয়াছেন।

অষ্টাচত্বারিংশদ্বর্ষাণি পৌরাণং বেদব্রহ্মচর্য্যং।

উপনীত দ্বিজাতিগণ বেদাধ্যয়ন ও বেদের অর্থ বোধের জন্য অষ্টচত্বারিংশদ্বর্ষ-ব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য করিবেন। পৌরাণং অর্থাৎ প্রাচীন মনুপ্রভৃতি ঋষিগণ ঐ রূপ ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

চতুর্ব্বিংশতিং দ্বাদশ বা প্রতিবেদং।
সম্বৎসরাবমং বা প্রতিকাণ্ডং।
গ্রহণান্তং বা।

এই দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্যের অধিকারী সকল সময়ে পুরুষ সাধারণ হইতে পারিবেন না, এজন্য বৌধায়নই কালের পরিমানান্তর নির্দ্দেশ করিতেছেন। প্রত্যেক বেদে চতুর্ব্বিংশতি বৎসর অশক্ত হইলে দ্বাদশ বৎসর তাহাতেও অশক্ত পুরুষ প্রতিকাণ্ডে সম্বৎসর ক্ষেপণ করিবেন তাহাতেও অসমর্থ পুরুষ যে কোন বেদ পাঠ ও তদর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক গার্হস্থ্য ধর্ম্মে অধিকারী হইবেন। মনু বলিয়াছেন,

ষট্ত্রিংশদাব্দিকং চর্য্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতং।
তদর্দ্ধিকং পাদিকংবা গ্রহণান্তিকমেব বা॥
বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপিযথা ক্রমং।
অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থাশ্রম মাবিশেৎ॥

ঋক্ যজুঃ ও সাম ত্রিবেদী, এই বেদত্রয়ের অধ্যয়নরূপ ব্রতকে ত্রৈবেদিক ব্রত কহে। ব্রহ্মচারী গুরুকুলে বাস করত ষট্ত্রিংশৎ বর্ষ ব্যাপিয়া ঋক্ যজুঃ ও সাম এই ত্রৈবেদিক ব্রতাচরণ করিবেন অর্থাৎ প্রত্যেক বেদশাখা দ্বাদশ দ্বাদশ বৎসর ব্যাপিয়া অধ্যয়ন করিবেন, অথবা অষ্টাদশ বর্ষ ব্যাপিয়া উক্ত ব্রতাচরণ করিবেন অর্থাৎ প্রত্যেক বেদ শাখা ছয় ছয় বৎসর অধ্যয়ন করিবেন কিম্বা নয় বৎসর পর্য্যন্ত বেদত্রয় অধ্যয়ন করিবেন অর্থাৎ প্রত্যেক বেদ শাখা তিন তিন বৎসর ব্যাপিয়া অধ্যয়ন করিবেন অথবা যাবৎ পরিমিত কালে ঐ বেদত্রয় অধ্যয়ন করিতে পারেন তত কাল গুরু গৃহে অবস্থিতি করিয়া অধ্যয়ন করিবেন।

জানা উচিত যে যদ্যপি ছান্দোগ্য উপনিষদে অথর্ব্ব বেদের উল্লেখ করিয়াছে যথা ঋগ্বেদং যজুর্ব্বেদং সামবেদ মথর্ব্বাণং চতুর্থমিতি, বিষ্ণুপুরাণাদি ও

বলিয়াছেন অঙ্গানিবেদাশ্চত্বার ইতি তথাপি যজ্ঞ মাত্র ঋক্‌ যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয় সম্পাদ্য বলিয়া মহর্ষিমনু ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত-বিধিতে ত্রিবেদীমাত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। এবং তিনি অথর্ব্ববেদ ব্রতচর্য্যা নিষেধও করেন নাই, এজন্য অন্যস্মৃতিতে বেদমাত্রে ব্রতশ্রবণ অভিহিত হইয়াছে। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন

প্রতিবেদং ব্রহ্মচর্য্যং দ্বাদশাব্দানিপঞ্চবা।

বৌধায়ন বলিয়াছেন, চতুর্ব্বিংশতিং দ্বাদশ বা প্রতিবেদং ইত্যাদি। এখানে প্রতিবেদ শব্দের নির্দ্দেশ থাকায় চতুর্ব্বেদাধ্যয়ন রূপ ব্রতই ব্রহ্মচারীর অনুষ্ঠেয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় শ্লোকে মনু বলিয়াছেন, স্নাতক ব্রহ্মচারী স্বধর্ম্মের ব্যাঘাত না করিয়া যথাক্রমে স্বীয় বেদশাখা অধ্যয়ন পূর্ব্বক স্ববেদাতিরিক্ত বেদশাখাত্রয় বা বেদশাখাদ্বয় অথবা একমাত্র বেদশাখা অধ্যয়ন করিয়া কৃতদার হইয়া গৃহস্থাশ্রমে বসতি করিবেন। কোনও ব্যাখ্যাতা বলেন প্রত্যেক বেদ হইতে বেদশাখাত্রয় অথবা বেদশাখাদ্বয় অথবা একমাত্র শাখা অধ্যয়ন কর্ত্তব্য একটিমাত্র বেদ হইতে নহে। স্নাতক তিন প্রকার, বিদ্যাস্নাতক ব্রতস্নাতক ও বিদ্যাব্রতস্নাতক। যিনি ব্রত সমাপন না করিয়া বেদ সমাপনপূর্ব্বক সমাবৃত্ত হয়েন তাঁহাকে বিদ্যাস্নাতক, যিনি বেদ সমাপন না করিয়া ব্রত সমাপন করিয়া সমাবৃত্ত হয়েন তাঁহাকে ব্রতস্নাতক, আর যিনি বিদ্যা ও ব্রত উভয় সমাপন করিয়া সমাবৃত্ত হয়েন তাঁহাকে বিদ্যা-ব্রতস্নাতক বলা যায়। এই ব্রহ্মচারী দ্বিবিধ উপকুর্ব্বাণ ও নৈষ্ঠিক। যাঁহারা গুরু কর্ত্তৃক অনুমত হইয়া সমাবর্ত্তন স্নানপূর্ব্বক দক্ষিণাদান বিধানে গুরুর উপকার সাধন করেন তাঁহাদিগকে উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী বলা যায়। পক্ষান্তরে যাঁহারা চিরজীবন গুরুশুশ্রূষায় রত থাকিয়া সেই ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত-বিধির আচরণীয় নিয়মাবলীর আচরণে সমাহিত হইয়া সিদ্ধি বা চরিতার্থতা লাভ করেন তাঁহা-রাই নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারী বলিয়া অভিহিত। নিষ্ঠা শব্দের সমাপ্তি অর্থ, শরীর-পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বিত হইলে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলা যায়। মহর্ষিমনুই প্রমাণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আসমাপ্তেঃ শরীরস্য যস্তু শুশ্রূষতে গুরুং।
স গচ্ছত্যঞ্জসা বিপ্রো ব্রাহ্মণঃ সদ্মশাশ্বতং॥

যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য যাবজ্জীবন গুরুর শুশ্রূষা করেন তিনি অবিনাশি ব্রহ্মধাম প্রাপ্ত হয়েন। বেদাধ্যয়ন ব্যতীত আরও কতকগুলি বিশেষ নিয়ম

নিয়ন্ত্রিত আছে, যাহা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ব্রহ্মচারীর প্রতিপাল্য, যেমন অজিন ধারণ মেখলা ধারণ দণ্ডধারণ কমণ্ডলু ধারণ ভিক্ষাচরণ অগ্নিতে সায়ং ও প্রাতঃ কালে সমিৎপ্রক্ষেপ মধুমাংসবর্জ্জন সন্ধ্যাউপাসনা প্রভৃতি, এগুলি অসাধারণ ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম, এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মচর্য্য প্রকরণে সাধারণ ভাবে সাধারণের জন্য মনু বলিয়াছেন,

ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষপহারিষু ।
সংযমেযত্নমাতিষ্ঠেৎ বিদ্বান্ যন্তেব বাজিনাং ॥
ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষমৃচ্ছত্য সংশয়ং ।
সংনিয়ম্যতু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং নিয়চ্ছতি ।

যেমন সারথি রথে নিয়োজিত অশ্বসমূহের নিয়মনে যত্নবান হয়েন, সেইরূপ জ্ঞানী মনুষ্যেরা চিত্তাকর্ষণকারী বিষয়সমূহে ভ্রাম্যমান ইন্দ্রিয়গণের সংযমনের জন্য যত্নবিধান করিবেন। ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ে একান্ত আশক্তি হওয়াতেই জীবের কেবল দৃষ্ট ও অদৃষ্ট দোষ প্রাপ্ত হয় সন্দেহ নাই, অতএব ইন্দ্রিয়দিগকে নিগ্রহ করিতে পারিলেই মানুষ অনায়াসে ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ প্রাপ্ত হইতে পারেন। অসাধারণ ব্রহ্মচর্য্য নৈষ্ঠিক ও উপকুর্ব্বাণ ভেদে ও অধিকারিভেদে নিয়ন্ত্রিত হইলেও যাহা গৌণ ব্রহ্মচর্য্য বা সাধারণ ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে বর্ণবিচার নাই। স্ত্রী-পুরুষ বিচার নাই, স্ত্রী-পুরুষ ও সকল বর্ণ তাহাতে অধিকারী, শাস্ত্রকার-গণ অবস্থাভেদে কার্য্যভেদে ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে তাদৃশ ব্রহ্মচর্য্যের উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন বিষ্ণুসংহিতা বলিয়াছেন

মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদবারোহণং বা।
ব্রহ্মচর্য্যং মৈথুনবর্জ্জনং তাম্বুলবর্জ্জনঞ্চ

স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিবেন অথবা সহানুগমন করিবেন। এখানে ব্রহ্মচর্য্য শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়সংযম তাম্বুলাদি বর্জ্জন। প্রচেতা বলিয়াছেন,

তাম্বুলাভ্যঞ্জনঞ্চৈব কাংস্যপাত্রে চ ভোজনং।
যতিশ্চ ব্রহ্মচারী ■ বিধবা চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥
একাহারঃ সদাকার্য্যো ন দ্বিতীয়ঃ কদাচন।
পর্য্যঙ্কশায়িনী নারী বিধবা পাতয়েৎ পতিং ॥
বৈশাখে কার্ত্তিকে মাঘে বিশেষনিয়মং চরেৎ।
স্নানং দানং তীর্থ-যাত্রাং বিষ্ণোর্নামগ্রহং মুহুঃ ॥

সুতরাং এখানে ব্রহ্মচর্য্য গৌণ ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ মুখ্যব্রহ্মচর্য্যের নিয়মাবলীর

মধ্যে ইন্দ্রিয়সংযমাদি সাধারণ নিয়মের বশবর্ত্তিতায় অবস্থিতি করাই এখানে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন করা বুঝিতে হইবে। শ্রাদ্ধ-প্রকরণে শ্রাদ্ধকর্ত্তা শ্রাদ্ধপূর্ব্ব-দিনে শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণবর্গ নিমন্ত্রণকালে তাঁহাদিগকে নিয়ম শ্রবণ করাইবেন

অক্রোধনৈঃ শৌচপরৈঃ সততং ব্রহ্মচারিভিঃ।
ভবিতব্যং ভবাদ্ভিশ্চ মযাত্র শ্রাদ্ধ কর্ম্মণি ॥

অর্থাৎ আগামী কল্য আমার অনুষ্ঠেয় শ্রাদ্ধ কার্য্যে আপনারা ক্রোধাদি বর্জ্জিত শৌচপরতন্ত্র ও ব্রহ্মচারী হইয়া থাকিবেন।

একাদশী-ব্রতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণ-চতুষ্টয়েরই অধিকার আছে তাহার ইতিকর্ত্তব্যতায় পদ্মপুরাণ বলিয়াছেন।

অভুক্‌ত্বা প্রাতরাহারং স্নাত্বাচম্য সমাহিতঃ।
সূর্য্যাদি দেবতাভ্যশ্চ নিবেদ্য ব্রতমাচরেৎ ॥
ব্রহ্মচর্য্যং তথা সত্যং শৌচমামিষ বর্জ্জনং।
ব্রতেম্বেতানি চত্বারি বরিষ্ঠানীতি নিশ্চয়ঃ ॥

অর্থাৎ ব্রতমাত্রের অনুষ্ঠানে পূর্ব্বদিনে যে সংযম বিধি অভিহিত আছে তাহাতে বলিয়াছেন, পূর্ব্বদিনে একাহার পূর্ব্বক স্নাত আচান্ত ও সমাহিত-চিত্ত হইয়া সূর্য্যাদি দেবগণকে নিবেদন পূর্ব্বক ব্রত আচরণ করিতে এবং ব্রত মাত্রে সত্য শৌচ আমিষ বর্জ্জন ও ব্রহ্মচর্য্য এই চতুষ্টয় সকলের পালনীয়। এইরূপ যে যে স্থানে বর্ণ নির্ব্বিশেষে স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে যে ব্রহ্মচর্য্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা গৌণ ব্রহ্মচর্য্য বা সাধারণ ব্রহ্মচর্য্য। তবেই দ্বিজাতিগণ অসাধারণ ব্রহ্মচর্য্যের ইতিকর্ত্তব্যতা বিশেষে অধিকারী হইলেও সাধারণ ব্রহ্মচর্য্যে অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যের সাধারণ নিয়ম ইন্দ্রিয় সংযমাদি চিত্তোৎ-কর্ষক নিয়মে সকলেই তুল্যাধিকারী বুঝিতে হইবে। এখানে আরও একটী কথা বলিয়া রাখা ভাল। মনু বলিয়াছেন,

শ্রোত্রং ত্বক্ চক্ষুষী জিহ্বা নাসিকা চৈব পঞ্চমী।
পায়ূপস্থং হস্তপাদং বাক্‌চৈব দশমী স্মৃতা ॥
বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈষাং শ্রোত্রাদীন্যনু পূর্ব্বশঃ।
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈষাং পায্বাদীনি প্রচক্ষতে ॥
একাদশং মনোজ্ঞেয়ং স্বগুণেনোভয়াত্মকং।
যস্মিন্ জিতেজিতাবেতৌ ভবতঃ পঞ্চকৌগণৌ ॥

অর্থাৎ কর্ণ ত্বক্ চক্ষু জিহ্বা ও নাসিকা এই পাঁচ ও পায়ু, উপস্থ হস্তপদ বাক্য

এই পাঁচ, উভয়ে দশ ইন্দ্রিয়। ইহার মধ্যে আনুপূর্ব্বিক্রমে শ্রোত্রাদি পাঁচকে বুদ্ধীন্দ্রিয় ও পায়ু প্রভৃতি পাঁচকে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলা যায়। অন্তরিন্দ্রিয় মনকে লইয়া ইন্দ্রিয়ের একাদশ সংখ্যা পূর্ণ হয়। মন সংকল্প সহকারে বুদ্ধীন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় উভয়ের প্রবর্ত্তক অতএব মনকে জয় করিতে পারিলে প্রোক্ত দশ ইন্দ্রিয়কেই জয় করা হয়। তবেই ইন্দ্রিয় সংযম অর্থে চিত্ত-সংযম করা। যিনি ইন্দ্রিয়ের রাজা বা সারথি, কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য এই দুর্দ্দম দানবপ্রতিম রিপু ষড়বর্গের ঘোর তাড়নায় ও বশবর্ত্তিতায় যে জীবজগৎ অবিধের বিধানে শিষ্টানুমোদিত পদ্ধতি উল্লঙ্ঘনে সর্ব্বদাই পাপ-সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিতেছে, বিজয়িনী মহাশক্তি সাধনায় সাধক মহাপুরুষগণ মহাশক্তির পুরোভাগে মূর্ত্তিমান ছাগ মহিষ মার্জ্জার মেষ উষ্ট্র নরবলির বাহ্য দৃষ্টান্তকে সার করিয়া অমূর্ত্ত তত্তৎ প্রকৃতিস্বরূপ শাস্ত্রোক্ত যে, কামাদি অন্তঃশত্রু ষট্‌কের বলিদান করাই অভিপ্রেত বলিয়াই অনুভূত হইতেছে। এই অন্তঃশত্রু ষট্‌কের জয় চিত্ত-সংযমেরই ফল। এ জন্যই ভগবান্ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন,

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন !
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥

যে কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল বাহিরে সংযত করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি স্মরণ করিতে থাকে সেই বিমূঢ়াত্মা ব্যক্তিকে কপটাচার বলা যায়। আর যিনি কামনা জয় করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়গণকে আয়ত্ত করিয়া কেবল বাহিরেই কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা বিহিত কর্ম্ম করিয়া থাকেন হে অর্জ্জুন, তিনিই শ্রেষ্ঠ। তাহা হইলে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ অর্থে চিত্তসংযমই তাৎপর্য্য, মন সংযত না হইলে কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বহিঃসংযমন মিথ্যাচারিত্বের পরিচয় মাত্র। এই ইন্দ্রিয়সংযম ব্রহ্মচর্য্যের প্রধান ধর্ম্ম। সুতরাং ধর্ম্মলক্ষণ প্রস্তাবে মনু যে দশটি ধর্ম্ম লক্ষণ অভিধান করিয়াছেন ধৃতি, ক্ষমা, দয়া, অস্তেয়, শৌচ ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ। এখানে ধৃতিশব্দের অর্থ ধৈর্য্য ইষ্ট বিয়োগানিষ্টপ্রাপ্তৌ চিত্তস্য যথাপূর্ব্বমবস্থানং। অর্থাৎ ইষ্টবিরহ ও অনিষ্ট লাভে চিত্তের সাম্যাবস্থা, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ অর্থে যে বিষয়ে আসক্তি পুরুষের দোষাবহ নয় তাদৃশ অপ্রতিসিদ্ধ বিষয়েতেও অনাসক্ত থাকা। বিদ্যা অর্থে আত্মতত্ত্ব জ্ঞান, সর্ব্বপ্রাণীর সুখ বা দুঃখ নিবৃত্তি করাই সত্য, এজন্য

সত্যং ভূতহিতং প্রোক্তং মনসোদমনং দমঃ।
তপঃ স্বধর্ম্ম বর্ত্তিত্বং শৌচং সঙ্কর-বর্জ্জনং।
সন্তোষো বিষয় ত্যাগো হ্রীরকার্য্যনিবর্ত্তনং।
ক্ষমা দ্বন্দসহিষ্ণুত্ব মার্জ্জবং সমচিত্ততা॥
জ্ঞানং তত্ত্বার্থ সম্বোধঃ শমশ্চিত্ত প্রশান্ততা॥
দয়া ভূতহিতৈষিত্বং ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ॥

দম অর্থে মনঃ-সংযম, স্বধর্ম্মে অবস্থিতির নাম তপস্যা, পরদার ত্যাগের নাম শৌচ, বিষয় ত্যাগ সন্তোষ, অকার্য্য-নিবৃত্তি হ্রীঃ, শীতোষ্ণাদি-সহিষ্ণুতাকে ক্ষমা বলে, সমচিত্ততাকে আর্জ্জব কহে, তত্ত্বার্থবোধকে জ্ঞান, চিত্তের প্রশান্তিকে শম বলে, নিজের হিতানুসন্ধান ব্যতিরেকে পরহিতেচ্ছাকে দয়া বলে ও মনকে নির্ব্বিষয় করার নাম ধ্যান কহে। এগুলি ব্রহ্মচর্য্যেরই ফলস্বরূপ। ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠানে মন এমন ভাবে গঠিত হয় যে তাঁহাকে তখন দেবতার আসনে বসাইয়া দূর হইতে অর্ঘ্যপুষ্পাঞ্জলি হস্তে ভক্তিভরে পূজা করিতে ইচ্ছা হয়। যে ব্রাহ্মণশরীরে ব্রহ্মচর্য্যের ছায়া পরিলক্ষিত হয়, এখনও ঘোর তামসাচ্ছন্ন কলিযুগেও চৌর্য্য মিথ্যা প্রবঞ্চনাপূর্ণ মানবের মধ্যেও অসত্যের ভিতরেও তাঁহার সমাদর তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি অচলভাবে অবস্থিতি করিতেছে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্যজীবনের মূলভিত্তি। গার্হস্থ্য-জীবন মঙ্গলময় করিতে হইলে, সংসার পবিত্র করিতে হইলে, এই প্রলোভন এই মায়ার ভিতর হইতেও সংসারতরুর সুফল কামনা করিতে হইলে, সেই তরুর মূলে ব্রহ্মচর্য্য বারিসিঞ্চন করা অত্যাবশ্যক,ইহাতে সন্দেহ কি? আমি গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করিব, আমার মনে সর্ব্বদাই হইবে আমার স্ত্রী সংসারের কল্যাণী হইবেন, সন্তানের দীর্ঘায়ুষ্ট সন্তানের চারিত্র্যবল সন্তানের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও তেজস্বিতা, সকল পিতারই সকল সময়ে সর্ব্বতোভাবে সম্প্রার্থনীয়, কিন্তু সেই সকল কল্যাণের নিদান পিতামাতা। সুসন্তান কামনা করিলে সুপিতা হওয়া আবশ্যক, অকালমৃত্যু অকাল জরা শোক মোহ যাহা কিছু সংসারের আবর্জ্জনা তাহার হাত হইতে গার্হস্থ্যজীবনকে দূরে রক্ষিত করিতে হইলে অগ্রে পিতা তুমি পবিত্র হও, তুমি সুগঠিত হও, তোমার আবর্জ্জনা অগ্রে অপসারিত হউক, সেই অপসারণ করার কার্য্যই আমাদের ব্রহ্মচর্য্যশিক্ষা। এই জন্যই ব্রহ্মচারী হওয়ার পর গৃহস্থ হইতে আদেশ করিয়াছেন।

অতঃপরং সমাবৃত্তঃ কুর্য্যদ্দারপরিগ্রহং।

শ্রুতি বলিয়াছেন "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ" পিতাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন সুতরাং পুত্রের জীবনের শুভাশুভের জন্য পিতাই দায়ী। আর্য্য মহর্ষিগণ সংসারের ভবিষ্যৎ কল্যাণ-কামনায় ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের পরও গার্হস্থ্য জীবনের উৎকর্ষ সাধনের জন্য গর্ভাধানাদি সংস্কারের বিধানপূর্ব্বক গর্ভাধানাদি বিষয়ে যে সমস্ত তিথি নক্ষত্র বারাদির বিধান করিয়াছেন, দুঃখের বিষয় তাহাতেও মানবপ্রকৃতি উদাসীন। শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন

চিত্রংকর্ম্ম যথানেকৈরঙ্গৈরুন্মীল্যতে শনৈঃ।
ব্রাহ্মণ্যমপিতদ্বৎ স্যাৎ সংস্কারৈর্বিধিপূর্ব্বকৈঃ॥

নানাবিধ রঙ্গদ্বারা চিত্রফলকের যেমন সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়, বিধিপূর্ব্বক গর্ভাধানাদি সংস্কার দ্বারা ব্রাহ্মণ্যও তদ্রূপ উজ্জীবিত হয়। এই সমস্ত গার্হস্থ্য আশ্রমের বিষয় সুতরাং অদ্য অনালোচনীয় বিধায় ইহার বিস্তার অনাবশ্যক। পরন্তু সংসার অনাবিল ও মঙ্গলময় করিবার জন্য ত্রৈকালিক অন্তস্তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণ সুদূরদর্শিতার পরিচয় প্রদানের সহিত যে সমস্ত বিধি নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য এত শুভোদর্ক, তাহার অভিপ্রায় এত সৎ ও মহৎ যে ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। আমরা হয়তো অনেক সময়ে যুক্তি ও তর্কের অবতারণা করিয়া আমাদের জ্ঞানের অনুকূলে মহর্ষিগণের অভ্রান্ত সিদ্ধান্তিত মত ভ্রান্ত ও অসিদ্ধ জ্ঞানে সুদূরপরাহত করিয়া থাকি, কিন্তু জানা উচিত যে আমাদের জ্ঞান স্বল্প, বিষয় ও জ্ঞেয় অনন্ত, পর্য্যাপ্তজ্ঞানে অপর্য্যাপ্তজ্ঞেয়ের সিদ্ধান্ত করা মাদৃশ ক্ষুদ্র বুদ্ধির কর্ত্তব্য কি না?

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া সেই প্রাচীন যুগের ব্রহ্মচর্য্য কলিতে নিষিদ্ধ এবং আমরাও দেশকালপাত্রানুসারে নানাবিধ উপায়ে তাদৃশরূপ ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠানে অশক্তবিধায় অপাত্র। বর্ত্তমান সময়ে সেই প্রাচীন নিয়মে বেদ পাঠ করা কতদূর সঙ্গত তাহা সহজতই উপলব্ধি হইতে পারে, যদ্যপি বর্ত্তমান সময়ে বেদের চর্চ্চা আমাদের দেশে কিছু পরিমাণে হইতেছে কিন্তু তাহা প্রাচীন পদ্ধতি ক্রমে নহে, হইতেও পারে না। বর্ত্তমান সময়ে আমরা রাজভাষা শিক্ষা করিতে বাধ্য ও তাহাই কর্ত্তব্য, আমাদের রাজরাজেশ্বরের কৃপায় ও রাজ্যপ্রতিপালনের সুশৃঙ্খলায় আমরা জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সুশিক্ষিত ও উন্নীত হইতেছি, এই শিক্ষার মধ্যেও জাতিনির্ব্বিশেষে ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে যদি আমরা সেই প্রাচীন যুগের ব্রহ্মচর্য্যের কথা আলোচনা করিয়া সেই প্রাচীনযুগের ব্রহ্মচর্য্যের ভাবীশুভ ফল স্মরণ করিয়া কিঞ্চিন্মাত্রও

সেই সংযমশিক্ষা, সেই শম দম অক্রোধ দয়া তিতিক্ষা ও সত্যনিষ্ঠার দিকে পাদমাত্রও অগ্রসর হইতে পারি, তাহা হইলে আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন কত মঙ্গলময় হয়, কত যে সুখের হয় ইহা কে না স্বীকার করিবেন? প্রাচীন শাস্ত্র-রাশি আলোচনা করিলে ইহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

ভারতবর্ষ, বিশেষ হিন্দুসমাজ, অধ্যাত্মজগতে যত উন্নীত ইহার প্রবৃত্তি মার্গ পর্য্যন্ত শাস্ত্রোপদেশ-বারি-বিধৌত থাকায় যেরূপভাবে নিবৃত্তি-নিয়ন্ত্রিত, পৃথিবীর কোন জাতি মধ্যে এরূপ অধ্যাত্মজগতের উন্নতি ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না, এবং সুশিক্ষিত ও সুসভ্য পৃথিবীর অন্যান্য জাতিগণ ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন। আমাদের উচিত বাল্যজীবনে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ঐ সাধারণ ব্রহ্মচর্য্য, যাহাতে জাতিভেদ বা ধর্ম্মভেদ বিচার নিষ্প্রয়োজন। সেই সংযম শিক্ষার প্রতি, সেই শম দম বিবেক অক্রোধ অহিংসা সত্য, ধর্ম্মের উন্মেষণার প্রতি, সেই গুরু-ভক্তি পিতৃমাতৃ-ভক্তি ও শাস্ত্র-বিহিতকার্য্যে শ্রদ্ধার প্রতি, বালকের কথঞ্চিৎ চিত্তাকর্ষণ করা, যাহাতে তাহার ভবিষ্যৎ সংসার গার্হস্থ্যজীবন পবিত্র ও শুভময় হইবে ও ঐহিক পারত্রিক মঙ্গললাভ করিয়া শান্তিদেবীর শান্তিময় ক্রোড়ে প্রশান্তভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে পারিবে। অলমতি প্রসঙ্গেন।

শ্রীশিতিকণ্ঠ বাচস্পতি।
ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ।

নাট্যসাহিত্যে দীনবন্ধু। (৫)

বিয়ে পাগলা বুড়ো ও সধবার একাদশী।

নীলদর্পণের পর নবীনতপস্বিনী রচনা করিয়া দীনবন্ধু বুঝিতে পারিলেন যে হাস্যরসেই তাঁহার ক্ষমতার সমধিক স্ফূর্ত্তি। এই হাস্যরসের মধ্যে অযথা দৌর্ব্বল্য বা প্রাবল্য নাই; বরং দৃঢ়হস্তে অঙ্কিত তুলিকার মধ্যে কবিপ্রতিভার সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাস দেখিতে নাই। দীনবন্ধু কাঁদাইতে জানিতেন, কিন্তু তাহার অপেক্ষা বেশী হাসাইতে জানিতেন। এই হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীর ন্যায় দীনবন্ধুর নবীনতপস্বিনী প্রতিভার ব্যায়াম-ক্রীড়া test শিল্প, নিকষ-প্রতীতি, আত্মপরীক্ষার চেষ্টা।

সেই জন্য নবীনতপস্বিনীর প্রহসনভাগে দীনবন্ধু যে অপূর্ব্ব হাস্যরস-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা এই গ্রন্থরচনার দুই বৎসর পরে (১৮৬৫

খৃঃ অঃ) তাঁহার "বিয়ে পাগলা বুড়ো"তো আরও পরিস্ফুটরূপে দেখিতে পাই। জীবিত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইলেও দীনবন্ধুর রসিকতা বিদ্বেষ-বর্জ্জিত এবং নাটকখানি আদ্যোপান্ত হাস্য-রসে পরিপূর্ণ; করুণরসের আবির্ভাব নাই বলিলেও চলে। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে গৌরমণি ও রামমণির বিধবা-বিবাহ বিষয়ক কথোপকথন কিছু করুণরসাত্মক; কিন্তু এ প্রসঙ্গটুকু বাদ দিলেও চলে। অনেকে বলেন রাজীবলোচনের বাসরের প্রেমালাপ গাম্ভীর্য্যমূলক; কিন্তু এ গাম্ভীর্য্য নিতান্ত হাস্যজনক। নিছক প্রহসন প্রতিভাশালী লেখকের হাতে পড়িলে কিরূপ মনোহর হইতে পারে তাহার প্রকৃত উদাহরণ—বিয়ে পাগলা বুড়ো। কেবল ঘটনাগুলিই যে প্রহসনাত্মক তাহা নহে, ইহার চরিত্রগুলিও আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে ইহার ঝোঁক প্রহসনের দিকে। ঘটনাপুঞ্জের সাহায্যে চরিত্রের আভ্যন্তরীণ বিকাশ অপেক্ষা ঈপ্সিত চরিত্রের কতকগুলি হাস্যজনক স্থূল বিশেষত্ব (ভাষাগত বা ভাবগত) ফুটাইয়া তোলাই ইহার উদ্দেশ্য; প্রহসনের চরিত্রচিত্রের ইহাই বিশেষত্ব। কতকগুলি ইস্কুলের ছোঁড়ারা মিলিয়া এক বিবাহকরণেচ্ছু বৃদ্ধকে লইয়া মিছামিছি বিবাহ দিয়া কৌতুক করিয়াছে—ইহাই নাটকের সামান্য প্রতিপাদ্য বিষয়; কিন্তু শিল্পীর কৃতিত্বে এই সামান্য কৌতুকও আমোদজনক হইয়াছে। রাজীবের বৈঠক-খানায় রাজীব ও ঘটকের কথোপকথন ও শেষে রতা-নাপিত কর্ত্তৃক ঝাঁটা ও চপেটাঘাতের সাহায্যে রাজীবের নির্ব্বিষ হওন, এবং কনক বাবুর বাগানে বিবাহের বাসর—নাটকে এই দুইটি প্রধান দৃশ্যই রচনানৈপুণ্যে অতুলনীয়। এই সমস্ত কৌতুককর ঘটনার উপর ঘটনার মধ্য দিয়া নাটকের সামান্য আখ্যান-বস্তু (plot) দর্শক বা পাঠকের ঔৎসুক্য শেষ পর্য্যন্ত পোষণ করিয়া রাখে।

বিয়ে পাগলা বুড়ো ১৮৬৬

ইহার বিশেষত্ব

এই ঔৎসুক্য পোষণের প্রধান কারণ—লেখকের সজীব চিত্রাঙ্কণ ক্ষমতা ও নিরবচ্ছিন্ন হাস্যরসের স্ফূর্ত্তি। দীনবন্ধুর অলৌকিক সামাজিক অভিজ্ঞতা ও অপরিসীম সহানুভূতির ফলে তিনি সকল শ্রেণীর লোকের সহিত মিশিতেন এবং সকল শ্রেণীর লোকের মনের ভাব বুঝিতেন। কিন্তু এই সহানুভূতি যে কেবল তাঁহারই ছিল এমন নহে; বাহাদুরী এই যে তাঁহার চিত্রাঙ্কণ-নৈপুণ্যে সেই সহানুভূতি তিনি পাঠকগণের মনেও জাগাইয়া তোলেন। প্রীতিপ্রদ হইলেও গ্রামবৃদ্ধ

হাস্যরসিকের সহানুভূতি

রাজীবলোচনের চরিত্রে দোষ অনেক। গ্রাম্য দলাদলি, গোঁড়ামী, মোড়লী, বিধবা কন্যার উপর অত্যাচার ইত্যাদি সৎক্রিয়া কিছুই তাঁহার বাদ যায় না। "যথার্থ বল্‌তে কি রাজীব মুখুয্যে না মলে দেশের নিস্তার নাই।" (১ম অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্ক)। তথাপি এ সকল দোষ সত্বেও, কালপেড়ে ধুতি ও কলোপ-ভূষিত, বাহাত্তুরেগ্রস্ত, বিবাহবিষয়ে ভগ্নমনোরথ বৃদ্ধের এ সমস্ত দুর্ব্বলতার উপর আমাদের রাগ বা ঘৃণা হয় না; নাট্যকারের অসূয়া ক্রোধ-সম্পর্কশূন্য অবাধ উচ্ছলিত হাস্যের স্রোতে আমরা ভাসিয়া যাই, ঘৃণা বা রাগ করিবার অবসর থাকে না, ইহাই শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিকের কৃতিত্ব।

দীনবন্ধু যে অসীম হাস্যরসের অধিকারী ছিলেন তাহা নবীন তপস্বিনীর ক্ষুদ্র প্রসঙ্গে বা গ্রাম্য বৃদ্ধ ও গ্রাম্যবালকের পাগলামি ও নষ্টামির মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই। এক বৎসর অতীত হইতে না হইতে দীনবন্ধু পুনরায় তাঁহার সুচিন্তিত সুলিখিত "সধবার একাদশী" নাটক লইয়া বঙ্গসাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হইলেন। নবীন তপস্বিনী বা তৎপরবর্ত্তী প্রহসনে যে প্রতিভার আভাস মাত্র দেখিতে পাই, এখানে সে প্রতিভার আনন্দ-স্ফূর্ত্তি। কবি আপনাকে চিনিয়াছেন, আপন হৃদয়ে প্রতিভা-মূর্ত্তির পরিচয় পাইয়াছেন। প্রহসন নামে অভিহিত হইলেও সধবার একাদশী প্রহসন অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর হাস্যাত্মক নাটক।

সধবার একাদশী ১৮৬৬

বিয়ে পাগলা বুড়ো, জামাই বারিক, সধবার একাদশী প্রভৃতি প্রহসনের সম্বন্ধে প্রথমেই একটা আপত্তি উঠিয়াছে যে, দীন-বন্ধুর হাস্যরসের রুচি নাকি তত মার্জ্জিত নহে। রুচি সম্বন্ধে এ আপত্তি আজ নূতন নহে। কলিকাতা রিভিউ পত্রে (১৮৭০ খৃঃ [illegible] খণ্ড) পাদরি লাল বিহারী দে যে অসংযত ভাষায় দীনবন্ধুকে আক্রমণ করিয়াছেন, তাহাতে যে কেবল কবির প্রতি অযথা দোষারোপ করা হইয়াছে তাহা নহে, গ্রন্থের আদরের জন্য তিনি বঙ্গীয় পাঠকবর্গেরও নিন্দা করিয়াছেন। পাণ্ডিত্যাভিমানী পাদরী সাহেব যাহা বলিয়াছেন তাহাতে কিছু যায় আসে না এবং লোকে তাহা অনেক দিন ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ও এইরূপ তীব্রভাবে সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন "সধবার একাদশী খালি মদের কথায় আরম্ভ এবং মাতালের কথাতেই

দীনবন্ধুর হাস্যরসের রুচি

রামগতি ন্যায়রত্ন

পর্য্যবসিত। ইহাতে হাস্যরসোদ্দীপক অনেক বিষয় বর্ণিত আছে সত্য কিন্তু আদ্যোপান্ত অশ্লীল বকামী ও মাতলামীর কথাতেই পরিপূর্ণ... ......শুদ্ধ কতকগুলি বকামির গল্প লিখিলেই যদি প্রহসন হইত তাহা হইলে কলিকাতায় মেছোবাজার ও সোণাগাছি প্রভৃতি স্থানে দৈনন্দিন যে সকল ব্যাপার সংঘটিত হয়, সেইগুলি অবিকল লিখিয়া লইলেও অনেক প্রহসন হইতে পারিত। উল্লেখমান প্রহসনে অটল ও নিমেদত্ত বরাবর সমান মাতলামী ও বেশ্যা প্রভৃতি লইয়া সমান চলাচলি করিয়াছে। তাহাদের চরিত্র উত্তম-রূপে চিত্রিত হইয়াছে সত্য কিন্তু তৎপাঠে সমাজের কিছুমাত্র শিক্ষালাভ নাই। সুতরাং ওরূপ বিবরণ লিখিয়া প্রহসন রচনায় কি প্রয়োজন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। দীনবন্ধু বাবুর ন্যায় সুসামাজিক ব্যক্তির হস্ত হইতেও এরূপ জঘন্য পদার্থ বহির্গত হইয়াছে।" এ সমস্ত কঠোর সমালোচনার কতদূর মূল্য তাহা বিবেচ্য, কারণ এরূপ সমালোচনার দিন এখনও অতীত হয় নাই। আধুনিক সময়ে কবি রবীন্দ্রনাথও তাঁহার

রবীন্দ্রনাথের মত

"বঙ্কিমচন্দ্র" প্রবন্ধে দীনবন্ধুর নাম উল্লেখ না করিলেও সমকালবর্ত্তী কতিপয় লেখকের রুচি সংযত ছিল না বলিয়া দীনবন্ধুর রচনার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছেন। আধুনিক ইংরাজী-সাহিত্য-রসজ্ঞ পণ্ডিতদিগের নিকট দীনবন্ধুর "মোটা কাজ" কিছু বিসদৃশ লাগিতে পারে এবং ইহাও স্বীকার্য্য যে রবীন্দ্রনাথ বা বঙ্কিমচন্দ্রের সুক্ষ্ম শিল্প দীনবন্ধুর গ্রন্থে দেখা যায় না, কিন্তু যখন রবীন্দ্রনাথ বলেন যে "নির্ম্মল শুভ্র সংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্ব্বপ্রথম বঙ্গসাহিত্যে আনয়ন করেন" তখন বোধ হয় তিনি বঙ্কিমের সহযোগী ও বন্ধু দীনবন্ধুর কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কারণ এ বিষয়ে দীনবন্ধুর কৃতিত্ব বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত একত্র উল্লেখযোগ্য। দীনবন্ধুর হাস্যরস কত উচ্চ শ্রেণীর, তাহা যে কেবল wit বা buffonery নয় ও হাস্যরসের রচনায় দীনবন্ধু কিরূপ যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন, সে বিষয়ের বিস্তৃত সমালোচনা আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে করিয়াছি ; এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র। তবে দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্রের হাস্যরসের কিঞ্চিৎ প্রভেদ দৃষ্ট হয় ; তাহার একটী কারণ এই যে বঙ্কিমচন্দ্র অধিকরূপে পাশ্চাত্য-ভাব আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন, দীনবন্ধু স্বদেশী ঠাঠ বা স্বদেশী সুর বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, "মোটা কাজ" হইলেও ইহাদের রসিকতা স্বদেশী এবং সরু কাজ যতই মনোহর হউক না কেন

তাহা কৃত্রিম ও বিদেশী ভাবাপন্ন। জামাই বারিকের পদ্মলোচন ও তাহার দুই স্ত্রীর বিবরণ আরও সূক্ষ্ম ও উৎকৃষ্ট ব্যাপার হইতে পারিত, কিন্তু বোধ হয় তাহা তত খাঁটি জিনিষ হইত না। প্রধানত কুরুচি বলিতে গেলে আমরা দুই রকম বুঝি, ভাষাগত ও ভাবগত। কুরুচির স্থান সাহিত্যে যত কম হয় ততই মঙ্গল। তোরাপের কতকগুলি উক্তি, সধবার একাদশী, জামাই বারিক ও লীলাবতীর অনেক স্থল ভাষাগত কুরুচির নিদর্শন। বিয়ে পাগলা বুড়োর বাসর ঘরের দৃশ্য ও অন্যান্য কতকগুলি স্থলে ভাষা একটু সংযত হইলে নাটকের মূল্যের কিছুমাত্র হানি হইত না। কিন্তু ভাবগত কুরুচির স্থান দীনবন্ধুর রচনায় বিরল।

ভাষাগত ও ভাবগত কুরুচি

দ্বিতীয়ত আমরা পূর্ব্বে আরও দেখিয়াছি যে দীনবন্ধু প্রধানত বাস্তব জীবন ও বাস্তব জগতের চিত্রকর। সেইজন্য অনেক সময় জীবন্ত আদর্শ যথাযথ অঙ্কিত করিতে গিয়া রুচির মুখ রক্ষা করিতে পারেন নাই। রাজীবলোচনের ন্যায় গ্রাম্য বৃদ্ধ ও রতা বা নশীরামের ন্যায় গ্রাম্য বালক আঁকিতে গেলে অনেক সময় গ্রাম্য রসিকতাও সঙ্গে সঙ্গে আনিতে হয়; তাহা না হইলে চিত্র অসম্পূর্ণ ও কৃত্রিম হইয়া দাঁড়ায়। রুচি রক্ষা হউক বা না হউক দীনবন্ধুর ন্যায় লোকের রচনা যে বিচিত্র ও বেগবান, সবল ও স্বাভাবিক হইয়াছে তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ঐ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে সুন্দর সমালোচনা করিয়াছেন তাহার উপর পরবর্ত্তী কোন সমালোচকের কলম চলে না। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন "তাঁহার সহানুভূতি তাঁহার অধীন বা আয়ত্ব নহে; তিনি নিজেই সহানুভূতির অধীন। তাঁহার সর্ব্বব্যাপী সহানুভূতি তাঁহাকে যখন যে পথে লইয়া যাইত, তখন তাহাই করিতে বাধ্য হইতেন। তাঁহার গ্রন্থে যে রুচির দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, বোধ হয় এখন তাহা আমরা বুঝিতে পারিব। তিনি নিজে সুশিক্ষিত ও নির্ম্মল চরিত্র, তথাপি তাঁহার গ্রন্থে যে রুচির দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার প্রবলা দুর্দ্দমনীয়া সহানুভূতি তাহার কারণ। যাহার সঙ্গে তাঁহার সহানুভূতি, যাহার চরিত্র আঁকিতে বসিয়াছেন, তাহার সমুদয় অংশই তাঁহার কলমের আগায় আসিয়া পড়িত; কিন্তু বাদ সাদ দিবার তাঁহার কোন শক্তি ছিল না। কেন না তিনি সহানুভূতির অধীন, সহানুভূতি তাঁহার অধীন নহে। তাই আমরা একটা আস্ত তোরাপ, আস্ত

বাস্তব জীবন ও বাস্তব জগতের চিত্র

নিমচাঁদ আস্ত আতুরি দেখিতে পাই ; রুচির মুখ রক্ষা করিতে গেলে ছেঁড়া তোরাপ কাটা আদুরী ও ভাঙ্গা নিমচাঁদ আমরা পাইতাম।"

কিন্তু এরূপ স্বভাবাঙ্কন ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে দীনবন্ধুর স্বভাবসিদ্ধ চিত্রকে Idealise করিবার নৈপুণ্য ছিল; তাহা না হইলে তাহার স্বভাবাঙ্কণ তত মনোজ্ঞ হইত না। হাস্য-রসিকের এরূপ Idealism থাকা প্রয়োজন। যাহা কুৎসিৎ, যাহা ঘৃণিত, যাহা মর্ম্মপীড়াকর, তাহা কখনই সুখদায়ক বা হাস্যাস্পদ হইতে পারে না, মানব জীবনের প্রাকৃতিক চিত্র অধিকাংশ সময়ে কর্কশ ও অশোভন এবং কাব্য বা নাট্যকলার উপযোগী নহে। সাহিত্যে Zolaism এর স্থান খুব উচ্চ নহে। অসুন্দরকে মাজিয়া ঘসিয়া সুন্দর ও কাব্য উপযোগী করিয়া লওয়াই কবি নাট্যকার ও হাস্য-রসিকের কার্য্য। কবি-কল্পনা যে শুধু অশরীরী অজ্ঞাত বা অননুভূতপূর্ব্ব পদার্থের সৃষ্টি করিবে এমন নয়, পরন্তু যাহা নিত্য-দৃষ্ট সুজ্ঞাত তাহাকে চিন্ময় সৌন্দর্য্যে অভিষিক্ত করাও কবিকল্পনার কার্য্য। Photography বা যথাযথ অঙ্কণ realism নহে। জীবনের অভিজ্ঞতার বিরোধী বা জীবনের স্মৃতিসম্পর্কবিহীন আদর্শ যেরূপ নিস্ফল, কল্পনাস্পর্শ-বর্জ্জিত জীবনের নগ্ন প্রাকৃতিক চিত্রও সেইরূপ অসার। সত্যের সহিত কল্পনার সম্মিলন কাব্যকলার উপযোগী। সেক্ষপিয়ার একজায়গায় বলিয়াছেন যে তাঁহার নাট্যকলার উদ্দেশ্য মনুষ্য জীবন দর্পণে প্রতিফলিত করা; কিন্তু এই স্থলে জীবনের ছায়া যে দর্পণে প্রতিবিম্বিত সেই দর্পণ তাঁহার কল্পনা-প্রবণ মার্জ্জিত শিক্ষিত কবির হৃদয়। জলধরের মত Falstaff. স্বার্থপর ইন্দ্রিয়পরায়ণ কাপুরুষ কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে আমরা ঘৃণা করিতে পারি না। পক্ষান্তরে সেক্সপিয়ারের প্রতিদ্বন্দ্বী নাট্যকার Ben Jonson এর চিত্রে কল্পনার ভাগ অতি অল্প; এই জন্য তাঁহার শিল্প সর্ব্বত্র সফল নহে। তাই সূক্ষ্ম সমালোচক Schlegel বলেন "There is more Spirit of observation than fancy in the comic inventions of Ben Jonson.

স্বভাবাঙ্কণে কল্পনার স্থান

*　*　*　*　*

Occasionally he reminds us of those over-accurate portrait-painter who, to insure a likeness, think that they must copy every mark of the small pox, every carbuncle or freckle" এইরূপ কষ্টশিল্প দীনবন্ধুর রচনায় দেখা যায় না, তাঁহার চিত্রাঙ্কণ পদ্ধতি

অনেকটা সেক্সপিয়ার প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের অনুরূপ। সেইজন্য বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন "দীনবন্ধু অনেক সময়েই শিক্ষিত ভাস্কর বা চিত্রকরের ন্যায় জীবিত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চরিত্রগুলি গড়িতেন; সামাজিক বৃক্ষে, সামাজিক বানর সমারূঢ় দেখিলে অমনই তুলি ধরিয়া তাহার লেজশুদ্ধ আঁকিয়া লইতেন। এটুকু গেল তাঁহার Realism তাহার উপর Idealise করিবার ক্ষমতাও বিলক্ষণ ছিল। সম্মুখে জীবন্ত আদর্শ রাখিয়া, আপনার স্মৃতির ভাণ্ডার খুলিয়া, তাহার ঘাড়ের উপর অন্যের দোষ গুণ চাপাইয়া দিতেন; যেখানে যেটী সাজে তাহা বসাইতে জানিতেন। গাছের বানরকে এইরূপ সাজাইতে সাজাইতে সে একটা হনুমান বা জাম্বুবানে পরিণত হইত। নিমচাঁদ, ঘটিরাম, তোলাচাঁদ প্রভৃতি বন্যজন্তুর এইরূপ উৎপত্তি।

তারপর ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রহবর্ণিত যে মাতলামি ও বকামির কথা এবং নৈতিক শিক্ষার অভাব লইয়া আক্ষেপ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে এস্থলে দুএকটী কথা বলা আবশ্যক। নৈতিক শিক্ষা যে সর্ব্বদা হাস্যাত্মক নাটকের উদ্দেশ্য, তাহা বলা যায় না। যাহা বিহিত, অভ্যস্ত ও উপাদেয় তাহা স্বাভাবিক,তাহাতে হাসিবার বা কাঁদিবার কিছুই নাই। এই জন্য যাহা আমাদের অভ্যস্ত নহে, যাহা অসঙ্গত বিকৃত অসদৃশ বা বিপরীতভাবাপন্ন তাহা হইতেই হাস্যরসের উৎপত্তি, কিন্তু এই বিকৃতি বা বৈসাদৃশ্যের একটা সীমা আছে। তাহা অতিক্রম করিলে আর হাসি থাকিবে না। মাতালের দুর্গতি দেখিলে হাসি পায়, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তাঁহার প্রতি আমাদের ঘৃণা বা অনুকম্পার ভাব উদয় হয় সেই মুহূর্ত্তেই আর হাসিবার অবসর থাকে না। অনুকম্পা ঘৃণা প্রভৃতি নৈতিক সহানুভূতি গাম্ভীর্য্য-মূলক, তাহাতে হাস্যরসের প্রসর নাই। সেই জন্য হাস্যাত্মক নাটক বা প্রহসন বর্ণিত দুর্গতি ভয়াবহ বা দুস্তর হওয়া উচিত নহে; অনিষ্টকর না হইয়া কেবল একটী বিপর্য্যয় ঘটান তাহার উদ্দেশ্য। সুতরাং হাস্যাত্মক নাটকের দুর্বৃত্ত পাত্রদিগের সমুচিত সাজা কখনও হয় না। বড় জোর জলধরের মত গুড় ও আলকাতরায় রূপান্তর, রাজীবলোচনের মত ঝাঁটা ও চপেটাঘাত, নিমেদত্তর মতন কিলচড়, কানমলা ও গলাটিপি অথবা নদের চাঁদের মত শুদ্ধ গলা টিপিতেই শেষ হয়। আধুনিক সময়ে এরূপ কায়িক দণ্ড সুরুচি-সঙ্গত নহে বলিয়া অনেকে আপত্তি করিয়া থাকেন, কিন্তু সেক্স-পিয়ার, মলিয়ার (Moliere) হলবর্গ (Holberg) প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ নাট্যকারগণ সকলেই এই প্রথার পক্ষপাতী। ইহা অপেক্ষা গুরুতর ন্যায় দণ্ড আনিয়া

ফেলিলে নাটকে গাম্ভীর্য্য আসিয়া পড়ে। সেই জন্য শ্লেগেল বলেন যে বিয়োগান্ত নাটকে যেরূপ মৃত্যু প্রভৃতি গুরুগম্ভীর বিষয়ের অবতারণা হাস্যাত্মক নাটকেও সেইরূপ এই সকল লাঞ্ছনার স্থান। Ben Jonson তাঁহার Volpone নামক নাটকে এরূপ পদ্ধতির অনুসরণ না করিয়া, দুষ্টের দমনের জন্য গুরুতর দণ্ড বিধির ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে নাটকের সমাপ্তি তত প্রমোদজনক হয় নাই। তাহা হইলে আমরা দেখিতেছি যখন নীতিশিক্ষা বা নৈতিক সহানুভূতির অবতারণা হাস্যরসিকের বিষয়ের বহির্ভূত, তখন হাস্যাত্মক নাটকে নৈতিক উপদেশের অভাব লইয়া আক্ষেপ করিলে চলিবে না। এ বিষয়ে পূর্ব্বোল্লিখিত প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ সমালোচক যাহা বলিয়াছেন তাহা আমরা এখানে উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গের শেষ করিব "As the comedy must place the spectator in a point of view altogether different from that of moral appreciation, with what right can moral instruction be demanded of comedy?...................................... The instruction of comedy does not turn on the dignity of the object proposed, but on the sufficiency of the means employed. It is, as has already been said, the doctrine of prudence; the morality of consequences and not of motives. Morality, in its genuine acceptation, is essentialily allied to the spirit of tragedy." Schlegel's *Dramatic Art and Literature* p. 187.

শ্রীসুশীলকুমার দে।

জীবনাদর্শ-নির্ব্বাচন।

আমাদের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক বিষয়েই দেখি বর্ত্তমান অবস্থা হইতে উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করিতে হইলে সাধারণতঃ আমরা একএকটী প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকি। এমন এক সময় ছিল যখন আমাদের অবলম্বনীয় কোন প্রণালী ছিল না। মানুষকে স্বীয় মস্তিষ্কের উদ্ভাবনীশক্তির উপর সর্ব্ববিষয়ে নির্ভর করিতে হইত; সেরূপক্ষেত্রে অন্ধকারে হস্তসঞ্চালন দ্বারা বহু সময় ও শক্তির ব্যয় করিতে হইত। কিন্তু একজনের প্রয়োজনাতিরিক্ত

পরিশ্রম, সময় ও শক্তিব্যয়ে যদি কোনও সুপ্রণালী উদ্ভাবিত হয়, তবে তদবলম্বনে আমরা অল্প সময়ে ও অল্প শক্তিব্যয়ে বহুপরিমাণ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারি। একটা কিছু আবিষ্কার করিতে আবিষ্কারকের হয়তো সমস্ত জীবন ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু সেই অসাধারণ ব্যক্তির জীবনব্যাপী সাধনার ফল গ্রহণ করিয়া শত শত সাধারণ লোক তাহাদের ক্ষুদ্র জীবনে ক্ষুদ্রবুদ্ধি সহায়তায় প্রভূত কার্য্য করিতেছে, অথচ তাহাদিগকে জীবনীশক্তির অপচয় করিতে ও সংসারের তাবৎ ভোগসুখ বিসর্জ্জন দিতে হইতেছে না। এই সকল কারণে অর্থাৎ সময় সংক্ষেপ, শ্রমলাঘব, ও অপচয় নিবারণ জন্য আমরা সাংসারিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সকল বিষয়েই "মহাজনাঃ যেন গতাঃ সঃ পন্থাঃ" বাক্যের সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া একএকটী আদর্শ অবলম্বন করিয়া থাকি। প্রতিভাশালী বা জ্ঞানীজন দ্বারা প্রদর্শিত প্রণালী অনুসরণের আর একটা বড় কারণ আছে। আমাদের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা জানি যে আমাদের উদ্ভাবন অপেক্ষা অনুকরণ ক্ষমতা অধিক, এবং আমরা মৌলিক উদ্ভাবনাপেক্ষা আদর্শের অনুকরণ দ্বারা অধিক পরিমাণে সৌষ্ঠব সম্পাদনে কৃতকার্য্য হইয়া থাকি। এমন কি, বর্ত্তমানযুগে নূতন কিছু আবিষ্কার করিতে হইলেও প্রাণালীবিশেষের সূত্রধারণ করিয়া অগ্রসর হইতে হয়। অতএব সকল বিষয়েই যে আদর্শানুসরণ একান্ত-প্রয়োজনীয় ও হিতকর সে সম্বন্ধে সকলেই একমত হইবেন।

কিন্তু আদর্শের নির্ব্বাচন ও অবলম্বন সহজ নহে। জ্ঞান, ক্ষমতা, রুচি ও উদ্দেশ্যের তারতম্যানুসারে আমরা বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন আদর্শ গ্রহণ করিয়া থাকি। শিক্ষার্থীর আদর্শ একজন বিদ্যানুরাগী অধ্যবসায়ী প্রতিভাশালী ছাত্র, কিন্তু কূটবুদ্ধিবিশিষ্ট সম্পন্ন গৃহস্থ নহেন। আবার, ঘোর সংসারীর নিকট কামিনীকাঞ্চনত্যাগী পরমহংস আদর্শরূপে গৃহীত নহেন, কিন্তু তাহার আদর্শ জীবিকাসংগ্রামজয়ী ধনজনপ্রতিপত্তিশালী শ্রেষ্ঠী অথবা ভূ-স্বামী। এইরূপে জ্ঞান, ক্ষমতা, রুচি ও উদ্দেশ্যের বিভিন্নতানুযায়ী আদর্শ অবলম্বন করি বলিয়া, আমরা প্রায়শই প্রথমে একটা প্রকাণ্ড ভুল করিয়া বসি এবং শেষে সংশোধনের সময় অতীত হইলে নৈরাশ্যসাগরে নিমজ্জিত হইয়া পশ্চাত্তাপরূপ বাড়বানলে বিদগ্ধ হইতে থাকি। তাদৃশ নৈরাশ্য ও পশ্চাত্তাপের হস্ত এড়াইতে হইলে বিশেষ চিন্তাপূর্ব্বক যথার্থ জীবনাদর্শ নির্ব্বাচন করিয়া তদনুসারে জীবনযাপন করিতে হইবে। জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ নিরূপণ উদ্দেশ্যে

পুরাতন ও বর্ত্তমানযুগে মানবজাতির মধ্যে কি কি আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার উল্লেখ ও সমালোচনা প্রয়োজন। আদর্শের বিভিন্নতানুসারে বিরাট মানবজাতিকে মোটামুটি চারিশ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা (১) চার্ব্বাকমতাবলম্বী (২) সকামধর্ম্মী (৩) বৈরাগ্যপন্থী (৪) ত্যাগী বা নিষ্কাম কর্ম্মী। নিম্নে তাহাদের সম্বন্ধে যথাক্রমে আলোচনা করা যাইতেছে :—

(১) মানবজাতির এক বিশাল শ্রেণী জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারেই হউক চার্ব্বাকের মতাবলম্বী। আধ্যাত্মিকতার উপর দেহাত্মবোধের অতিমাত্রায় প্রাধান্যহেতু তাহারা দৈহিক ও ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি-বিধানই জীবনের উদ্দেশ্য বা কার্য্য বলিয়া মনে করে। ইহাদের বিদ্যাশিক্ষাই বল, আর সাংসারিক কর্ম্মই বল, সমস্তের ভিতর দেহেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিরূপ একমাত্র উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের জীবনের কর্ম্মবৈচিত্র্য বিশ্লেষণ করিলে ঐরূপ উদ্দেশ্যের উপরে কিছু দেখা যায় না। ইহাদের মধ্যে যাহারা আত্মহিত-বোধে অক্ষম ও প্রবৃত্তি-চরিতার্থতাবিষয়ে একান্ত অসহিষ্ণু,—তাহারা নানা-প্রকার অত্যাচারবশতঃ রুগ্ন, অকর্ম্মণ্য, নিঃস্ব ও ঘৃণিত হইয়া আমরণ জীবন্মৃত অবস্থায় বাস করে। আর, যাহারা একটু আত্মহিত বুঝে, তাহারা স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম ও সমাজ-বিধি লঙ্ঘন না করিয়া সমস্ত বিষয়ে মাঝামাঝি পথে চলিয়া আত্মীয়পরিবারসহ আমরণ সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকে। এই শ্রেণীর লোক বলদৃপ্ত ও অহঙ্কারী বলিয়া ধর্ম্ম ও পরলোকের ধার ধারে না—মৃত্যু দেখিলেও মৃত্যু ও তৎপরবর্ত্তী অবস্থার কথা ভাবে না, এবং পরম প্রিয়জনের অভাব হইলেও দুদিন পরে সব শোকতাপ বিস্মৃত হইয়া আবার আমোদআহ্লাদের সহিত ঘরকন্না করিতে থাকে। ইহারা কেবল নিজ নিজ শরীর লইয়াই ব্যস্ত, রক্তমাংসের তৃপ্তি হইলেই ইহাদের সব হইল এবং ইহাদের পিতামাতার প্রতি ভালবাসা, বন্ধুপ্রীতি, পত্নীপ্রেম অপত্য-স্নেহ প্রভৃতির কেন্দ্রস্থান আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তি।

(২) সকামধর্ম্মী :—এই শ্রেণীর লোক কার্য্যত প্রথমোক্ত শ্রেণীর অনুরূপ হইলেও তাঁহাদের জীবন-যাপনে এমন একটু বিভিন্নতা আছে যাহাকে মন্দের ভাল বলা যাইতে পারে। ইঁহারা মানুষের উপরে যে দেবতা আছেন এবং ইহলোকের পর পরলোক আছে তাহা অল্পাধিক পরিমাণে স্বীকার ও বিশ্বাস করেন। ইঁহারা নিজ নিজ ধর্ম্মবিশ্বাসানুসারে সময় সময়

লৌকিক শক্তির উপরস্থ কোনও কিছুর নিকট ভক্তির সহিত মস্তক নত করিয়া থাকেন। কিন্তু এবম্বিধ বশ্যতা ও নতিস্তুতি, জ্ঞানজ ও আদর্শ-প্রীতি-প্রসূত নহে। যেমন কোনও লোক গাছের উঁচু ডাল হইতে আম পাড়িবার জন্ত আকর্ষীকে আদর করে, কিন্তু তাহার প্রকৃত আদরের বস্তু অমৃতফল যথেচ্ছসংখ্যক ভূতলে পতিত হইলেই আকর্ষীর আদর চলিয়া যায়—তদ্রূপ এই শ্রেণীর লোকের দেবধর্ম্মে শ্রদ্ধা কামাপ্রাপ্তির খাতিরে এবং রোগ দুঃখদারিদ্র্যাদি হইতে মুক্তির নিমিত্ত। যাথার্থ্যতঃ এই সব লোক শুধু "প্রেয়ের" উপাসনা করিয়া থাকে—দেবতা ও ধর্ম্মকে তল্লাভের সহায়ক জ্ঞানে নতিস্তুতিরূপ তোষামোদ ও সোপচার পূজারূপ উৎকোচ বা উপঢৌকন প্রদান করিয়া থাকে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে উপরিবর্ণিত দুই শ্রেণীর লোকই কোনও মহৎ জীবনাদর্শ দ্বারা চালিত নহে। রক্তমাংসের তৃপ্তি ও প্রবৃত্তির চরিতার্থ-তাই তাহাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, এবং তৎসাধনেই তাহাদের জীবনের একমাত্র ব্যবহার। এই বিষয়ে উহাদের মধ্যে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ইতর ও ভদ্র বলিয়া কোন প্রভেদ নাই। অসভ্য, অশিক্ষিত বা ইতরজনেরা যেমন আপন আপন রক্তমাংসের দেহটা এবং তৎসহ অবিচ্ছেদ্যসম্বন্ধে আবদ্ধ স্ত্রীপুত্রাদি নামক তদ্রূপ আর কয়েকটী দেহ লইয়া সারাটাজীবন ব্যস্ত থাকে,—শিক্ষিত, সভ্য বা ভদ্রজনেরাও তাহাই। এইটুকুমাত্র প্রভেদ যে ইতর লোকেরা স্থূলবিষয়ে, অল্পে ও সহজে তৃপ্ত হয়; আর শিক্ষিত, সভ্য ভদ্র মহোদয়গণের আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি নাই,—তাঁহারা উপভোগ্যগুলিকে তাঁহাদের কল্পনাপ্রসূত সৌখিনতার নূতন নূতন রকমে আস্বাদন করিতে চান, এবং নানাপ্রকারে জীবন-যাপন প্রণালীতে বাহ্য চাকৃচিক্য বা আড়ম্বরের সঞ্চার করিয়া থাকেন। কিন্তু চিনির ছাঁচ যে রকমেরই হউক না কেন, মূলে যে চিনি সেই চিনি। তাই, উপরোক্ত শ্রেণীদ্বয়ের সকলেরই সমস্ত জীবনের যে এক সাধারণ ও সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য দেখা যায়—তাহা দৈহিক অভাব পূরণ, পঞ্চেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিনিমিত্ত রূপরসাদি উপভোগ, সাধারণ্যে প্রশংসা ও সম্ভ্রমলাভ, এবং তৎসর্ব্বপ্রদায়ক অর্থের আরাধনা। যহোদের অর্থ ও উপ-ভোগ্যের অভাব নাই, তাহারা নিষ্কর্ম্মা হইয়া সৌখিনতায় ও পানাহার নিদ্রা-রমণীবিলাসোপভোগে জীবনকাল অতিবাহিত করে। আর, অপেক্ষাকৃত

তাড়নায় কৃষি, শিল্পবাণিজ্য বা ধনীর দাসত্ব দ্বারা অর্থোপার্জ্জন পূর্ব্বক প্রকৃত ও কল্পনাসৃষ্ট উভয়বিধ অভাব মোচন, অল্লাধিক সখের তৃপ্তি ও পরিচিতমহলে প্রতিপত্তি স্থাপন করিয়া থাকে। এইরূপে মানবসমাজের বৃহত্তর সংখ্যকই কাম-কাঞ্চন-সেবার নিমিত্ত জীবনধারণ করিয়া থাকে। তাহাদের কাম-কাঞ্চন আরাধনায় এমনই একটা তীব্র মাদকতা আছে যে তাহারা হিতাহিতবোধ ও মনুষ্যত্ব হারাইয়া ফেলে, কখনই "যথেষ্ট হইয়াছে" মনে করিয়া তৃপ্তিলাভ পূর্ব্বক অনুসরণীয় বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে না, এবং কাম-কাঞ্চন-মদিরার পিপাসায় ছটফট করিয়া তৎশান্তি-মানসে উদ্যম, স্বাস্থ্য, আয়ুঃ,বুদ্ধি, বিবেচনা প্রভৃতি সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া ফেলে—একবারও ভাবে না যে সে গুলির সদ্ব্যবহার হইল কি না, এবং হঠাৎ মৃত্যু আসিয়া যে সমস্ত পণ্ড করিয়া দিতে পারে চক্ষুর সম্মুখে শত শত মৃত্যু সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও একবারও তাহা তাহাদিগের মনে হয় না। যে দেহের জন্য তাহারা সমস্ত শক্তি ও সারাটী জীবন ব্যয় করিতেছে, তাহা যে এক অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর দিনে ভস্মীভূত হইয়া ধূলায় মিশিয়া যাইবে, এবং তৎপর ক্রমে ক্রমে মানবমন্ হইতে তাহাদের ক্ষুদ্র স্মৃতিটুকু লোপের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পার্থিব অস্তিত্বের সত্যতা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে—ইহা তাহারা বুঝিয়াও বুঝে না। তাহারা বহু ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিলেও কোন তত্ত্বকথা তাহাদের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করে না। সেই পল্লবগ্রাহীগণ নিজেরাও অনেক সময় বিজ্ঞ সাজিয়া উপদেষ্টার আসনগ্রহণ করে; কিন্তু সেই কপট বক-ধার্ম্মিকেরা কেবল বিদ্যাবুদ্ধির অভিমানবশতঃ আত্মপ্রতিষ্ঠা ও যশোলাভ কামনায় শব্দাড়ম্বরের সৃষ্টি করিয়া থাকে মাত্র। হায়! ঈদৃশ লোকসমূহের আধ্যাত্মিক অবস্থা এতদূর শোচনীয় এবং তাহাদের উপর দেহাত্মবোধের এত প্রাধান্য যে তাহারা স্বাধীনেচ্ছাবিহীন কলের ন্যায় দৈহিক প্রবৃত্তিনিচয়দ্বারা সতত অজ্ঞানান্ধকারে চালিত হইয়া থাকে, এবং জীবনের সত্যতা উপলব্ধি সম্বন্ধে একটুমাত্রও জ্ঞান-প্রাপ্ত, আগ্রহান্বিত ও সচেষ্ট নহে।

(৩) উপরোক্ত শ্রেণীদ্বয়ের বহুউর্দ্ধে স্থান পাইতে পারেন এমন একশ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহাদিগকে "বৈরাগ্যপন্থী" বলা যাইতে পারে। এই শ্রেণীর লোক দেহাত্মজ্ঞান দ্বারা অভিভূত নহেন, এবং তাঁহাদের সকলের মধ্যেই অল্পাধিক পরিমাণে আধ্যাত্মিকতার বিকাশ স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। রক্তমাংসের দেহ যে নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী, এবং তদভ্যন্তরস্থ

অবিনাশী আত্মা যে সেই দেহ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন—ইহা তাঁহারা প্রাণে প্রাণে বোধ করেন এবং সে জন্য রক্তমাংসের সেবায় প্রথমোক্ত শ্রেণীদ্বয়ের ন্যায় তৎপর নহেন। চার্ব্বাক-মতাবলম্বী ও সকামধর্ম্মীগণ যেমন "দেহই আমি" এই ভ্রান্তিবশতঃ একমাত্র নশ্বর রক্তমাংসের সেবাতেই ব্যাপৃত থাকে, তেমনি এই বৈরাগ্য-পন্থীগণ "আমি দেহ নই, আমি ক্ষণভঙ্গুর দেহাবরণ দ্বারা আবৃত অবিনাশী আত্মা" এবম্বিধ জ্ঞানবশতঃ প্রতিক্রিয়ার নিয়মানুসারে সম্পূর্ণ বিপরীত পথ অবলম্বন পূর্ব্বক দেহকে অতিশয় তুচ্ছজ্ঞান করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর লোক সতত সন্ত্রস্ত থাকেন পাছে রক্তমাংসের দুর্ব্বলতার কাছে অবনত হইতে হয়; এবং সর্ব্বপ্রকার ভোগবিলাস ত্যাগ করিয়া নানাপ্রকার কায়িক কৃচ্ছ্রসাধনদ্বারা দৈহিক প্রবৃত্তিনিচয়কে সংযমিত ও শাসিত করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। ইহারা যতদিন বাঁচেন, অতি সন্তর্পণে কাল কাটাইয়া থাকেন—যেন পৃথিবীর ধূলাকাদা তাঁহাদের গায়ে না লাগে। ইঁহাদের ধারণা যে প্রাক্তনকৃত পাপের ফলেই পৃথিবীতে জন্ম হয়। সুতরাং জন্মান্তরের ও ইহজীবনের পাপক্ষয় নিমিত্ত এবং মুক্তিকামনায় ইঁহাদের কেহ কেহ দান ও তীর্থ পর্য্যটন দ্বারা পুণ্যসঞ্চয়ে এবং জপতপঃপূজাদিতে সতত ব্যাপৃত থাকেন; আবার, কেহ কেহ একেবারে সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া তীর্থপর্য্যটন বা নির্জ্জনগিরিগুহাবাস অবলম্বন পূর্ব্বক আমরণ যোগতপস্যা ও ভজন সাধনে জীবন অতিবাহিত করেন। ইঁহাদের ত্যাগ ও সংযমের এবম্বিধ উজ্জ্বল চিত্র দর্শন করিলে, এবং বাসনাসংগ্রামে ইঁহাদের দৃঢ়তা ও বীরত্বের বিষয় ভাবিলে অতিমাত্রায় চমৎকৃত, বিস্মিত ও ভক্তিরসাপ্লুত হইতে হয়। কিন্তু ইঁহাদের সংযম, দৃঢ়তা ও ত্যাগ সর্ব্বথা অনুকরণীয় হইলেও ইঁহারা আদর্শস্থল হওয়ার অনুপযুক্ত। কারণ ইঁহাদিগের আদর্শের মূলে এমন একটী ভুল রহিয়াছে যে তজ্জন্য ইঁহাদেরও পার্থিব জীবন ব্যর্থ হইয়া যায়। ইহাদিগের নিকট পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ ও জীবনধারণ অপরাধীর দ্বীপান্তর—নির্ব্বাসনস্বরূপ প্রতীত। সুতরাং ইহারা পৃথিবী ও পার্থিব জীবনকে ভালবাসিতে না পারিয়া ঘৃণা, তাচ্ছিল্য বা ঔদাসীন্যের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। যাহা কিছু পার্থিব, তৎপ্রতি কাহারও এবম্প্রকার তাচ্ছিল্য ও ও অনাস্থা জন্মিলে, তাহার দ্বারা কোনও জগৎহিতকর কার্য্য সম্ভব নহে। তাদৃশ লোকের আত্মোৎকর্ষ সঙ্কীর্ণ-স্বার্থপরতাপ্রসূত নিরর্থক নিষ্ক্রিয়তা, এবং ভগবদারাধন বৃথা তোষামোদ ও শূন্যগর্ভ চাটুবাদ এই আর কিছুই নহে।

যে পৃথিবীর সামান্য তৃণগাছিতে পর্য্যন্ত আশ্চর্য্য সৃষ্টি কৌশল এবং অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের একত্র সমাবেশ দৃষ্ট হয়, তাহাকে হেয় জ্ঞানকরা কি বিশ্ব-স্রষ্টার প্রতি অশ্রদ্ধা-প্রদর্শন নহে? অপার অতল নীলাম্বুধিপরিবেষ্টিত, রম্যগিরি-নদীসরোবরবনোপবনশোভিত, সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা আমাদের এই সুন্দর বসুন্ধরা কি পাপীর নির্ব্বাসন-দণ্ডভোগের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে? যখন উষাকালে উদীয়মান বাল-সূর্য্যের অস্ফুটালোকে পূর্ব্বাকাশ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে, এবং যখন মধ্যাহ্নরবির প্রোজ্জ্বলচ্ছটায় চারিদিক স্বর্ণ-দীপ্তিমণ্ডিত হইয়া উঠে—তখনও কি পৃথিবীকে নির্ব্বাসন-স্থান বলিয়া মনে হয়? আবার, সায়ংকালে—যখন অস্তগামী রবির স্নিগ্ধ ছবি কুলুকুলু রবে প্রবাহিত তটিনীর নীর-বক্ষে প্রতিফলিত হইয়া ধীরে ধীরে সলিলগর্ভে লুকায়িত হয়, যখন দুই পার্শ্বের ক্ষেত্রসমূহে শ্যামল শস্যরাজি ক্রীড়াকুশল সমীরণের হস্তধারণ করিয়া হেলিয়া দুলিয়া নাচিতে থাকে, যখন তরুশাখায় বসিয়া বিহগকুল মধুর কূজনে নিশারাণীর আগমনী গাহিতে থাকে, এবং চন্দ্রাতপসদৃশ নীল নভোমণ্ডলে বিলম্বিত দীপাবলীর ন্যায় অসংখ্য তারকামণ্ডলী ও সুধাকর একে একে উদিত হইয়া তরল স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ বিকীরণে যামিনীকে হাসাইয়া তুলে—তখন প্রকৃতির সেই মোহন সাজ ও সান্ধ্যোৎসব দেখিয়াও কি মনে হয় এই পৃথিবী কারাগার এবং মানব শাস্তি-ভোগের নিমিত্ত এখানে প্রেরিত হইয়াছে? কখনই নহে, কখনই নহে। মানবের প্রতিস্রষ্টার যে যত্ন ও ভালবাসা তাহা অবর্ণনীয় ও অচিন্তনীয়।

হে মানব! তোমার দেহটী কি আশ্চর্য্য জিনিষ একবার ভাবিয়া দেখ দেখি। তোমার চক্ষু কর্ণ নাসিকাদি স্থূলেন্দ্রিয়গুলির রচনা-কৌশল কি আশ্চর্য্য, তাহাদের ক্ষমতা ও কার্য্য কি অদ্ভুত, এবং তোমার দৈহিক প্রয়োজন সাধন, পুষ্টি, তুষ্টি ও আত্মার বিবিধ প্রকাশ-ক্রিয়ার পক্ষে তাহারা কেমন উপযোগী! তোমার জীবনধারণ ও পুষ্টির নিমিত্ত স্নিগ্ধ সমীরণ, স্বচ্ছ সলিল আয়ুবলারোগ্যদায়ক খাদ্য এবং উত্তাপ ও আলোকাদি সৃষ্ট হইয়াছে। তোমার তৃপ্তি ও সন্তোষ বিধানের নিমিত্ত জলে, স্থলে, নগরে, কাননে সর্ব্বত্র কত শোভা, কত সৌন্দর্য্য ছড়ান রহিয়াছে। উত্তালতরঙ্গময় অগাধ নীলাম্বুধি, অম্বরচুম্বিগিরিশৃঙ্গ ও রবিচন্দ্রতারকাকিরণোদ্ভাসিত নীলনভোমণ্ডলে তোমার নয়ন রঞ্জন করে, মন্দানিল চারিদিকে ফুল্লকুসুমসৌরভ ছড়াইয়া তোমারই নাসিকার তৃপ্তি বিধান করে, এবং সুমধুর কোকিলকাকলি ও বিহগকূজন

তোমারই শ্রুতি-সুখ উৎপাদন করে। এ সকল স্থূলেন্দ্রিয়ের উপভোগ্য ব্যতীত মানব জীবনে কত প্রকারের যে সুখ আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। মানব! পিতামাতার অপত্যস্নেহ, ভ্রাতাভগ্নীর ভালবাসা, বন্ধুর প্রীতি, পত্নীর প্রেম ও সন্তানের ভক্তি এ সকলে কত মাধুর্য্য, কত আনন্দ পাইয়া থাক একবার ভাবিয়া দেখ দেখি। আবার মানব-মস্তিষ্কের কার্য্য কি অদ্ভুত! ক্ষুদ্র সসীম বিরাট কল্পনা করিয়া থাকে এবং অসীম অনন্তকে ধারণা করিতে পারে। মানব মস্তিষ্ক কেমন অভাবনীয় ভাবে প্রকৃতির গূঢ়রহস্য উদ্ঘাটন পূর্ব্বক প্রাকৃতিক মহাশক্তিচয়কে আয়ত্ত করিয়া তাহাদের দ্বারা নানা প্রয়োজন সাধন করিয়া থাকে! মানব ক্রমশঃ নিখিল জগৎকে আপনার করিয়া লইতেছে—মনে হয় যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মানবের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। মানবের প্রতি বিধাতার এবম্প্রকার যত্ন এবং মানবের ঈদৃশ ঐশ্বর্য্য দেখিয়া দৃঢ় প্রতীতি জন্মে যে এক মহোদ্দেশ্য সাধন জন্য ভগবান মানবাত্মাকে দেহ-বিশিষ্ট করিয়া ধরাতলে প্রেরণ করিয়াছেন। এই বিশ্বের কিছুই নিরর্থক সৃষ্ট হয় নাই; যে বস্তুকে আমরা ক্ষুদ্রতম ও হেয় জ্ঞান করি তাহারও প্রয়োজনীয়তা ও কার্য্য সম্বন্ধে ধীরভাবে চিন্তা করিলে আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে হয়। বাস্তবিকই, চিন্তাশীলের চক্ষু লইয়া জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা বৈচিত্র্যপূর্ণ বিশ্ব-সৃষ্টি ব্যাপারের মধ্যে এমন একটী ক্রমিক প্রণালী বা বিধান ও শৃঙ্খলা দেখিতে পাই—যাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে একটী তদপেক্ষা উন্নত অপর একটীর গঠন, বর্দ্ধন ও সৌষ্ঠব সম্পাদনের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে এবং একের জন্ম ও জীবনের সার্থকতা অপরের জন্ম ও পরিপোষণে। এই নিখিল ভুবনে কাহারও জীবন তাহার আত্মসুখভোগের নিমিত্ত নহে। সৃষ্টির কারণ ও উদ্দেশ্য আমাদের জ্ঞানের অতীত হইলেও, আমরা এইটুকু বুঝিতে পারি যে বিশ্বসৃষ্টির মূলে ভগবানের লীলাসুখেচ্ছা বিদ্যমান; এবং সমগ্র বিশ্ব লীলাময়ের লীলোৎসবের দ্রব্য সম্ভার।

অতএব হে মানব! তুমি কেবল নশ্বর পাঞ্চভৌতিক দেহের তৃপ্তি-বিধানে অবিরত রত থাকিয়া আপনাকে মিথ্যায় পরিণত করিওনা; অথবা পৃথিবীতে আগমন ও অবস্থানকে প্রাক্তনকৃত পাপের ফল মনে করিয়া—মুক্তির নিমিত্ত পুনর্জন্ম নিবারণোদ্দেশ্যে নানাকৃচ্ছ্রসমন্বিত নিষ্ক্রিয়বৈরাগ্যসাধন দ্বারা অমূল্য জীবনকে ব্যর্থ করিও না।

তুমি লীলাময়ের অতি প্রিয় লীলা-সহচর,—তুমি জীবনের মূল্য,

প্রয়োজনীয়তা ও সত্যতা উপলব্ধি করিয়া লীলাময়ের ইচ্ছাসাধন দ্বারা জন্ম ও জীবন সফল ও সার্থক কর। পৃথিবীর পাপ, তাপ, জ্বালা, যন্ত্রণা প্রভৃতি দেখিয়া কাপুরুষের ন্যায় ভীত ও কর্ত্তব্য হইতে পশ্চাৎপদ হইওনা। যখন পরমপ্রভু কর্ত্তৃক একটা বিশেষ কর্ত্তব্য সম্পাদন নিমিত্ত ধরাতলে প্রেরিত হইয়াছ, তখন আবর্জ্জনারাশির ভিতরেই নিঃসঙ্কোচে কাজ করিতে হইবে—হস্তপদ অপরিস্কার হইবে বলিয়া দ্বিধা করিলে চলিবে না। তোমার নিকট হইতে জগৎ কিছু চায়—সমস্ত বিশ্ব তজ্জন্য সাগ্রহে তোমার মুখপানে চাহিয়া আছে। তোমার যেটুকুতে জগতের প্রয়োজন তাহা অন্যের কাছ হইতে পাওয়া যাইবে না; নচেৎ তুমি সৃষ্ট হইতে না—কারণ তুমি তো ফটোগ্রাফের কপি নও, প্রত্যেকর মধ্যে যখন আপন জনক জননী ও সহোদর ভ্রাতা ভগ্নী হইতেও চিন্তা, অনুভূতি রুচি প্রভৃতি সম্বন্ধে একটু বিভিন্নতা লক্ষিত হয়—যখন প্রত্যেকের ও অপর সকলের মধ্যে সর্ব্ববিষয়েই একটু পার্থক্য আছে, তখন তোমাতে এমন একটু বিশেষত্ব আছে যাহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আর কাহারও মধ্যে নাই। জগৎকে তোমার সেই বিশেষত্বটুকু—সেই নূতনত্বটুকু দিতে হইবে, নতুবা জগৎ অভাব-বিশিষ্ট ও অপূর্ণ থাকিবে।

"ফাগুনের কুসুম ফোটা হবে ফাঁকি
তোমার এই একটী কুঁড়ি রইলে বাকি।"

শত বাধা আসুক, শত বিঘ্ন আসুক, কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত হইও না; তোমার প্রাণসখার লীলোৎসবের আয়োজন করিতে হইবে। জগতের আবর্জ্জনা রাশি পরিস্কার করিয়া, আধি ব্যাধি, দুঃখ, দারিদ্র, নৈরাশ্য, হিংসা, দ্বেষ, অজ্ঞান তিমির, জড়তা প্রভৃতি দূর করিয়া সৌন্দর্য্য, পবিত্রতা, আরোগ্য, সমৃদ্ধি, আশা, উৎসাহ, শান্তি, প্রেম, আনন্দ, জ্ঞানদ্যুতি প্রভৃতি দ্বারা জগৎকে উৎসবের জন্য সাজাইতে হইবে;—তবে তো জগৎ স্বর্গে পরিণত ও তোমার প্রাণকান্তের আগমনের উপযুক্ত হইবে। ভাই! সেই উৎসবানন্দের বিষয় কল্পনা করিলে আনন্দে আত্মহারা হইয়া যাইবে—সেই কল্পনানুভূতি তোমার জীবনে সতত সরসতা ও সঞ্জীবনীশক্তির সঞ্চার করিবে। যেদিন আনন্দময় লীলোৎসবে প্রীত হইয়া প্রত্যেকের প্রাণের ভিতর আদেশ করিবেন "আনন্দ কর" সেদিন সকল হৃদয় ও সকল আত্মা মিলিয়া একহৃদয় একাত্মা হইয়া আনন্দময়কে সোঽহং-জ্ঞানে উপলব্ধি করিতে করিতে আপনারা আনন্দে পরিণত হইয়া যাইবে। হে মানব! তুমি তোমার এ জীবনে সে আনন্দ

আস্বাদন করিতে পার বা না পার তাহাতে ক্ষতি নাই—তোমার অমর আত্মা যথাসময়ে সে আনন্দ ভোগ করিবেই। তুমি এখন কেবল তোমার কর্ত্তব্য করিয়া যাও। নিজেকে ক্ষুদ্র মনে করিয়া নিরুৎসাহ হইওনা—ভগবানের কাছে, বিশ্বের কাছে তোমার "ক্ষুদ্র"ই বড়। তোমার সময় ও সামর্থ্যের সদ্ব্যবহার করিয়া যাও—কার্য্যের পরিমাণ বা ফলের জন্য ভাবিও না। কর্ত্তব্য স্থির করিতে অপারগ হইয়া নৈরাশ্যে ডুবিও না। তোমার ভিতর যদ্রূপ প্রবৃত্তি ও শক্তি সামর্থ্য আছে—তোমার কর্ত্তব্য তদনুযায়ী ব্যতীত আর কিছু হইতে পারে না। অতএব সর্ব্বাগ্রে ভাল করিয়া আপনাকে জান, এবং তৎপর আত্মশক্তি ও বৃত্তিগুলিকে পূর্ণ বিকশিত, গঠিত ও কার্য্যক্ষম করিয়া তোল। কুসুম প্রস্ফুটিত হইলেই তাহার সৌরভবিতরণ কার্য্য আপনা হইতেই হইতে থাকে। তুমি যখন পরিণত, সুস্থ ও কার্য্যপটু দেহ, এবং পূর্ণ-বিকশিত, জাগ্রত ও ক্রিয়মান হৃদয়, মন ও আত্মা লইয়া পূর্ণ পুরুষরূপে দণ্ডায়মান হইবে, তোমার নিজস্ব ফুটিয়া উঠিবে এবং তুমি আপনা হইতে সঠিকভাবে তোমার বিশেষ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া জগৎকে এক অভিনব উপঢৌকন প্রদান করিবে। অতএব তুমি সৎসঙ্গ, সৎশিক্ষা, সদনুশীলন ও সৎকার্য্য দ্বারা তোমার শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির উদ্বোধন ও পূর্ণতা সম্পাদন কর; এবং ভগবানে আত্মসমর্পণ ও তোমার সর্ব্বস্ব ব্রহ্মার্পণ করিয়া সতত মহাদাদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া কর্ম্ম করিতে থাক। তাহা হইলেই মিথ্যা জীবন সত্যে পরিণত হইবে, মৃত্যুমরিচীকার মধ্যে অমৃতের উৎস বাহির হইবে, এবং জীবনের সকল বিষাদ ও নৈরাশ্যের অন্ধকারে অত্যুজ্জ্বল আনন্দজ্যোতি প্রকাশিত হইবে। ঐ দেখ! তোমাকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিবার জন্য মনু রাজর্ষি জনক, মহর্ষি ব্যাস, দেবর্ষি নারদ, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, শঙ্কর, চৈতন্য, নানক, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতির সার্থক ও সত্যজীবন দেদীপ্যমান আদর্শরূপে বিদ্যমান। ইঁহাদিগকে সন্ন্যাসীও বলিতে পার, গৃহীও বলিতে পার। ইঁহাদের কেহ কেহ আত্মপরিবারের ক্ষুদ্র সীমায় আবদ্ধ না থাকিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক বিশ্বকে আপনার পরিবার ভাবিয়া গৃহকর্ত্তার ন্যায় জগৎ-পরিবারের মঙ্গল ও উন্নতির জন্য জীবন ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। আবার কেহ কেহ নিজের ক্ষুদ্র পরিবারকে বিশ্ব-সেবাকর্ম্মে আপনার সহায়ক কর্ম্মসঙ্গীমাত্র জ্ঞান করিয়া বাহিরে গৃহস্থ অন্তরে সন্ন্যাসী এবম্বিধভাবে জীবনের কর্ত্তব্য

করিয়া গিয়াছেন। সকলের ভিতরেই বিশ্বপ্রেম, ত্যাগ, সংযম, কর্ম্মদৃঢ়তা, ব্রহ্মে আত্মসমর্পণ এবং জগদ্ধিতসাধনে আত্মোৎসর্গ পূর্ণ ভাবে দৃষ্ট হয়। মানবজাতি সাধনা দ্বারা ইঁহাদিগের আদর্শ জীবন লাভ করিতে পারিলেই খৃষ্টীয় ধর্ম্মমতে যীশুর পুনরভ্যুদয় এবং আমাদের হিন্দুবিশ্বাসমতে সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মপ্রকাশময় হইবে।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মজুমদার।

ভাগবতধর্ম্ম।

বাসুদেব-উপাসনা সাধকজীবনে প্রত্যক্ষ্যে প্রত্যাবর্ত্তন, এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এই কথাটার প্রকৃত তাৎপর্য্যবোধের উপর ভাগবতধর্ম্মের রহস্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে।

মানুষের জীবন একটা দ্বন্দ্বের সাহায্যে আপনাকে উপলব্ধি করে। এই দ্বন্দ্বের একদিকে জড় একদিকে চেতন, একদিকে অসুর একদিকে সুর, একদিকে সংসার আর একদিকে নিত্যধাম, এই লীলার নাম নিত্য-সমুদ্রমন্থন। বিষই বলুন আর অমৃতই বলুন এই সমুদ্রমন্থনে সমুদয় সামগ্রীর উদ্ভব হইতেছে। যেমন ঘড়ির দোলকযন্ত্র বা পেন্‌ডুলম্ সর্ব্বদাই একদিক হইতে অপর দিকে দুলিতেছে, উঠিতেছে আর নামিতেছে—বিরামবিহীন—এক মুহূর্ত্তেরও স্থৈর্য্য নাই তেমনই এই সংসার কেবলই সরিতেছে, ইহারি নাম জগৎ কেননা ইহা চলিতেছে। Every thing is in a flux.

এই যে নিত্য চাঞ্চল্য, সর্ব্বদাই এদিক হইতে ওদিকে যাতায়াত,ইহারই মধ্যে বিশ্বের যাবতীয় সমস্যার অবস্থিতি। জড়বস্তু, উদ্ভিদ, পশু বর্ত্তমানকালের বৈজ্ঞানিকগণ যাহারই তত্ত্ব আলোচনা করিতেছেন সকলেরই ইতিহাসে এই বিরোধ বা সমুদ্রমন্থন আবিষ্কার করিতেছেন। মানুষ যখন চেতনভাবে এই সমুদ্রমন্থনের প্রতি চাহিয়া বিচলিতচিত্তে ইহার সমস্যার মীমাংসায় আত্মনিয়োগ করিল তখনই তাহার ইতিহাসে ধর্ম্মের উৎপত্তি হইল। তখন সে দেখিল একদিকে প্রেয় আর একদিকে শ্রেয়, সে উভয়ের মধ্যবর্ত্তী, উভয়েই তাহাকে যুগপৎ আকর্ষণ করিতেছে। একদিকে জড় আর একদিকে চেতন উভয়ের মধ্যে সে দোলায়িত, তাহার মনে প্রশ্ন উঠিল সে কোথায় দাড়াইবে? দাঁড়াইবার একটা স্থির ভূমি পাইবার জন্য যে বিরামবিহীন চেষ্টা, সেই চেষ্টাই মানবজাতির ইতিহাস, এই ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করিয়া যুগের পর যুগ অগ্রসর হইয়া দেখা

গেল, মানুষ একবার এখানে একবার ওখানে আপনার চিরবিশ্রামের স্থান আছে এইরূপ অনুভব করিতেছে। মানুষ একবার জড়বাদী হইল, প্রত্যক্ষের মধ্যে ইহলোককে সর্ব্বস্ব করিয়া সান্ত্বনা পাইবার জন্ম চেষ্টা করিতে লাগিল। একটা সাময়িক কৃতকার্য্যতাও সে পাইল, কিন্তু সেখানে দাঁড়াইতে পাইল না, তাহার নিজেরই প্রকৃতি তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তাহার সোণার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিল। হিরণ্যকশিপু একটা বড় সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা স্থায়ী হইল না তাহার নিজেরই পুত্র প্রহলাদ বিদ্রোহী হইল। রাবণ এই প্রকারের একটা গৌরবময়ী সভ্যতা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাও থাকিল না। শিশুপাল, দন্তবক্র ও দুর্য্যোধন, তাঁহাদের চেষ্টাও স্থায়িত্বলাভ করিল না প্রাচীনভারতের ইতিহাসে এই প্রকারের বহু দৃষ্টান্ত বর্ণিত হইয়াছে। ইহারা প্রত্যক্ষেরই পূজা করিয়াছিলেন। অপ্রত্যক্ষকে অস্বীকার করিয়াছিলেন কিন্তু গঙ্গার স্রোতের মুখে ঐরাবতের স্থায় ভাসিয়া গিয়াছেন।

প্রত্যক্ষের মধ্যে যখন মানুষ দাঁড়াইতে পারে না, তখন সে প্রত্যক্ষকে ছাড়িয়া অপ্রত্যক্ষের আরাধনা করে। শ্রীমদ্ভাগবতের দক্ষযজ্ঞ প্রস্তাবে শিবের যে চিত্র অঙ্কন করা হইয়াছে তাহা প্রত্যক্ষকে উপেক্ষা করিয়া অপ্রত্যক্ষের উপাসনা। দক্ষ ও শিব দুজনেই চরমপন্থী। দক্ষ বলেন ভাব ভক্তি বা জ্ঞানের প্রয়োজন কি ? আমি বিশুদ্ধভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করিব, যথাবিহিত দ্রব্য-সম্ভার সংগ্রহ করিব, ক্রিয়ার ফল অবশ্যই হইবে। শিব বলেন যে আমার শ্বশুর দক্ষ যখন সভায় আসিয়াছিলেন, তখন আমি মনে মনে তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছিলাম, বাহিরে শরীরের দ্বারায় লোক দেখাইবার জন্য প্রণাম অভিবাদন করিয়া কি হইবে ? এই গেল চরমপন্থিদের কথা। ইহাদের একজন বলে প্রত্যক্ষই সত্য, অপ্রত্যক্ষ একটা কল্পনামাত্র ; আর একজন বলে অপ্রত্যক্ষই সত্য প্রত্যক্ষ একটা মিথ্যা মায়া ও মোহাবেশ মাত্র ; এই নিত্য সমস্যা। সমাজের মধ্যে আসিয়া মানুষ একবার বলে সমাজই মূলাধার, তুমি ব্যক্তি তোমার স্বার্থ সুবিধা সমস্তই সমাজের কল্যাণে উৎসর্গ কর, ইহাই তোমার পরমার্থ ; এই আদর্শের অনুবর্ত্তনে কিছুকাল চলিতে চলিতে ব্যক্তি একদিন বিদ্রোহী হইয়া পড়ে সে তখন বলে আমার ব্যক্তিগত মঙ্গলের জন্যই সমাজ। সমাজ যদি আমার ব্যক্তিগত স্বত্ব ও সুবিধার উপর হস্তক্ষেপ করে তাহা হইলে আমি বিদ্রোহের আগুন জ্বালাইয়া সমাজের জীর্ণ কাষ্ঠখানিকে পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিব।

কাব্যে শিল্পে সর্ব্বত্রই এই বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। একবার বাহিরে ঝুঁকিতেছে, একবার ভিতরে আসিতেছে, একবার ইন্দ্রিয় একবার ইন্দ্রিয়াতীত তাহার উপাস্য হইতেছে। এই বিরোধের মীমাংসা কোথায়? আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি যে বাসুদেব-উপাসনা এক হিসাবে প্রত্যক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন। একথা শুনিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে অপ্রত্যক্ষকে উপেক্ষা করিয়া হিরণ্যকশিপুর মত রাজা বা দক্ষের মত ব্রাহ্মণ যে পথ আশ্রয় করিয়াছিলেন আমরা সেই পথের কথা বলিতেছি। বাসুদেব-উপাসনা অপ্রত্যক্ষকে স্বীকার করিয়া নিত্যকে আত্মসাৎ করিয়া প্রত্যক্ষে ফিরিয়া আসিল। কথাটা আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি। পূর্ব্বে একবার আলোচনা করা হইয়াছিল যে, মানবের চৈতন্যের চারিটী অবস্থা আছে। বহিঃপ্রাজ্ঞ, অন্তঃপ্রাজ্ঞ, উভয়তঃপ্রাজ্ঞ ও তুরীয়। এই যে তৃতীয় অবস্থা অর্থাৎ উভয়তঃ প্রাজ্ঞ অবস্থা, এই খানেই বাসুদেব উপাসনার আরম্ভ, শ্রীমদ্ভাগবতের মতে দক্ষ বহিঃপ্রাজ্ঞ শিব অন্তঃপ্রাজ্ঞ আর বাসুদেব উভয়তঃপ্রাজ্ঞ। বাসুদেব নারায়ণ যখন আসিলেন তখন শিবের সহিত দক্ষের সন্ধি হইয়া গেল। তাঁহাদের মধ্যে সম্পর্ক গোড়া হইতেই ছিল, কিন্তু তাঁহারা ইহা বুঝিতে পারেন নাই, সতী দক্ষেরই কন্যা এবং শিবের অর্দ্ধাঙ্গিনী, সুতরাং শিব ও দক্ষ ইহাদের মিলনই স্বাভাবিক কিন্তু যাহা স্বাভাবিক তাহা সহজে ঘটে না, তাই সতীকে নিজের দেহ আগুনে আহুতি দিতে হইল। সতীর এই দেহনাশ দক্ষকে কাঁদাইল, শিবকেও কাঁদাইল, শিব ও দক্ষের মধ্যে যে বিরোধ এত দিন ধূমায়িত হইতেছিল আজ তাহা বীরভদ্রের বিক্রমে ও হুঙ্কারে প্রকটভাবে জ্বলিয়া উঠিল। না জ্বলিলে নির্ব্বাপিত হয় না তাই জ্বলিয়া উঠিল। সতীর দেহত্যাগ হিন্দু-সাধনার ইতিহাসে একটী বৃহৎ ঘটনা, সতীর দেহত্যাগ ছাড়া দুই চরমপন্থীর মিলন হয় না।

বাসুদেব-উপাসনা এই মিলনের উপর প্রতিষ্ঠিত—ভাগবতধর্ম্ম এই মিলনেরই আদর্শ।

ভাগবতধর্ম্মের পরিপূর্ণ বিকাশ বৃন্দাবনে শ্রীনন্দনন্দনের আবির্ভাবে। এই আবির্ভাব ও এই লীলা প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষের মিলন। মানুষ মানুষের উপাসক, অমানুষের বা অতিমানুষের নহে। এতদিন যাহাকে অতি-মানুষ বলিয়া ভাবিতেছিলাম, আজ আমি ব্রজের মানুষ হইয়া দেখিলাম সে মানুষ। ব্রহ্মা কিন্তু তাহা বুঝিতে পারিলেন না, ইন্দ্রও তাহা বুঝিতে পারিলেন না, যাহা হউক

ইঁহারা দেবতা প্রথমটা বুঝিতে না পারিলেও শেষে বুঝিতে পারিলেন, কারণ দিব্ ধাতু প্রকাশাত্মক। কংস ও শিশুপাল কিন্তু কখনই বুঝিতে পারিলেন না। কংস তাঁহার নিজের ভূমিতে দাঁড়াইয়া যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন, প্রহরীগণকে অস্ত্রে শস্ত্রে সাজাইয়া সারারাত্রি দ্বারে দ্বারে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছিলেন, নিজেও অমাত্য সভাসদগণ সহ জাগিয়া বসিয়া ছিলেন, কিন্তু কখন যে তাঁহারই কারাগারের অন্ধকার কক্ষ আলো করিয়া তিনি আসিলেন এবং কেমন করিয়াই বা চলিয়া গেলেন, বেচারা তাহা বুঝিতে পারিল না। নারদ, যিনি প্রহ্লাদের গুরু এবং লীলাময়কে ধরাইয়া দেওয়া যাঁহার কার্য্য, তিনি কংসকে সন্ধানটা দিয়াও দিলেন না—কংস আতঙ্কে বহুবিধ অনুষ্ঠানের মধ্যে ক্ষিপ্তভাবে ঘুরিতে লাগিল। সুতরাং বাসুদেব-উপাসনা প্রত্যক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন বলিয়া ব্যাপারখানা নিতান্ত সহজ নয়। ইহা কি তাহা বুঝাইতে হইলে, ইহা কি নহে তাহা বুঝিয়া দেখিলে সুবিধা হওয়া সম্ভব অর্থাৎ ব্রহ্মা বহির্মুখ করিয়া আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া অন্বয়ী মুখে অপেক্ষা ব্যতিরেকী মুখে এই বাসুদেব, উপাসনার তত্ত্ব আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব।

কংসের কারাকক্ষে আবির্ভূত হইয়া কংস রাজ্যের সীমামধ্যে নিত্যলীলা প্রকট হয় অথচ কংস তাহা দেখিতে পায় না, আর শিশুপাল দেখিয়াও দেখিতে পায় না। সুতরাং কংসের পরিচয়ের দ্বারা আমরা যদি সতর্ক হইতে চেষ্টা করি তাহা হইলে হয়ত লীলা বা বাসুদেব-উপাসনা বুঝিতে পারিব।

কংস কে? আমার মধ্যেও কংস আছে, শুধু কংস কেন আমার মধ্যে সকলেই আছে, যদি আমার মধ্যে না থাকিত তাহা হইলে তাহার ভাবনা ভাবিয়া আমার কিছু লাভও হইত না, আর তাহার ভাবনা আমি ভাবিতেও পারিতাম না। আমার মধ্যে সবই আছে সুতরাং কংসের অন্বেষণ করা যাউক।

লোকে মনে করে কংস বড় সাহসী ও বীর, কিন্তু আমরা দেখিতেছি তাহার মত ভীরু আর দ্বিতীয় নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনায় দেখা যায় খুব সমারোহের বিবাহ। বিবাহ হইয়া গিয়াছে, পাত্র বসুদেব আর পাত্রী দেবকী রথে চড়িয়া যাইতেছেন। বিবাহের কন্যা শ্বশুরবাড়ি যাইতেছেন সঙ্গে হাতী ঘোড়া লোকজন গীতবাদ্য মহামহোৎসব, চারিদিকেই আনন্দ। কংস ভগিনী দেবকীকে ভালবাসিতেন, সেই জন্য নিজেই

চালাইয়া লইয়া যাইতেছেন, আজ তাঁহার মনেও খুব আনন্দ। সৎপাত্রে ভগ্নীর বিবাহ হইয়াছে বড়ই সুখের কথা। হঠাৎ দৈববাণী হইল "রে অবোধ কংস আজ এত আনন্দ করিতে করিতে যে ভগিনীকে লইয়া যাইতেছিস্ সেই ভগিনীর অষ্টম গর্ভে তোর বিনাশকর্ত্তার জন্ম হইবে" অপ্রত্যক্ষের এই প্রথম আক্রমণ, কংস যদি বীরের মত প্রত্যক্ষে বসিয়া থাকিতে পারিত তাহা হইলে সে বিচলিত হইত না। আবার সে যদি অপ্রত্যক্ষের প্রকৃত রহস্য বুঝিত, তাহা হইলেও বিচলিত হইত না। কিন্তু কংস দোলকযন্ত্রের ন্যায় দুলিতেছে, তাহার দাঁড়াইবার স্থান নাই, উৎসবের আনন্দ কোলাহল থামিয়া গেল। প্রকাণ্ড কালমেঘ আসিয়া শরতের পূর্ণচন্দ্রকে যেমন আচ্ছাদন করে ঠিক সেরূপ একখানি বিষাদের কালমেঘ আসিয়া উৎসবের ঔজ্জ্বল্য ঢাকিয়া ফেলিল।

সুশাণিত খড়্গ ঝল্ ঝল্ করিতেছে, দেবকীর কেশমুষ্টি দৃঢ় হস্তে ধরিয়া কংস তাহাকে হত্যা করিবার জন্য সেই খড়্গ উত্তোলন করিল, চারিদিকে এত লোক কিন্তু সকলেই কংসঅনুচর, কাহারও সাহস হইল না কংসের কার্য্যে বাধা দেয়। বাধা দিবে কি, সকলেই ভাবিতেছে নিজেকে বাঁচনই পরম ধর্ম্ম। কেবলমাত্র বসুদেব আসিয়া কংসকে ধরিলেন, কেবলমাত্র তিনিই বিচলিত হন নাই। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার পুরোদেশে বসুদেব যে শান্ত ও অবিচল ভাব প্রকাশ করিলেন, তাহা জগতে অত্যন্ত বিরল। বসুদেব যাহা বলিলেন তাহার প্রত্যেক কথাতেই তিনি যে বসুদেব অর্থাৎ মূর্ত্তিমান জ্ঞান ইহা প্রমাণিত হইতেছে। বসুদেবও বীর সুতরাং ইচ্ছা করিলে তিনি কংসকে যুদ্ধেও আহ্বান করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা করেন নাই। তিনি প্রথম কংসকে সামমার্গ আশ্রয় করিয়া একরূপ তোষামোদ করিয়া তাঁহার বক্তব্য আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার যেটুকু বক্তব্য, বিশেষ দৃঢ়-তার সহিত সেটুকুও বলিতে ত্রুটী করেন নাই। তিনি প্রথম বলিলেন হে কংস! তোমার গুণ প্রসংশনীয়, শূরগণ তোমার গুণের শ্লাঘা করিয়া থাকে অতএব তুমি কি করিতেছ? ইহাতে তোমার দুর্যশ হইবে, এইটুকু বলিয়া কংসকে কিছু শান্ত করার পর তিনি যে কথাটী বলিলেন কংসের প্রকৃতিগত বিশিষ্টতা তাহার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে নিহিত রহিয়াছে। তিনি বলিলেন যাহারা জন্মাইয়াছে তাহাদের দেহের জন্মের সঙ্গেই মৃত্যুও জন্মাইয়াছে সুতরাং দেহধারীর পক্ষে মৃত্যু অনিবার্য্য, আজই হউক আর শতবর্ষ পরেই

হউক মৃত্যু প্রাণীর পক্ষে অবশ্যম্ভাবী, কংসের নিকট বসুদেবের ইহাই প্রথম কথা। প্রথমে আমরা যে দ্বন্দ্বের কথা বলিয়াছি যে সমুদ্রমন্থনের কথা বলিয়াছি ইহাই তাহার প্রথম কথা।

মরণের পারে যাইতে চাই, মরণকে অতিক্রম করিতে চাই; কংসও চাহিয়াছিল, হিরণ্যকশিপুও চাহিয়াছিল, রাবণও চাহিয়াছিল, সমস্ত জগতই ত তাহাই চায় কিন্তু পার হইবে কি করিয়া? এইখানেই কংস ও বসুদেবের তর্ক। হিরণ্যকশিপু প্রত্যক্ষকে আয়ত্ত করিয়াছিল। ব্রহ্মার নিকট বর চাহিয়াছিল যেন অভ্যন্তরে বা বহির্ভাগে আমার মৃত্যু না হয়, মানুষ বা পশুর দ্বারা আমার মৃত্যু না হয়, দিবায় ও রাত্রিতে যেন আমার মৃত্যু না হয়, পৃথিবী বা আকাশে যেন আমার মৃত্যু না হয়। সে ভাবিয়াছিল এই যে বর লইলাম ইহার দ্বারাতেই আমি অমর হইব, কিন্তু সে বুঝিতে পারে নাই যে মৃগও নহে মনুষ্যও নহে এমন প্রাণীর হস্তে, দিবাও নহে রাত্রিও নহে এমন সময়ে, পৃথিবীওনহে আকাশও নহে এমন স্থানে মৃত্যু হইতে পারে।

রাবণ যাহা মনেও করিতে পারে নাই, সেই নর ও বানরের হস্তে তাহার জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিশাল বংশের ও রাজ্যের নাশ হইয়া গেল। মরণকে জয় করিতে হইবে। কিন্তু যে ভয় করে সে জয় করিতে পারে না। সমুদ্রমন্থনের বিষে চরাচর যখন মৃত্যুভয়ে কাঁপে তখন সেই বিষ যিনি আনন্দের সঙ্গে পান করেন তিনিই মৃত্যুঞ্জয়, সুতরাং মরণের গতি রোধ করিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছে সে পুনঃপুনঃ মরিয়াছে। আর মরণকে যে হাসিতে হাসিতে বরণ করিয়াছে সেই মরণের পরপারে অমৃতধামে গমন করিয়াছে। মরণ সর্ব্বাপেক্ষা ধ্রুব, এই কষ্টিপাথর, যে ভীরু ইহাকে এরাইতে চায় তাহার প্রত্যেক চেষ্টা তাহাকে মরণের সমীপবর্ত্তী করে। এই সত্যটা কংস বুঝিতে পারেন নাই।

বসুদেব যাহা বলিলেন তাহার তাৎপর্য্য এই, জীব যখন জন্মায় তখন তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না। সে সুখী হইবে কি দুঃখী হইবে, সে ধনী হইবে কি দরিদ্র হইবে সে পাপী হইবে কি পুণ্যাত্মা হইবে পণ্ডিত হইবে কি মূর্খ হইবে, ইহা বলা যায় না। কেবল একটা কথা স্থির করিয়া বলিতে পারা যায়, তাহা এই যে সে মরিবে সুতরাং এই চাঞ্চল্যপূর্ণ সংসারে মৃত্যুই সর্ব্বাপেক্ষা নিশ্চিত। কিন্তু কংস এই সুনিশ্চিত সত্যকে রোধ করিতে চায় আর এই যে কংসের বাঁচিবার চেষ্টা ইহা দেহ লইয়া বাঁচা, কারণ তত্ত্বদর্শী

বসুদেব তাহাকে বলিলেন যে, এই দেহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে দেহী আপনার কর্ম্মের দ্বারা অবশ হইয়া দেহান্তর প্রাপ্ত হয়। অধিক কি পথে চলিবার সময় সম্মুখের পা মাটীতে রাখিয়া তাহার পর যেমন পিছনের পা তোলা হয়, অথবা তৃণ-জলৌকা যেমন সম্মুখের তৃণটী ধরিয়া তবে পিছনের তৃণটী ছাড়ে, সেইরূপ জীব একটি নূতন দেহ আগে আশ্রয় করিয়া তবে পূর্ব্ব দেহ পরিত্যাগ করে। মৃত্যু যখন এই প্রকারের ব্যাপার, তখন সেজন্য বিচলিত হইবার কারণ নাই। কংস তাহার এই দেহটী লইয়া বাঁচিতে চায়। বাঁচিতে চাওয়াত স্বাভাবিক, ইহা প্রত্যেক জীবের প্রকৃতির মূলে বিদ্যমান, কিন্তু সত্য সত্য বাঁচিতে হইবে। কংস যে ভাবে বাঁচিতে চাহেন ইহা সত্যকার বাঁচা নয়, ইহা একটী মোহ, একটী স্বপ্ন, তাই বসুদেব বলিলেন যে, রাজদেহ ও শূকরদেহ দুই সমান। জলে চন্দ্রের ছায়া পড়িলে পর বাতাসে যেমন তাহা কাঁপে সেই প্রকার আত্মার জন্ম হয় না, দেহে অধ্যাস হয় মাত্র। বসুদেব এমন নিপুণতাবে কথাগুলি বলিলেন যে, কংস বুঝিতে পারুন বা না পারুন, তখন নিবৃত্ত হইলেন। বসুদেব এইরূপ অঙ্গীকার করিলেন যে, তাঁহার পুত্র হইলে তিনি কংসের হস্তে সমর্পণ করিবেন। আপাততঃ গোলযোগের নিষ্পত্তি হইল বটে কিন্তু কংস এই দেহ আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে অর্থাৎ যাহা মিথ্যা ছায়া মাত্র তাহাকে সত্য করিতে, যাহা হইবার নহে তাহাই করিতে, চেষ্টান্বিত হইয়া রহিলেন।

বাঁচিবার জন্য তিনি না করিয়াছেন এমন কর্ম্ম নাই। নিরীহ ও নির্দ্দোষ বসুদেব ও দেবকীকে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন, সদ্যজাত শিশুর চাঁদ মুখের পানে প্রসূতি যখন হৃদয়ভরা স্নেহ ও প্রাণভরা আনন্দ লইয়া করুণকোমল নেত্রে চাহিয়া আছেন তখন সেই শিশুকে কাড়িয়া আনিয়া মারিয়া ফেলিয়াছেন। এ মহাপাপ কেন? কংস বাঁচিতে চাহেন, যাহা হইবার নহে তাহাই করিতে চাহেন। কেবল বসুদেব-দেবকীর সন্তান বিনাশেই কংসের চেষ্টা শেষ হয় নাই, শেষে তাহার রাজ্যমধ্যে যাবতীয় সদ্যজাত শিশুকে বিনাশ করিতে লাগিল, কেন না কংস বাঁচিতে চাহে। এই প্রকারে বাঁচিবার চেষ্টা কংস-প্রকৃতির লক্ষণ। কংসের পিতা উগ্রসেনের প্রকৃতিতেও এই ভাবটা সূক্ষ্মরূপে ছিল, প্রথমে আমরা তাঁহার পরিচয় পাই নাই শেষে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল। উগ্রসেনের প্রকৃতি মধ্যে লুক্কায়িত এই বিষ যখন ব্যক্ত হইল তখন কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, ভারতের অধিকাংশ

রাজবংশ ধ্বংশ হইয়াছে, যদুবংশ তখন অত্যন্ত প্রবল। যদুবংশ ধ্বংশ হইলেই শ্রীকৃষ্ণ লীলা সম্বরণ করেন। দশম স্কন্ধের প্রথমেই কংসের কথা আর একাদশ স্কন্ধের প্রথমে উগ্রসেনের কথা। উগ্রসেনের কথাটা এই।

যদুবংশের বালকগণ এতদূর উদ্ধত হইয়াছে যে, একদিন বড় বড় মহর্ষিগণের সহিত তাহারা কৌতুক করিয়া বসিল। বিশ্বামিত্র, অসিত, কণ্ব, দুর্ব্বাসা, ভৃগু, অঙ্গিরা, কশ্যপ, বামদেব, অত্রি, বশিষ্ঠ, নারদ প্রভৃতি ঋষিগণ যাইতেছেন আর যদুবংশীয় বালকেরা জাম্ববতীর পুত্র সাম্বকে স্ত্রীবেশ পরিধান করাইয়া মুনিদের সম্মুখে লইয়া গিয়া তাঁহাদের প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এই মেয়েটীর গর্ভ হইয়াছে ইহার কি সন্তান হইবে বলিয়া দিলে অনুগৃহীত হইব। ঋষিগণ সমস্তই বুঝিলেন, কুপিত হইয়া বলিলেন ইহার গর্ভে তোমাদের কুলনাশন এক মুষলের জন্ম হইবে, বালকেরা সাম্বের উদরের বস্ত্র মধ্যে দেখিল একটী মূষল রহিয়াছে। তাহাদের মনে ভয় হইল তাহারা শ্রীকৃষ্ণকে কিছু বলিল না, উগ্রসেনের নিকট গিয়া সমস্ত কথা বলিল। উগ্রসেন বালকদের কোনরূপ তিরস্কার করিলেন না, তিনি ঋষিদের অব্যর্থ বাক্য কি করিয়া ব্যর্থ করা যায় তাহাই ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার সুপক্ক মাথায় একটা উপায়ও আসিয়া জুটিল। তিনি বলিলেন এই লৌহমুষলকে চূর্ণ করিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দাও। উগ্রসেন ভাবিয়াছিলেন তাহা হইলেই আর কুলনাশন হইবে না। মানুষের এই প্রকার প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও তৎপ্রসূত উপায়-উদ্ভাবন যদি সকল কার্য্যের নিয়ামক হইত তাহা হইলে চিন্তা করিবার কিছুই থাকিত না। উগ্রসেন যাহা স্বপ্নেও কখন ভাবিতে পারেন নাই, দৈব ইচ্ছায় তাহাই হইল। মুষলের ভিতরের সামান্য একটু লোহা চূর্ণ হইল না। অপর অংশ গুঁড়া হইয়া গেল। সমুদ্রের লোণা জলের সহিত এই লৌহচূর্ণের কিরূপ রাসায়নিক ক্রিয়া হইল তাহা বলা যায় না, বৈজ্ঞানিকেরা তাহা আলোচনা করিলে লাভবান হইতে পারেন। কিন্তু লোহার গুঁড়ায় এরকা নামক এক তৃণের জন্ম হইল, সে তৃণ পাহাড়ের বাঁশের মত। এই তৃণের লাঠিতে যদুবংশীয়গণ ভবিষ্যতে পরস্পর পরস্পরের মাথা ভাঙ্গিয়া দিবে বলিয়া তৃণ বাড়িতে লাগিল। ঐ মুষলের যে অংশ চূর্ণ হয় নাই সেই অংশ এক মৎস্য আসিয়া গ্রাস করিল। এক কৈবর্ত্ত জাল ফেলিয়া মাছ ধরিতে ধরিতে সেই মাছটিকে ধরিয়া ফেলিল, মাছের পেট হইতে লৌহখণ্ড বাহির হইলে পর জরা নামক এক ব্যাধ সেই লৌহখণ্ড লইয়া তাহার তীরের ফলা প্রস্তুত করিল। এই

প্রকারে যদুবংশের বিনাশ ও শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের ব্যবস্থা অপ্রত্যক্ষের মধ্যে সকলের অগোচরে হইয়া থাকিল।

তাহা হইলে কংস-প্রকৃতি কি, মোটামুটি বুঝিতে পারা যাইতেছে, পুরাণাদি শাস্ত্র যতই শ্রবণ ও স্মরণ করা যাইবে এই প্রকৃতির সহিত আমাদের ততই পরিচয় হইবে। এই প্রকৃতি আমাদিগকে লীলা দেখিতে দেয় না।

ইহা ছাড়া আর এক প্রকৃতি আছে সেও লীলা দেখিতে পায় না। কংশ যেমন প্রত্যক্ষকেই সর্ব্বস্ব করিয়া ধরিয়া বসিয়া আছে, ইহারা তেমনই অপ্রত্যক্ষে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া প্রত্যক্ষকে মানিতে চায় না। বেদবাদী ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞশালায় গ্রীষ্মকালের দ্বিপ্রহরে ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় কাতর রাখাল বালকগণকে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম অন্নভিক্ষা করিতে পাঠাইয়াছিলেন। যজ্ঞের কার্য্য তখন শেষ হইয়া গিয়াছিল সুতরাং সে সময় অন্ন দিলে তাঁহাদের কর্ম্মের কোন হানি হইত না, কিন্তু তাঁহারা অন্ন দিলেন না। শ্রীমদ্ভাগবত এই সমস্ত ব্রাহ্মণকে "বেদবাদী" বলিয়াছেন। "বেদবাদী" কথার অর্থ শ্রীধর স্বামীর মতে বেদ-ঘোষণশীল অর্থাৎ যাঁহারা বেদের কথা লইয়া উন্মত্ত হইয়া আছেন, বেদের মর্ম্ম কি তাহা জানেন না। ইহারা 'ক্ষুদ্রাশা' 'ভূরিকর্ম্মা' 'বালিশ' অর্থাৎ মূর্খ, কিন্তু সে কথা বলিবার উপায় নাই, তাঁহারা নিজেদের অত্যন্ত জ্ঞানবৃদ্ধ ও ক্রিয়াদক্ষ বলিয়া বিবেচনা করেন। এই সমস্ত যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের পত্নীগণ তাঁহাদের দ্বিজাতি-সংস্কার, গুরুগৃহে বাস, শৌচ ও ত্রিবিধ দীক্ষা না থাকিলেও লীলায় প্রবেশ করিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণগণের ভাগ্যে তাহা হইল না। পতিব্রতা পত্নীগণের পুণ্যের ফলে, শেষ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণদের কিছু চৈতন্ত হইয়াছিল বটে কিন্তু কংসরাজার ভয়ে তাঁহারা লীলা স্বীকার করিতে পারেন নাই। কংসের মৃত্যু-ভয় আর ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রভয় ও কংসভয়, এমন করিয়া ভয়ের মধ্যে থাকিলে লীলায় প্রবেশ ঘটে না। বেদ বলিয়াছেন 'অভীঃ' অর্থাৎ ভয়শূন্য হইতে হইবে। আবার বলিয়াছেন বলহীন ব্যক্তির আত্মলাভ ঘটে না, যাহারা 'আধমনা' লোক তাহারা লীলায় যাইতে পারে না। যে ব্রজবাসীগণকে লইয়া এই লীলা হইয়াছিল, তাহাদের বিষয় চিন্তা করিলে প্রথমে দেখা যায় যে, তাহারা কেমন ভয়হীন, নিজেদের সরল বিশ্বাসের পশ্চাতে তাহারা চলিয়াছে,নিজেদের হৃদয়ের কাছে তাহারা চোর নয়।গোপীগণ তো লোকভয়, ধর্ম্মভয়, শাস্ত্রভয়, লজ্জা সকলই ছাড়িয়াছিলেন, অন্যান্য ব্রজবাসীরাও সকলই ছাড়িয়াছিলেন। ইন্দ্রযজ্ঞ একটা কত বড় ব্যাপার, কতকাল হইতে গোপ-

পল্লীতে তাহার অনুষ্ঠান, কৃষ্ণ তাহার প্রতিবাদ করিলেন, বলিলেন ইন্দ্র দেবতা সত্য, কিন্তু তোমাদের তিনি দেবতা নহেন, যে যাহা দ্বারা বর্ত্তমান হয় তাহার তাহাই দেবতা 'অঞ্জসা যেন বর্ত্তেত তদেবাস্যহি দৈবতম্' কিন্তু এটুকু বোঝে কে ? আমার স্বভাব যাহা চায় আমি যে তাহা লুকাইয়া চলিয়াছি, গোপনে যাহা করি প্রকাশ্যে যে তাহারই প্রতিবাদ করি, এমন করিয়া মিথ্যার উপাসনা যে করে সে লীলায় প্রবেশ করে না। ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধ গোপগণকে বুঝাইলেন, যে মানুষ যেভাব অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে যদি সে সেভাব ছাড়িয়া অন্যভাবের পূজা করে তাহা হইলে অসতী নারীর যেমন উপপতি-সেবা, ঠিক সেই প্রকার কার্য্য করা হয়। ইন্দ্র বড় লোকের দেবতা, স্বর্গে যাহারা সুধা খাইতে চায় তাহারা ইন্দ্রের পূজা করে করুক, তোমরা গরু বাছুর লইয়া চাষ আবাদ কর বড় লোকের দেবতা লইয়া তোমাদের কি ?

শ্রীকৃষ্ণের কথায় বৃদ্ধ গোপেরা বুঝিলেন। এতদিন তাঁহারা নিজের হৃদয়ের সরল স্পন্দনের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই। তাই মানুষ হইয়াও অতি-মানুষের মধ্যে অভীষ্ট দেবকে খুঁজিয়াছেন, আজ তাঁহারা সত্য বুঝিলেন। বেদবাদী ব্রাহ্মণদের মত কংসের ভয়ে সত্য পাইয়াও তাঁহারা অনুসরণে নিরস্ত হন নাই। বৃদ্ধ গোপগণ ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ করিয়া দিলেন। দেবরাজের কোপ ভূরি ভূরি অশনি গর্জ্জন ও স্তম্ভের ন্যায় স্থূল জলধারার অজস্র বর্ষণের মধ্য দিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু গোপগণ কৃষ্ণের উপর বিশ্বাস করিয়া বসিয়া থাকিলেন, বিচলিত হইলেন না। বেদবাদী ব্রাহ্মণগণের উপর এমন ধারা অত্যাচার কংস বোধ হয় করিতেন না, কারণ তাঁহাদের পত্নীগণ রাখাল বালকদের জন্য সোণার থালায় করিয়া চতুর্ব্বিধ অন্ন লইয়া গিয়াছিল বলিয়া রাজদরবারে কোন অভিযোগ হয় নাই, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা পণ্ডিত লোক, কাজেই বেশী সতর্ক, সকল দিক বজায় রাখিয়া চলেন। বেশী বিদ্যা হইলে এই রূপই [illegible] কাজেই তাঁহারা জানিয়াও গ্রহণ করিলেন না। কিন্তু এমন করিয়া সকল দিক যাহারা বজায় রাখিতে চাহিয়াছে, তাহাদের কোন দিকই বজায় থাকে নাই ইহারই নাম ক্ষিপ্তচিত্ততা, সারল্য ও একাগ্রতা ব্যতিরেকে কিছু হয় না। বেদবাদী ব্রাহ্মণদের যজ্ঞশালায় শ্রীকৃষ্ণ যেদিন অন্নভিক্ষা করেন, সেই দিন তিনি যমুনার তীরবর্ত্তী বৃক্ষ সমূহের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া প্রকৃত ধর্ম্মের বা ভাগবত ধর্ম্মের যাহা সার কথা, তাহাই বুঝাইয়াছিলেন। টীকাকারেরা বলিয়াছেন এই কথাগুলির তাৎপর্য্য বড়ই গভীর,

কারণ পরে দেখা যাইবে যে, বৃক্ষগণকে দেখিয়া বৃক্ষগণের তত্ত্ব আলোচনা করিয়া সত্য ধর্ম্মের যে শিক্ষা ও উপদেশ পাওয়া যায়, বহু শাস্ত্রের জটিল সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহা পাওয়া যায় না।

বাসুদেব-উপাসনা প্রত্যক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন। ইহার অর্থ এই যে, আমরা নিজেদের কাছে যেন নিজেদের বঞ্চনা না করি, হৃদয় যখন যাহা সত্য করিয়া চায় তাহা যদি অসৎ হয় তাহা হইলে আর চাহিব না, আর যদি সৎ ও স্বাভাবিক হয় তাহা হইলে জোরের সহিত নির্ভয়ে তাহা চাইব। শব্দের জন্য স্পর্শের জন্য রূপ রস গন্ধের জন্য প্রতিমুহূর্ত্তে যে পাগল, সে যখন বলে আমার উপাস্য শব্দহীন স্পর্শহীন রূপরস গন্ধহীন, তখন সে ত মরিতে বসিয়াছে।

"The death of nations is in the rejection of their own most wistful desire. The truth appears, is seen, touched, handled and debated; is accepted notionally but rejected in fact and crucified.

এই কথাটী একজন নব্য মার্কিন গ্রন্থকারের। সুতরাং বর্ত্তমান জগতে লীলাবাদের মূলে যে সত্য নিহিত, তাহা প্রচার হইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবত বাসুদেবই বেদ, যজ্ঞ, যোগ, ক্রিয়া, জ্ঞান, তপস্যা ও ধর্ম্মের লক্ষ্য, এই কথা বলারপর পরবর্ত্তী চারিটি শ্লোকে এই কথাই আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন। এই সমুদয় শ্লোকে লীলাবাদের সাধনার যাহা আদর্শ তাহাই বলা হইতেছে।

স এবেদং সসর্জ্জাগ্রে ভগবানাত্মমায়য়া।
সদসদ্রূপয়া চাসৌ গুণময্যাগুণোবিভুঃ॥
তয়া বিলসিতেষেবু গুণেষুগুণবানিব।
অন্তঃপ্রবিষ্ট আভাতি বিজ্ঞানেন বিজৃম্ভিতঃ॥
যথা হ্যবহিতো বহ্নি দারুষেকঃ স্বযোনিষু।
নানেব ভাতি বিশ্বাত্মা ভূতেষু চ তথাপুমান্।
অসৌ গুণময়ৈর্ভাবৈভূ্ত সূক্ষ্মেন্দ্রিয়াত্মভিঃ।
স্বনির্ম্মিতেষু নির্ব্বিষ্টো ভুঙ্‌ক্তে ভূতেষু তদ্‌গুণান্॥

পূর্ব্বের শ্লোক দুইটিতে বলা হইয়াছে যে সকল শাস্ত্র ও সকল সাধনা বাসুদেবে সমন্বয় প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন যেন আপত্তি করা হইতেছে, ইহা কি প্রকারে সম্ভব ?

"ননু জগৎসর্গপ্রবেশনিয়মাদিলীলাযুক্তে বস্তুনি সর্ব্বশাস্ত্রসমন্বয়ো দৃশ্যতে কথং বাসুদেবপরত্বং সর্ব্বস্য।" জগতের সৃষ্টি, তাহাতে প্রবেশ ও তাহার পরিচালন, যে বস্তুর লীলা সেই বস্তুকেই সকল শাস্ত্র পরম বস্তু বলিয়াছেন সুতরাং সকল শাস্ত্র ও সকল সাধনা বাসুদেবপর এরূপ কথা বলা হইল কেন? ইহার উত্তরে শ্রীমদ্ভাগবত চারিটি শ্লোকে বলিতেছেন এই বাসুদেবের কার্য্যকারণাত্মিকা মায়া, যাহার দ্বারায় তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন সেই মায়া তাঁহার স্বরূপের অর্থাৎ তাঁহার আত্ম-মায়া। তিনি বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী, আত্ম মায়ায় সৃজন করিয়াও স্বয়ং অগুণ। এই গেল তাঁহার জগৎকারণতা, তিনি তাঁহার মায়ায় বিলসিত এই সমুদয় গুণের অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া বিজ্ঞান বা চিচ্ছক্তি দ্বারায় বিজৃম্ভিত অর্থাৎ অতিশয় উর্জ্জিত হইয়া রহিয়াছেন। এই গেল প্রথম দুইটি শ্লোকের অর্থ। ইহার দ্বারায় বাসুদেবতত্ত্ব যে একই সময়ে সগুণ ও নির্গুণ ইহাই বলা হইল। আর যে মায়া সৃষ্ট ও জগৎ প্রবেশ লীলা আদির হেতু সেই মায়া তাঁহার নিজের ইহাও বলা হইল। আর তৃতীয় কথা এই বলা হইল যে, পিতৃভূত ও প্রজাপতি আদি যাহা কিছু আমাদের উপাস্য তৎসমুদয়েরই বাসুদেব স্রষ্টা। তৃতীয় শ্লোকটীতে যাহা বলা হইল তাহা কঠোপনিষদের একটী সুপরিচিত শ্লোকের ভাব লইয়া রচিত এইরূপ মনে হয়। কিন্তু শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাহার একটু অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন। শ্লোকটির প্রথম অর্থ এই যে, তিনি অর্থাৎ বাসুদেব এক হইয়াও বহুরূপে লীলা করিতেছেন। অগ্নি যেমন আপনার প্রকাশক বহু বস্তুতে নিহিত থাকিয়া নানারূপে প্রকাশিত হন, বিশ্বাত্মাপুমান্ অর্থাৎ পরমেশ্বর সেইরূপ যাবতীয় প্রাণীতে অন্তর্যামী বা ক্ষেত্রজ্ঞ হইয়া যোনিগত তারতম্য অনুসারে নানারূপে প্রকাশ পান। এই অর্থ শ্রীধর স্বামীর মতানুযায়ী, হইাতে যেন অগ্নির প্রজ্জ্বলিত অবস্থার কথাই বলা হইল অর্থাৎ আগুণ যেমন বক্র কাষ্ঠে বক্র, চতুষ্কোণ কাষ্ঠে চতুষ্কোণ হইয়া প্রকাশ পায় অথচ আগুণ এক, বাসুদেবও সেইরূপ নানা দেহে নানারূপে অভিব্যক্ত। শ্রীল শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন অন্তর্যামী পরমেশ্বর সকলভূতে সর্ব্বদাই অবস্থিত, কিন্তু অগ্নি যেমন অপ্রকট তিনিও সেইরূপ। মন্থন করিলে অগ্নি যেমন সকল বস্তুরই ভিতর হইতে প্রকটিত হয় এবং সেই বস্তুকে পুড়াইয়া ফেলে সেইরূপ শ্রবণাদি সাধনের সাহায্যে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হইবামাত্র জীবের মায়িক উপাধি দূর হইয়া যায়। সৃষ্টিলীলা, জগৎ প্রবেশ ও প্রকাশলীলা বলার পর ৪র্থ শ্লোকে ভোগরূপালীলা বর্ণনা করিতে-

ছেন, এই বিশ্বাত্মা ভূতসূক্ষ্মসমূহ, বিষয়সমূহ, ইন্দ্রিয়সমূহ আত্মা ও মন প্রভৃতির গুণময় ভাবের দ্বারা আপনার নির্ম্মিত দেব তির্য্যক প্রভৃতি ভূতে প্রবিষ্ট হইয়া তদনুরূপ বিষয় সমূহ ভোগ করিতেছেন। জীবের যে বৈষয়িক সুখভোগ তাহা অন্তর্যামী ব্যতীত সিদ্ধ হয় না এবং জীব তাঁহার তটস্থা শক্তি বলিয়া সেই জীবের সাহায্যে সেই অন্তর্যামী নিজেই ভোগ করিতেছেন অথবা জীবকুলকে ভোগ করাইতেছেন এরূপও বলা যায়। ইহাই শ্রীল শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কৃত টীকার তাৎপর্য্য। তাহা হইলে ব্যাপারটা এইরূপ। আমি মনে করিতেছি আমি দেখিতেছি, ইহা ভ্রম। আমাদের এই অনন্ত কোটী জীবের বহুরূপে দর্শন ক্রিয়ার মধ্যে একমাত্র তিনি দ্রষ্টা, আমাদের এই বহু জীবের বহুবিধ ভোগের তিনি একমাত্র ভোক্তা, ইহাই লীলাবাদ।

এইবার প্রথমস্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ শ্লোক

ভাবয়ত্যেষ সত্ত্বেন লোকান্ বৈ লোকভাবনঃ।
লীলাবতারানুরতো দেবতির্য্যঙ্ নরাদিষু॥

এই শ্লোকে অবতার সমূহের আবির্ভাবের, বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণাবতারের সাধারণ প্রয়োজন বলিতেছেন। প্রতিযোনিতে অন্তর্যামীরূপে বহুরূপ হইয়া বহু উপাধির আশ্রয়ে তিনি যে লীলা করিতেছেন তাহা বলা হইল, ইহা ছাড়া স্বরূপের নিত্যলীলায় তিনি লোকসমূহকে পালন করেন অথবা আপনাতে প্রেমযুক্ত করেন, তিনি সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া দেব তির্য্যক্ নরাদিতে লীলার জন্য যে সকল অবতারত্ব গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে অনুরক্ত হইয়া লোক সকলের মঙ্গল হইয়া থাকে।

উদাসী।

ব্যাপ্ত হ'য়েছে বিশ্ববক্ষ
কাহার করুণা-উচ্ছ্বাসে
গরিমামাখা দীপ্তি কাহার
ভাসিয়া যায়গো বিমানে?
গুচ্ছ করিয়া গুছিয়া হাস্য
কে দেয় ছড়ায়ে এখানে
কোন্ ক্ষিতির সীমান্ত সে
হাসির রাজ্য সেখানে।

মহিমা কাহার আশ্বাস দেয়
ব্যথীর ব্যথা ক্রন্দনে
পুঞ্জীকৃত আঁধার মাঝে
পুলকি কাহার স্পন্দনে?
গগনে করিছে রাঙা
শোভন কান্ত সিন্দুরে,
তাণ্ডব করে নৃত্য এত
ভক্ত-হৃদয়-কন্দরে

অদৃশ্য তার পরশ লাগি
ফুলের কুঁড়ি মুঞ্জরে।
তাঁর করুণা মধু-পানে
মক্ষিকা সব গুঞ্জরে।
দীক্ষা কাহার পাঠায় কর্ণে
ঊষার বায়ু-হিল্লোলে
দন্তিছে কার শাসন-ব্যাজে
তুমুল সিন্ধু-কল্লোলে?

ভূচর খেচর বদ্ধ কাহার
বিশাল বিশ্বপিঞ্জরে
কোথায় তিনি লিপ্ত মায়া
দুর্গম কোন্ মন্দিরে।
মুক্তি-ব্যাকুল বিশ্ববাসী
সবাই যেন প্রবাসী
অস্থিরতা তাদের যেন
করছে আমায় উদাসী।

শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

রুদ্ধ।

"গান"

তুমি অসীমের মাঝে লয়ে যাবে বলে
"রুদ্ধ" তোমারি আশে
আর কত-কাল, বসে রবে প্রভু
দীর্ণ মলিন বাসে?
যদি চিরসঞ্চিত পাপ-জলদ,
আবরিয়া মোরে রাখে গো
তরুণ অরুণ, আকাশে আমার
আর যদি পাহি ভাতে গো—
তবে ফুটিবেনা কিগো, কোরক তোমার
জীবন-সলিল-পাথারে
তুমি লুটিবেনা কিগো হে মোর ভ্রমর
সে মধু আমার মাঝারে?
যদি হারানো'র নাহি মধু গো
হে মোর নিভৃত-হৃদয়-দেবতা
জগজন-মন-বঁধু গো!
তবে কেন চায় চিত্ত নিতি হারাইতে
অভয় চরণে হরষে।
তুমি অসীমের মাঝে ইত্যাদি।

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য।
সংস্কৃত কলেজ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণভক্তি রসকদম্ব। (১০)

সমঃ ॥২৮॥
রাগদ্বেষবিমুক্তো যঃ সমঃ স কথিতো বুধৈঃ ॥
বদান্যঃ ॥২৯॥
দানবীরো ভবেদ্‌যস্তু স বদান্যো নিগদ্যতে ॥
ধার্ম্মিকঃ ॥৩০॥
কুর্ব্বন্ কারয়তে ধর্ম্মং যঃ স ধার্ম্মিক উচ্যতে ॥
শূরঃ ॥৩১॥
উৎসাহী যুধি শূরোঽস্ত্র প্রয়োগে চ বিচক্ষণঃ ॥
ইতি দ্বিধা ॥
করুণঃ ॥ ৩২ ॥
পরদুঃখাসহো যস্তু করুণঃ স নিগদ্যতে
মান্যমানকৃৎ ॥৩৩॥
গুরুব্রাহ্মণ বৃদ্ধাদি পূজকো মান্যমানকৃৎ ॥
দক্ষিণঃ ॥৩৪॥
সৌশীল্য সৌম্য চরিতো দক্ষিণঃ কীর্ত্ত্যতে বুধৈঃ ॥
বিনয়ী ॥৩৫॥
ঔদ্ধত্যপরিহারী যঃ কথ্যতে বিনয়ী-ত্যসৌ ॥
হ্রীমান্ ॥৩৬॥
জাতেঽস্মর রহস্যেঽন্যৈঃ ক্রিয়মাণে ভবেঽথবা।
শালীনত্বেন সঙ্কোচং ভজন্ হ্রীমানু-দীর্য্যতে ॥
শরণাগত পালকঃ ॥৩৭॥
পলায়ন্ শরণাপন্নান্ শরণাগত পালকঃ ॥
সুখী ॥৩৮॥
ভোক্তা চ দুঃখগন্ধৈরপ্যস্পৃষ্টঃ সুখী ভবেৎ ॥
যথা
ন হানিং ন গ্লানিং ন নিজগৃহ কৃত্য ব্যসনিতাং ॥
ন ঘোরং নোদ্‌ঘূর্ণাং ন কিল কদনং বেত্তি কিমপি।
বরাঙ্গীভিঃ সঙ্গীকৃত সুহৃদনঙ্গাভি রঞ্জিতো
হরির্ব্বৃন্দারণ্যে পরমনিশমুচ্চৈর্বিহরতি
ভক্ত সুহৃৎ ॥৩৯॥
সুসেব্যো দাস বন্ধুশ্চ দ্বিধা ভক্ত-সুহৃন্মতঃ ॥
প্রেমবশ্যঃ ॥ ৪০ ॥
প্রিয়ত্বমাত্রবশ্যো যঃ প্রেমবশ্যোভবে-দসৌ ॥
যথা মাতুঃ শ্রমং দৃষ্ট্বা উদূখল-বন্ধনে আসীৎ ॥
সর্ব্বশুভঙ্করঃ ॥ ৪১ ॥
সর্ব্বেষাং হিতকারী যঃ স স্যাৎ সর্ব্ব-শুভঙ্করঃ ॥
প্রতাপী ॥ ৪২ ॥
প্রতাপী পৌরুষোদ্ভূত শত্রুতাপি প্রসিদ্ধিভাক্ ॥
কীর্ত্তিমান্ ॥ ৪৩ ॥
যশোভিনির্ম্মলৈর্যুক্তঃ কীর্ত্তিমানিতি কথ্যতে ॥

রক্তলোকঃ ॥ ৪৪ ॥
পাত্রং লোকানুরাগানাং রক্তলোকং বিদুর্ব্বুধাঃ ॥
সাধুসমাশ্রয়ঃ ॥ ৪৫ ॥
সদেকপক্ষপাতী যঃ স স্যাৎ সাধু-সমাশ্রয়ঃ ॥
নারীগণমনোহারী ॥ ৪৬ ॥
সুন্দরীগণমোহনঃ ॥
সর্ব্বারাধ্যঃ ॥ ৪৭ ॥
সর্ব্বেষামগ্রপূজ্যো যঃ স সর্ব্বারাধ্য উচ্যতে ॥
সমৃদ্ধিমান্ ॥ ৪৮ ॥
মহাসম্পত্তিযুক্তো যঃ স ভবেচ্চসমৃদ্ধি-মান্ ॥
বরীয়ান্ ॥ ৪৯ ॥
সর্ব্বেষামপি মুখ্যো যঃ স বরীয়ানী-র্য্যতে ॥
ঈশ্বরঃ ॥ ৫০ ॥
বিধেশ্বর স্বতন্ত্রশ্চ দুর্জ্জ্যাজ্ঞশ্চ কীর্ত্ত্যতে ॥
ইতি দ্বিধা।
সদাস্বরূপসংপ্রাপ্তো মায়াকার্য্যাহবশী-কৃতঃ ॥ ৫১ ॥
অথ সর্ব্বজ্ঞঃ ॥ ৫২
পরচিত্তস্থিতং দেশ কালান্তরিতং তথা।
যো জানাতি সমস্তার্থং স সর্ব্বজ্ঞো নিগদ্যতে ॥
নিত্যনূতনঃ ॥ ৫৩ ॥
সদানুভূয়মানোপি করোত্যননুভূতবৎ।
বিস্ময়ং মাধুরীভির্যঃ স প্রোক্তো নিত্যনূতনঃ ॥
সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গঃ ॥ ৫৪
সচ্চিদানন্দঘনাকৃতিঃ ॥
সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ ॥ ৫৫
স্ববশাখিলসিদ্ধিঃ স্যাৎ সর্ব্বসিদ্ধি-নিষেবিতঃ ॥
অবিচিন্ত্য-মহাশক্তিঃ ॥ ৫৬
যথা।
দিব্যসর্গাদি কর্ত্তৃত্বং ব্রহ্মরুদ্রাদি-মোহনং।
ভক্তপ্রারব্ধবিধ্বংস ইত্যাদ্যাচিন্ত্য-শক্তিতা ॥
কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহঃ ॥ ৫৭
অগণ্য জগদণ্ডাঢ্যঃ কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহঃ।
কাহং তমো মহদহং খচরাগ্নিবার্ভূ ইতি দশমে ॥
অবতারাবলীবীজং অবতারী নিগদ্যতে ॥ ৫৮
বেদানুদ্ধরতে জগন্তী বহতে ইত্যাদি ॥
হতারিগতিদায়কঃ ॥ ৫৯ ॥
মুক্তিদাতা হতারীণাং হতারিগতি-দায়কঃ ॥
আত্মারামগণাকর্ষী ইত্যেতদ্ব্যক্তার্থঃ ॥
অসাধারণ চতুষ্কং যথা তত্রলীলা ॥ ৬১
সন্তি যদ্যপি ভূয়াংশ কৃষ্ণলীলা মহোত্তমাঃ।
গোপাললীলাস্তত্রাপি সর্ব্বতোহতি মনোহরাঃ ॥

এবং বৃহদ্বামনে।
নহি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে
কীদৃশং ভবেৎ ॥
প্রেম্না প্রিয়াধিক্যং ॥ ৬২ ॥
গোপীবাক্যং দশমে।
অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং
ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাং ইত্যাদি ॥
বেণুমাধুর্য্যং ॥ ৬৩ ॥
বিদগ্ধমাধবে।
রুদ্ধন্নম্বুভৃতশ্চমৎকৃতিপরং কুর্ব্বন্
মুহুস্তুম্বুরুং।
ধ্যানাদন্তরয়ন্ সনন্দনমুখান্‌বিস্মেরয়ন্
বেধসং ॥
ঔৎসুক্যাবলিভির্বলিঞ্চটুলয়ন্
ভোগীন্দ্রমাঘূর্ণয়ন্
ভিন্দন্নণ্ডকটাহভিত্তিমভিতো বভ্রাম
বংশীধ্বনিঃ ॥
রূপমাধুর্য্যং ॥ ৬৪ ॥
শ্রীদশমে
কাস্ত্র্যঙ্গতে কলপদামৃতবেণুগীত—
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্নচলেত্রিলোক্যাং
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্যরূপং
যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥
দিঙ্মাত্র কহিল ইথে গুণের কথন।
সম্যক্ কৃষ্ণের গুণ কে করে গণন ॥
আকাশের তারা কিম্বা পৃথিবীর ধূলি।
বরং গণনা করে যে হয় সুকৃতি ॥
সমুদ্রের ঢেউ গণন বরং হয়।
কৃষ্ণের অচিন্ত্যগুণ সংখ্যা নাহি হয় ॥
এই কথা ব্রহ্মস্তুতি ভাগবত দশমে।
দৈন্য উক্তি করি স্তুতিকৈল প্রভু
স্থানে ॥
যথা।
গুণাত্মনস্তেপি গুণানবিমাতুং
হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য।
কালেন যৈর্ব্বাবিমিতাঃসুকল্পৈ
ভূপাংশবঃ খেমিহিকাদ্যুভাসঃ ॥
নিত্যগুণ যুক্ত কৃষ্ণ নায়ক-শিরোমণি।
ভক্তাপেক্ষিক কৃষ্ণ ত্রিবিধ বাখানি ॥
পূর্ণতম পূর্ণতর পূর্ণ ভগবান।
নাটক শাস্ত্রে কহেন এই তিন নাম ॥
যথা।
হরি পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধা।
অখিলগুণ প্রকাশক সর্ব্বগুণোপেত।
পূর্ণতম নন্দগৃহে ভগবান খ্যাত ॥
তাহা হৈতে কোন গুণ অল্প সন্দর্শন।
পূর্ণতর নাম বলি হয় বিশেষণ ॥
তাহা হৈতে ন্যূনগুণ যাহাতে দেখিয়ে।
পূর্ণ ভগবান কৃষ্ণ সেখানে কহিয়ে ॥
যথা
প্রকাশিতাখিলগুণঃ স্মৃতঃ পূর্ণতমো-
বুধৈঃ।
অসর্ব্বব্যঞ্জকঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণোঽল্পদর্শকঃ ॥
শ্রীকৃষ্ণপূর্ণতম গোকুল নগরে।
পূর্ণতর মথুরাতে পূর্ণ দ্বারকাপুরে ॥
যথা
কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূদ্গোকুলা-
ন্তরে
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকামথুরাদিষু ॥
লীলাভেদে ক্রীড়ালাগি রসের পোষণ।

সেই কৃষ্ণ চতুর্ব্বিধ নায়ক নাম হন॥
ধীরোদাত্ত ধীরললিত ধীরপ্রশান্ত-
নাম।
ধীরোদ্ধত বলি এই চারি অভিধান॥
অথ ধীরোদাত্তঃ।
গম্ভীর বিনয় ক্ষমাশীল কারুণ্যতা।
ধীরোদাত্ত দৃঢ়ব্রতাদি গূঢ়গর্ব্বতা॥
ধীরোদাত্ত গুণ দেখি শ্রীরঘুনন্দনে।
লীলাক্রমে ভক্ত কৃষ্ণে তাহা মানে॥
ইদং হি ধীরোদাত্তত্বং পূর্ব্বৈঃ প্রোক্তং
রঘুদ্বহে।
তত্তত্কার্য্যাবেশ তথা কৃষ্ণে
বিলোক্যতে॥
অথ ধীরললিতঃ।
বিদগ্ধ নবতরুণ রস পরিহাস।
প্রেয়ার অধীন হয় বিবিধ বিলাস॥
ধীর ললিতের গুণ এইরূপ দেখি।
নন্দসুতে ব্রজপুরে সর্ব্বভাবে লেখি॥
ললিতের গুণ প্রায় কন্দর্পে উদাহরণ।
প্রকট ললিত ধীর শ্রীনন্দনন্দন॥
যথা।
গোবিন্দে প্রকটং ধীরললিতত্বং
প্রদৃশ্যতে।
উদাহরন্তি নাট্যজ্ঞাঃ প্রায়োঽত্র
মকরধ্বজং॥
অথ ধীরশান্তঃ
শমপ্রকৃতি সুখী বিনয়ী জিতেন্দ্রিয়।
ক্লেশাদি সহনগুণ ধীরশান্তে হয়॥
এই গুণ যুধিষ্ঠির রাজাতে দেখিয়ে।
লীলাক্রমে সেইগুণ শ্রীকৃষ্ণে লেখিয়ে॥

যথা।
যুধিষ্ঠিরাদিকো ধীরৈর্ধীরশান্তঃ
প্রকীর্ত্তিতঃ॥
অথ ধীরোদ্ধতঃ॥
মাৎসর্য্য অহঙ্কার আর মায়ারোষ
ছল।
ধীরোদ্ধতে দেখি পুন এই ত সকল॥
ধীরোদ্ধতাদিগুণ রয় ভীমসেনে।
লীলাভেদে কভু দেখি শ্রীনন্দ নন্দনে॥
যথা।
ধীরোদ্ধতাশ্চ বিবস্তির্ভীমসেনাদি-
রুচ্যতে।
ধীরোদ্ধতের গুণ মাৎসর্য্যাদি করি।
অহঙ্কার মায়াদি হয় দোষের ভিতরি॥
সর্ব্বদোষ হীন হয় ভগবানের দেহ।
ধীরোদ্ধত গুণ তবে কিসে কৃষ্ণে কহ॥
এই দোষ নাহি কৃষ্ণে প্রচারে
বাহিরে।
লীলাক্রমে কোন রস পোষকের তরে॥
যথা
মাৎসর্য্যাদ্যাঃ প্রতীয়ন্তে দোষত্বেন
যদপ্যমী।
লীলাবিশেষ শালিত্বান্নির্দ্দোষে
হত্রগুণাস্মৃতাঃ॥
শ্রীকৃষ্ণদেহেত সর্ব্ব দোষ অদর্শন।
মাৎসর্য্যাদিক সেহ লীলার কারণ॥
বৈষ্ণব তন্ত্রে কহে তাহার প্রমাণ।
অষ্টাদশ মহাদোষে রহিত ভগবান॥
যথা
অষ্টাদশমহাদোষৈ রহিতা ভগবত্তনুঃ।

সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী সত্য বিজ্ঞানানন্দরূপিনং।
অষ্টাদশ দোষঃ বিষ্ণুযামলে ॥
মোহস্তন্দ্রা ভ্রমো রুক্ষরসতা কাম উল্বনঃ
লোলতা মদমাৎসর্য্যে হিংসা খেদ পরিশ্রমৌ।
অসত্যং ক্রোধ আকাঙ্ক্ষা আশঙ্কা বিশ্ববিভ্রমঃ।
বিষমত্বং পরাপেক্ষা দোষা অষ্টাদশোদিতা ॥
তারপর শুন কৃষ্ণের অষ্ট মহাগুণ।
শোভা বিলাস আর মাধুর্য্য লক্ষণ ॥
মাঙ্গল্য স্থৈর্য্যতেজ ললিত ঔদার্য্য।
এই ত কহিল পুন অষ্টগুণধৈর্য্য।
ইত্যাদি কহিল কৃষ্ণগুণাদি লক্ষণ।
এবে কহি শ্রীকৃষ্ণের সহায় যেবাজন ॥
গর্গ সান্দীপনি মুনি আদি যেবাগণ।
ধর্ম্মবিষয়ে তারা সহায়রূপ হন ॥
যুযুধান আদি হয় যুদ্ধাদি সহায়।
উদ্ধবাদি করি হয় প্রিয় মন্ত্রণায়।
এবে কহি শুন তার ভক্তের লক্ষণ।
সত্যবাক্যাদি গুণযুক্ত যেবাসব হন॥
সেই সব ভক্ত ভেদ বিশেষ লেখিয়ে।
সাধক আর সিদ্ধ নাম দ্বিবিধ কহিয়ে ॥
অথ ভক্তাস্তে দ্বিধা যথা।
তে সাধকাশ্চ সিদ্ধাশ্চ দ্বিবিধা পরিকীর্ত্তিতা ॥
তত্র সাধকাঃ।
কৃষ্ণসাক্ষাৎকৃতৌ যোগ্যাঃ
সাধকা ইতি কীর্ত্তিতাঃ ॥
বিল্বমঙ্গলতুল্যাঃ যে সাধকাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ।

অথ সিদ্ধাঃ।
নাহি জানে কোন ক্লেশ কৃষ্ণাশ্রয় ক্রিয়া।
প্রেমাসুখাস্বাদ যার সদানন্দ হিয়া ॥
সিদ্ধভক্ত বলি কহি সেই সবগণ।
তাহে সেই সিদ্ধ দেখি দ্বিবিধ লক্ষণ ॥
যথা
সংপ্রাপ্ত সিদ্ধয়ঃ সিদ্ধাঃ নিত্যসিদ্ধা শ্চতে দ্বিধা ॥
সংপ্রাপ্ত সিদ্ধয়ো যথা।
সাধনানুক্রমে কিম্বা শ্রীকৃষ্ণের কৃপায়।
সংপ্রাপ্ত সিদ্ধ হয় দ্বিধা পুন তায়।
সাধন সিদ্ধা কৃপাসিদ্ধা দুই বিবরণ।
মার্কণ্ডেয় আদি করি সাধন সিদ্ধ হন ॥
যথা। মার্কণ্ডেয়াদয়ঃ প্রোক্তাঃ সাধনৈঃ প্রাপ্তসিদ্ধয়ঃ
অথকৃপাসিদ্ধাঃ শ্রীদশমে যজ্ঞপত্ন্যঃ।
নাসাং দ্বিজাতি সংস্কারো ন নিবাসো গুরাবপি।
ন তপো নাত্ম-মীমাংসা ন শৌচং ন ক্রিয়াঃ শুভাঃ ॥
তথাপিহ্যুত্তমশ্লোকে কৃষ্ণে যোগে-শ্বরে হরৌ।
ভক্তির্দৃঢ়ান চাস্মাকং সংস্কারাদি-মতামপি ॥
কৃপাসিদ্ধা যজ্ঞপত্নীবৈরোচনি শুকাদয়ঃ ॥
ইতি।
অথ নিত্যসিদ্ধাঃ।
নিত্য সিদ্ধগণ হয় কৃষ্ণসহচর।

নিত্যানন্দ গুণ সভে আনন্দ অন্তর।
আত্মা হৈতে কোটিগুণ কৃষ্ণে প্রেম যার।
কৃষ্ণ সুখে সুখী সদা সতত বিহার॥
কৃষ্ণ তুল্য অভিমানী বিহার সমান।
নিত্য সিদ্ধ ব্রজবাসী সকলে প্রধান॥
যথা।
আত্মকোটিগুণং কৃষ্ণে প্রেমাণং পরমং গতাঃ।
নিত্যানন্দগুণাঃ সর্ব্বে নিত্যসিদ্ধামুকুন্দবৎ॥
অপিচ।
ইত্যাদ্যঃ কথিতা নিত্যপ্রিয়া যাদববল্লভাঃ।
এষাং লৌকিক বচ্চেষ্টা লীলা মধুরিপোরিব।
পঞ্চাশত যেবাগুণ লেখিল কৃষ্ণেতে।
কোনগুণ রয় তার নিত্য সিদ্ধতে॥
এই ত কহিল স্থূলে ভক্তের লক্ষণ।
রতিভেদে পুন তাহে পঞ্চবিধ হন।
শান্তভক্ত দাসভক্ত সুত ভ্রাতৃগণ।
সখাগুরু বর্গপ্রিয়া এই নিরূপণ॥
যথা।
ভাবাস্ত কীর্ত্তিতা শান্তাস্তথা দাস সুতানুজাঃ।
সখায়ো গুরুবর্গশ্চ প্রেয়স্যশ্চেতি পঞ্চধা॥
আলম্বন সূত্র এই কহিল বর্ণন।
উদ্দীপন কারে কহি করহ শ্রবণ॥
কৃষ্ণভাব উৎপন্ন হয় যার শ্রবণ কীর্ত্তনে।
উদ্দীপন তারে কহি শাস্ত্রের শাসনে।
উদ্দীপন তাহে দেখি অনেক প্রকার।
শ্রীকৃষ্ণের গুণ চেষ্টাদি প্রসাধনাদি আর॥
হাস্যাঙ্গ সৌরভ বংশীনুপুরের ধ্বনি।
শিঙ্গা রব পদ ক চিহ্ন বহুবিধ জানি॥
ঐশ্বর্য্য তুলসীগন্ধ পাঞ্চজন্য রব।
কৃষ্ণক্ষেত্র হরি বাসর যাত্রা মহোৎসব॥
যথা।
উদ্দীপনাস্ত তে প্রোক্তাভাবমুদ্দীপয়ন্তি যে।
তে তু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য গুণাশ্চেষ্টা প্রসাধনং
সিতাঙ্গ সৌরভে বংশ শৃঙ্গনুপুর কম্ববঃ
পদাঙ্ক ক্ষেত্রতুলসী ভক্ত তদ্বাসরাদয়ঃ॥
তত্রগুণাঃ কায়িকবাচিকমানসাশ্রয়াশ্চ।
তত্রকায়িক গুণাঃ বয়ঃ সৌন্দর্য্য রূপমৃদুতাদয়ঃ।
এষাং আলম্বনত্বঞ্চ উদ্দীপনত্বঞ্চ।
যদা কৃষ্ণঃ সুরম্যাঙ্গ ভাব্যতে তদালম্বনং
যদাতু কৃষ্ণস্য সুরম্যাঙ্গত্বং ভাব্যতে তদা উদ্দীপনং॥
যথা।
এষামালম্বনত্বঞ্চ তথোদ্দীপনতাপিচ।
তত্র বয়ঃ।
কৌমারং পৌগণ্ডং কৈশোরং ইতি ব্রজে ত্রিবিধং।
পঞ্চ বর্ষ পর্য্যন্ত কৌমার কহিয়ে।
দশবর্ষ পর্য্যন্ত পৌগণ্ড লেখিয়ে।
ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত কৈশোর মোহন
তারপর হয় কৃষ্ণের যৌবনদর্শন॥

যথা।

কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং
দশমাবধি।
আষোড়শাচ্চকৈশোরং যৌবনং
স্যাত্ততঃ পরম্॥

সর্ব্বরসের উপযুক্ত কৈশোর ভাবনা।
ব্রজানুগাসভাকার কৈশোর বাসনা॥
কৈশোর বয়স ভেদ ত্রিবিধ লক্ষণ।
আদ্য মধ্য শেষ এই শাস্ত্রের নিরূপণ॥
প্রথম কৈশোর একাদশ বর্ষ অষ্টমাস।
প্রথম কৈশোরে কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য
প্রকাশ॥
নেত্রান্তে অরুণ ছবি উজ্জ্বল চরণ।
লোমাবলী বক্ষে হয় প্রকট দর্শন॥
বৈজয়ন্তী মালা গলে শিরে শিখি পাখা
নটবেশ বংশীধারী শোভার নাহি লেখা

যথা শ্রীদশমে

বর্হাপীড়ম্ নটবর বপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণি-
কারম্। বিভ্রদ্বাস কনক কপিশম্
বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্। রন্ধ্রান্ বেণোরধর
সুধয়া পূরয়ণ্ গোপবৃন্দৈ। র্বৃন্দারণ্যম্
স্বপদরমণম্ প্রাবিশদ্গীত-কীর্ত্তিঃ॥

অত্র নখাগ্রানাং খরতা ভ্রূবিক্ষেপ
দন্তানাম্ তাম্বুলাদ্যৈ রঞ্জনম্ ইতি
চেষ্টিতং

অথ মধ্য কৈশোরঃ

ঊরু বাহু সুবলন তুঙ্গ বক্ষস্থল।
নব নাগরীরস আরম্ভ কেবল॥
সহাস মধুরগান নয়নভঙ্গিমা।
কুঞ্জ কেলি রাসারম্ভ পরিহাসাননা॥

যথা

উরুদ্বয়স্য বাহ্বোশ্চ কাপিশ্রীরুরসস্তথা
মূর্ত্তের্মধুরিমাদ্যঞ্চ কৈশোরে সতি
মধ্যমে॥ অথ শেষ কৈশোরং।

পূর্ব্ব হৈতে অঙ্গের শোভা অতিশয়।
পার্শ্বে ত্রিবলি ব্যক্ত মধ্য ক্ষীণ হয়॥

পূর্ব্বতোপ্যধিকোৎকর্ষং বাঢ়মঙ্গানি
বিভ্রতি! ত্রিবলি ব্যক্তিরিত্যাদ্যং
কৈশোরে চরমে সতি।

নবযৌবন কৃষ্ণ কৈশোর শেষে কন।
ব্রজদেবীর যিঁহো সর্ব্বস্ব রূপ হন॥
রাসাদিক লীলা নানারসপরকাশ।
কর্ণাকর্ণি কথালাপ বিবিধ উল্লাস॥
ইত্যাদি ত্রিবিধ ভেদ রয় উদ্দীপনে।
বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর ত্রিবিধলক্ষণে॥

অথ সৌন্দর্য্যং—

অঙ্গানাং শোভনং সৌন্দর্য্যং

ঘনদ্যুতি পীতবাস সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।
কর পদ মুখ নাসা শোভন অধর॥

অথ রূপং—

আভরণ পরিধানে বিবিধ ভূষণে॥
রূপ বলি নরে কয় শুন বিজ্ঞজনে॥

অথমৃদুতা—

মৃদুতা কহিয়ে যাথে অত্যন্ত কোমল।
স্পর্শে মৃদু যেন মালতীর দল॥

অথ চেষ্টা—

চেষ্টা রাসাদিলীলা আর দুষ্ট বধে।
গোপীগণ লঞা ব্রজে রাসলীলা সাধে॥
বৃষভাসুর আদি করি দুষ্ট দলন।
অনুসঙ্গে ইত্যাদি চেষ্টানুকরণ॥

দুষ্টবধো ললিতমাধবে—

শম্ভুর্যং নয়তি মন্দরকন্দরান্ত
মূর্দ্ধান সলীলমপি যত্র শিরোধুনানে
আঃ কৌতুকং কলয় কেলিনবাদরিষ্টং
তং দুষ্টপুঙ্গব মসৌ হরিরুন্মমাথ ॥

অথ প্রসাধনম্—

বস্ত্রাকল্প মণ্ডনাদ্যং প্রসাধনং

তত্র বসনং—

পীতবর্ণ রক্তবর্ণ সূর্য্যকান্তি সম।
শ্রীকৃষ্ণের পরিধেয় ত্রিবিধ বসন ॥
যুগ্ম চতুষ্ক তথা ভূয়িষ্ঠ বসন।
সংক্ষেপত কহি তাহা করহ শ্রবণ ॥
নবার্করশ্মি কাশ্মীর হরিতালাদি সন্নিভং।
যুগং চতুষ্কং ভূয়িষ্ঠং বসনং ত্রিবিধং হরেঃ
তত্র যুগং দ্বিবস্ত্রং পরিধেয়ং উত্তরীয়ঞ্চ

চতুষ্কং যথা—

পরিধেয়ং কঞ্চুকং কটিবেষ্টিত পটিং
শিরোবেষ্টনঞ্চ ॥

অথভূয়িষ্টং—

অনেক বর্ণ বসনং নটবেশক্রিয়োচিতং
ভূয়িষ্টং ॥

অথাকল্প

কবরী চূড়া বেণী চ ইতি ত্রিবিধ
আকল্প পুষ্পাদিকেশবেশ কবরী, উর্দ্ধ-
বদ্ধকচাচূড়াপৃষ্ঠ ভাগে দীর্ঘতয়া কেশ
গুম্ফনং বেণী ॥

মালা ত্রিধা—

বৈজয়ন্তী, রত্নমালা, বনস্রজ; ॥

পঞ্চপুষ্পময়ী জানু পর্য্যন্ত লম্বিতা
বৈজয়ন্তী।
পত্রপুষ্পময়ী চরণপর্য্যন্তং চরণমালা
পুনর্ভেদ বৈকক্ষকং আপীড়ম্ শেখরম্
ইতি ত্রিধা ভেদঃ। উরসি তির্য্যক্-
ক্ষিপ্তম্ বৈকক্ষিকং শিখা স্থিতে
মাল্যে আপীড় শেখরৌ ॥

পুনর্ভেদঃ—

কণ্ঠাদৃজু লম্বিমাল্যং প্রালম্বং ॥
রত্নমালা স্বর্ণাদি নির্ম্মিতা বনমালা
নানা পুষ্প রচিত চন্দ্রিকান্বিতা।

অথ মণ্ডনম্

কিরীট কুণ্ডল হার মুক্তাদি নির্ম্মিত
বলয়ঙ্গুরীয়ক কেয়ূর নূপুরাদ্যং রত্ন
মণ্ডনং। মণ্ডনং ভূষণং ॥
স্মিতং মধুর হাস্যং রসসৌরভং সর্ব্বদৈব
অগুরু কুঙ্কুমাদিবৎ।

অথ বংশঃ

সেই বংশ হয় জানি ত্রিবিধ প্রকার।
বেণু মুরলী বংশী ত্রিবিধ ভেদ যার ॥

যথা

এষ ত্রিধা ভবেবেণু মুরলী বংশীকে-
ত্যপি ॥ তত্র বেণুঃ

দ্বাদশাঙ্গুল দীর্ঘে স্থূল অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ-
ষড়রন্ধ্রান্বিত বেণু পাবিকাক্ষনাম।

অথ মুরলী

হস্তদ্বয় পরিমিত মুখরন্ধ্রযুত।
চতুরন্ধ্রসমাযুক্ত মুরলী বিখ্যাত ॥

☞ এই সংখ্যার প্রথম ফর্ম্মার পৃষ্ঠার সংখ্যা ভুল হইয়াছে—১ হইতে ৮ পর্য্যন্ত যথাক্রম ৭৩ হইতে ৮০ হইবে। গ্রাহকগণ সংশোধন করিয়া লইবেন।

৫ম বর্ষ] আষাঢ়, ১৩২২ [৩য় সংখ্যা

মাসিকপত্রিকা।

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক সম্পাদিত।

সূচীপত্র

মূল্য বার্ষিক ডাকমাশুল সহ ২৲ দুই টাকা মাত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৶০ তিন আনা।

১৫ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা এই ঠিকানায় প্রবন্ধ ও টাকাকড়ি সম্পাদকের নিকট প্রেরিতব্য।

রাধারমণ সেবাশ্রম ও নিত্যানন্দ মাতৃমন্দিরের সংক্ষিপ্ত মাসিক কার্য্যবিবরণী

জুলাই ১৯১৫।

এই মাসে সর্ব্বসমেত ৪৭২ জন বাহিরের দরিদ্র রোগীর ঔষধ ও অনেক স্থলে পথ্য দিয়া চিকিৎসা করা হইয়াছে। এই রোগীগণের বিবরণ।

জ্বর	সর্দ্দি-কাশী	হাম	উদরাময়	আমাশয়
৯৬	৩৪	২	৬৮	৩০
অজীর্ণঅম্লরোগ	চর্ম্মরোগ	অস্ত্রচিকিৎসা	উপদংশ	প্রমেহ
১৯	২৬	৭	২	২৭
বাত	স্ত্রীরোগপ্রদরাদি	চক্ষুরোগ	রাত্র্যন্ধ	বিবিধ অর্শভগন্দরনাসা
৭	৩০	৩০	২	৮৮+২+১+১

আশ্রমে ও ধর্ম্মশালায় ১৬ জন রোগীকে রাখিয়া চিকিৎসা করা হইয়াছে। তাহাদের রোগের বিবরণ

গ্রন্থিবাত ১ কুষ্ঠ ১ বসন্ত ১ পৃষ্ঠব্রণ ১ রক্তাতিসার ৩ হাঁপানি ২ ম্যালেরিয়া ৩ চক্ষুরোগ ৩ উদরী ১

ইহা ছাড়া ১২০ জন দরিদ্রকে অন্ন ও পথ্য দেওয়া হইয়াছে ৪ জন বিদেশী দরিদ্রকে অর্থসাহায্য করা হইয়াছে ৮ জন ভদ্র বিধবা নিয়মিত অর্থসাহায্য পাইয়াছেন ২ জন দরিদ্র স্কুলের ছাত্রের বেতন দেওয়া হইয়াছে ৬ জন সংস্কৃতাধ্যায়ী ছাত্র নিয়মিত আহার্য্য পাইয়াছেন ৬টি মৃতদেহ ও আশ্রমে মৃত দুইটির সৎকার করা হইয়াছে।

১লা আগষ্ট তারিখে রোগী ছাড়া আশ্রমের নিয়মিত অধিবাসী—অন্ধ ৩ জন জরাগ্রস্ত ১ আতুর ২ মাতৃহীন শিশু ৩ নিরাশ্রয় বালক ৩ স্থায়ী সেবক ৬

মাতৃমন্দিরে ১০ জন প্রসূতি ও ২ জন গর্ভবতী ৪টি বালক ও ৬টি বালিকা আছে। একজন তত্ত্বাবধায়িক স্বামীসহ এখানে বাস করেন। শিশু পালনের জন্য একজন ধাত্রী আছেন।

এই মাসে সেবাশ্রমে ৭২.৸১০ ও মাতৃমন্দিরে ১১০ ৵ একুনে ৯১১৸৵১০ ব্যয় হইয়াছে। ইহার মধ্যে কৃষ্ণনগর কমিটি মাতৃমন্দিরের জন্য ৫০৲ দেওয়ায় সেবাশ্রমের ব্যয় ৮৬১৸৵২০ হইয়াছে এই ব্যয়ের মধ্যে ২৫০৲ পূর্ব্বের দেনা শোধ। আয় ৪৪৩৵০ মাত্র হওয়ায় ১লা আগষ্ট ৪১৮৸১০ দেনা থাকে।

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক।

সম্পাদক।

বীরভূমি, ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা,
আষাঢ়, ১৩২২।

আনন্দ-লীলা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের দেশে যে সংবাদ প্রচার করেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থের মর্ম্মস্থলে বিদ্যমান। শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বহুপূর্ব্বেই প্রচারিত হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার কথাও আমাদের দেশে অপরিজ্ঞাত ছিল না—কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের যাহা মর্ম্মকথা তাহা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু কর্ত্তৃকই সাধারণভাবে প্রচারিত হয়—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে তদীয় ভক্তগণ যেভাবে বুঝিয়াছেন—ঠিক সেইভাবে বুঝিতে হইলে শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থের অভ্যন্তরে যে ভাব-ধারা প্রবাহিত হইতেছে, তাহার গতির সহিত আমাদের হৃদয়ের পরিচয় হওয়া প্রয়োজন।

এই ভাব-ধারার সহিত পরিচয় হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব একটি আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নহে। এই ব্রহ্মাণ্ড-লীলার প্রথম প্রত্যুষ হইতেই গোপনে গোপনে—স্থূলদর্শী সাধারণ মানবের জ্ঞানের অগোচরে, অথচ ভক্তজনের হৃদয়কে আপ্যায়িত ও আনন্দিত করিয়া যে উদ্যোগ চলিতেছিল, এই আবির্ভাব সেই আয়োজনসমূহের শ্রেয়-ফল। আচার্য্য ও ভক্তগণ এই ভাবেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলার তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন এবং লীলার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করার ইহাই একমাত্র উপায়। এই ভাব-ধারার নাম আনন্দলীলা—বৃন্দাবন ও নবদ্বীপে ইহার শেষদৃশ্যের অভিনয়।

২ শ্রীমদ্ভাগবতের—প্রসিদ্ধ ও সর্ব্বজনসম্মানিত টীকাকার শ্রীধরস্বামী—শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রায় ৩০০, শত বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের যে টীকা রচনা করিয়াছেন তাহার সাহায্যে সাধনশীল ও পবিত্রমনা অনেক মহাত্মা শ্রীমদ্ভাগবতের ও শ্রীকৃষ্ণলীলার প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন—কিন্তু অধিকাংশ মানবের পক্ষে তাহা হয় নাই। নীলাচলে অবস্থিতিকালে বল্লভ ভট্টের সহিত শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর যে কথোপ-কথন হয়, তাহাতে শ্রীধরস্বামীর টীকা সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর যাহা মত

তাহা সুব্যক্ত হইয়াছে। বল্লভভট্ট একদিন বলিলেন যে আমি শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়াছি—এই কথা শুনিয়া—

"প্রভু হাসি কহে স্বামী না মানে যেইজন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন॥"

অন্যস্থানে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু এই বল্লভভট্টকেই বলিলেন—

"শ্রীধর স্বামীর প্রসাদে ভাগবত জানি।
জগৎগুরু শ্রীধরস্বামী গুরু করি মানি॥"

* * * *

"শ্রীধরানুগত কর ভাগবৎ-ব্যাখ্যান।
অভিমান ছাড়ি ভজ কৃষ্ণ ভগবান॥
অপরাধ ছাড়ি কর কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত এই কয়টী পয়ার হইতে শ্রীধরস্বামী সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের যাহা মত তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। এই শ্রীধরস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের টীকার প্রারম্ভে বলিয়াছেন যে এই শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র ব্রহ্মসূত্রের অর্থ—মহাভারতের অর্থ-বিনির্ণয়, গায়ত্রীর ভাষ্য এবং বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য। শ্রীমদ্ভাগবতের এইরূপ মহিমা শ্রীধরস্বামীর পূর্ব্বেও আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল। শ্রীধরস্বামী এই সমস্ত মত গ্রহণ করিয়াছেন, এবং এই সমস্ত মত প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা রচনা করিয়াছেন।

অনধিকারীর হস্তে পড়িয়া কেবল শাস্ত্রের বলিয়া নহে সকল বস্তুরই অনাদর হইয়া থাকে। এই জন্য আমাদের দেশে অধিকারী-নির্ণয়ের জন্য এত চেষ্টা। এই শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রও একসময়ে অনধিকারীর হস্তে পড়িয়াছিলেন এবং তাহার ফলে অনেক ভ্রান্তমতও প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামীর টীকা আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে এই প্রকারের ভ্রান্তমত দূর করিবার জন্য তাঁহাকে চেষ্টা করিতে হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের টীকার প্রারম্ভেই শ্রীধরস্বামীকে সপ্রমাণ করিতে হইয়াছে যে এই গ্রন্থখানিই শ্রীমদ্ভাগবত। ব্যাপারখানা বুঝুন—এ একেবারে যেন গোটা মানুষটাই চুরি! প্রাচীন অন্যান্য শাস্ত্রে শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হইয়াছে। যাঁহারা শাস্ত্রবাক্যে আস্থাবান তাঁহারা এই সমস্ত উক্তি উড়াইয়া দিতে পারেন না। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতের অশেষ মাহাত্ম্য স্বীকার করিতে তাঁহারা প্রস্তুত, কিন্তু

তাঁহারা এই আপত্তি তুলিলেন যে এই গ্রন্থখানিই সেই প্রকৃত ভাগবত কি না? অর্থাৎ এই গ্রন্থখানি যে জাল নহে তাহা কি প্রকারে জানা যাইবে?

প্রাচীনকালের এই আপত্তির কথা ভাবিলে একালের ইহা অপেক্ষাও একটা বড় আপত্তির কথা মনে হয়। আপনারা বোধ হয় অনেকেই জানেন যে বিলাতী দার্শনিক পণ্ডিত ডুগাল্ড্ ষ্টুয়ার্ট এক বৃহৎ প্রবন্ধ লিখিয়া পাশ্চাত্য জগতে সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন যে কেবল সংস্কৃত-সাহিত্য নহে, সমুদয় সংস্কৃত ভাষাটাই একটা মিথ্যা জুয়াচুরি। সংস্কৃত ভাষা বা সংস্কৃত সাহিত্য বলিয়া সত্য সত্য একটা কিছু নাই এবং কখনও ছিল না। আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ জয় করার পর ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণেরা গ্রীক্ ভাষা ও সাহিত্যের সহিত পরিচিত হয়। তখন তাহারা এই গ্রীক্ ভাষা ও সাহিত্যের অনুকরণে একটা কৃত্রিম ভাষা ও সাহিত্য প্রস্তুত করে। পূর্ব্বে অর্থাৎ ইউরোপে যখন প্রথম সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের গৌরবের কথা প্রথম প্রচারিত হইতেছিল সে সময়ে ডুগাল্ড্ ষ্টুয়ার্টের এই মত অনেকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। অধিক কি ইংরাজী ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দেও ডাব্লিনের একজন অধ্যাপক এই মতের সমর্থন করিয়া এক বৃহৎ প্রবন্ধ রচনা করেন। বিলাতে এই মতটা প্রচারিত হওয়ার অবশ্য একটা হেতু আছে। সে হেতুটা এই। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর খ্রীষ্টান জেসুইট সম্প্রদায়ের একজন পাদ্রী একখানি পুস্তক লইয়া ফরাসী দেশে প্রচার করেন এবং বলেন যে ইহা ভারতবর্ষের সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ। বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত ভল্‌টেয়ার এই গ্রন্থের খুব সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে প্রমাণিত হইল যে এই গ্রন্থখানি জাল। এই কারণেই প্রকৃত সংস্কৃত গ্রন্থের যখন আলোচনা ও আদর আরম্ভ হইল তখন এই সমগ্র জিনিসটাই জাল এই প্রকারের কথাও স্থানে স্থানে প্রচার হইতে লাগিল।

একটা গোটা ভাষা ও সাহিত্যই যদি জাল বলিয়া প্রচারিত হইতে পারে, তাহা হইলে একখানি গ্রন্থকে 'জাল' বলিয়া অপবাদ দেওয়া একটা অসম্ভব ব্যাপার নহে। শ্রীধরস্বামীর টীকা আলোচনা করিলে এ প্রকার কথা প্রচার হইবার দুইটি কারণ অনুমিত হয়। প্রথম কারণ, সাম্প্রদায়িক বিরোধ। মানুষ যতই 'এক ভগবান্ এক ভগবান্' বলুক না কেন, সাম্প্রদায়িক স্বার্থের ক্ষুদ্র-গণ্ডী ছাড়াইয়া উঠিতে পারে না। দ্বিতীয় কারণটি শ্রীমদ্ভাগবতের রাসলীলার টীকার প্রথমেই শ্রীধরস্বামী যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের কুব্যাখ্যা করিয়া মূর্খ লোককে ঠকাইয়া অনেক

স্বার্থপর ও ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ব্যক্তি সমাজের অমঙ্গল করিতেছিল। তাহারা নিবৃত্তি ও সংযমের পরিবর্ত্তে যথেচ্ছাচার প্রচার করিতেছিল। এই দুই কারণেই সম্ভবতঃ এই প্রকারের একটা মত কোন কোন স্থানে প্রচারিত হইয়াছিল যে এই গ্রন্থখানি প্রকৃত শ্রীমদ্ভাগবত নহে। শ্রীধরস্বামীর টীকানুসারে আমরা কথাটা দেখাইতেছি। শ্রীধরস্বামীকৃত প্রথম শ্লোকের টীকার শেষ কথা "অতএব ভাগবত নামান্যদিত্যপি নাশঙ্কনীয়ম্।" অতএব ভাগবত নামে অন্য গ্রন্থ আছে অর্থাৎ এখানি সে গ্রন্থ নহে এরূপ আশঙ্কা করিবেন না।

শ্রীশ্রীরাসলীলার টীকার প্রারম্ভে শ্রীধরস্বামী বলিলেন যে এই লীলার উদ্দেশ্য মদনের দর্পজয়। অমনি যেন একজন আপত্তিকারী বলিয়া উঠিলেন, পরস্ত্রী-বিনোদের দ্বারা কি কন্দর্পের দর্প জয় হয়? ইহাতে যে কন্দর্পের সেবা করা বুঝায়। এই আপত্তির উত্তরে শ্রীধরস্বামী রাসপঞ্চাধ্যায়ের মূল হইতে চারিটি বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিলেন যে এইচারিটি বাক্যের মর্ম্ম অবধারণ করিলেই প্রকৃত তাৎপর্য্য ও রহস্য বুঝিতে পারা যাইবে। তাহার পর তিনি বলিলেন আমাদের যাবতীয় শাস্ত্রই নিবৃত্তির বা সংযমের উপদেশ করিয়াছেন, আবার এই রাসলীলা বিশেষ করিয়া নিবৃত্তিপরা। কাম-কথা, যাহা রাসলীলায় দৃষ্ট হয় তাহা একটি আবরণ-মাত্র। এই কথা বলিয়া তিনি বলিলেন যে রাসের ব্যাখ্যা করিয়া আমি তাহা প্রতিপাদন করিব। "শৃঙ্গার-কথাপদেশেন বিশেষতো নিবৃত্তিপরেয়ং পঞ্চাধ্যায়ীতি ব্যক্তি করিষ্যামঃ।"

এই শ্রীমদ্ভাগবতকে শ্রীধরস্বামী ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়াছেন। ব্রহ্মবিদ্যা সকল বিদ্যার প্রতিষ্ঠাভূমি, ইহা বেদের কথা। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মত ও শিক্ষা— যাঁহাদের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে তাঁহারা সকলেই শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠতা বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামী বিরচিত "ষট্সন্দর্ভ" নামক সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থের প্রথম সন্দর্ভেই অর্থাৎ তত্ত্বসন্দর্ভেই শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য বিশেষভাবে খ্যাপন করা হইয়াছে। ঐ অংশটুকুর যাহা মর্ম্ম আমি কেবল তাহাই বলিতেছি; ঐ গ্রন্থ আপনারা আলোচনা করিবেন।

পুরাণ পঞ্চমবেদ, এরূপ কথা প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত আছে। স্কন্দ-পুরাণের প্রভাস খণ্ড হইতে বচন উদ্ধার করিয়া শ্রীজীবগোস্বামী বলিতেছেন যে "বেদের ন্যায় পুরাণের অর্থকেও নিশ্চল মনে করি। বেদসকল পুরাণেই প্রতিষ্ঠিত। শ্রুতি ও স্মৃতিতে যাহা পাওয়া যায় না, পুরাণ হইতে সে সমুদয় অবধারিত হইয়া থাকে। কিন্তু পুরাণ নানা দেবতার কথা বলিয়াছেন, সুতরাং

পুরাণের অর্থ দুর্বোধ্য। মৎস্যপুরাণে কথিত হইয়াছে যে কল্পভেদে—পুরাণের বিভিন্নতা হইয়াছে। সাত্ত্বিক কল্পে শ্রীহরির মাহাত্ম্য অধিক—রাজসকল্পে ব্রহ্মার মাহাত্ম্য অধিক এবং তামসকল্পে অগ্নির ও শিবের মাহাত্ম্য অধিক কীর্ত্তিত হইয়াছে। সত্ত্বরজস্তমোময় সংকীর্ণ কল্পসকলে সরস্বতীর ও পিতৃগণের মাহাত্ম্য উক্ত হইয়াছে। মৎস্যপুরাণে পুরাণসমূহের শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। সাত্ত্বিক পুরাণসমূহ শ্রেষ্ঠ হইলেও তৎসমুদয়ের মধ্যেও আবার মতভেদ রহিয়াছে। কেহ বলেন ব্রহ্ম সগুণ, কেহ বলেন নিগুর্ণ, কেহ বলেন জ্ঞানমূলক, কেহ বলেন জড়-মূলক, সুতরাং এই সমুদয়ের মধ্যে শেষ কথা কি তাহা নিরূপণ করা কঠিন। ব্রহ্মসূত্র হইতে পরমার্থ নির্ণয় করা যায়, কিন্তু সূত্রগুলি অত্যন্ত অল্পাক্ষর ও গূঢ়, সুতরাং উপায় কি? শ্রীজীব গোস্বামী তত্ত্বসন্দর্ভে এইরূপ প্রসঙ্গ করিয়া উপসংহারে বলিতেছেন "তদেবং সমাধেয়ং, যদ্যেক-তমেব পুরাণলক্ষণমপৌরুষেয়ং সর্ব্ববেদেতিহাসপুরাণানামর্থসারং ব্রহ্মসূত্রোপজীব্যঞ্চ ভবদ্‌ভুবি সম্পূর্ণং প্রচরদ্রূপম্ স্যাৎ। সত্যমুক্তম্। যত এবচ সর্ব্বপ্রমাণানাং চক্রবর্ত্তিভূতমস্মদভিমতং শ্রীমদ্ভাগবতমেবোদ্ভাবিতম্ ভবতা"॥ ইহার অর্থ "যদি অপৌরুষেয় বেদইতিহাস ও পুরাণ সকলের সারার্থ-প্রকাশক ব্রহ্মসূত্রের উপজীব্য এবং এই জগতে সম্পূর্ণরূপে প্রচারিত এবং পুরাণের যে সমস্ত লক্ষণ সেই সমস্ত লক্ষণযুক্ত কোন একখানি পুরাণ থাকে, তাহা হইলে সেই পুরাণের সাহায্যে এই সংশয়ের সমাধান হইতে পারে। অতএব সকল প্রমাণের শীর্ষস্থানীয় আমাদিগের অভিপ্রেত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থখানি উদ্ভাবিত হইল।

ভগবান বেদব্যাস সমুদয় পুরাণ আবিষ্কার করিলেন—ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করিলেন কিন্তু শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যপূর্ণ, বিচিত্র গূঢ় লীলা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকায় তিনি চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলেন না—তখন তিনি সমাধিস্থ হইয়া আপনার রচিত সূত্রসকলের অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ এই শ্রীমদ্ভাগবত প্রাপ্ত হইয়া প্রচার করিলেন। "যস্মিন্নেব সর্ব্বশাস্ত্রসমন্বয়ো দৃশ্যতে। সর্ব্ব-বেদার্থসূত্র লক্ষণাং গায়ত্রীমধিকৃত্য প্রবর্ত্তিতত্বাৎ।" অর্থাৎ এই শ্রীমদ্ভাগবতে সকল শাস্ত্রের সমন্বয় দৃষ্ট হইয়া থাকে, কারণ গায়ত্রী, সকল বেদার্থের সূত্রস্বরূপ আর শ্রীমদ্ভাগবত এই গায়ত্রীকে অবলম্বন করিয়া প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকেই গায়ত্রীর অর্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে. এই প্রকারে নানা পুরাণের উক্তি-অবলম্বনে শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীধরস্বামীর কর্ত্তৃক

প্রদর্শিত পথে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠতা, পূর্ণতা, ব্রহ্মসূত্রের অর্থরূপতা প্রভৃতি প্রতিপাদন করিয়াছেন।

শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থের মত বিশেষ আদরের সহিত গ্রহণ করেন নাই, শ্রীজীবগোস্বামী তাহারও হেতু নিরূপণ করিয়াছেন। এই হেতু অনেক বৈষ্ণব গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। পদ্মপুরাণের একটী উক্তির উপরেই এই কথাটীর প্রতিষ্ঠা। তথায় এইরূপ বলা হইয়াছে যে "শঙ্করাচার্য্য পরমভক্ত হইলেও ভগবানের একটী বিশেষ আদেশ-পালনের জন্যই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভগবৎতত্ত্ব গোপন করিয়া মায়াবাদ অবলম্বনে উপনিষদাদির ব্যাখ্যার সাহায্যে অদ্বৈতবাদ স্থাপন করাই সেই আজ্ঞা। এই কারণে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতকে গ্রহণ করেন নাই; কিন্তু শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য স্বরচিত শ্রীগোবিন্দাষ্টকাদিগ্রন্থে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া ব্রজেশ্বরীর বিস্ময়—ব্রজকুমারীগণের বসনচৌর্য্য প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণলীলার এই সমুদয় কথা শ্রীমদ্ভাগবত ব্যতীত অন্যত্র নাই। অতএব তিনি শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ আলোচনা করিয়াছেন এবং গ্রহণও করিয়াছিলেন। কিন্তু যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁহার আবির্ভাব, তাহার প্রতিকূল্য ঘটিবার সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া জনসমাজে—এই গ্রন্থের প্রকৃত মহিমা প্রচার করেন নাই, ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। সাত্বত-(ভক্ত) গণের মধ্যে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে শঙ্করাচার্য্যের অন্যান্য শিষ্য পুণ্যারণ্য প্রভৃতি আচার্য্যের প্রকৃত অভিপ্রায় না বুঝিয়া এমনভাবে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন যে শ্রীমধ্বাচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের মনে ভয় হইল যে বৈষ্ণবেরা শ্রীমদ্ভাগবতকে নির্গুণ ও চিন্মাত্রপর বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন। এই জন্য তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিবার পথ প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলা হইল তাহা শ্রীজীব গোস্বামী কৃত তত্ত্বসন্দর্ভের কথা। এই কথাগুলি আশ্রয় করিয়া আমি আপনাদিগকে প্রাচীন আচার্য্যগণের যাহা মত তাহাই জ্ঞাপন করিতেছি।

আমরা আমাদের দেশে পৌরাণিক সাহিত্য নামে পরিচিত এক অতি বিশাল সাহিত্য দেখিতে পাই। অষ্টাদশপুরাণ আমাদের পরিচিত। ব্রহ্ম পদ্ম বিষ্ণু বায়ু ভাগবত নারদীয় মার্কণ্ডেয় অগ্নি ভবিষ্য ব্রহ্মবৈবর্ত্ত লিঙ্গ বরাহ স্কন্দ বামন কূর্ম্ম মৎস্য গরুড় ও ব্রহ্মাণ্ড এই অষ্টাদশ পুরাণ। ইতিহাস ও পুরাণাত্মক পঞ্চম বেদ শতকোটী শ্লোকে নিবদ্ধ এবং ব্রহ্মার

মুখ হইতে ইহা নিঃসৃত হইয়াছে, ইহাই প্রাচীনকালের বিশ্বাস। শ্রীমদ্ভাগবতের ৩য় স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ে ঐরূপ উক্তিই দেখিতে পাইবেন। মধ্যে আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ এমন একটা দিন আসিয়াছিল যখন এই সমুদয় পুরাণের নামও আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এখন জাতীয় চিত্তের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আমাদের অতীতের সহিত যাহাতে একটা প্রকৃত পরিচয় হয়, সেজন্য চারিদিকে একটা চেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে। প্রায় সমুদয় পুরাণই ইংরাজী ও বাংলাভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। সংস্কৃত মূলগ্রন্থও সুলভ, সুতরাং পৌরাণিক সাহিত্যের সহিত পরিচিত হওয়া পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে যতটা কঠিন ছিল এখন আর ততটা নাই। আমার বিশেষ অনুরোধ আপনার সমুদয় পুরাণ ও উপপুরাণগুলি ভাল করিয়া পাঠ করিবেন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের সমগ্র সাধনার প্রতিবিম্ব এই পৌরাণিক সাহিত্যেই পাওয়া যায়। পৌরাণিক সাহিত্যের সহিত হৃদয়ের পরিচয় হয় নাই, এ প্রকারের লোককে জাতীয় হিসাবে শিক্ষিত বলা যায় না। অবশ্য পূর্ব্বে পুরাণগুলি যেরূপ উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়াছিল এখন আর সেরূপ উপেক্ষিত নহে—অনেকেই পুরাণশাস্ত্রের আলোচনা করিতেছেন। কিন্তু পৌরাণিক-সাধনাদ্বারা হৃদয়বৃত্তির অনুশীলন করিবার জন্য পুরাণের আলোচনা অতিশয় বিরল। পুরাণের মধ্য হইতে, একালে আমরা যাহাকে ইতিহাস বলি, তাহার কোন তথ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় কিনা এই জন্যই আজ, কাল পুরাণের আলোচনা হইতেছে। ইহাও একটা আবশ্যকীয় কার্য্য। কিন্তু এই প্রকারের কোন উদ্দেশ্য লইয়া সমালোচনার ছুরিকাহস্তে পৌরাণিক সাধনার তপোবনে প্রবেশ না করিয়া তথায় যে হৃদয়োচ্ছ্বাস চারিদিকে বহিয়া যাইতেছে সেই উচ্ছ্বাসের দ্বারা আত্মহৃদয়ের অনুশীলন করিবার জন্য শ্রদ্ধাবান সাধকের মত প্রবেশ করা অধিক প্রয়োজন। ইহার কারণ এই যে, আমরা আমাদের অতীতের সহিত যে পারম্পর্য্যসূত্রে বদ্ধ হইয়াছিলাম আমাদের নবীন শিক্ষা ও দীক্ষা সেই সূত্র ছিন্ন করিয়া দিতেছে। আমাদের অতীতের বুক হইতে ভাব ও রসের ধারা বর্ত্তমানের নৈরাশ্য মরুভূমিকে যতদিন অবিশ্রান্তভাবে সরস না করিবে ততদিন আমাদের যাবতীয় চেষ্টা ও উদ্যম কক্ষভ্রষ্ট গ্রহের উদ্দেশ্য-হীন গতির মত।

পৌরাণিক সাধনার পূর্ণ পরিণতি শ্রীমদ্ভাগবতে পরিদৃষ্ট হইবে। তত্ত্ব-সন্দর্ভ হইতে শ্রীজীব গোস্বামীর যে মত বর্ণনা করা গেল তাহার সাহায্যে

ইহাই বুঝিতে পারা যাইতেছে। প্রাচীনকালের সাধক ও ভক্তগণ, যাঁহারা রসিক ও ভাবুক হইয়া পৌরাণিক সাধনার যাহা প্রকৃত রস তাহা পান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতে এই পূর্ণতা দেখিয়াছেন। তাঁহাদের হৃদয়ের সহিত পরিচিত হইতে হইলে তাহাদের এই মতের অনুবর্ত্তন করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। নতুবা তাঁহাদের হৃদয় ও মনের সহিত আমাদের ঠিক যোগ থাকিবে না। এমন হইতে পারে যে একালে আমরা নূতন কিছু পাইব যাহা তাঁহারা পান নাই বা পাইলেও প্রচার করেন নাই, আবার তাঁহাদের সমগ্রভাবটি আমরা চো করিয়া না পাইতেও পারি। এ প্রকারের কিছু প্রভেদ হওয়া কেবল সম্ভব নহে, স্বাভাবিক। কিন্তু বাঁচিতে হইলে, সত্যের আশ্রয়ে থাকিতে হইলে যোগসূত্র রক্ষা করার জন্য চেষ্টা থাকা প্রয়োজন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পৌরাণিকী সাধনার পূর্ণতা কিরূপে হইল তাহা আমরা এইরূপ উদাহরণের দ্বারা বুঝিতে পারি।

যেমন একজন কবি একটী আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হইয়া, একখানির পর আর একখানি, এই প্রকারের অসংখ্য কাব্য রচনা করেন এবং এই প্রকারে বহুকাব্যে তাঁহার ঐ মানস আদর্শ কিছু কিছু পরিব্যক্ত হইতে হইতে পরিণত বয়সের এক শুভক্ষণে বিরচিত একখানি কাব্যে তাঁহার সেই আদর্শ পূর্ণাঙ্গ-রূপে প্রকাশিত হইয়া পড়ে—সেইরূপ আমাদের এই আর্য্যজাতি অতি দীর্ঘকাল ধরিয়া একটী বিশেষ ভাবের ছাঁচে এই দেশ ও কালে বিস্তৃত ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপার আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এই চেষ্টার ফলে যাবতীয় পুরাণ প্রচারিত হইয়াছে, এই প্রকারে বহু পুরাণ প্রকাশিত হইতে হইতে ব্যাসদেব এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ সমাধিস্থ হইয়া ধ্যানযোগে প্রাপ্ত হইলেন। যে তত্ত্ব অন্যান্য পুরাণে কম বা বেশী করিয়া ব্যক্ত হইয়াছে শ্রীমদ্ভাগবতে তাহার পরিপূর্ণ সমাবেশ। পূর্ব্বে কবির যে আদর্শ-কাব্যের কথা বলা হইল, সেই আদর্শ কাব্যখানির সাহায্যে যেমন কবির অন্যান্য কাব্যগুলির সম্বন্ধ, মূল্য ও তাৎপর্য্য নিরূপণ করিতে পারা যায় এবং সমুদয় কাব্যের মধ্যেই এক সুমহান্ ঐক্যের প্রতিষ্ঠা-ভূমিরূপে অখণ্ড কবিহৃদয়ের সমুদয় অংশটী আমরা দেখিতে পাই, পৌরাণিক সাহিত্যে শ্রীমদ্ভাগবতও ঠিক সেইরূপ। স্কন্দপুরাণের একটী শ্লোক তত্ত্বসন্দর্ভে উদ্ধৃত হইয়াছে—

"ব্যাসচিত্তস্থিতাকাশাদবচ্ছিন্নানি কানিচিৎ।

অর্থাৎ ব্যাসদেবের চিত্তস্থিত আকাশ, মহাকাশ—ঐ মহাকাশ হইতে খণ্ড খণ্ড করিয়া অঙ্গে গ্রহণ পূর্ব্বক, ভাণ্ডার হইতে বস্তু গ্রহণ করিয়া যেমন ব্যবহার করা হয় সেইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ব্যাস একজন নহেন—একথাটী প্রাচীন কথা। বিষ্ণুপুরাণে ইহা আছে এবং তত্ত্বসন্দর্ভে বিষ্ণুপুরাণের প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। সেই উদ্ধৃত বাক্যে পরাশর বলিতেছেন আমার পুত্র ব্যাস অষ্টাবিংশতি মন্বন্তরে চতুষ্পাদ বেদকে চারিভাগে বিভাগ করিলেন। এই ধীমান বেদব্যাস কর্ত্তৃক বেদসমূহ যেমন "ব্যস্ত" (বিভক্ত) হইলেন, অন্যান্য ব্যাসকর্ত্তৃক ও আমাকর্ত্তৃক বেদ সকলও সেইরূপ বিভক্ত হইয়াছেন—হেব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠগণ এইরূপে সকল চতুর্যুগে বেদের বিস্তৃত শাখাভেদসকল ভিন্ন ভিন্ন ব্যাস কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে। এই সমুদয় ব্যাসের মধ্যে মহাভারত-রচয়িতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসই সাক্ষাৎ নারায়ণের অংশ। স্কন্দপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে দ্বাপরযুগে গৌতম ঋষির শাপে জ্ঞান অজ্ঞানে পরিণত হইয়াছিল (এখন ইউরোপে যেমন হইয়াছে)। ব্রাহ্মণেরা ভগবানের নিকট এই বিষয় নিবেদন করিলে ভগবান পুরুষোত্তম ব্যাসরূপে আবির্ভূত হইয়া বেদের উদ্ধার সাধন করিলেন।

এইবার আমার যাহা বক্তব্য তাহা শ্রবণ করুন। পৌরাণিকী সাধনা একটী বিশিষ্ট সাধনা—এই সাধনপথ আশ্রয় করিয়া বহু বহু ভক্ত মানব নিজ নিজ জীবন সফল করিয়াছেন। যেমন আজকাল আমরা বলি যে কবিদের একটী জগৎ আছে—ঐতিহাসিকদের একটী জগৎ আছে—বৈজ্ঞানিকদের একটী জগৎ আছে। বিশেষ সাধনা ব্যতিরেকে সেই সেই জগতে কেহ প্রবেশ করিতে পারে না। সেইরূপ আমি আপনাদিগকে বলিতেছি যে পৌরাণিকদিগের একটি জগৎ আছে, সাধনাব্যতিরেকে আপনারা সে জগতে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। পৌরাণিকের জগৎ বলিলে আপরারা অনেকেই হয়ত মনে করিবেন, এ এক কল্পনার রাজ্য। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। পরমার্থতত্ত্ব (Ultimate Reality) লইয়া যখন বিচার, তখন আমরা যে জগৎকে প্রত্যক্ষ ও সত্য বলি, তাহার কতখানি সত্য আর কতখানি কাল্পনিক তাহাও বেশ সাহসপূর্ব্বক আলোচনা করা দরকার। এই প্রত্যক্ষই একমাত্র সত্য, সাধারণ বৈজ্ঞানিকী বুদ্ধিই একমাত্র বুদ্ধি, ইহাও একালের একটা প্রকাণ্ড কুসংস্কার—অন্যান্য কুসংস্কারের ন্যায় এই কুসংস্কারও মানবচিত্ত হইতে ক্রমশঃ দূরীভূত হইতেছে, ইহা আপনারা

অন্য সময়ে আলোচনা করিবেন। একালের একজন সুপ্রসিদ্ধ মনিষী Sir Oliver Lodge এই সিদ্ধান্তটী বিশেষ দক্ষতার সহিত বর্ত্তমান জগতের চিন্তারাজ্যে উপস্থিত করিতেছেন। তিনি দেখাইতেছেন যে সত্যের প্রকার-ভেদ আছে। তাঁহার আলোচনা পদ্ধতি সম্বন্ধে উপস্থিত আমার কিছু বলিবার নাই। পৌরাণিকী সাধনার রাজ্যে প্রবেশ করিলে এবং মানবীয় চিন্তার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের মধ্যে যে সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা আলোচনা করিলে আমরা এই তত্ত্ব সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। যেমন রসায়নশাস্ত্রের আলোচনায় সফলতা লাভ করিতে হইলে অতীতের যাবতীয় রসায়বিৎ পণ্ডিতগণের গবেষণা ও সাধনার দ্বারা আমার মনোবৃত্তির অনুশীলন একান্ত-ভাবে আবশ্যক, অলঙ্কার-শাস্ত্রের বা ন্যায়শাস্ত্রের সূত্রের আলোক হস্তে লইয়া রসায়নবিদের জগতের বস্তুদর্শনের প্রয়াস বিড়ম্বনা মাত্র, সেইরূপ পৌরাণিকী সাধনার দ্বারা হৃদয়-বৃত্তির বা অনুভূতির এক বিশিষ্টরূপ অনুশীলন ব্যতিরেকে এরাজ্যে প্রবেশ করিয়া সত্যজ্ঞানের আশা করা নিতান্তই বিড়ম্বনা। প্রতীচ্যদেশের চিন্তার সাহায্যে আমার প্রতিপাদ্য কথাটী যাঁহারা বুঝিতে চাহেন তাঁহারা Sir Oliver Lodge প্রণীত "Reason and Belief" গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবেন।

প্রাচীন পুরাণের মত ও গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ আচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামীর মত উদ্ধার করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে আমাদের দেশের এক সম্প্রদায় সাধকের যাহা ধারণা তাহা আপনাদিগকে জ্ঞাপন করা হইল। এখন আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন যে শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনায় পৌরাণিকী সাধনা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, আমাদের দেশে এখনও কেহ কেহ মনে করেন যে পুরাণগুলি বুঝি আধুনিক। এ মতে আজকাল বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে কেহ আর আস্থাবান নহেন, বৃহদারণ্যক উপনিষদেও পুরাণের কথা বিশেষ-ভাবে বলা হইয়াছে। পুরাণ-সমূহ এখন যে আকারে রহিয়াছে চিরদিন হয়ত সে আকারে ছিল না—কিন্তু পুরাণ যে চিরদিনই রহিয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই। পৌরাণিকী সাধনার শেষ সফলতা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর লীলার মধ্যে আচার্য্য সাধুগণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু তাঁহার অনুবর্ত্তী ভক্তগণকে যে নবচেতনায় জাগ্রত করিলেন, তাঁহার করুণার অঞ্জন প্রাপ্ত হইয়া এই সমুদয় সাধু যে শক্তি লাভ করিলেন, তাঁহার সাহায্যে তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের মর্ম্ম প্রত্যক্ষ অনুভব করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে আমাদিগকে আরও অনেক আলোচনা করিতে হইবে। অদ্য শ্রীমদ্ভাগবতের একটী মূলভাব আপনাদিগের নিকট উপস্থিত করিতেছি এই ভাবটী আপনারা গ্রহণ করিলে শ্রীকৃষ্ণলীলার অনেক রহস্য বুঝিতে পারিবেন। এই মূল ভাবটীর নাম আনন্দ-লীলা। আমি পৌরাণিকের ভাষায় বিষয়টি আপনাদিগের নিকট বর্ণনা করিতেছি। আপনারা বৈজ্ঞানিক সমালোচনার সুতীক্ষ্ণ ছুরিকাখানি কিছুক্ষণের জন্য তুলিয়া রাখিয়া ভাবুকের মত হৃদয় দিয়া এই রস পান করিবার চেষ্টা করিবেন।

মানুষ যখন সংসারে আসিয়া ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কিছুদিনের জন্য বিষয়-ভোগের আনন্দ-লাভের পর আত্মচিন্তায় রত হয় এবং চারিদিকে দুঃখ ও পরাজয় দর্শন করিয়া দুশ্চিন্তাকাতরচিত্তে জ্ঞানীর নিকটে জিজ্ঞাসু হইয়া উপস্থিত হয়, তখন জ্ঞানী তাঁহাকে বলেন পরমাত্মার কথা শুনিবে, তাঁহাকে মনন করিবে এবং ধ্যান ধারণার সাহায্যে তাঁহার সহিত তোমার যে গূঢ় ও গম্ভীর সম্বন্ধ তাহা উপলব্ধি করিবে। মানুষ তখন জিজ্ঞাসা করে এই যে পরমাত্মা ইনি কেমন? জ্ঞানী উত্তর করেন বাক্য ইঁহাকে বর্ণনা করিতে পারে না, মন ইঁহাকে অনুমান করিতে পারেনা। ইনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ অব্যয় ইত্যাদি। এই সমুদয় শুনিয়া মানুষের ভয় হয়। ভয় ছাড়া লোভেরও উদয় হইতে পারে—কারণ বেদ যাঁহাকে শব্দ স্পর্শের এবং বাক্যমনের অতীত বলেন কিছুক্ষণ পরেই তাঁহাকে আবার সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বশক্তিমান, প্রভৃতি বলিয়া থাকেন। বেদ ক্রমশঃ বলিলেন যে এই যে পরম বস্তু যিনি ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান প্রভৃতি নামে অভিহিত, তাঁহাকে ভালবাসিতে হইবে "প্রিয়মুপাসীত"—তিনি পুত্র হইতেও প্রিয়—বিত্ত হইতেও প্রিয়—অন্য সমুদয় বস্তু হইতেও প্রিয় এবং অন্তরতম। এই প্রকারে বেদের মধ্যেই ভয় ও লোভের ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া প্রেমধর্ম্মের সুস্পষ্ট সূচনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রেমধর্ম্মের আদর্শ-প্রতিষ্ঠাই যদি উপনিষদের শেষ সিদ্ধান্ত হয়—তাহা হইলে শ্রীমদ্ভাগবতকে বেদান্তের ভাষ্য বলা অত্যন্ত সঙ্গত হইয়াছে। উপনিষদের শিরোভাগে ব্রহ্মতত্ত্বের যে সমুদয় পরিচয় পাওয়া যায়, তৎসমুদয়কে এককথায় "আনন্দং ব্রহ্মেতি" তৈত্তিরীয় উপনিষদের এই উক্তির দ্বারা প্রকাশ করিতে পারা যায়, এই সূত্রটির মধ্যেই "আনন্দ-লীলা-বিভোর ভগবান" তাঁহার "লীলারসমাধুরী" লইয়া লুকাইয়া রহিয়াছেন। সমগ্র পৌরাণিকী সাধনা, বিশেষ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত,

এই ভাবটুকু ধরিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক যে প্রেমধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয় তাহার মর্ম্মকথা এই আনন্দ-লীলাময়ের উপলব্ধির মধ্যেই নিহিত। শ্রীমদ্ভাগবতের টীকার আরম্ভে শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন শ্রীমদ্ভাগবত এক স্বরতরু ; প্রণব ইহার অঙ্কুর (তারাঙ্কুর) সত্য ইহার ভূমি এবং ভক্তি ইহার আলবাল অর্থাৎ একটি অঙ্কুরের চারিদিকে আলবাল দিয়া জলসিঞ্চন করিতে করিতে কালে সেই অঙ্কুর যেমন বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হয়, সেই প্রকার ভক্ত ভাবুকগণ বা রসিক উপাসকগণ দীর্ঘকালব্যাপী সাধনার রসবারি সিঞ্চনে এই প্রণব অঙ্কুরকে শ্রীমদ্ভাগবতে পরিণত করিয়াছেন। প্রণবতত্ত্ব বিস্তৃতভাবে আলোচনার বিষয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে ইনি সগুণ ব্রহ্ম এবং সগুণ ও নিগুর্ণবাদের পূর্ণ সমন্বয়ের উপর ভগবদ্‌গীতার যে পুরুষো-ত্তমতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, ইনি সেই পুরুষোত্তম। পাতঞ্জলদর্শনের ভাষায় ইনি সেই পুরুষোত্তমের বাচক, কিন্তু পরমতত্ত্বে উপস্থিত হইয়া যখন নাম ও নামী অভেদ হইয়া যায় তখন ইনিই সেই পুরুষোত্তম। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বেদের সার গায়ত্রী এবং শ্রীমদ্ভাগবত গায়ত্রীর ভাষ্য। এখন আমাদের জানিয়া রাখা উচিত যে গায়ত্রীর সার প্রণব, এই প্রণবের মধ্যে মোটা মুটি দেখিতে পাই, সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়, লীলার এই তিনটী তরঙ্গ একত্রে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে সুতরাং লীলাবাদের সমগ্র রহস্যই প্রণব। তৈত্তিরীয় উপ-নিষদ বলিয়াছেন সৃষ্টি স্থিতি ও লয় এই তিনই এক আনন্দ হইতে হইয়া থাকে সুতরাং প্রণব শ্রীমদ্ভাগবতের অঙ্কুর এবং "আনন্দং ব্রহ্মেতি" ইহাই বীজ। এইবার আনন্দ-ব্রহ্মের আলোচনা করা যাউক।

আমাদের প্রকৃতিতে আনন্দের ক্রীড়া হয়। হইতে পারে ঐ আনন্দ নির্ম্মল নহে, হয়ত উহা অত্যন্ত বিমিশ্র কিন্তু তাহা হইলেও আনন্দ সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই একটা ধারণা আছে। সুস্পষ্ট ও সঠিক ধারণা যে নাই তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ আনন্দবস্তুর সুস্পষ্ট ও সঠিক ধারণাই বৃন্দাবনে শ্রীনন্দ-নন্দনের আরাধনা এবং সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের সাধনা-ধারা সেই আরাধনা সাগরে যাইয়া সম্মিলিত ও পরিণতি-প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং আনন্দতত্ত্ব আমা-দের বিশেষভাবে ধ্যানধারণার সামগ্রী। অন্ধকারময়ী রাত্রিতে মেঘাবৃত আকাশে বিদ্যুৎ-বিকাশের মত এই আনন্দ আমাদের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা স্থির হয় না। কারণ আমরা ধরিতে পারি না। যে নবীন মেঘের গায়ে সৌদামিনী অচঞ্চলা হয়, আমাদের ভাগ্যাকাশে এখনও সে নবীন

মেঘের উদয় হয় নাই। তাই "ক্ষণপ্রভা প্রভাসম বাড়ায় মাত্র আঁধার পথিকে ধাঁধিতে" আনন্দের ক্ষণিক প্রকাশ আমাদিগকে ভ্রান্তির মধ্যে পথহারা করিয়া আরও গভীর অন্ধকারে লইয়া যাইতেছে। কাজেই শান্ত ও নির্ম্মল চিত্তে আনন্দতত্ত্বের ধ্যানধারণা আমাদের যেন নিত্যকর্ম্মের অঙ্গীভূত হয়।

আমাদের দিক দিয়া আনন্দের আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে আনন্দের সহিত আপনার বাহিরে ছড়াইয়া পড়িবার এবং পরকে আপন করিবার, নিজের আনন্দরস সকলকে পান করাইয়া নিজের মত তাহা-দিগকেও আনন্দযুক্ত করিবার একটা প্রবল ইচ্ছা রহিয়াছে। আনন্দ কেবল একটী জ্ঞান নহে, ইচ্ছা ও ক্রিয়ার মধ্যেও ইহার প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী। চুপ করিয়া বসিয়া আছি, মনে আনন্দ নাই মুখখানি মলিন, মুখে কথা নাই, হঠাৎ আনন্দ আসিল! এ আনন্দ হয় ত বিষয়ানন্দ। কিন্তু বিষয়ানন্দেরও প্রাণ ব্রহ্মা-নন্দ। আনন্দ যেমন আসিল, মলিনমুখ উজ্জ্বল হইল, মুখে হাসি আসিল, আনন্দ বাড়িতে বাড়িতে মানুষ উঠিয়া দাঁড়াইল, শেষে ছুটাছুটি করিয়া পথের লোককে ডাকিয়া আনিয়া তাহাদের সহিত হাস্যালাপ ও কোলাকুলি করিতে লাগিল। ইহাই আনন্দের স্বভাব! আনন্দ প্রেম। "আনন্দচিণ্ময়রস প্রেমের আখ্যান।"

এইবার চিন্তা করা যাউক যিনি অসীম আনন্দময় তাঁহার প্রকৃতি কিরূপ হইবে? বেশ মোটামুটি ভাবেই আলোচনা করা যাউক। এই আলোচনায় আমাদিগকে একটি এমন কথা ব্যবহার করিতে হইবে যাহা আমাদের নিকট অবোধ্য। কিন্তু সেই কথাটি ব্যবহার করা ব্যতীত উপায় নাই। সে কথাটি "অসীম"। যিনি অনন্ত আনন্দময় তাঁহার প্রকৃতিতে আত্মবিতরণের অসীম ব্যাকুলতা আছে। এই 'অসীম ব্যাকুলতা' কি তাহা ধারণা করা খুবই কঠিন। মোটামুটি গণিত বা গতিবিজ্ঞানের সাহায্যে আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে অসীম ব্যাকুলতা একরূপ নির্ব্ব্যাকুলতা। কারণ আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে অসীম-গতি আর ঐকান্তিকী স্থিতি একই কথা। Infinite motion is absolute rest. ইহা এই প্রকারে বুঝিতে পারা যায়। মনে করুন আমার এই দুইটি অঙ্গুলির ব্যবধান একহাত। একটি সর্ষপকে এই ব্যবধানের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে লইয়া যাইতেছি। এক মিনিটে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে আনিলাম। এইবার সর্ষপের গতি দ্বিগুণ করা যাউক তাহা হইলে আধ মিনিটে একপ্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে আসিবে। গতিকে ৪ গুণ করিলে সিকি মিনিট লাগিবে। ১০০ গুণ

করিলে এক মিনিটের একশত ভাগের একভাগ সময় লাগিবে। তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে গতি যত বাড়িতেছে ঐ বস্তুটির দুই বিন্দুতে অবস্থিতিকালের মধ্যে যে ব্যবধান তাহা ততই কমিয়া যাইতেছে। সুতরাং গতি যদি অসীমে যায় তাহা হইলে ব্যবধান একেবারেই থাকিবে না অর্থাৎ একই সময়ে ঐ সর্ষপ উভয় স্থানে অবস্থান করিবে অর্থাৎ বিন্দু রেখা হইয়া স্থিতি লাভ করিবে। সুতরাং অসীম গতি আর স্থিতি যে এক জিনিস ইহা বুঝা খুব কঠিন নয়। এই চিন্তার প্রণালী আশ্রয় করিলে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবাদের সমন্বয় কিরূপ তাহা বুঝিতে পারা যাইবে এবং এই সমন্বয়ের রহস্যটুকুর উপলব্ধি শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব অবগত হওয়ার জন্য একান্তভাবে প্রয়োজন।

যাহা হউক মোটামুটি বুঝা গেল যে যিনি অনন্ত আনন্দময় তাঁহার প্রকৃতিতে এক নিত্যকাল স্থায়ী অসীম ব্যাকুলতা রহিয়াছে। এই ব্যাকুলতা কিসের জন্য? উত্তর দেওয়া বড়ই কঠিন! সকলই রহস্য। তাঁহার বাহিরে যে আর কিছুই নাই, তাহা হইলে নিজে নিজেকে আলিঙ্গন করিবার জন্য, নিজেকে নিজে আস্বাদন করিবার জন্য। শ্রীমদ্ভাগবতে ইহারই নাম আত্মারামের রমণ। এ কথা শ্রীশ্রীরাসলীলায় পরিব্যক্ত হইবে। কিন্তু প্রথমেই বিষয়টিকে এত কঠিন করিয়া প্রয়োজন নাই।

সহজ কথায় দেখিতেছি ভগবান আত্মদানের জন্য ব্যাকুল! সমুদ্র যেমন আপন আনন্দে অধীর হইয়া সর্ব্বদাই নৃত্য করে, ঢেউ তুলিয়া তুলিয়া তটের চরণে আসিয়া লুটাইয়া লুটাইয়া পড়ে, কিন্তু প্রস্তরময় তট নীরব ও নিস্পন্দ, সে সাড়াও দেয় না। সমুদ্র-তরঙ্গ বিফলমনোরথ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া যায়—কিন্তু এজন্য সমুদ্রের রোষ নাই, অভিমান নাই। রোষ থাকিলে সমুদ্র অসীম জলরাশি উচ্ছ্বাসিত করিয়া পৃথিবীকে ভাসাইয়া ও ডুবাইয়া দিতে পারিত, কিন্তু সে তাহা করে না; বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায় আবার ঘুরিয়া আসিয়া সেই অকৃতজ্ঞ তটের অঙ্গে লুটাইয়া পড়ে—অনন্ত আনন্দময় পরমপুরুষও তেমনি। চরমতত্ত্ব যাহাই হউক সে কথা তুলিয়া এখন প্রয়োজন নাই। এই প্রকাশিত বিশ্বলীলায় দেখিতেছি একদিকে শ্রীভগবান আর একদিকে মানুষ। মানুষ ভগবান্‌কে ডাকে না, তাঁহাকে ভুলিয়া আপনার প্রকৃত কল্যাণ উপেক্ষা করিয়া দুঃখ ও যন্ত্রণার পথে ছুটিতেছে। এখন ভাবিতে হইবে ভগবান্ কি করিতেছেন? তিনি কি কর্ম্মফলদাতারূপে যে যেমন কর্ম্ম করিতেছে কেবলমাত্র তদনুযায়ী ফল

বিধান করিতেছেন? প্রথমটা অনেকের তাহাই মনে হয়। কিন্তু শ্রীভগবানের স্বরূপের অর্থাৎ তাঁহার আনন্দভাবের পরিচয় যিনি পাইয়াছেন, তিনি দেখিতেছেন যে ভগবান ছুটিয়া ছুটিয়া আসিতেছেন, তিনি আপনার আনন্দে বিভোর ও আত্মহারা, পুনঃ পুনঃ ছুটিয়া আসিয়া মানবের হৃদয়-দুয়ারে আঘাত করিতেছেন। মানুষ অহঙ্কারের অর্গল দিয়া হৃদয় দুয়ার বন্ধ করিয়া নিশ্চিন্ত বসিয়া অবিদ্যার দুঃস্বপ্ন দর্শন করিতেছে। প্রেমময় হরি সাড়া না পাইয়া ফিরিয়া যাইতেছেন, কিন্তু তাঁহার অভিমান নাই, তাঁহার রোষ নাই, আবার তিনি আসিতেছেন। এই লীলা তিনি সর্ব্বদাই করিতেছেন।

এইবার বিষয়টি শাস্ত্রবাক্য ও তত্ত্বের মধ্য দিয়া আলোচনা করা যাউক। পৌরাণিক সাধনার প্রাণের কথা শ্রীভগবানের আবির্ভাব। শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন তাঁহার অবতার অসংখ্য। একটা সাধারণ কথা, ভগবান কেন আসেন? ইহার সাধারণ উত্তর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। সে শ্লোককয়টি সকলেই জানেন। সেখানে বলা হইয়াছে যে যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই তিনি আসেন ও দুষ্কৃতিকারীদিগকে বিনাশ করিয়া ধর্ম্মসংরক্ষণ করেন। যাঁহারা শ্রীভগবানের আনন্দভাব হৃদয়ে অনুভব করেন এই স্থানটি পড়িয়া তাঁহাদের মনে একটু সন্দেহের উদয় না হইয়াই পারে না। "আমি দুষ্কৃতিকারীদিগকে বিনাশ করিব" এই কথা শুনিয়া মানুষ বলিবে তাহা হইলে দুষ্কৃতিকারীদের আর উদ্ধার নাই। এ যে অনন্ত-নরক-বাদ (Eternal damnation) প্রচার করা হইল। আচার্য্য শঙ্করের টীকায় এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নাই, কিন্তু পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী তাঁহার টীকায় এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন। তিনি বলেন

"লালনে তাড়নে মাতুর্নাকারুণ্যং যথার্ভকে।
তদ্বদেব মহেশস্য নিয়ন্তুর্গুণদোষয়োঃ॥"

শিশুকে লালনে মায়ের তাড়না যেমন নির্দ্দয়তা নহে বিশ্বনিয়ন্তা মহেশ্বরেরও সেইরূপ।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবানের আবির্ভাবের অন্যরূপ কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। শ্রীরাসলীলার শেষাংশে বলা হইয়াছে—

"অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।

ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥"

অর্থাৎ শ্রীভগবান মানবদেহ আশ্রয় করিয়া এমন সব লীলা করেন যাহা শ্রবণ করিয়া মানুষ ভগবৎপরায়ণ হয়।

ভগবদাবির্ভাবের এই হেতুটিকেই সূত্ররূপে অনুসরণ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত আনন্দলীলার ধারা, যাহা যুগকল্প মন্বন্তরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে ও শ্রীনদীয়ায় পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন।

এই লীলার যাহা বিপরীত দিক, সেই দিকটা আশ্রয় করিয়া আমরা কথাটা পরিস্ফুট করিতেছি। হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু, রাবণ ও কুম্ভকর্ণ, দন্তবক্র ও শিশুপাল, এই তিন দৈত্যযুগল পৃথিবীতে কত ভয়ঙ্কর অশান্তি উৎপাদন করিয়াছে। ইহাদের অত্যাচারে পৃথিবী কাতরা হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়াছেন এবং ব্রহ্মার সাহায্যে ক্ষীরোদসাগরে যাইয়া ভগবান বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইয়াছেন। ভগবান এই সমুদায় দৈত্যের অত্যাচার হইতে পৃথিবীকে রক্ষা করিবার জন্য, যথাক্রমে বরাহ ও নৃসিংহ, শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। ভগবানের এই আবির্ভাব ও দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধে তাঁহাকে যে দারুণ ক্লেশভোগ করিতে হয়, সেই সকল ক্লেশের কথা আলোচনা করিলে প্রথমে আমাদের মনে হয় যে এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া ভগবান বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন, তিনি যেন আর সৃষ্টি রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। দানবেরা যেন তাঁহার প্রায় সমকক্ষ। শ্রীরামচন্দ্রলীলা এবং শ্রীকৃষ্ণলীলা শ্রবণ করিলে স্বভাবতঃই মনে এই প্রকার চিন্তার উদ্ভব হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতকার শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে যে পুরাতন ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে সনকাদি মুনিগণ বৈকুণ্ঠনাথকে দর্শন করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন, জয় ও বিজয় নামক বৈকুণ্ঠের দুইজন দ্বারী তাঁহাদের ভিতরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করেন। সনকাদি মুনিগণ এজন্য জয় ও বিজয়কে অভিশাপ প্রদান করেন যে তোরা অসুর হইয়া জন্মগ্রহণ কর। শেষে ভগবান আসিয়া সমুদয় ব্যাপারের মীমাংসা করিয়া দেন। এই জয় বিজয়ই অসুরযুগল হইয়া তিনবার বিশ্বলীলার রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছিল।

ভগবানের পার্ষদ দুইজন ব্রহ্মশাপে আসুরি যোনিতে নিক্ষিপ্ত হইলে ভগবান তাহাদের সান্ত্বনা করিয়া বলিয়াছিলেন "তোমাদের ভয় নাই,

তাহাই হইবে ; আমি ব্রহ্মশাপ নিবারণ করিতে পারি, কিন্তু তাহাতে আমার ইচ্ছা নাই। এই যে অভিশাপ ইহা আমার অভিপ্রায়মতই হইয়াছে।" শ্রীমদ্ভাগবতের ৩য় স্কন্ধের ষোড়শ অধ্যায়ের উনত্রিংশৎ শ্লোকের এইরূপ মর্ম্ম। এই শ্লোকের টীকায় পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী বলিতেছেন যে প্রকৃত তত্ত্ব এই—

"যদ্যপি সনকাদীনাং ক্রোধো ন সম্ভবতি। ন চ ভগবৎপার্ষদয়োঃ তয়োঃ ব্রাহ্মণ-প্রাতিকূল্যং। ন চ ভগবতো স্বভক্তোপেক্ষা! ন চ বৈকুণ্ঠগতানাং পুনর্জন্ম। তথাপি ভগবতঃ সিসৃক্ষাদিবৎ কদাচিৎ যুযুৎসা সমজনি। তদান্যেষামল্পবলত্বাৎ স্বপার্ষদানাঞ্চ তুল্যবলত্বেঽপি প্রতিপক্ষানুপপত্তেঃ। এতৌ এব ব্রাহ্মণনিবারণে প্রতিবর্ত্য তেষু চ ক্রোধমুদ্দীপ্য তচ্ছাপব্যাজেন প্রতিপক্ষো বিধায় যুদ্ধকৌতুকং সম্পাদনীয়মিতি ভগবতৈব ব্যবসিতঃ অতঃ সর্ব্বং সংগচ্ছতে তদিদমুক্তং শাপো ময়ৈব নিমিত্ত ইতি মাভৈষ্টমস্ত শমিতি হন্তং নেচ্ছে—মতং তু মে ইত্যাদি চ॥".

যদিও সনকাদি ঋষিগণের ক্রোধ হওয়া সম্ভব নহে এবং শ্রীভগবানের পার্ষদ দুইজনের ব্রাহ্মণের প্রতি কোনরূপ শত্রুতা থাকা সম্ভব নহে, তাহার পর ভগবান আপনার ভক্তকে কখনও উপেক্ষা করেন না এবং যাহারা বৈকুণ্ঠে গিয়াছে তাহাদের আর পুনর্জন্ম হয় না, তথাপি শ্রীভগবানের মনে যেমন সৃষ্টির ইচ্ছা জাগ্রত হয়, সেইরূপ একদিন যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা জাগ্রত হইল। কিন্তু শ্রীভগবানের তুলনায় অন্য সকলেই অত্যন্ত অল্পবল, তাঁহার যাহারা পার্ষদ তাঁহারা অনেকটা সমবল। ভগবানের এই যুদ্ধ-ইচ্ছা সফল করিবার জন্য. তাঁহার এই পার্ষদ দুইজনকে প্রতিপক্ষ করিলেন। ব্রাহ্মণদিগকে বৈকুণ্ঠপ্রবেশে বাধা দিবার প্রবৃত্তি পার্ষদদ্বয়ের মনে জাগাইয়া দিয়া এবং ব্রাহ্মণদিগের মনে ক্রোধের উদ্দীপন করাইয়া ব্রাহ্মণদিগের শাপপ্রদানের ছলে স্বকীয় পার্ষদদ্বয়কে প্রতিপক্ষ করিয়া যুদ্ধকৌতুক সম্পাদন করিতে হইবে এইপ্রকারের ব্যবস্থা ভগবানই করিলেন। এই জন্যই ভগবান জয়বিজয়কে বলিলেন যে এই শাপ আমার অভিপ্রায়েই হইয়াছে, তোমরা ভয় করিও না। জয়বিজয়ের এই উপাখ্যান প্রচারিত হওয়ার পর আমাদের সমুদয় ধারণা একেবারে বদলাইয়া গেল। পূর্ব্বে ভাবিতেছিলাম দৈত্যের উদ্ভবের দ্বারা পৃথিবীর ক্লেশ হইলে ভগবান সত্যই বিপন্ন হইয়া পড়েন—এবং সত্যই বুঝি তিনি দৈত্যগণকে বিনাশ করেন, এখন দেখা গেল দৈত্যেরাও তাঁহার

আপনার লোক, যাত্রার দলের অধিকারী যেমন আপনার আশ্রিত ব্যক্তিকে আপনার শক্র সাজাইয়া যুদ্ধের অভিনয় করিয়া স্বয়ং আনন্দের আস্বাদন করেন এবং অন্যান্য সকলের আনন্দ বিধান করেন—ভগবানও সেইরূপ আপনার লোককে দৈত্য সাজাইয়া বীররসের অভিনয় করেন। আনন্দই এ লীলার মূল। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই এই আনন্দ লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

মহারাজা পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম ঘটনা, এই ঘটনাতেও অনেকগুলি অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হইয়াছে এবং ভগবানের এই আনন্দ-লীলার সাহায্য ব্যতীত অন্যপ্রকারে ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যায় না। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার টীকায় এ কথা স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন। মহারাজা পরীক্ষিতের ন্যায় ধর্ম্মনিষ্ঠ ও ভগবদভক্ত সাধু ব্যক্তির সামান্য পিপাসায় একেবারে জ্ঞানশূন্য হওয়া অসম্ভব। তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে সমাধিস্থ ব্রাহ্মণকে চিনিতে না পারাও অসম্ভব—সুতরাং এইপ্রকারে ঘটনাগুলির সৃষ্টি করিয়া মহারাজ পরীক্ষিতের মনে বৈরাগ্য জাগাইয়া তাঁহাকে স্বধামে লইয়া যাওয়া এবং কলিসমুত্তীর্ণ হওয়ার অমোঘ উপায়-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র প্রচার করা এই লীলার উদ্দেশ্য সুতরাং আনন্দময়ের আনন্দাস্বাদনই শ্রীমদ্ভাগবতের যাবতীয় লীলার গূঢ় ও একমাত্র তাৎপর্য্য। আমাদিগকে এই আনন্দভাবের জাগরণে জাগ্রত হইতে হইবে—এই জাগ্রত অবস্থার নামই "প্রসন্নোজ্জ্বলচিত্ততা"—এই অবস্থাতেই মানুষ রসিক ও ভাবুক হয়।—এই অবস্থার মধ্য দিয়া বিশ্বব্যাপারের আলোচনা করিলে শ্রীমদ্ভাগ-বতের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যাইবে।

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে, শ্রীমদ্ভাগবতের এবং শ্রীকৃষ্ণলীলার গূঢ় মর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কর্ত্তৃক সার্ব্বজনীনভাবে প্রচারিত হইয়াছে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলার সাহায্যে আলোচনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণলীলারহস্য বুঝিতে পারিলে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারা যাইবে—ইহার কারণ এই যে, শ্রীকৃষ্ণলীলার মধ্যে সর্ব্বত্র অর্থাৎ সকলব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায় না—গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আচার্য্যেরা বলেন যে শ্রীকৃষ্ণ অবতার নহেন—তিনি অবতারী—ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের মত—অন্যান্য পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হইলেও তাঁহার স্বরূপের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হয় নাই—এই জন্য কেহ কেহ বলেন কৃষ্ণ নরনারায়ণ, কেহ বলেন

তিনি বামন—আবার কেহ বলেন তিনি ক্ষীরোদশায়ী তৃতীয় পুরুষ অবতার। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপায় প্রকৃত রহস্যের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন, তিনি বলিলেন শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে এই যে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচারিত হইয়াছে ইহার সমুদয়গুলিই সত্য—যিনি যতটুকু দেখিয়াছেন বা বুঝিয়াছেন সেই টুকুই বলিয়াছেন—প্রকৃত কথা এই, শ্রীকৃষ্ণ অবতারী—তাঁহার দেহে সমুদয় অবতার বিদ্যমান সুতরাং শ্রীকৃষ্ণলীলার সমুদয় ঘটনা এক পর্য্যায়ভুক্ত নহে। গৌড়ীয় আচার্য্যগণ সমগ্র শ্রীকৃষ্ণলীলাকে মোটামুটী তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ, পুরদ্বয়ে অর্থাৎ মথুরা ও দ্বারকায় পূর্ণতর, আর বৃন্দাবনে পূর্ণতম—এই গেল মোটামুটি বিভাগ। তাঁহার পর শ্রীবৃন্দাবনে যে লীলা হইল তাহার সমুদয় ঘটনাও একশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নহে। যেমন শ্রীকৃষ্ণ পূতনা ও অন্যান্য অসুর বধ করিয়াছিলেন, একথা লীলাগ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্বরূপে অসুর সংহার করেন নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের উক্তি অনুসারে "বিষ্ণুদ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর সংহারে।" যিনি দৈত্য বিনাশ করিলেন তিনি বিষ্ণু।

এই রহস্য কি প্রকারে বুঝিতে হইবে, এইবার তাহাই বলিতেছি। বিষয়টি অনেকের কাছে খুব কঠিন বলিয়া মনে হয় কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত ও লীলাতত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁহারা উপদেশ পাইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট ইহা অত্যন্ত সহজ। একটা ঘটনা ঘটিল। সকলের নিকট ঘটনাটি একরূপ নহে। যাঁহার শক্তি বা উপলব্ধি যেরূপ তিনি এই ঘটনাটিকে সেইরূপ একটা নাম দিলেন। এই প্রকারের একটা ঘটনাকে একজন বলিলেন পূতনাবধ আর একজন বলিলেন পূতনামোক্ষণ। যাঁহারা বিষ্ণুতত্ত্বে ভগবত্তা পর্য্যবসিত দেখেন, তাঁহারা বলিলেন পূতনা বিনষ্ট হইল, আর যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে বা নন্দনন্দনকে পরতত্ত্ব বলিয়া ধরিয়াছেন তাঁহারা দেখিলেন পূতনা মাতৃগতি লাভ করিল। ইংরাজীতে যাহাকে Standpoint বলে তাহারই প্রভেদনিবন্ধন এইরূপ ঘটিতেছে। যাঁহারা বাহিরকে একান্তভাবে বাহির বলিয়া ধারণা করেন অর্থাৎ যাঁহারা বহিঃপ্রাজ্ঞ তাঁহারা ইহা বুঝিবেন না। আবার যাঁহারা অন্তঃপ্রাজ্ঞ তাঁহারাও ইহা বুঝিবেন না—'সৎ' ভাবে বা 'চিৎ' ভাবে অর্থাৎ সত্তা বা চৈতন্যকে পরতত্ত্ব বলিয়া তাহারাই সাহায্যে যাঁহারা যাবতীয় তত্ত্ব বা ঘটনা উপলব্ধি করেন তাঁহারা এই রহস্য বুঝিবেন না। যাঁহারা উভয়তঃ-প্রাজ্ঞ অর্থাৎ সৎ ও চিৎ এই উভয়ভাবের আনন্দে সমন্বয় বা সার্থকতা উপলব্ধি করায় যাঁহাদের লীলাদৃষ্টি স্ফুরিত হইয়াছে তাঁহারা ইহা বুঝিতে পারিবেন।

বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ অনেক অসুর বিনাশ করিয়াছেন, ইহার সমস্তগুলি সম্বন্ধেই এই এক কথা।

তাহা হইলে এইটুকু পাওয়া গেল যে বৃন্দাবনের শ্রীনন্দ-নন্দন যদিও পরমতত্ত্ব, যদিও তিনি বৃন্দাবনে সর্ব্বদাই লীলা করিতেছেন তথাপি বৃন্দাবনে

তাঁহাকে ধরা বড়ই কঠিন। ঘটনাগুলি বিমিশ্র, ইহাদের মধ্যে কোন্ কোন্-টিতে স্বরূপের প্রকাশ ইহা অবধারণ করা বড়ই কঠিন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-লীলায় এ প্রকারের দুরূহতা আদৌ নাই। এখানে বিমিশ্র ঘটনার সমা-বেশের দ্বারা স্বরূপের উপলব্ধিতে আমাদের বিশেষ প্রতিবন্ধক নাই। অবশ্য শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীনন্দনন্দনের স্বরূপ প্রকাশের আরও অন্যান্য প্রতিবন্ধক আছে সে সমুদয় আমরা পরে আলোচনা করিব। উপস্থিত আমরা দেখিতেছি যে বৃন্দাবনে অবতারীর দেহে থাকিয়া অন্যান্য অবতারেরা নিজ নিজ কার্য্যসাধন করায় আমরা পরতত্ত্বের উদ্দেশ সকল সময়ে করিতে পারি না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলায় স্বরূপের পরিচয় সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল। এই স্পষ্টতা কি প্রকারে সাধিত হইয়াছে তাহার আলোচনা আমরা বিস্তৃতভাবে ক্রমশঃ করিব। উপস্থিত আচার্য্যগণের মতানুসারে এইটুকু বলিতে চাই যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলায় শ্রীকৃষ্ণের এই স্বরূপের পরিচয় স্পষ্টরূপে পাওয়া যায়। কবি প্রেমানন্দ দাস তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত পদটিতে এই কথাই বলিতেছেন।

"এ মন গৌরাঙ্গ বিনে নাহি আর।
হেন অবতার, হবে কি হয়েছে,
হেন প্রেম পরচার।
দুরমতি অতি, পতিত পাষণ্ডী,
প্রাণে না মারিল কারে।
হরিনাম দিয়ে, হৃদয় শোধিল,
যাচি গিয়া ঘরে ঘরে॥
ভব বিরিঞ্চির, বাঞ্ছিত যে প্রেম,
জগতে ফেলিল ঢালি।
কাঙ্গালে পাইয়ে, খাইল নাচিয়ে,
বাজাইয়ে করতালি॥
হাসিয়ে কাঁদিয়ে, প্রেম গড়াগড়ি,
পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ।
চণ্ডালে ব্রাহ্মণে, করে কোলাকুলি,
কবে বা ছিল এ রঙ্গ॥
ডাকিয়ে হাঁকিয়ে, খোল করতালে,
গাহিয়ে ধাইয়ে ফিরে।
দেখিয়া শমন, তরাস পাইয়ে,
কপাট হানিল দ্বারে॥
এ তিন ভুবন, আনন্দে ভরিল,
উঠিল মঙ্গল সোর।
কহে প্রেমানন্দে, এমন গৌরাঙ্গে,
রতি না জন্মিল তোর॥"

চ্যবন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উপবন বিহার।

বৈবস্বত মনুর পুত্রের নাম ইক্ষ্বাকু। ইক্ষ্বাকুর নয় পুত্রের মধ্যে শর্য্যাতি তৃতীয় পুত্র। শর্য্যাতি বহু রাজ-কন্যা বিবাহ করিয়া পরম সুখে রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। বহু বনিতাসত্ত্বেও রাজা শর্য্যাতির আনর্ত্ত নামীয় একমাত্র পুত্র ও সর্ব্বসুলক্ষণান্বিত পরমাসুন্দরী সুকন্যা নাম্নী কন্যা ব্যতিরেকে আর সন্তানাদি হয় নাই। স্বয়ং রাজা যেমন এই পুত্র ও কন্যাকে ভালবাসিতেন তাঁহার পত্নীগণও তাহাদিগের প্রতি তদ্রূপ প্রেমানুরক্ত ছিল।

নৃপতিপ্রবর শর্য্যাতির নগরের অনতি-দূরে পরমরমণীয় এক উপবন ছিল। সেই উপবনের মধ্যস্থলে চারুতীর্থমালাপরিশোভিত সুপ্রশস্ত মার্গ-সমূহে সুশোভিত সুবিমল সলিলপূর্ণ বিস্তীর্ণ এক সরোবর ছিল। হংস, কারণ্ডব চক্রবাক সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণের লীলাক্ষেত্র হইয়া সেই সরোবরের অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল। কমল কুমুদকহ্লার প্রভৃতি জলপুষ্পগণ প্রস্ফুটিত থাকায় উহা মানস সরোবরের কান্তিধারণ করিয়াছিল। সেই সরোবরের চতুর্দ্দিকে শাল তাল তমাল বট পুন্নাগ অশোক কিংশুক অশ্বত্থ কদম্ব সরল প্রভৃতি মহীরুহগণ শাখাপ্রশাখা বিস্তারপূর্ব্বক সশস্ত্র শান্ত্রীর ন্যায় দণ্ডায়মান আছে। মধ্যে মধ্যে যূথিকা, মল্লিকা, প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষে শুভ্রবর্ণ পুষ্প প্রস্ফুটিত হওয়ায় সেই উপবন, অপরূপ শোভার আধার হইয়াছিল। এই উপবনে পিকগণের নিরন্তর কুহরব পাপিয়ার 'চোক গেল' ময়ূরের কেকা-রব তত্রত্য জনগণের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিত। উপবনের মধ্যস্থিত সেই সরোবরের সমীপবর্ত্তী বৃক্ষলতাদি সমাচ্ছন্ন কোন স্থানে প্রশান্তচিত্ত তপস্যা-নিরত ভৃগুনন্দন চ্যবন অবস্থিত ছিলেন। এই উপবন নির্জ্জন জানিয়াই তিনি মৌনব্রত ধারণপূর্ব্বক সমাহিতচিত্তে প্রাণ বায়ু নিরুদ্ধ করিয়া তপে নিমগ্ন ছিলেন। তিনি জলাদি পান পরিত্যাগ ও ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক পরাৎপরা জগদম্বার ধ্যানে নিরত থাকায় বহিরিন্দ্রিয়ের বৃত্তিসমূহ বিলুপ্ত হইয়াছিল। বহুকাল নিশ্চলভাবে অবস্থিত থাকায় তাঁহার দেহ বল্মীক-মৃত্তিকায় আবৃত ও লতাজালে পরিবেষ্টিত হইয়া পিপীলিকা সমূহে সমাকীর্ণ হইয়াছিল। মৃত্তিকা-স্তূপ এরূপ প্রকাণ্ড হইয়াছিল যে সমীপবর্ত্তী হইয়াও তাহার ভিতর মনুষ্য

আছে কিছুতেই বোধ হইত না। অপরাপর বল্মীকস্তূপ হইতে এই স্তূপের এইমাত্র বিশেষত্ব ছিল যে সেই স্তূপের যেখানে ঋষিপ্রবরের চক্ষু ছিল তথায় দুইটী ছিদ্র ছিল। এই ছিদ্র দ্বারা উপবনের আলোক প্রবিষ্ট হওয়ায় তাঁহার ধ্যানস্তিমিত নেত্রদ্বয় যেন ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছে বলিয়া বোধ হইত।

একদা রাজা শর্য্যাতি অন্তঃপুরচারিণী পরমাসুন্দরী মহিষীগণসহ বিচিত্র বিচিত্র যানারোহণে সেই পদ্মবনমণ্ডিত সুবিমল-সলিল সরোবরে আগমন পূর্ব্বক পরমানন্দে বিহার করিতে লাগিলেন। যানবাহী ও শকটচালকগণ দূরে বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবেশনপূর্ব্বক হাস্যকৌতুকে নিমগ্ন আছে। অশ্বগণ যদৃচ্ছ নবদূর্ব্বা ভক্ষণ করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। সরোবরাভ্যন্তরে রাজা মহিষীগণসহ সন্তরণ ও জলক্রীড়াদিতে নিযুক্ত আছেন। অন্তঃপুর-বাসীগণের কেহ বা স্নানার্থ সরোবর-জলে দূরবর্ত্তী তীর্থমালা দিয়া অবরোহণ করিয়াছে, কেহ স্নান করিয়াছে, কেহ বা তীর্থ-মালার উপর উপবেশনপূর্ব্বক অঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিতেছে। অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী অনবদ্যাঙ্গী রাজ-কুমারী সুকন্যা সখীগণসহ সরোবরের অপর পারে পুষ্পচয়ন ও ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। ক্রীড়াকালে অপ্রাপ্ত-যৌবনা সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিতা নৃপনন্দি-নীর ভূষণ-শিঞ্জনে শ্রুতিসুখকর শব্দ উত্থিত হইতেছিল! ক্রীড়াপরা রাজ-নন্দিনী সখীগণসহ ক্রমশঃ সেই বল্মীকের সমীপবর্ত্তিনী হইলেন। অপূর্ব্ব সেই বল্মীক ও তাহাতে চক্ষুর ন্যায় দুইটি ছিদ্র দেখিয়া তথায় উপবেশন পূর্ব্বক তিনি সেই ছিদ্রদ্বারা অভ্যন্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখিলেন সেই বল্মীকরন্ধ্র মধ্যে যেন দুইটী খদ্যোত জ্যোতিঃ বিকীরণ করিতেছে। এই অদ্ভুত জ্যোতি দর্শন মাত্রেই, ইহা কি দেখিবার জন্য তাঁহার মনে লালসার উদয় হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হইয়া বল্মীক উত্তোলন করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহাতে বিফলমনোরথ হইয়া সখীগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন ইহার ভিতর কি অদ্ভুত পদার্থ আছে আমার দেখিবার লালসা হইয়াছে।

জনৈক সখী তাঁহাকে পরিহাস করিয়া কহিল তুমি যেভাবে উহাকে আলিঙ্গন করিয়াছ তাহাতে বোধ হইতেছে যেন তোমার বর ঐ বল্মীক মধ্যে বিরাজ করিতেছেন।

সুকন্যা। পরিহাস নয় সখি, আমি এক অপূর্ব্ব জ্যোতি উহার মধ্যে

নিরীক্ষণ করিয়াছি, একটা বড় খর্জ্জুরের কাঁটা আন দেখি, তাহা হইলে কি উহা বুঝিতে পারা যাইবে।

সখী। সখি! বিরত হও; দেখিতেছ না এটী বল্মীকের স্তুপ, উহার মধ্যে কণ্টক প্রবেশ করাইয়া দিলে কতকগুলি পিপীলিকা বিনষ্ট হইবে।

ইতিমধ্যে অনৈক সখী খর্জ্জুরকণ্টক আনয়ন করিলে নিকটবর্ত্তিনী সখীর বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া সেই কণ্টক রন্ধ্র দিয়া প্রবেশ করাইয়া দিলেন। অমনি কি যেন বিদ্ধ করিলেন ভাবিয়া রাজকুমারীর দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সসম্ভ্রমে কণ্টক বাহির করিয়া লইলেই দেখিতে পাইলেন কণ্টক রক্তলিপ্ত হইয়াছে। তখন হায় আমি কি করিলাম, কাহার সর্ব্বনাশ করিলাম বলিয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে রাজকুমারী সখীগণসহ তথা হইতে পলায়ন করিলেন।

এ দিকে তপস্যা-নিরত বৃদ্ধ চ্যবনের প্রতি নৃপনন্দিনীর ঈদৃশ নৃশংস আচরণে রাজা শর্য্যাতি স্বয়ং, তদীয় মহিষীগণ, যানবাহনাদি সকলেই ক্ষুধা-মান্দ্য হেতু অভূতপূর্ব্ব ক্লেশ অনুভব করিতে লাগিলেন। তখন রাজা, পরি-বারগণ ও রাজকুমারীসহ পুনরায় নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ময়ামায়া সকাশে

বনমধ্যে অবস্থানকালে কিঙ্করগণসকাশে এই অদ্ভুত পীড়ার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া এবং নিজের ও মহিষীগণের সেই পীড়াপ্রাপ্ত হইবার উপক্রম দেখিয়া রাজা অবিলম্বে স্বনগরীতে আগমন করিলেন। রাজান্তঃপুরী মধ্যে সক-লেই ক্ষুধাহীনতা বশতঃ কষ্ট পাইতে লাগিলেন। এদিকে নগরী হইতে সংবাদ আসিতে লাগিল সৈনিকগণ ক্ষুধাহীনতা-বশতঃ দিন দিন কৃশ হইয়া পড়ি-তেছে। অশ্বশালে ও গজশালে অশ্বগণ ও মাতঙ্গগণ আহারে অনিচ্ছাবশতঃ অস্থিকঙ্কাল সার হইয়া পড়িতেছে। এতাদৃশ পীড়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে সকলেরই প্রাণসংশয়, এই চিন্তায় অভিভূত হইয়া রাজপুঙ্গব শর্য্যাতি ইহার কারণানুসন্ধানে মন নিবিষ্ট করিলেন। তিনি কর্ম্মচারীগণের নিকট সংবাদ লইয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে উপবনযাত্রীগণ ব্যতিরেকে আর কেহই এই পীড়াক্রান্ত হয় নাই। তখন তাঁহার সম্যক জ্ঞান হইল উপবন যাত্রী-গণের কেহ না কেহ নিশ্চয়ই কোন দেবতা বা মহাপুরুষের প্রতি অসদ্ব্যবহার করিয়া থাকিবে। তাঁহার স্মরণ হইল উপবনের পশ্চিমভাগে অনলতুল্য মহাতপা মুনিবর চ্যবন আছেন তাঁহারই প্রতি কেহ কোন অত্যাচার করিয়া থাকিবে। মনোমধ্যে এইরূপ আন্দোলন করিয়া তাঁহার দৃঢ়ধারণা হইল যে সেই তপঃপ্রভাবসম্পন্ন বয়োবৃদ্ধ মাননীয় মুনিবর ভার্গবের অবহেলা ব্যতি-রেকে এরূপ অদ্ভুত পীড়ার আবির্ভাব হইতে পারে না। তখন মহারাজ শর্য্যাতি সৈনিক ও যানবাহক প্রভৃতিগণকে আহ্বানপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করি-লেন "তোমরা কি কেহ উপবনস্থ সরোবরের পশ্চিমভাগে অবস্থিত তপোবৃদ্ধ

ভৃগুনন্দন চ্যবনের প্রতি কোন অত্যাচার বা কোন প্রকারে, তাঁহার অব-মাননা করিয়াছ ?” তচ্ছ্রবণে পীড়াকাতর সৈনিকমণ্ডলী ও যানবাহকগণ কহিল “মহারাজ ! আমরা তাঁহার প্রতি অজ্ঞানকৃত কোন দোষ করি নাই কারণ আমরা সকলেই তাঁহার প্রভাব ও আবাসস্থান অবগত আছি। আমরা শরীর বা বাক্য দ্বারায় কিম্বা মনে মনেও কখন তাঁহার কোন অপকার করিয়াছি তাহা স্মরণ হয় না। অনন্তর মহারাজ সুহৃদবর্গ ও মহিষীগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে একই উত্তর প্রাপ্ত হইলেন। স্ত্রীগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিবার সময় তিনি স্বীয় কন্যা সুকন্যার দর্শন পাইলেন না। তথাপি তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, পরমধার্ম্মিকা দর্শনলোভনীয়া সুকন্যা কখনও এতাদৃশ পাপাচারণ করিতে পারে না, সুতরাং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সভাস্থলে উপবেশন পূর্ব্বক মন্ত্রী ও সভাসদগণসহ কর্ত্তব্য নির্ণয় বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা একবাক্যে কহিলেন, “মহারাজ ! আপনি ও আপনার সৈনিক ও যানবাহকগণ যে পীড়াগ্রস্ত হইয়া নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন আমরাও সেই পীড়াদ্বারা আক্রান্ত হইয়া অশেষ ক্লেশ অনুভব করিতেছি। অতএব আমরা যদি কোনপ্রকার দোষে দোষী হইতাম, আপনার নিকট ব্যক্ত করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিতাম।”

এদিকে শিষ্টস্বভাবা আদরিণী নৃপনন্দিনী সখীগণসহ পীড়াক্রান্ত হইয়া যে কেবল কষ্ট পাইতেছিলেন তাহা নহে। তিনিই সেই তপস্যানিরত নিষ্পাপ মুনিবরের অহিতসাধন পূর্ব্বক দারুণ মনঃপীড়ায় ব্যথিতা হইয়া সখীগণ সঙ্গে খ্যাতিপ্রতিষ্ঠিত মহামায়ার মন্দিরে গমনপূর্ব্বক আত্মকৃত দুষ্কৃতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তিনি অত্যন্ত কাতরভাবে দীন মনে সাষ্টাঙ্গে প্রণতিপুরঃসর মহাদেবীর চরণতলে পতিতা আছেন এমন সময়ে বীণাবিনিন্দিত মধুর স্বরে তাহার শ্রুতিমূলে ধ্বনিত হইল, “হে রাজনন্দিনি, তুমি যাহার নিকট অপরাধিনী তাঁহার আদেশ পালন করিলে ক্ষমাপ্রাপ্ত হইবে। সুতরাং গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তোমার পিতার নিকট গমন করিয়া সমস্ত ঘটনা বিবৃত কর এবং অনুরোধপূর্ব্বক তাঁহাকে সেই মহাত্মা চ্যবনের নিকট প্রেরণ কর। তাঁহার অনুনয় বিনয়ে প্রসন্ন হইয়া মুনিবর যে আজ্ঞা করি-বেন তাহাই পালন করিলে তোমার পিতা মহিষীগণসহ যাবৎ রোগমুক্ত হই-বেন এবং তুমিও যশস্বিনী হইবে।”

সুন্দরী কন্যাললাম মাতার এই আশ্বাস-বাক্যে পরম আপ্যায়িতা হইলেন এবং সেই দেবীমূর্ত্তিসকাশে শত সহস্র বার প্রণাম করিয়া তথা হইতে সখীগণ সমভিব্যাহারে পিতার উদ্দেশে গমন করিলেন। ক্রমশঃ

শ্রীভূধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

বিরহিনী রাধা ।

মদন-মোহন-মানস-মোহিনী
মদন-মোহন বিহনে আজ।
বিরহ-বিধুরা, দেখিয়া ললিতা
পরায় বঁধুর মিলন-সাজ॥
কেন বিনোদিনি, উন্মাদিনী ধনি,
খলিত-বসনা গলিত কেশে।
এস এস মম পরাণ-পুতলি
সাজাই তোমায় মোহন বেশে।
ব্রজ ছাড়া নয় শ্যাম রসময়
ঐ শোন ধনি মুরলী বাজে,
অভিসার-সাজে বিভূষিতা হয়ে
মিলিতে চলগো নাগর-রাজে॥
শিরে চূড়া পর, গলে মণিমালা,
অঙ্গুরী বলয় ভূষণ করে।
কটির উপরে বাজুক কিঙ্কিণী
চরণে নুপুর রসের ভরে।
নীল নীচোলে বদন ঢাকহ
গোবিন্দ-মিলনে বাধা গো বহু।
অকলঙ্ক পূর্ণ শশীর ভরমে
গরাস করয়ে যদি গো রাহু॥
মঙ্গল-কলস তাম্বুল-বীটিকা
ব্যজনিকা করে আমরা সবে।
জয় রাধে বলে যাব বিনোদিনি
নিকুঞ্জ মাঝারে গোবিন্দ রবে।
শ্রীরাধা—কইরে ললিতা পরাণ-সজনি
কোথায় শুনিছ বাঁশীর তানে।
শ্যাম-অনুগত হৃদয়-পুতলী
নাচে নাগো কেন বাঁশীর গানে।
ময়ুর ময়ুরী ভ্রমর ভ্রমরী
দেখলো ললিতে অবশ হয়ে।
হরিণ হরিণী শ্যামলা ধবলা
জলদ পানেতে আছে গো চেয়ে॥
মকরন্দে কেন বসেনা ভ্রমর
কোমল তৃণেতে চরেনা গাভী।
ময়ুর নাচেনা পেখম তুলিয়ে
ধরেছে সকলে বিষাদ-ছবি।
তাই বলি সখি কেন দাও ব্যথা
রাধার পরাণে কিবা লো কাজে।
বঁধুর বিরহে বিরহিনী রাধা
পশিবে মানস-জাহ্নবী মাঝে।
বলিয়া ধাইল বিনোদিনী ধনী
ব্যাকুলিতা হয়ে পাগলপারা।
তমালের শাখা তরু লতাবলী
জড়ায়ে ধরিছে চরণে তারা॥
ধাইয়া যাইতে তরুলতাবলী
ধরিতেছ কেন চরণে বেড়ে
কেন দাও বাধা সবিনয়ে বলি
দাওনা দাওনা দাওনা ছেড়ে।
বিপুল বেগেতে ধাইয়া ললিতা
ধরিল রাধার যুগল পদে।
বলিতে লাগিলা বিনোদিনী ধনি
আনিয়া দেখাব শ্যামল চাঁদে
পরাণ ত্যজিবে পরাণ প্রতিমে।
প্রণয়ের হাট ভাঙ্গিয়া যাবে
সকল যাইবে, তোমার সহিতে
কেবল যমুনা জাহ্নবী রবে।
শুনহ ললিতে শেষের বচন
এই ভার দিনু তোমারে আজ।
যতনে সেবিও মদন-মোহনে
যখন থাকিবে বরজ মাঝ।
আমার রোপিত মল্লিকা মালতী
চম্পকের ফুলে গাঁথিয়া মালা
তুলসীর সনে রাধা নাম লিখে
বঁধুরে আমার দিওগো ডালা।
একবার হেথা আনিস্ তাহারে
দেখাস্ রাধার চরমতনু।
মানস জাহ্নবী সলিলে বঁধুর
ধুইও রাতুল চরণ জনু॥

শ্রীহরিদাস বিদ্যাবাগীশ।

নবদ্বীপ সেবাশ্রম সম্বন্ধে দুএকটি কথা।

পাঁচ বৎসর হইল কলিকাতার একজন ভদ্রলোক বৈরাগী হইয়া শ্রীনবদ্বীপ-ধামে একটি সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া এই সেবাশ্রম চালাইতেন, এই সেবাশ্রম চালাইতে যে তাঁহাকে কত কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে তাহার সীমা নাই। কিন্তু তিনি একদিনের জন্যও বিচলিত হন নাই, অক্লান্তভাবে দিনরাত্রি খাটিতেন। তিনি বৈরাগী হইয়াছিলেন, কিন্তু সেবাশ্রম করিয়াছিলেন বলিয়া নবদ্বীপের বৈরাগীসমাজ তাঁহার উপর ভিতরে ভিতরে খুবই বিরক্ত ছিলেন। অনেক বৈরাগী বলিতেন যে, রোগীর সেবা করা, মড়া ফেলা, এসব বিবেকানন্দের দলের কাজ, ইহা বৈষ্ণবের শুদ্ধাচার-সম্মত নহে। যাঁহারা শাস্ত্র পড়িয়াছেন এপ্রকারের বৈষ্ণব সমাজের নেতৃগণ গম্ভীরভাবে বলিতেন যে, জনসেবা কর্ম্মকাণ্ড, ইহাতে বন্ধন হয়, ইহাতে অহঙ্কার হয় সুতরাং ইহা বিশুদ্ধ বৈষ্ণবমতের অনুমোদিত নয়। নিম্নাধিকারী খৃষ্টান প্রভৃতির ইহাই পথ। যিনি সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন গৃহস্থাশ্রমে থাকার সময় তাঁহার নাম ছিল পুলিনবিহারী মল্লিক, ভেক লওয়ার সময় তাঁহার গুরু তাঁহাকে নাম দিয়াছিলেন নিত্যানন্দ দাস। অনেকে গোপনে তাঁহার কার্য্যের নিন্দা করিতেন বটে, কিন্তু প্রকাশ্যে অশেষ প্রশংসা করিতেন। ইহার প্রথম কারণ এই যে, নিত্যানন্দ দাস এত ভাল লোক ছিলেন যে, কেহ তাঁহাকে তীব্রভাবে গালাগালি করিলেও তিনি হাসিতে হাসিতে তাঁহার পায়ের ধূলা লইতেন। দ্বিতীয় কথা এই যে, তিনি সর্ব্বদাই পরের উপকার করিতেন, এই দুইটি কারণে প্রকাশ্যে তাঁহার সহিত বড় একটা বিরোধ হইত না, কেবল দু একবার হইয়াছিল তাহা আমরা স্থানান্তরে বর্ণনা করিব।

নিত্যানন্দ দাস মহাশয় এই জনসেবাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি বলিতেন বৈষ্ণবসমাজে এই জনসেবা বা জীবে দয়া যতদিন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পথ বলিয়া স্বীকৃত না হইবে, ততদিন অন্যান্য যাবতীয় অনুষ্ঠান একেবারে নিষ্ফল। তিনি বলিতেন যে, তাঁহার গুরুদেব শ্রীশ্রীমৎ রাধারমণ চরণ দাস বাবাজী মহাশয় তাঁহাকে এইরূপ উপদেশই দিয়া গিয়াছেন।

দেশের লোক এই নীরব ও ত্যাগশীল সাধকের কাতর জীবনের প্রতি

বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করেন নাই, নিজের সম্প্রদায়ের নিকট তাঁহাকে প্রতিপদে উপেক্ষিত হইতে হইয়াছিল, কিন্তু এজন্য তিনি কখনও ক্ষুব্ধ বা বিচলিত হন নাই। তিনি জানিতেন তাঁহার কার্য্য একদিন স্বীকৃত ও অবলম্বিত হইবে। তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেন যে, তিনি ভগবানের প্রতি চাহিয়া এই সেবাকার্য্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করিতে পারিলেই কৃতার্থ হইবেন। তিনি যাহা বুঝিতেন ঠিক তাহাই করিলেন। মাঘী মেলার সময় বহুযাত্রীর সমাগমবশতঃ নবদ্বীপে যখন অতি ভয়ানক বিসূচিকা রোগের আবির্ভাব হইল, তখন তিনি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সাত দিন সাত রাত্রি অক্লান্তভাবে বিদেশী সহায়হীন বিসূচিকারোগগ্রস্ত তীর্থযাত্রীর সেবা করিতে করিতে হাস্যমুখে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

তাঁহার সেবাশ্রম নূতন লোকের হাতে আসিল। সংসার ছাড়িবার সময় তিনি বোধ হয় বুকের মধ্যে খুব একটা বড় আশা পোষণ করিতেছিলেন, তিনি হয়ত ভাবিতেছিলেন দেশে একটা জাগরণ আসিয়াছে, সমগ্র হিন্দুসমাজে একটা নব চেতনার সঞ্চার হইয়াছে, নবদ্বীপে চারি শত বৎসর পূর্ব্বে যে প্রেমধর্ম্মের বিজয়দুন্দুভি বাজিয়াছিল, সেই দুন্দুভি-ধ্বনি অনেক দিন পরে আবার যেন দেশের লোকে শুনিতে পাইয়াছে। দেহ-ত্যাগ করিবার সময় নিত্যানন্দ দাস এই প্রকারের একটা খুব বড় আশা পোষণ করিতেছিলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন দেশের, অন্ততঃপক্ষে শিক্ষিত সম্প্রদায়, তাঁহার কার্য্যটীর প্রকৃত মূল্য জানিয়া গ্রহণ করিবে, এই জন্য তিনি সাত জন ট্রাষ্টির উপর তাঁহার কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া যান। তাঁহার কার্য্য চলিতেছে, কিন্তু এই কার্য্য সম্বন্ধে কয়েকটী অতি প্রয়োজনীয় কথা দেশের সকলের চিন্তা করিয়া দেখা উচিত।

কেহ কেহ বলেন নবদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত এই সেবাশ্রম নবদ্বীপের লোকের সাহায্যে পরিচালিত হওয়া উচিত, নবদ্বীপের বাহিরে যাঁহাদের বাড়ী তাঁহারা ইহাকে সাহায্য করিবেন কেন? এই আপত্তি শুনিয়া বড়ই দুঃখ হয়, এই জন্য দুঃখ হয় যে, আমরা দেশকে ভালবাসি বলিয়া এবং দেশের হিতের জন্য যাহা হউক একটা কিছু করিব বলিয়া যে সময় এত বদ্ধপরিকর হইয়াছি, সে সময়ে আমাদের দেশসম্বন্ধে আদৌ কোন জ্ঞান নাই।

নবদ্বীপের এই সেবাশ্রম কাহাকে সাহায্য করে? নবদ্বীপের স্থানীয় লোকেরা সেবাশ্রম হইতে বিশেষ কোনরূপ সাহায্যের প্রত্যাশী নহেন।

বাঙ্গলা উড়িষ্যা ও আসামে হিন্দুর বাসস্থান এমন কোন গ্রাম নাই যেখান হইতে প্রতি বৎসর নবদ্বীপে তীর্থযাত্রী আসে না। বাঙ্গালা দেশে উড়িষ্যায় ও আসামে হিন্দুর বাসস্থান এমন কোন গ্রাম নাই, যেখানে প্রতি বৎসর কথকতা, শাস্ত্র-ব্যাখ্যা, কীর্ত্তন, স্মৃতির ব্যবস্থা, দীক্ষা-দান প্রভৃতির মধ্য দিয়া নবদ্বীপের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয় না, ইহা ছাড়া দেশে দেশে সর্ব্বদাই নবদ্বীপের মহিমা ও নদীয়ার ঠাকুর শ্রীচৈতন্যের কথা প্রচারিত হইতেছে। গ্রামের সাধারণ লোকে এই সকল কথা স্থূলভাবে বোঝে, তাহারা মনে করে বাঙ্গালা দেশের কেন্দ্র-স্থানে পবিত্র সুরধনীর তীরে প্রেম ও করুণা দিয়া গঠিত একটা স্থান আছে। ফলে কোন লোক যখন গ্রামে আর খাইতে পায় না অথবা গ্রামের সমাজ যখন কোন কারণে তাহাকে তাড়াইয়া দেয়, তখন বুকের মধ্যে খুব বড় একটা আশা লইয়া ভিক্ষা করিতে করিতে পদব্রজে বহু ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া নবদ্বীপে আসে। এমন কত লোক—কেহ পীড়িত হইয়া, কেহ অন্নাভাবে মুমূর্ষুপ্রায় হইয়া প্রতিদিন নবদ্বীপে আসিতেছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। বাঙ্গালা দেশে যে বৈষ্ণব ধর্ম্মের পুনরুত্থান হইতেছে তাহাই ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল। এই সমস্ত লোক কোথায় দাঁড়াইবে? অনেকে আজ উচ্চ কণ্ঠে বৈষ্ণব আন্দোলনের মাহাত্ম্য প্রচারে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের এই আহ্বান শুনিয়া যাহারা সরল বিশ্বাসের বশবর্ত্তীতায় নবদ্বীপে আসিতেছে তাহাদিগকে এক মুষ্টি অন্ন দিবার জন্য এ পর্য্যন্ত কোনও ব্যবস্থা করা হয় নাই।

আমরা মনে করি যে আমাদের খবরের কাগজ এবং সভা সমিতির আন্দোলনের মধ্যে গোটা বাঙ্গলা দেশ অধিকৃত! ইহা একটি প্রকাণ্ড মোহ। এ মোহ না ভাঙ্গিলে আমরা কিছুই করিতে পারিব না। পল্লীগ্রামে সহস্র সহস্র মেলা হয়, কত লোক সেখানে আসে, তাহারা আমাদের আন্দোলন আলোচনার মধ্যে যেটুকু স্বাস্থ্য আছে তাহা পায় না, আমাদের জীবনের বিলাস-ব্যসন টুকুই তাহারা গ্রহণ করে। এই যে এক সর্ব্বনাশের প্রশস্ত পথ আমরা খুলিয়া দিয়াছি ইহার তথ্য আমাদিগকে কেহই বুঝাইয়া বলে না। কিন্তু এখনও দেশে জনসেবার উপকরণ প্রকৃত দৈন্য আছে, এখনও প্রাচীন দেশীয় পদ্ধতির মধ্য দিয়া লোকশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। চারি শত বৎসর পূর্ব্বে

নদীয়ার প্রেমান্দোলনের ফলে জনশিক্ষার যে ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল চোক খুলিয়া দেখিলে কলিকাতা নগরীর বিপুল জনতার ভীষণ কোলাহলের মধ্যেও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়, খোল করতাল লইয়া, মন্দিরা খঞ্জনী লইয়া, করতালি একতারা লইয়া কত বৈষ্ণব কত বৈষ্ণবী একমুষ্ট চাউলের বিনিময়ে নদীয়ার সেই প্রেমের ঠাকুরের কথা, বৃন্দাবনের সেই নিভৃত নিকুঞ্জের কথা অমৃতনিস্যন্দী সুরে এখনও সংসারসন্তপ্ত গৃহস্থের কর্ণে প্রতিদিন কীর্ত্তন করিতেছেন। আমরা যখন একটী লাইব্রেরী করিব বা স্কুল করিব বলিয়া চাঁদার খাতা হাতে লইয়া কত বড় লোকের সুপারিশ চিঠি লইয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াই, তখন বাঙ্গলা দেশের গ্রামে গ্রামে কত সহস্র সহস্র মুদ্রা মন্দির-নির্ম্মাণের জন্য, মহোৎসবে বৈষ্ণবভোজনের জন্য চব্বিশ প্রহর হরিসংকীর্ত্তনের জন্য মুক্ত হস্তে প্রদত্ত হয়, সরকার বাহাদুর এ সকলের হিসাব করেন নাই কাজেই আমারা ঘরে বসিয়া ইহার সন্ধান পাই নাই। কিন্তু ইহা সত্য। এই বদান্যতার মধ্যে আমাদের দেশ আছে, এই প্রেমানন্দের উজ্জ্বল আবেগের মধ্যে আমাদের বাঙ্গালা দেশ এই দুর্দ্দিশার দিনে এখনও আত্মরক্ষা করিতেছে।

শ্রীধামনবদ্বীপে বৈষ্ণব সমাজে সাধু নিত্যানন্দ দাসের জীবনের এই আদর্শ যদি প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তাহা হইলে কেবল যে নবদ্বীপে আসিয়া সকল জেলার তীর্থযাত্রী অভাব ও অসুবিধার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে তাহা নহে, দেশব্যাপী এই বিপুল বৈষ্ণবআন্দোলন, যাহা একটী আলস্য ও কর্ম্মবিমুখতা গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া দিতেছে, সেই আন্দোলন নবজীবনের অমৃতবিন্দু বহন করিয়া প্রত্যেক বাঙ্গালীকে পরার্থপরতার মন্ত্রে দীক্ষা দান করিবে, প্রত্যেকের প্রাণ পরের জন্য কাঁদিয়া উঠিবে, আমাদের এই বাঙ্গালা দেশ সত্য করিয়া প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যের দেশ হইয়া সমগ্র পৃথিবীকে এক নবসাধনায় উদ্বোধিত করিবে। প্রকৃত বাঙ্গালীজাতির প্রাণ নদীয়ায়। এখন আমরা তাহা ভুলিয়া গিয়াছি, সেই জন্য সাধু নিত্যানন্দ দাসের এই জীবনদান আমাদের পাষাণ-হৃদয়ে কোনরূপ তীব্রস্পন্দন জাগাইতে পারিতেছে না, সেই জন্যই কেহ কেহ বলেন নবদ্বীপের সেবাশ্রম নবদ্বীপের সাহায্যে চলা উচিত।

এইবার আরও একটু গুরুতর কথা উত্থাপন করা যাইতেছে, সাধু নিত্যানন্দ দাস বৈষ্ণব ধর্ম্মের যে তাৎপর্য্য তাঁহার গুরুদেবের নিকট পাইয়াছিলেন এবং যে সাধনায় তিনি হাসিতে হাসিতে নিজের জীবন দিয়া গিয়াছেন

তাহা কি প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্ম্ম নহে ? জনসেবার মধ্য দিয়া, আর্ত্তের আর্ত্তিদূরীকরণের মধ্য দিয়া, পতিত অধমজনের উন্নয়নের মধ্য দিয়া, অনাথ ও নিরাশ্রয়কে শিক্ষায় উন্নত করার মধ্য দিয়া কি আমাদের প্রেম-ধর্ম্ম সেই নবযুগে আত্মপ্রকাশ করিবে না ? শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভু জগতের দ্বারে দ্বারে পতিতের উদ্ধারের জন্ত কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভিখারীর বেশে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, শ্রীনিত্যানন্দ কলসীর কানা খাইয়া পতিতকে কোলে লইয়া প্রেমদান করিয়াছেন, আর আমরা কি তাঁহাদের নাম লইব অথচ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঘরের কোণে বসিয়া সাধু বলিয়া সমাজের নিকট পরিচিত হইয়া, স্বলভে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিব ? শ্রীচৈতন্ত নিত্যানন্দের উপাসকগণ বাহিরে এস, জগৎ যে কাঁদিতেছে,পতিত অধমের করুণ ক্রন্দনে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল পরিপূর্ণ, লক্ষ লক্ষ নরনারী অজ্ঞান তিমিরে ডুবিয়া রহিয়াছে, প্রেম লইয়া, করুণা লইয়া বাহিরে ছুটিয়া আইস, ব্যাধি-গ্রস্তকে ঔষধ পথ্য দাও, আতুর অন্ধের সেবা কর সমাজ যাহাদিগকে পদাঘাত করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে, যাহাদের কেহ নাই পাপপঙ্কে যাহারা ডুবিয়া যাইতেছে, জগন্মঙ্গল হরিনাম মহামন্ত্রে তাহাদের চিত্তের অন্ধকার দূর কর, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সকলের অগ্রে চলিয়াছেন, স্কন্ধে জলের কলস হস্তে সম্মার্জ্জনী, এই গুণ্ডিচা-মার্জ্জন ! কত আবর্জ্জনা জমিয়াছে ! এস সকলে মিলিয়া সেই আবর্জ্জনা দূর করি. রথ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, চলিতেছে না। কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে ! দেখিয়া হৃদয় জ্বলিয়া যাইতেছে এস গুণ্ডিচা মার্জ্জন করিয়া কৃষ্ণকে ব্রজে লইয়া আসি।

সাধু নিত্যানন্দ দাস এই পথে বিচরণ করিয়াছেন ! তিনি বড় আশা বুকে লইয়া তাঁহার দেশকে এই পতাকা দিয়া গিয়াছেন ! জাগ্রত উত্থিত হও, তাঁহার পতাকা নিয়ে সকলে সম্মিলিত হও। এই মঙ্গলের পথ, এই আনন্দের পথ, ইহাই একমাত্র জীবনের পথ।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

শ্রীরামানন্দ রায় সংবাদ।

"প্রভু কহে এহোবাহ্য আগে কহ আর
রায় কহে জ্ঞান-শূন্যা ভক্তিসাধ্যসার ॥"

প্রভু জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকে 'বাহ্য' করায় শ্রীরাম রায় জ্ঞানশূন্যা ভক্তিকে সাধ্যসাররূপে নির্দ্দেশ করিলেন। একটী শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকের দ্বারা নিজ মত সমর্থন করিলেন। শ্লোক যথা--শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে তৃতীয়শ্লোকে শ্রীভগবন্তং প্রতি শ্রীব্রহ্মবাক্যং

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্যনমন্তএব জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাং।
স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভির্যে প্রায়শোঽজিত জিতোপ্যসিতৈ-
স্ত্রিলোক্যাং।"

যাঁহারা জ্ঞানলাভের যত্নকে পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে প্রণাম করিয়া, সাধুস্থানে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহাদের শ্রীমুখ হইতে বহির্গত আপনার কথা-সুধা শ্রবণ বিবর দিয়া পান করেন, হে অজিত! ত্রিভুবন মধ্যে প্রায়ই তাঁহাদিগের দ্বারা তুমি পরাজিত হও।

"আপনাকে যাহারা প্রণাম করে", প্রণামটি শুধু বাহ্যাড়ম্বর নহে কায়মনোবাক্যের দ্বারা আপনার শ্রীচরণে নত হয়। জ্ঞান পাওয়া ত দূরের কথা, ব্রহ্মা জ্ঞানলাভের প্রয়াসকেও ত্যাগ করিতে বলিলেন। কারণ তর্কাদি জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া থাকে, এবং জ্ঞান না যাইলে শুদ্ধ বিশ্বাস হয় না। শ্রীনীলমণিকার বলেন শুদ্ধাভক্তি জ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বারা আচ্ছাদিতা নহে, এখানে জ্ঞান সম্বন্ধে তর্কাদিজড়িত জ্ঞান, লীলাপরিজ্ঞান নহে, সেইজন্য শ্রীভক্তিরসামৃতকার বলিতেছেন।

"যৎ পাদপঙ্কজপলাশবিলাস-ভক্ত্যা
কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্নরিক্তমতয়ো যতয়ো নিরুদ্ধ
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবং"

শ্রীসনৎকুমার কহিলেন, রাজন্! মনুষ্যের অহঙ্কাররূপ হৃদয়গ্রন্থি কর্ম্মরজ্জু দ্বারা আবদ্ধ। ইহা যেমন সাধুগণ শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দের ভক্তি দ্বারা উন্মোচন

করিতে পারেন, তদ্রূপ বাসুদেবধ্যানবিরহিত নির্ব্বিষয়মতি যতিগণ ইন্দ্রিয়চয়কে নিগ্রহ করিয়াও সমর্থ হয়েন নাই, অতএব আপনি সেই আশ্রয়-স্বরূপ ভগবান বাসুদেবকে ভজনা করুন। এই রতিকে ভক্ত সকল শান্ত প্রেম বলিয়া থাকেন, কারণ ইহাতে জ্ঞানও নাই অথচ ভগবৎ-সম্বন্ধও নাই। কিন্তু ভগবদ্‌ভজন ক্রিয়া আছে; সম্বন্ধ স্থলে পিতামাতা সখা প্রভৃতির ভাব বুঝিতে হইবে।

শ্রীশ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুপাদ এই শ্লোকটী ব্যাখ্যা করিতেছেন, যথা শ্রীবৈষ্ণবতোষণী—'জ্ঞানে প্রয়াস' অর্থাৎ ভক্তসকল জ্ঞানার্জ্জন পরিশ্রম পরিত্যাগ করিয়া, তোমার রূপগুণ লীলা বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া থাকেন। তীর্থপর্য্যটন না করিয়া কায়মনোবাক্যের দ্বারা তোমার হইয়া থাকেন অর্থাৎ কথা শ্রবণ কালে অঞ্জলি বন্ধন, বাক্যের দ্বারা তাহার অনুমোদন আর মনের দ্বারায় তাঁহার আস্তিক্য অনুভব করেন, এবং তোমার স্বরূপ ঐশ্বর্য্য ও মহিমা বিচার করেন না। তোমার বার্ত্তা কেমন? যাঁহারা মিথ্যোক্তি ও সর্ব্বেন্দ্রিয়ক্ষোভ দূর করিবার জন্য মৌনী হন, তাহাদিগকেও মুখরিত অর্থাৎ শব্দিত করে আত্মারামদিগকেও গুণগান করায়। ভবদীয় শব্দের অর্থ আপনার কিম্বা আপনার পরম ভক্ত শ্রীনন্দ প্রভৃতির। জীবন্তি, অর্থাৎ উপজীবন্তি অর্থাৎ তোমার কথা তাঁহাদের বাঁচিবার উপায় যেমন জীবের উপজীবিকা বাঁচিয়া থাকিবার কারণ। সেই কথা সাধুদিগের হৃদয়ে নিহিত, এইজন্য স্থানস্থিত শব্দে সাধু সঙ্গকে বর্ণনা করিলেন, যথা "লবমাত্রে সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধ হয়" "জিতোঽসি" তত্তৎ তো সদা স্ফুরসি অর্থাৎ তোমার তনুকে তাঁহারা বশীভূত করেন যথা শ্রীচরণপদ্মকে হস্তের দ্বারা। তোমার মিলনকে আহ্বানের দ্বারা, আর তোমার মনকে মনের দ্বারা। তাঁহাদের জিহ্বা সর্ব্বদা তোমার গুণ গান করে হস্ত তোমার কিম্বা তোমার দ্বিতীয় তনু শ্রীবিগ্রহের চরণ সেবা করে, মন সেই প্রেমপাগলিনী রাজনন্দিনীর প্রেমে বিভোর তোমার তনুকে চিন্তন করে, আর বাক্য তোমার গুণ কীর্ত্তন করে। আর তোমার ভক্তের পার্শ্বে সর্ব্বদা অবস্থান করাও তনুজয় বলিয়া কথিত হয়। যথা শ্রীনলকূবরমনিগ্রীবউদ্ধারপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে বলিতেছেন :—

"বাণীগুণানুকথনে শ্রবণৌকথায়াম্

হস্তৌচ কর্ম্মসু মনস্তব পাদয়োর্নঃ।

স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাস জগৎপ্রণামে
দৃষ্টিঃ সতাং দর্শনেঽস্তু ভবত্তনূনাং ॥"

শ্রীভাবার্থ দীপিকাতে শ্রীধর স্বামী বলেন "ত্বৎকথামৃতপাথোধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ। কুর্ব্বন্তি কৃতিনঃ কেচিচ্চতুর্ব্বর্গং তৃণোপমং" আপনার কথারূপ অমৃত সাগরে বিহারশীল কোন কোন ব্যক্তি চতুর্ব্বর্গ অর্থাৎ ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষকে তৃণজ্ঞান করিয়া থাকেন।

"ব্রহ্মানন্দোভবেদেষ চেৎ পরার্দ্ধগুণীকৃতঃ।
নৈতিভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপি ॥"

যদি ব্রহ্মানন্দকে দ্বিপরার্দ্ধ গুণ করা যায় তাহা হইলে তাহা ভক্তিসুখ-সমুদ্রের পরমাণুর সহিত তুলনা হইতে পারে না।

"ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তি সুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়োভবেৎ ॥"

যাবৎ ভুক্তি (অর্থাৎ ভোগবিষয়িণী আসক্তি) মুক্তি (সালোক্যাদিরূপা)-রূপা পিশাচতুল্য অভিলাষ হৃদয়ে অবস্থান করে, তাবৎ হৃদয়ে ভক্তিসুখের উদয় হয় না। পিশাচ যেমন জন্তুতে আবিষ্ট হইয়া তাহাকে আপনার মতে লইয়া যায় সেইরূপ ভুক্তি ও মুক্তি জীবের সর্ব্বস্ব হরণ করে। মানুষ ক্রুদ্ধ হইয়ে যখন জ্ঞানশূন্য অর্থাৎ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়, কিন্তু প্রতি-পক্ষের অনিষ্ট চিন্তা ভুলে না তখন তাহাকে ঠিক জ্ঞানশূন্য বলা যায় না, ইহাকে চিত্তের বিক্ষেপ অবস্থা বলে। ইহাতেও পরিপূর্ণ মাত্রায় জ্ঞান থাকে। যেমন সূর্য্যের উদয়ে তমোক্ষয় হয় সেইরূপ ভক্তিসূর্য্য উদিত হইয়া জ্ঞানরূপ তমোকে বিনষ্ট করিয়া থাকেন। প্রভু এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন—"প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর। রায় কহে প্রেমভক্তি সর্ব্বসাধ্য সার" জ্ঞানশূন্যাভক্তি শুদ্ধাভক্তি হইলেও 'জ্ঞান'পদ আমার প্রভুর ভাল লাগিল না। যদি বলা যায় এস্থানটি জ্ঞানশূন্য, তাহা হইলে পুনরায় জ্ঞানের পূর্ণতা সম্ভাবনা আছে, কিন্তু ভক্তি প্রেমবিজড়িতা হইলে তাহাতে জ্ঞানের উদয় সম্ভাবনা নাই। বিষয়জ্ঞান ভক্তিতে আসে না, তবে দুর্ব্বিপাকবশতঃ কোন কোন ভক্তের ভক্তিতে জ্ঞানের উদয় দেখা যায়, সেইজন্য প্রভু প্রেম-ভক্তিকে, সর্ব্বসাধ্যসার রূপে গ্রহণ করিলেন। এই অবস্থায় জ্ঞান উদয় হইয়েও তাহার অস্তিত্ব থাকে না, ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজর্ষি রাজত্ব পাইলেও তাঁহার

হরিস্মৃতির ক্ষয় হয় নাই। এস্থলে শ্রীরামানন্দ রায় একটি পদ্যাবলী-ধৃত নিজকৃত শ্লোক বর্ণনা করিলেন। শ্লোক যথা

"নানোপচারকৃতপূজনমাত্মবন্ধোঃ
প্রেম্ণৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা
তাবৎ সুখায় ভবতো ননুভক্ষ্যপেয়ে"

হে আত্মবন্ধো! নানা উপচারে পূজা করিলেও ভক্তের হৃদয় দ্রব হয় না, কিন্তু প্রেমের দ্বারায় গলিয়া যায়, যাবৎ উদরে ক্ষুধা থাকে তাবৎ আহার্য্য ও পানীয় বস্তুতে রুচি থাকে। শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরামানন্দ রায় আত্মবন্ধু বলিলেন, কারণ পিতামাতা প্রভৃতি সকলেই দেহবন্ধু, আত্মবন্ধু নহেন, দেহ যতক্ষণ, সম্বন্ধ ততক্ষণ। দেহ যাইলে আর সম্বন্ধ থাকে না। কিন্তু ভগবৎ-সম্বন্ধ আত্মগত, ইহা কোন কালে ক্ষয় হয় না। বস্তুতঃ একটি লোকের পুত্রের যদি জ্বর হয় তবে সে তাহার বাহিরের অবস্থা দর্শন করেন কিন্তু আত্মার অবস্থা দর্শন করিতে পারে না, ঔষধদান করিয়া তাহার ব্যাধি নাশ করেন বটে কিন্তু ব্যাধির হেতুভূত অনাদি কাল-জড়িত সংসারবাসনা ক্ষয় করিতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ আত্মবন্ধু, তিনি জীবের ব্যাধির মূলীভূত বাসনা ক্ষয় করেন। আহার্য্য বস্তু স্তরে স্তরে সজ্জিত থাকিলেও ক্ষুধার অপেক্ষা করে, নচেৎ সে বস্তু থাকা না থাকা সমান। সূর্য্য উদিত হইয়া অণুপরমাণুকে আলোকিত করিতেছেন, কিন্তু অন্ধের পক্ষে দিবারাত্র সমান, সেইরূপ প্রেমের দ্বারায় ভগবৎ-আনন্দ আস্বাদিত হয়, তাহা আস্বাদ করিতে দ্বিতীয় ক্ষুধা আর নাই। সে অবস্থায় ভক্ত অন্তরে বাহিরে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করেন, আনন্দে বিভোর হইয়া নৃত্য করেন, কখনও বা ক্রন্দন করেন। ক্ষুধা না থাকিলে আহারে আনন্দ হয় না এবং অজীর্ণতা হয়, কিন্তু ভগবানের নাম ও ধ্যান, প্রেম না থাকিলেও প্রেমকে ক্রমে বিকাশ করেন। নৈষধচরিতে বর্ণিত আছে প্রেমে বস্তু বাস করে না গুণ বাস করেন, যদি প্রেমেতে ভগবানকে জলগণ্ডুষ অর্পিত হয়, তাহা হইলে কোটী পুষ্করিণী দান অপেক্ষা ভক্তের হৃদয়ে বিমলানন্দের উদয় হয়। শ্রীদাম নামক সখা গোবিন্দকে একটি উচ্ছিষ্ট ফল ভোজন করাইতেছেন, যদি ফলটী লইয়া বিচার হয় তাহা হইলে শ্রীদাম সখার দোষ হয়, কিন্তু উচ্ছিষ্ট ফল শ্রীবদনে শ্রীদাম দিতেছে কেন? যদি ফলটি কটু তিক্ত হয় তাহা হইলে তাহার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ বিষণ্ণ হইবেন,

যাহার বিষ ও অমৃত সমান শ্রীদাম প্রেমপ্রভাবে তাহা ভুলিয়া গেলেন। তবেই দেখা গেল বস্তুজ্ঞান প্রেমের নাই কেবল প্রিয়ের গুণজ্ঞান আছে। দ্বারকায় ব্রাহ্মণ পৃথক তণ্ডুল শ্রীবদনে দিতে অবাঙ্মুখ হইয়াছিলেন, কিন্তু ভগবান্ তাহা পরিত্যাগ করেন নাই। কোটী কল্পকাল যজ্ঞাদি দ্বারায় যাজ্ঞিক সকল যে ভগবান্‌কে ভোজন করাইতে পারেন না, ভক্ত তাঁহাকে ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত করেন, প্রদত্ত না হইলেও ভগবান্ গ্রহণ করেন, গোপী সকল গৃহের অভ্যন্তরে নবনীত রাখিলেও সেই তমালশ্যামাঙ্গ সুকোমল শ্রীহস্তের দ্বারা তাহা চুরি করিয়া লইয়াছিলেন বা লইতেছেন। বস্তু বিচার করিলে চুরি করা হয় কিন্তু যাঁহার জগৎ ব্রহ্মাণ্ড, তিনি চুরি করিয়া বেদ-মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিলেন, ইহা প্রেমের প্রতাপ, প্রেম ভগবানের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। ভক্তহৃদয় হইল তাঁহার রাজ্য, বস্তু ভাল হউক বা না হউক প্রেম তাহা জ্ঞান করেন না, কারণ প্রেমে জ্ঞান নাই, ভক্তিতে ভক্ত ভগবান্‌কে শুচিতে অর্পণ করেন, কিন্তু প্রেম শুচি অশুচি মানেন না, ভাল মন্দ মানেন না, এই জন্য ভক্তিতে জ্ঞানের সদ্ভাব থাকিলেও প্রেমে জ্ঞানের অসদ্ভাব নাই, তবে সে জ্ঞান গোবিন্দ-সম্বন্ধ থাকায় বৈষয়িক জ্ঞান বলা যায় না। শ্রীরাধা ঠাকুরাণী বিদগ্ধ মাধব নাটকে বলিতেছেন

"যস্যোৎসঙ্গসুখাশয়া শিথিলিতা গুর্ব্বীগুরুভ্যস্ত্রপা
প্রাণেভ্যোপি সুহৃত্তমাসখি তথা যূয়ংপরিক্লেশিতাঃ
ধর্ম্মঃ সোঽপি মহান্ ময়া ন গণিতঃ সাধ্বীভিরধ্যাসিতো
ধিৈর্ধ্যং তদুপেক্ষিতাপি যদহং জীবামি পাপীয়সী।"

হে সখি! যাঁহার ক্রোড়দেশে নিবাসরূপ সুখাশায় গুরুজনের সকাশে লজ্জাকে শিথিল করিয়াছি, তোমরা যে প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম, তথাপি কত ক্লেশ দিয়াছি এবং সাধ্বীগণের অনুষ্ঠিত মহান্ ধর্ম্মকেও আমি গণনা করি নাই, অতএব এই পাপীয়সী আমি, কৃষ্ণ কর্তৃক উপেক্ষিত হইয়াও জীবন ধারণ করিতেছি, তখন আমার ধৈর্য্যকে ধিক্, এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

"যার সঙ্গ সুখ আশে, কৈনু ধর্ম্ম কর্ম্মনাশে
তেয়াগিনু গুরু লজ্জাগণ।
যত সখীগণ তোরা, প্রাণ হইতে অধিক মোরা,
দুঃখ দিল যাহার কারণ।
সখি হে রহ ধৈরয আমার।

সে কৃষ্ণ উপেক্ষাগুলি, তবু রহে পাপপ্রাণী,
কিবা চাহে করিবারে আর।
যাহার লাগিয়া সতী, ধর্ম্ম তেয়াগিনু অতি,
না গণিনু দুর্জ্জন বচন।
দুকূলে কলঙ্ক হইল, তাহা নাহি মনে কৈল,
সেরূপে মগন হৈল মন।
যাহার লাগিয়া কত, গুরুর গঞ্জনা যত,
করিয়া লইনু হিয়া-হার।
এতেক কহিতে রাই, মূর্চ্ছা পাইয়া সেই ঠাঁই,
পড়ি রহে জ্ঞান নাহি আর॥
বিশাখা সম্ভ্রমে যাইয়া, তাঁরে কহে ধরি লঞা,
ধৈর্য্য হও না ভাব অসার।
ইহা শুনি পোড়ে মনে দাস যদুনন্দনে,
মুখে বাক্য না হয় সঞ্চার॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং দ্বাদশাঙ্ক ধৃত তস্যৈব শ্লোকঃ

"কৃষ্ণভক্তি রসভাবিতামতিঃ।
ক্রীয়তাং যদি কুতোপিলভ্যতে।
তত্রলোল্যমপি মূল্যমেকলং
জন্ম কোটিসুকৃতৈর্ণলভ্যতে॥

যদি কোথা হইতে পার কৃষ্ণভক্তি রসযুক্ত চিত্ত লাভ কর, ইহা কোটী জন্ম পুণ্য করিয়াও পাওয়া যায় না, ইহার একটি মূল্য আছে মূল্যটী কি না রাগ অর্থাৎ আশক্তি। ইহা কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের কৃপাদ্বারা লাভ করা যায়।

প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে দাস্য প্রেম সর্ব্বসাধ্য সার॥

যদিও শান্তপ্রেমে—কৃষ্ণ-নিষ্ঠা ও বিষয়তৃষ্ণাত্যাগ এই দুইটী গুণ আছে, কিন্তু দাস্যপ্রেমে সেব্য সেবক ভাব অর্থাৎ তিনি প্রভু আমি তাঁহার দাস এই গুণ থাকায় ইহার আধিক্য বর্ণনা করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের নবমস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে একাদশ শ্লোকে অম্বরীষকে দুর্ব্বাসা মুনি বলিতেছেন

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিম্বা দাসানামবশিষ্যতে॥

যে শ্রীগোবিন্দ নাম কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে জীবের অশেষ উপাধির ক্ষয় হইয়া চিত্তের নির্ম্মলতা হয়, সেই তীর্থপদ ভগবানের দাসসকলের কিছুই অপ্রাপ্য নাই বা সকলই তাঁহারা পাইয়াছেন। তীর্থপদ শব্দের অর্থ অশেষ তীর্থ যাঁহার চরণ রেণুর অভিষেকে তীর্থত্ব লাভ করিয়াছে কিম্বা তীর্থ কেবল মাত্র যাঁহার শ্রীচরণ। স্পর্শমণি স্পর্শে লোক যেরূপ কাঞ্চনতা লাভ করে শ্রীহরি-চরণ প্রভাবে স্থাবর জঙ্গম সকল জীবই পবিত্রতা লাভ করে এবং অন্যকেও পবিত্র করিতে সক্ষম হয় অথচ তাঁহার পবিত্রতা পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকে। যদি নাম-শ্রবণের এরূপ মাহাত্ম্য তাহা হইলে যাঁহারা ভক্তিভাবে কীর্ত্তন করেন বা কর্ণাঞ্জলি দ্বারা মুহুর্ম্মুহু পান করেন তাঁহাদেরই বা কি ভাগ্য, তাহাই কৈমুত্যন্যায়ে বলিতেছেন। ইহার একটি দৃষ্টান্ত—যেমন রাজা কার্য্য করেন তখন প্রজা তাঁহাকে যমের ন্যায় দর্শন করিয়া থাকেন, আর গৃহে আসিলে তাঁহার পিতা মাতা, পুত্র, স্ত্রী ও বান্ধব সকল আপনাদের একমাত্র হিতকর বন্ধুরূপে দর্শন করিয়া থাকেন, সেইরূপ বিধিমার্গ ভজন, রাজদর্শনের ন্যায়; ব্রজপ্রেমমার্গে ভজন রাজার পুত্রাদি দর্শন কিম্বা পুত্রাদির রাজ-দর্শনের ন্যায়।

ক্রমশঃ।—

শ্রীহরিদাস বিদ্যাবাগীশ।

গ্রীক-দর্শন।

(পূর্ব্বাভাস)

(১)

বিশ্ব-নিয়ন্তা মনুষ্যজাতিকে জ্ঞান ও চিন্তাশক্তির অধিকারী করিয়া অপরাপর সৃষ্ট পদার্থের উপরে এক উৎকৃষ্ট স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। মানব ইহার বলে যে কেবলমাত্র আপন হিতাহিত বিচার বা রক্ষণোপায় নির্দ্ধারণ করিয়া লয়, তাহা নহে; পরন্তু আপনার ও জগতের অস্তিত্ব এবং তাহাদের কারণ ও চরম লক্ষ্য বুঝিয়া লইতেও প্রয়াস পায়। কিন্তু মানুষ এই পরম সম্পদের অধিকারী হইলেও সকলে তাহা তুল্যরূপে ভোগ করিতে সমর্থ হয় না; ব্যক্তি ও জাতিবিশেষের মধ্যে জ্ঞান-বিকাশের তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। মানব জগতে যে সমুদয় জাতি আপন আপন জ্ঞান ও শক্তি বিকাশের নিমিত্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, প্রাচীন গ্রীক জাতি তন্মধ্যে এক প্রধান।

জ্ঞানের এক নাম দর্শন। দর্শন শব্দের অতি সহজ অর্থ দেখা। আমরা যাহা দেখিতে পাই, তাহার নিশ্চয়তা সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ থাকে না। এরূপ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের নামই দর্শন। হিন্দুঋষিগণ তথ্য দেখিতে পাইতেন, বৈদিক মন্ত্রসমূহ তাঁহাদিগের নিকট সাক্ষাৎ প্রতিভাত হইত; ইত্যাদি কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার অর্থ এই যে, তাঁহারা অতি নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ নিঃসন্দেহরূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেন। ইহারই নাম দর্শন। মণীষিগণ অসাধারণ ধীশক্তিপ্রভাবে অতি দুরূহ বিষয়ও সম্যক্ বুঝিয়া লইতে পারেন, এরূপ চিরকালই পারিয়াছেন, এখনও পারেন এবং ভবিষ্যতে পারিবেন।

অতি প্রাচীনকালে—খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় পঞ্চমশতাব্দী পর্য্যন্ত—প্রায় একাদশ শত বৎসর ব্যাপিয়া, গ্রীক জাতি ও তাহাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত নিকটবর্ত্তী আরও কয়েকটি জাতির মধ্যে, জগতের চরম তথ্য অবগত হইবার নিমিত্ত, এক প্রবল আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হয়। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে অনেকানেক মণীষি আবির্ভূত হইয়া এক প্রবল চিন্তাস্রোত প্রবাহিত রাখিয়াছিলেন। তাহার ফলে সমুদ্রমন্থনে উত্থিত অমৃতের ন্যায় কত সত্যসুধার আবিষ্কার হইয়াছে! বিশ্ব-মানব এখনও তাহার অমৃত আস্বাদনে তৃপ্তি লাভ করিতেছে। গ্রীক ঋষিগণ এই দীর্ঘ কাল মধ্যে আপন আপন অসাধারণ চিন্তাশক্তির প্রভাবে জাগতিক ব্যাপারের যে সকল জ্ঞান ও সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার সাধারণ নাম গ্রীক-দর্শন।

(উৎপত্তি)

(২)

গ্রীক-দর্শনের হেতু কি অথবা তাহার উৎপত্তি কোথায় এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন। পূর্ব্বানুক্রমিক ঘটনার কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ নির্ণয় দ্বারা জড়-জগতের ব্যাখ্যা হইয়া থাকে; চিন্তা-জগতেও কোন একটা ভাব বা মতের সেরূপই সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ করা সম্ভবপর কি না, এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞানের এই উপমানের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাচীন গ্রীকদিগের চিন্তাধারার কারণ ও উৎপত্তি ক্ষেত্র নির্ণয় করিতে গেলে, তাহাতে অন্ততঃ উহার ঐতিহাসিক তথ্য কথঞ্চিৎ উদ্‌ঘাটিত হইবে সন্দেহ নাই।

এই স্থলে নির্ণেয় বিষয় এই ঃ—গ্রীক-দর্শন আপনা আপনি উৎপন্ন—

স্বাধীন, কি অপর কোন জাতির দর্শন হইতে সমুদ্ভূত—পরাধীন। এবং অপর কোনও প্রাচীনতর জ্ঞান-গৌরব-সম্পন্ন জাতির নিকট গ্রীক দর্শনকে ঋণ স্বীকার করিতে হইলে, সে সৌভাগ্য-গরিমার অধিকারী কে?

ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে গ্রীক-দর্শনের জন্মের অর্থাৎ অনুমান খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে মানব-রাজ্যের যে যে প্রদেশ প্রধানতঃ জ্ঞানালোক-চ্ছটায় আলোকিত দেখা যায়, তাহার মধ্যে প্রাচীন মিসর, য়িহুদী সভ্যতার লীলাভূমি এসিয়ামাইনর, পারস্য দেশ, চীন ও ভারতবর্ষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে যদি কোনও দেশ বা জাতির সহিত গ্রীকদিগের দর্শনের দিক দিয়া কোনও প্রকার সম্পর্ক থাকে, তবে তাহা কেবল মাত্র গ্রীসের নিকটবর্ত্তী দক্ষিণপূর্ব্বস্থিত এসিয়া মাইনর ও মিসর এবং সুদূর ভারতবর্ষের সহিত।

প্রাচীন কিংবদন্তী এই—পীথেগোরাস্, ডিমক্রেটিস্, প্লেটো প্রভৃতি প্রধান প্রধান গ্রীক-দার্শনিকগণ প্রাচীন মিশরের দর্শনবিজ্ঞানাদি পাঠ করিয়া, তাহা হইতে স্ব স্ব মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। গ্রীক-ঐতিহাসিকদিগের পিতৃপুরুষ হিরোদোতাস্ খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে লিখিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার সময় মিসরবাসিগণ গ্রীকদিগের ধর্ম্মগুরু বলিয়া পরিচিত হইতে চাহিত। তাহাদের দার্শনিক তত্ত্বও যে মিসর হইতে গৃহীত, এইরূপ এক অস্পষ্ট ধারণা খৃঃ পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দী হইতে চলিয়া আসিতেছিল। হয়ত বিদেশীয়েরাই প্রথমে এই মত প্রচার করে; কিন্তু উত্তরকালের গ্রীকগণও যে তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছিল তাহার নিদর্শন বিরল নহে। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর শিক্ষাভূমি আলেকজেন্দ্রিয়ার য়িহুদী পণ্ডিতগণের মতে তাহাদেরই শিক্ষাগুরু ও ধর্ম্ম-বীরগণ গ্রীকহৃদয়ে জ্ঞানবীজ বপন করিয়াছিলেন; প্রাচীন ও মধ্যযুগের খৃষ্টধর্ম্মযাজকগণ এই মতের পোষকতা করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন য়িহুদী-দিগের মতামত অনেক স্থলেই গল্প বলিয়া উপেক্ষিত হইয়াছে; কিন্তু গ্রীক-দর্শন যে এই দুই প্রাচ্য জাতির ধর্ম্ম ও দর্শন হইতে উদ্ভূত, বর্ত্তমান যুগেও অনেকে এই মতের সমর্থন করিয়া থাকেন। উনবিংশ শতাব্দীর জর্ম্মণ-পণ্ডিত রথ ও গ্লেডিস্কে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

কিন্তু কোন জাতির ধর্ম্ম, জ্ঞান, আচার ইত্যাদি অপর জাতির ধর্ম্ম প্রভৃতি হইতে গৃহীত কি না এ বিষয়ে কোন স্বাধীন মত ব্যক্ত করা সমীচীন নহে। যে পর্য্যন্ত কোন নিঃসন্দেহ ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া কিছু বলিতে পারা না যায়, ততক্ষণ ইহাদের পরস্পর মৌলিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ

করা যাইতে পারে না। যাঁহারা কথিতরূপে গ্রীক-দর্শনের অধীনতা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, তাঁহাদের অভিমত সম্পূর্ণরূপে কিংবদন্তীর উপর স্থাপিত; কোন সাময়িক ঘটনা বা ব্যক্তিগত মত তাহার অনুকূলে পাওয়া যায় না। অধিকন্তু পরবর্ত্তীকালের লেখকদিগের পুস্তকাদিতেই এইরূপ মতবাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়; প্রাচীনতর গ্রন্থে ইহা অতি বিরল; ইহাতেও মনে হয়, উত্তরকালের এইপ্রকার সিদ্ধান্ত কল্পনা-প্রসূত। উল্লেখযোগ্য প্রাচীন গ্রীক-গ্রন্থাদিতে যে প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাতে গ্রীকদর্শনের কোনরূপ ঋণস্বীকার নাই। মনস্বী এরিষ্টটল্ তৎপূর্ব্বকালীন সাহিত্য-বিজ্ঞানাদির আলোচনা করিতে গিয়া প্রাচীন মিসরবাসিদিগকে গণিতশাস্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তিনি তদ্দেশীয় বা অপর কোন প্রাচ্যদেশীয় দার্শনিকের নাম উল্লেখ করেন নাই। পরন্তু পরবর্ত্তীকালের বিজ্ঞান ও দর্শনের উৎপত্তি ও প্রসার দেখাইতে গিয়া প্রাচীন গ্রীসের জ্ঞানগরিমার যুগের দিকেই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তৎপূর্ব্বেও তদীয় গুরু আচার্য্য-চুড়ামণি প্লেটো দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞতা গ্রীকচরিত্রেরই লক্ষণ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন।

গ্রীক-দর্শন য়িহুদী ও মিসরীয় দর্শনের ছায়া মাত্র—এই মত প্রতিপাদনের পক্ষে আর এক যুক্তি এই যে, গ্রীক-দর্শন ও ইহাদের মধ্যে অনেক বিষয়ে ঐক্য ও সমতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। বাস্তবিক বিভিন্ন চিন্তাশীল জাতি বা ব্যক্তির ভাব ও গবেষণার বিষয়ে একতা বা সামঞ্জস্য লক্ষিত হইলে, তাহা যে পরস্পরের অনুকরণফল এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না। কারণ স্বভাবতঃ মানবের চিন্তাশক্তি এক প্রকারের; ভাব ও ধারণার বিষয়ও সাধারণ। আবার কোন কোন জাতির মধ্যে যে সামান্যলক্ষণ দেখা যায়, সেই সম্বন্ধে ইহাও বলা যাইতে পারে, যে অতি প্রাচীনকালে ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ হয়ত একই ভূখণ্ডের অধিবাসিরূপে একই জাতির অন্তর্গত ছিল; পরে তাহাদের বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন দেশে গিয়া বসতি বিস্তার করিয়াছে, এবং পূর্ব্বতন ভাষা, ভাব ও আচারাদিতে কতক ঐক্য রাখিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু গ্রীক-দর্শনের স্বতন্ত্রতা প্রতিপাদনের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট নহে। যে সকল জাতিকে গ্রীকদিগের দর্শন-গুরু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, বাস্তবিক অনেক স্থলেই তাহাদের ভাবরাশি প্রকৃত দর্শন নামের যোগ্য হইতে পারে না—জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় সম্বন্ধে কতকগুলি অস্বাভাবিক ও আজগবী

মতমাত্র। গ্রীকদর্শনের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিপরীত—ইহা জাগতিক ব্যাপারের স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত তথ্য-পূর্ণ। তাহাতে কোন প্রকার অসঙ্গত, অলীক কুসংস্কার বা উপধর্ম্মের অনুকরণ থাকিতে পারে না; ইহা অতিশয় সুমার্জ্জিত ও এক অসাধারণ জাতীয় চরিত্রের মোহরযুক্ত। কোন জাতি অপরের নিকট হইতে ধর্ম্ম বিজ্ঞানাদি গ্রহণ করিলে, তাহাতে যে বিদেশীয় ভাব পরিলক্ষিত হয়, গ্রীকদিগের অতি প্রাচীন দার্শনিক তথ্যেও তাহার লেশমাত্র নাই। আবার জাতীয় ও বিজাতীয় ভাবের মধ্যে যে বিরুদ্ধসম্বন্ধ থাকা সম্ভবপর গ্রীক-দর্শনে তাহা অতি বিরল—কোন বিষয় বা মীমাংসার সহিত অপর বিষয় বা সিদ্ধান্তের অসামঞ্জস্য প্রায় দেখা যায় না। এতদ্ভিন্ন গ্রীক-দর্শনের আর এক বিশেষত্ব এই যে অন্যান্য দেশের ন্যায় উহা কখনও, যাজকসম্প্রদায়ের করায়ত্ত ছিল না; পরন্ত প্রথম হইতেই ব্যক্তিগত স্বাধীন চিন্তায় সঞ্জাত ও জনসাধারণের যত্নে পরিপোষিত হইয়াছিল।

হিন্দুদর্শনের সহিত সম্বন্ধ বিচার।

হিন্দু দর্শনের সহিতও গ্রীক-দর্শনের অনেক বিষয়ে ঐক্য দেখা যায়। তাহাতে আবার প্রশ্ন উঠিতে পারে, ইহারা পরস্পর কোন-প্রকারে সম্পর্কিত কি না? পীথাগোরাস, এম্পিদক্লিস ও প্লেটোর জন্মান্তর-বাদ এবং ডিমক্রিটাসের পরমাণুবাদের সহিত হিন্দু-দর্শনের মিল রহিয়াছে; ইহা ছাড়া ন্যায়-দর্শনে অনুমানের বিবিধ অবয়বের সহিত গ্রীক 'লজিকে' (Logic) 'সিলজিজমের' (Syllogism) সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে অনেকে মনে করিতে পারেন, গ্রীস ও ভারতবর্ষ, ইহাদের কেহ অপরের নিকট হইতে স্বীয় দার্শনিক তত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। বাস্তবিক এই বিষয়ে দুই বিরোধী মতই প্রচারিত আছে।

এক শ্রেণীর লোকের মতে হিন্দুদর্শন গ্রীকদর্শনের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী; বৈদিক-যুগ হইতে তাহার কাল নির্দ্ধারণ করা যায়, এরিষ্টটল্ প্রভৃতি গ্রীক পণ্ডিত-গণের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব হইতে ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে গ্রীস দেশে এক অস্পষ্ট কিংবদন্তী চলিয়া আসিতেছিল; কথিত আছে মহাবীর আলেকজেন্দর তাঁহার দিগ্বিজয়কালে এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, ভারতবর্ষীয় কতিপয় সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। এই প্রকার এক শ্রেণীর 'সাধু' গ্রীক ভাষাতে "জিম-নো-সফিষ্ট" বা দিগম্বর পণ্ডিত (দার্শ-

নিক) নামে কথিত হইয়াছে। মহামতি আলেকজেন্দর কেবল যে একজন অসাধারণ বীরপুরুষ ছিলেন তাহা নহে, মানবের মঙ্গলকামী বিদ্যোৎসাহী নরপতিও ছিলেন। গ্রীক-জগতে এক আদর্শ মানব-সমাজ গঠন করিবেন এই কল্পনায় তিনি ভারতবর্ষ হইতে দর্শনের নানাবিধ পুস্তক স্বদেশে আপন শিক্ষাগুরু এরিষ্টটেলের নিকট প্রেরণ করেন ; তদ্দৃষ্টে গ্রীক ন্যায় ও দর্শনাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং গ্রীক-দর্শন হিন্দু-দর্শনেরই ছায়া মাত্র। জার্ম্মাণ পণ্ডিত গরেস্ প্রভৃতি কেহ কেহ এই মতের সমর্থন করিয়াছেন।

কথাটা সহজেই আমাদের শ্রুতিমধুর। আমরা কোন বিষয়ে আপন মৌলিকতা দেখাইয়া, অপরকে তাহার অধীনতা স্বীকার করাইতে পারিলে, স্বভাবতঃ আনন্দ বোধ করি। বিশেষ, বর্ত্তমান নানাবিধ দৈন্যের দিনে, আমাদের অতীত ইতিহাস এত গৌরবান্বিত—বর্ত্তমান জগতের এই যে বিশাল উন্নতি, তাহা সকলই আমাদের করায়ত্ত ছিল—বিশ্ব-সভ্যতার দুয়ারে আমাদের কতই দেয় জিনিস রহিয়াছে—এইরূপ চিন্তা স্বতঃই এক প্রকার সুখ-কল্পনার উপাদান হইতে পারে। শুধু আমরা নহি, অন্যান্য জাতিও এইরূপ বোধ করিয়া থাকে। পাশ্চাত্য জগতের বর্ত্তমান উন্নতিশীল জাতি কেহ সহজে স্বীকার করিতে চাহিবে না যে, তাহাদের সভ্যতা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু কোথাও ছিল বা হইতে পারে ; অথবা তাহারা কোন বিষয়ে কাহারও অপেক্ষা হীন বা কাহারও অধীন। মানব-প্রকৃতি সাধারণতঃ এইরূপ। কি জাতি, কি ব্যক্তি, সকলেই আপন প্রাধান্য বোধ করিয়া তৃপ্তি লাভ করে ও তাহা প্রতিপন্ন করিতে চাহে। এই বিষয়ে একদেশদর্শিতার হাত এড়ান সহজ নহে।

আবার এক সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মতেরও অভাব নাই। জর্ম্মণ ঐতিহাসিক নীবুড় প্রভৃতি অনেক গ্রীকতত্ত্ববিদ্ বলিয়াছেন, গ্রীক দর্শনের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ অতি প্রাচীন কাল হইতে ইতিহাসের গাত্রে এইরূপ সুস্পষ্ট অঙ্কিত রহিয়াছে, যে তাহা হইতে কিছুতেই অনুমান করা যায় না, যে তাহা ভারতবর্ষ বা অন্য কোন দেশের জ্ঞানৈশ্বর্য্য হইতে গৃহীত হইয়াছে—'চুরি করা মালে গঠিত।' "সুতরাং যখন ভারতীয় ও গ্রীক দর্শনের মধ্যে এক সুন্দর সাদৃশ্য রহিয়াছে, তখন ভারতীয় দর্শন নিশ্চয়ই গ্রীক ভাবাপন্ন মাসিদনের প্রতিষ্ঠিত বক্তৃয়া রাজ্যের ভারতবাসিদিগের উপর তৎকালিক (খ্রীঃ পূঃ [illegible] শতাব্দী) বিস্তৃত প্রভাবের ফল হইবে।" অর্থাৎ এক সময়ে ভারত-

বর্ষের কোন অংশ বক্ট্রিয়ারাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল; বক্ট্রিয়ার গ্রীক ভাবাপন্ন মাসিদনিয়ানরা ভারতবাসিদিগের নিকট গ্রীক দর্শন প্রচার করিয়াছিল; তাহাতেই ভারতীয় দর্শনের উৎপত্তি। এ বড় চমৎকার মীমাংসা! এরূপ হইলে মুসলমানশাসন সময়ে বঙ্গদেশে নব্য-ন্যায়ের যে অসাধারণ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, তাহাও কোন আরবী বয়াদ্ বা পারসিক কবিতার ফল হইবে!

কিন্তু বাস্তবিক কোন পক্ষেরই এইরূপ চরম ধারণা পোষণ করিবার যুক্তি-যুক্ত হেতু নাই। উভয় দেশেরই দর্শনেতিহাস আলোচনা করিলে, স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, তাহাদের প্রাচীনতম সভ্যতার মধ্যে যে জ্ঞানলিপ্সার বীজ নিহিত ছিল, তাহাই ক্রমশঃ অঙ্কুরিত ও বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া, উত্তর কালে দর্শনের পূর্ণ অবয়বে প্রকাশ পাইয়াছে। হিন্দু দর্শনের মূল যেমন বৈদিক সাহিত্যে, গ্রীক দর্শনেরও গোড়া হোমর ও হিসিয়দ প্রভৃতির বর্ণিত পৌরাণিক বিবিধ বৃত্তান্তে। ভারতীয় দর্শনের যে অঙ্কুর অস্পষ্ট ভাবে বৈদিক সূক্ত-সমূহে ছড়ান রহিয়াছে, তাহাই ক্রমশঃ উপনিষদের অধ্যাত্মতত্ত্বে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া কালক্রমে প্রচলিত দর্শনের বিভিন্ন শাখাতে পরিণত হইয়াছে। সেইরূপ গ্রীসেও হোমর এবং হিসিয়দ প্রভৃতির পৌরাণিক সাহিত্য ও কাব্যাদিতে যে তত্ত্বানুসন্ধানের আভাস রহিয়াছে, তাহাই পরবর্ত্তী দার্শনিক যুগে আইওনিক ও ইলিয়েটিক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের স্থিতি ও পরিণতি ইত্যাদি বিবিধ বাদের আকৃতি ধারণ করিয়াছিল; কালক্রমে তাহা নীতি-বিজ্ঞানা-দির বিভিন্ন মত ও বাদানুবাদের সৃষ্টি করিয়া গ্রীক-জ্ঞান-জগত আলোড়িত করিতেছিল। এই সময়ে মহর্ষি সক্রেটসের আবির্ভাব; তৎসাময়িক 'সফিষ্ট' সম্প্রদায়ের হাতে গ্রীক-দর্শন ধ্বংসোন্মুখী হইতেছিল। সক্রেটিস তাহার উদ্ধার সাধন করিলেন। এই সময় হইতে গ্রীক দর্শনের এক নূতনযুগের আবির্ভাব হইল। সক্রেটিসের আবিষ্কৃত মহৎতত্ত্ব সমূহ, শিষ্য-পরম্পরাক্রমে প্রথমতঃ প্লেটোর ভাবমাত্র-বাদে পরিণত হয়; তৎপরে এরিষ্টটল তাহা হইতে বিভিন্ন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত করিয়া, গ্রীকদর্শনের পূর্ণতা জ্ঞাপন করিয়া-ছেন। পরবর্ত্তী কালের গতি নির্দ্ধারণ করা কঠিন নহে। এইরূপে পূর্ব্বাপর গ্রীসের চিন্তা ধারার এক অবিচ্ছিন্ন শৃঙ্খল রহিয়াছে।

বাস্তবিক যে পর্য্যন্ত কোন নিঃসন্দেহ ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া না যায় যে, ভারতীয় এবং গ্রীক দর্শনের কোনটী অপর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে,

সে পর্য্যন্ত ইহাদের মৌলিকতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করা আদৌ সঙ্গত নহে। যদি এরূপ কোনও প্রমাণ থাকিত যে, হিন্দু ও গ্রীকগণ কোন প্রাচীন সময়ে পরস্পরের ভাষা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াছিল; অথবা ইহাদের ভাষাতে এমন কোন নিদর্শন থাকিত যাহাতে, একের কোন দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক শব্দ অপরের কোন শব্দের সহিত সম্পূর্ণ মিলিয়া যায়, তাহা হইলেই এইরূপ সন্দেহ করা যাইত। তদভাবে এই দুই দর্শন যে প্রাচীন জগতের দুই প্রধান চিন্তাশীল জাতির স্বাধীন চিন্তার ফল, এইরূপ মনে করাই বিধেয়। যদি ইহাদের আলোচ্য বিষয়ে কোন ঐক্য বা সমতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে, এই মাত্র মনে করিতে হইবে যে সত্যের বিশাল রাজ্যে রত্নের অনুসন্ধান করিতে গিয়া, দুই জাতিই কোন কোন বিষয়ে সমান ও একজাতীয় রত্নের অধিকারী হইয়াছে। এইরূপ সাম্য বা ঐক্য থাকা অসম্ভব নহে; কারণ স্বভাবতঃ মানবের চিত্তপ্রণালী এক প্রকারের, গবেষণার বিষয়ও সাধারণ।

বাস্তবিক গ্রীকগণ ভারতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল কি না, অথবা ভারতীয় ঋষিগণই গ্রীকদিগের নিকট হইতে কোন দার্শনিকতত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা, এই প্রশ্ন প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিকগণের নিকট উদিত হয় নাই; মধ্যযুগেও এইদিকে কাহারও দৃষ্টি নিক্ষেপ দেখা যায় না। বর্ত্তমান যুগে ভারতবর্ষের সহিত ইউরোপীয়দিগের সংশ্রব জন্মিয়াছে, অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষাবিদ্‌ হইয়া ভারতীয় দর্শনের সহিত পরিচিত হইয়াছেন। এই পরিচয়ের ফলে, অনেকে প্রাচীন সাহিত্যাদি হইতে ঐতিহাসিকতত্ত্ব উদ্ভাবিত করিতে অত্যধিক আকাঙ্ক্ষার পরিচয় দিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্বজ্ঞতার আকাঙ্ক্ষা, একটু সীমা অতিক্রম করিলেই, বিপরীত ফল প্রসব করিয়া ফেলে; বিকৃত মৌলিকতা অতি সহজেই প্রভূত অনিষ্ট সাধন করিতে পারে। সুখের বিষয় সকলেই এক পথের পথিক নহেন; পরলোকগত মনস্বী আচার্য্য ম্যাক্স-মূলার ইহাদের অন্যতম। বর্ত্তমান এই দৈন্যের দিনে, ভারতবর্ষ জ্ঞান-গরিমার সম্পদে জগতের নিকট পরিচিত হইবার পক্ষে, আচার্য্য ম্যাক্স-মূলারের নিকট যতদূর ঋণী, তত আর কাহারও নিকট নহে। মানবের আদিম ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণাও অসাধারণ। ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্য, ধর্ম্ম ও দর্শন তাহাকে বিমোহিত করিয়াছিল; জ্ঞান-জগতে ভারতবর্ষের স্থান অতিশয় উচ্চ ইহাও তিনি মুক্তকণ্ঠে গাহিয়া

গিয়াছেন; কিন্তু গ্রীক দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া তাহা যে ভারতীয় দর্শনের অবলম্বন অথবা ছায়া মাত্র, কোনওরূপে তাহা স্বীকার করেন নাই। পক্ষান্তরে ইহাদের মধ্যে কোনরূপ হেতু ঘটিত সম্পর্ক আছে, ইহা নির্দ্ধারণ করিতে কেহ না যান, এতদ্‌পক্ষে যথেষ্ট অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক প্রত্যেক জাতিরই এক একটী বিশেষত্ব আছে; গ্রীক ও হিন্দুদিগের পক্ষে এই বিশেষত্ব দার্শনিক তত্ত্ব নির্দ্ধারণেই সমধিক প্রস্ফুরিত হইয়াছিল; আবার দার্শনিক তত্ত্বনির্দ্ধারণেও ইহারা উভয়ে আপন আপন প্রকৃতিগত বিশেষত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছে। হিন্দু ও গ্রীকদর্শন যে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয়, এবং ইহাদের যে বিস্তর প্রকৃতিগত পার্থক্য রহিয়াছে, প্রবন্ধান্তরে তাহা দেখাইবার অভিপ্রায় রহিল। এক্ষণে গ্রীক দর্শন যে গ্রীক-ভূমিরই স্বতঃপ্রসূত ফল, এতৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিব।

বাস্তবিক গ্রীক-দর্শনের উৎপত্তি নির্ণয় করিতে হইলে, গ্রীস দেশের সাধারণ অবস্থা প্রাচীন গ্রীকদিগের জাতীয় প্রকৃতি এবং গ্রীক সমাজের প্রাচীন অবস্থা প্রভৃতি পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে কিরূপ অবস্থাতে সর্ব্বপ্রথম গ্রীকহৃদয়ে জ্ঞান-লিপ্সা জাগরিত হইয়াছিল, এবং গ্রীক দর্শনের সৃষ্টি হইয়াছিল।

গ্রীস দেশটি যে স্থলে অবস্থিত, এবং তাহার বিভিন্ন প্রদেশ সমূহ যেরূপ ভাবে গঠিত, তাহাতে গ্রীকগণ স্বভাবতঃ উদ্যমশীল ও নানাদিকে কার্য্যক্ষম হইয়া উঠিয়াছিল। সমগ্র দেশটি একটী সুবৃহৎ উপদ্বীপ; সমুদ্রের সীমান্তরেখা আঁকিয়া বাঁকিয়া এরূপভাবে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে যে, দেশের প্রায় সমগ্র ভাগই সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী; অসংখ্য দ্বীপমালা নীল-আকাশে তারকা রাশির ন্যায় সমুদ্রের গায়ে ভাসিয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বদিকের দ্বীপপুঞ্জ বহুদূর ব্যাপিয়া এশিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই সমুদয় দ্বীপ ও নিকটবর্ত্তী সাগর-সংলগ্ন দেশ-সমূহ নানা প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারী ছিল; গ্রীকগণ অতি প্রাচীন কাল হইতেই ঐ সমুদয় দেশে নানাবিধ সুবিধা দেখিতে পাইয়া, উপনিবেশ ও আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। গ্রীসের ইতিহাসে সেই উপনিবেশ বিস্তারের যুগ প্রাচীন গ্রীক-কীর্ত্তির সবিশেষ পরিচায়ক। এই উপনিবেশসমূহ ও উপদ্বীপ-গ্রীস লইয়া প্রাচীন গ্রীক-জগত। গ্রীক-বসতি মাত্রই গ্রীসের প্রাচীন গৌরব ও জ্ঞানগরিমার উৎপত্তি-ক্ষেত্র। গ্রীক দর্শনের ইতি-

হাস আলোচনা করিবার সময় পরিলক্ষিত হইবে, গ্রীসের অনেক প্রসিদ্ধ দার্শনিক এই উপনিবেশ ভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

উপদ্বীপ-গ্রীসের মধ্যভাগ কতকগুলি উপত্যকার সমষ্টি-মাত্র। চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত ; কোন একটী উপত্যকার সহিত অপর কাহারও বড় সম্বন্ধ নাই। এইরূপ পরস্পর বিচ্ছিন্ন উপত্যকা সমূহ প্রথমাবধিই অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যরূপে গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব প্রবল থাকায়, কখন কখন একে অপরের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেও চাহিত। প্রত্যেকেই আপন আপন দেশের উন্নতি বিধানে যত্নপর ছিল। জ্ঞানচর্চ্চা এবং বিদ্যানুশীলনে প্রবৃত্তিও এইরূপে জাগরিত হইল।

গ্রীসদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যকে আর এক হেতু বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ঐতিহাসিকযুগের পূর্ব্বে দেখা যায়, গ্রীকগণ প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিতে আকৃষ্ট ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বিভিন্ন দেবরূপে তাহাদের অর্চ্চনা করিত ; এবং সেই অনুযায়ী আপনাদের নীতিসূত্র ও জীবনাদর্শ গঠন করিয়া লইয়াছিল। এইরূপ ধর্ম্মবিশ্বাস বা ধারণা কুসংস্কার ও উপধর্ম্ম বলিয়া নিন্দিত হইতে পারে ; কিন্তু ইহার ভিতর জাগতিক ব্যাপারের যে কারণানুসন্ধান ও জ্ঞান-লিপ্সার আভাস পাওয়া যায়, তাহাই উত্তর কালের কোনও শ্রেষ্ঠতর দার্শনিক বাদের সূচনা করিতে পারে।

স্বাধীন-চিন্তাশীলতা গ্রীকচরিত্রের এক বিশেষ লক্ষণ। স্থানীয় অবস্থানুসারে গ্রীকদিগকে যে ভাবে বাস করিতে হইত, তাহাতে অতি সহজেই এই স্বাধীন প্রকৃতি গ্রীকসমাজে বদ্ধমূল হইয়া পড়ে। চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতমালা, মধ্যস্থলে এক একটী উপত্যকা, ইহা লইয়া বিভিন্ন গ্রীকরাজ্য। এইরূপ বহু রাজ্যে সমগ্র দেশটি বিভক্ত ছিল ; প্রায় সকল রাজ্যেরই পরিসর কম, জনতা অধিক ; কঠোর পরিশ্রম করিয়া সকলকে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইত। দেশের প্রায় চতুর্দ্দিকে সমুদ্র ; প্রায় সকল রাজ্যেরই সমুদ্র নিকটবর্ত্তী ; সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য প্রথমাবধি অতি সহজেই প্রচলিত হইয়া উঠে। এইরূপে চতুর্দ্দিকে গ্রীককার্য্য তৎপরতার স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে ; গ্রীক প্রতিভার তরঙ্গ তাহাতে নানাপ্রকারে ক্রীড়া করিতে লাগিল। স্বাধীন-চিন্তাশীলতার বীজ পূর্ব্বাবধি গ্রীকচরিত্রে নিহিত ছিল ; এক্ষণে তাহা বিবিধ কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করিয়া, নানাবিধ ফল উৎপাদন করিতে আরম্ভ করিল। উত্তর কালের গ্রীকদর্শন যে ...

দেখা যায়, গ্রীকচরিত্রের এই কার্য্যপ্রবণতাই তাহার কারণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। স্থানান্তরে তাহা সম্যক প্রদর্শিত হইবে। প্রায় সকল দেশেরই প্রাচীন ইতিবৃত্তে নানাবিধ কুসংস্কার ও কুরীতির বিবরণ পাওয়া যায়; গ্রীক সমাজে তাহা অতিশয় বিরল। জাতীয় চরিত্রের স্বাধীন-চিন্তা-প্রিয়তাই ইহার প্রধান কারণ। স্বাধীন মত প্রচার ও স্বেচ্ছানুরূপ জ্ঞানচর্চ্চার পক্ষে গ্রীকসমাজে তেমন কোনও বাধা ছিল না। ইউরোপীয় ইতিহাসের মধ্যযুগে স্বাধীনচেতা ধর্ম্মসংস্কারক ও বিজ্ঞানবেত্তাদিগকে সমাজের হস্তে যেরূপ অত্যাচার ও নিগ্রহ সহ্য করিতে হইয়াছিল, গ্রীক ইতিহাসে সেরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। জাতীয় জীবনের এইরূপ ভাব জ্ঞানচর্চ্চার পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল।

গ্রীকচরিত্রের এরূপ আরও অনেক লক্ষণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, গ্রীকজাতি স্বভাবতঃ জ্ঞানপিপাসু ছিল; কোনও একটি প্রশ্ন উপস্থিত হইলে, তাহার মীমাংসা না করিয়া থাকিতে পারিত না। কোনও বিষয়ে দার্শনিক মীমাংসায় উপস্থিত হইতে হইলে, মানসিক যে স্থিরতা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতার আবশ্যক, গ্রীকচরিত্রে তাহা স্বভাবসিদ্ধ ছিল। স্বাভাবিক হেতু ও কারণ নির্দ্ধারণ করিয়া, কোন বিষয়ের বিচার ও যুক্তির দ্বারা মীমাংসা করিতে প্রাচীন গ্রীকগণ সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন। আজিও গ্রীকেরা এই প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভুলিতে পারে নাই। শুনিতে পাওয়া যায়, আথেন্সের রাজপথে চলিতে চলিতে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, দলে দলে গ্রীকগণ পথপ্রান্তে বা উদ্যান প্রাঙ্গণে একত্র হইয়া কোনও কিছুর তর্ক বা যুক্তিতে ব্যাপৃত রহিয়াছে; এবং অতি ধীর ও শান্তভাবে তাহার মীমাংসা সাধন করিতেছে। এই প্রকার চিত্তের স্বভাবসিদ্ধ স্থৈর্য্য গ্রীকজাতির জ্ঞানজগতে উন্নতি লাভের এক প্রধান কারণ।

দেশের আচার ব্যবহার ও রীতি নীতির প্রতি শ্রদ্ধাবান থাকা গ্রীকচরিত্রের আর একটি লক্ষণ। ইহাও তাহার ধীর প্রকৃতিরই পরিচায়ক। নানা দিকে নিয়মের অধীন থাকিয়া, তাহাদের কথাবার্ত্তা ও চিন্তা-প্রণালী সহজেই সংযত ও ধারাবাহিক হইয়া আসিয়াছিল। এই প্রকার সংযম ও শৃঙ্খলা জ্ঞানানুশীলনের সহায়, এবং দার্শনিক গবেষণার অনুকূল। আবার এইরূপ নিয়ম ও পদ্ধতির অধীন থাকাতে, তাহাদের এই প্রত্যয় অতি সহজেই জন্মিয়াছিল যে, ব্যক্তিগত জীবনে প্রত্যেকে আংশিকভাবে এক বিশাল সমগ্রের অন্তর্ভুক্ত, এবং সকলেই সেই বিরাটের নিয়ম মানিয়া চলিতে বাধ্য।

এই প্রত্যয় অলক্ষ্যে জাতীয় চরিত্রে বদ্ধমূল হওয়াতে, নানা দিকে অত্যাশ্চর্য্য ফল উৎপাদন করিতে থাকে, গ্রীকদর্শন প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তি প্রায় চারিশত বৎসরের গ্রীকদিগের সামাজিক ইতিহাসে তাহার নিদর্শন রহিয়াছে। এই সময়কে প্রাচীন গ্রীসের এক বিশেষ উন্নতির যুগ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এই সময় প্রাচীন গ্রীকসাহিত্য ও কাব্যাদির চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়; নানাবিধ মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য ও নাট্যকাব্যাদি তখনই রচিত হইয়াছিল। এই সমুদয় ধর্ম্ম ও ঈশ্বর তত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব ও নৈতিক বিবিধ তত্ত্বের আলোচনায় পরিপূর্ণ। চরিত্রের উৎকর্ষসাধন, প্রতি বিষয়ে মাধুর্য্য-সম্পাদন এবং স্ফুর্ত্তি ও সন্তোষ বিধান, জীবনের পূর্ণতা সম্পাদন প্রভৃতি মানব জীবনের যাহা কিছু শ্রেয়, তাহার নিমিত্ত একটা জাগরণ জাতীয় জীবনের সকল দিকে ফুটিয়া উঠিতেছিল; তাহার প্রেরণায় বিবিধ সম্প্রদায় চিত্র ও নাট্যাদি বিবিধ বিদ্যার আকারে, এবং সত্যাদর্শের স্বরূপ নিরূপণে নিযুক্ত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী যুগের দর্শন ও বিজ্ঞানের উৎপত্তি নির্ণয় করিতে হইলে এস্থলে তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে।

এইরূপে দেখা যায়, গ্রীকদর্শন এক স্বাধীনজাতির স্বতন্ত্র চিন্তাধারারই ফল, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যুক্তি-বিরুদ্ধ নহে।

শ্রীবিধুভূষণ দত্ত।

ভক্ত।

নীরবে কাঁদিয়া সাধিয়া সাধিয়া,
জাগা'য়ে ঘুমন্ত প্রাণ,
কতদিন পরে ভক্ত আজি রে
পেয়েছে প্রেম-সন্ধান।
অমৃতের ধারা বহি'ছে সে প্রেম
অন্তর-জগত জুড়ে।
সে প্রেম-মদিরা পিয়ে মাতোয়ারা,
চলে কভু উঠে পড়ে।
আচরণ তা'র যেন বিপরীত,
কত লোকে কত বলে।

কভু তা' শুনিয়া উঠে চমকিয়া,
আপনে লুকা'য়ে চলে।
আবার কখন সব ভুলে যায়,
জগতের লজ্জামান।
হাসে, নাচে, গায়, কাঁদে উভরায়,
কে জানে কি তা'র প্রাণ!
ভাব নিধি তা'র অন্তরে বসিয়া,
ভাবায় অনন্ত ভাবে।
অভাব-পীড়িত জগতের জন
তা'র কি সন্ধান পা'বে!

শ্রীউমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বর্ত্তমান যুদ্ধের পরিণাম।

বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে ইউরোপে যে শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইবে তাহাত দিব্যচক্ষে দেখা যাইতেছে। বাড়ী ঘর, ধন দৌলত গ্রাম নগর ধ্বংস হইয়া যাইবে; বহুযত্নলব্ধ, বহুকালের সঞ্চিত সভ্যতা শত বৎসর পিছাইয়া যাইবে,—সেত বলাই বাহুল্য। কিন্তু ইহার ফলে মানবজাতি হয়ত ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইবে; অনেকে হয়ত বা—এমন মুষ্ড়াইয়া যাইবে যে আর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না, সেকথা হয়ত তেমন সত্যভাবে আমরা ভাবিতে সাহস পাইতেছি না। আবার যাহারা বা কোন প্রকারে টিকিয়া থাকিবে, তাহাদের সমাজের ভিত্তিমূল রক্ষা করাই হয়ত এক বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইবে। এই যে যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ দিতেছে—ইহারা কাহারা? দেশের যে সকল কর্ম্মঠ, বুদ্ধিমান, শূর, বীর, সুস্থ ও সবল যুবক ও প্রৌঢ় ব্যক্তি, তাহারাই ত যুদ্ধে বলির আহুতি প্রদত্ত হইতেছে। আর এই যে দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের ধ্বংস, ইহাইত যুদ্ধের প্রধান ক্ষতি। যুদ্ধাবসানে একদিকে থাকিবে অধিকাংশই ভীরু, কাপুরুষ, রুগ্ন, বৃদ্ধ ও বালকের দল—অন্যদিকে থাকিবে লক্ষ লক্ষ যুবতী বিধবা ও বিবাহযোগ্যা কুমারীর দল। তাহার ফলে বীজাশুদ্ধি এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতি ও সমাজের অধঃপতন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারম্ভে মহাবীর

অর্জ্জুন এই আশঙ্কাই করিয়াছিলেন; আর ফলে ঘটিয়াছিলও তাহাই। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর আর ভারতবর্ষ পূর্ব্বের মত মাথা তুলিতে পারিল না। তাহার পরেই ত দীর্ঘকালব্যাপী নিবিড় অন্ধকারের যুগ!

এত গেল একভাবের কথা। যে সকল ক্ষেত্রে স্ত্রী পুরুষের বিবাহ হইবে এত তাহারই কথা। কিন্তু যুদ্ধের ফলে একদিকে পুরুষের সংখ্যা খুব কমিয়া যাইবে ও অন্যদিকে তাহার তুলনায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা অনেক বেশী হইয়া দাঁড়াইবে। একেই ইউরোপের প্রায় সর্ব্বত্র পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অনুপাতে বেশী। আর যুদ্ধের ফলে সেই অনুপাতের বৈষম্য কত অধিক হইয়া দাঁড়াইবে তাহা কে বলিতে পারে? এখন যেরূপভাবে লোকক্ষয় হইতেছে—আর কিছুদিন সেইরূপ চলিলে ইউরোপত এক প্রকার পুরুষশূন্যই হইয়া পড়িবে। এরূপ অবস্থায় যাহা ঘটিতে পারে —তাহা নিম্নলিখিতরূপে ব্যক্ত করা যায়।—

(১) বৈধ বহুবিবাহ (বহু পত্নীত্ব);

(২) অল্পসংখ্যক রমণীর বিবাহ ও অপর সকলের অনূঢ়া অবস্থায় অবস্থিতি বা দেশান্তর গমন;

(৩) অবৈধ বহুবিবাহ।

যে সকল সমাজে বহুবিবাহ অনুমোদিত সেখানে রমণীর সংখ্যাধিক্য হইলে স্বভাবতঃই বহুবিবাহ প্রথা অবলম্বিত হয় ও তাহার ফলে জাতি ও সমাজস্থিতি অব্যাহত থাকে। কিন্তু খৃষ্টান ইউরোপে ইহা অসম্ভব; সেখানে বহুবিবাহপ্রথা অবলম্বিত হইবে ইহা কল্পনা করাও যায় না।

সুতরাং এখনকার মত এক পত্নীর বিবাহই চলিতে থাকিবে বলা যায়। কিন্তু তাহার ফলে আমাদের পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় অবস্থা উপস্থিত হইবে। অল্পসংখ্যক রমণীরই বিবাহ হইবে; বেশীর ভাগ রমণীকেই অনূঢ় থাকিতে হইবে। এই সকল অনূঢ়াগণ হয় দেশে থাকিয়াই নানাভাবে কাল কাটাইবে অথবা স্বামী অন্বেষণে দেশান্তর গমন করিবে। বলা বাহুল্য ইহার কোন অবস্থাই সমাজস্থিতির অনুকূল নহে। বিবাহের অল্পতা প্রযুক্ত লোকসংখ্যা কমিয়া যাইতে থাকিবে এবং সমাজ অবনতির দিকে যাইবে।

কিন্তু স্বামী-অন্বেষণে দেশান্তরগমন কম স্ত্রীলোকের পক্ষেই সম্ভব হইবে। সামাজিক ও প্রাকৃতিক নানাকারণে অনূঢ়া রমণীগণের অধিকাংশই দেশে থাকিয়া যাইবে। তাহাদের কেহ কেহ ব্রহ্মচর্য্য পালন

করিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু মনুষ্যপ্রকৃতির বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা আশা করা যায় না যে সকলেই সেইরূপ সংযম রক্ষায় সমর্থ হইবে। অধিকাংশ স্ত্রীলোকেই তাহা পারিবে না, ইহাই বলা যায়। ফলে বৈধবহুবিবাহ না চলিলেও, অবৈধবহুবিবাহ চলিতে থাকিবে। অবৈধবহুবিবাহের আর এক নাম ব্যভিচার। ব্যভিচার যে সমাজ ও জাতির ধ্বংস করিবে তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। ধ্বংসের পূর্ব্বে রোমের ঠিক এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। ব্যভিচার এত বাড়িয়াছিল যে রোমক রমণীরা নূতন উপপতির পরিবর্ত্তনের হিসাবে বৎসর গণনা করিতেন। আর তাহাও দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধেরই পরিণাম। বিশ্ববিজয়ী রোম পৃথিবী জয় করিতে তাহার পুরুষজাতিকে একরূপ নির্ম্মূল করিয়া দিয়াছিল বলিলেই হয়;—আর যাহারাও জীবিত থাকিত তাহাদের অধিকাংশই বহু দূরে বিদেশে যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত। এই অস্বাভাবিক অবস্থার প্রতিশোধ প্রকৃতি ভীষণরূপেই লইয়াছিল।

সুতরাং যে দিক দিয়াই দেখিনা কেন, এই যুদ্ধের পরিণাম যে ইউরোপের যুধ্যমান জাতি সমূহের পক্ষে মঙ্গলকর নহে,—সর্ব্বরকমেই মহান্ অনিষ্টকর ও জাতীয়তার ধ্বংসসূচক তাহা নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে।

কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে এই যুদ্ধের ফলে ইউরোপের জাতিসমূহের অনিষ্ট না হইয়া অন্য প্রকারে ইষ্টই হইবে। যে সকল ব্যক্তি যুদ্ধশেষে ফিরিয়া আসিতে পারিবে, তাহাদের বিশেষরূপ শারীরিক ও মানসিক শক্তিসম্পন্ন হওয়াই সম্ভব। সুতরাং তাহারা যে বংশসৃষ্টি করিবে, তাহা জাতীয় অবনতির কারণ না হইয়া উন্নতির কারণই হইবে। জাতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে বলা যায়, হয়ত বা কোন কোন জাতি হারিয়া সমূলে ধ্বংসের পথে যাইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যাহারা অযোগ্য তাহাদেরই এরূপ দশা হইবে। আর যাহারা যোগ্যতর জাতি তাহারা যুদ্ধাবসানে জয়ী হইয়া আরো প্রবল ও উন্নততর হইয়া উঠিবে এবং পৃথিবীতে মানব সভ্যতার এক নূতন যুগ প্রবর্ত্তন করিবে।

এরূপ মত ভবিষ্যতের কল্পনার উপর গড়িয়া উঠিতে পারে, কিন্তু সত্যের পরীক্ষায় ইহা টিকে না। দেখিতে পাওয়া যায় যে যাহারা বেশী সাহসী ও ধৈর্য্যশালী,—এক কথায় শ্রেষ্ঠ প্রকৃতির লোক, তাহারাই বেশীর ভাগ যুদ্ধে মারা যায়। সাহসী বীরেরাই যুদ্ধে অগ্রগামী হইয়া থাকে

এবং বেশী মরে, ইহাত প্রসিদ্ধ কথা। যাহারা ফিরিয়া আসে তাহারা সকলেই খুব সাহসী বীরপুরুষ এরূপ বলা যায় না। অন্যদিক দিয়া দেখা যায় যে, যাহারা যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসে তাহাদের মধ্যে অনেকেই রুগ্ন, আহত বা দুর্ব্বল হইয়া ফিরিয়া আসে; অনেকের জীবনীশক্তি চিরদিনের মত নষ্ট হইয়া যায়। এক কথায় তাহারা আর সমাজের বড় বেশী কাজে লাগে না। তাহাদের মধ্যে যাহারা বিবাহ করে, তাহারাও সুস্থ ও সবল সন্তানের জন্ম দিতে পারে না। প্রবল হত্যাকাণ্ডের মধ্যে যাহারা থাকে, তাহাদের স্নায়বিক ও মানসিক বিপ্লবও অনেক সময় ঘটিতে দেখা যায়। এই সকল লোকের বীজও কখনও শুদ্ধ হইতে পারে না।

জাতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে বলিতে হয় যে সভ্যতর জাতিই সকল সময়ে যুদ্ধে জয়লাভ করে না। আর প্রবলতর জাতিও সব সময়ে সভ্যতর হয় না। প্রবল জাতি জয়লাভ করিলে বলের মাহাত্ম্য প্রমাণিত হয় বটে; কিন্তু তাহা মানবসভ্যতার উন্নতির অনুকূল হয় না। যে সভ্যজাতি হারিয়া যায় সে নিজেও অধঃপতনের ধাপে নামিয়া যাইতে বাধ্য হয়; আর বিশ্বমানবও তাহার প্রদত্ত জ্ঞান বিজ্ঞান প্রভৃতি হইতে বঞ্চিত হয়। বর্ব্বর গথেরা যখন রোম জয় করিয়াছিল, তখন তাহারা রোমান জাতির চেয়ে বেশী সভ্য ছিল না। তাহার ফলে রোমীয় সভ্যতা ধ্বংস হইয়া বহুশতাব্দীব্যাপী ইউরোপের অন্ধকারময় মধ্যযুগ। পাঠানেরা যখন হিন্দুদিগকে জয় করিয়াছিল, তখনও বলেরই জয় হইয়াছিল, সভ্যতার জয় হয় নাই।

কিন্তু বিশ্বরাজ্যে কোন ঘটনাই নিরর্থক নহে। তাই মনে হয় এই লোকক্ষয়কর ভীষণ যুদ্ধেরও প্রয়োজন ছিল। বহুদিন পূর্ব্বে ম্যালথাস্ চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়াছিলেন যে মানবসমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় প্রায় সকল দেশেই যে পরিমাণ লোক বাড়িতেছে, সে পরিমাণ খাদ্য উৎপন্ন হইতেছে না। এইরূপ ভাবে লোক বাড়িয়া চলিলে কিছুদিন পরে এরূপ অবস্থা দাঁড়াইবে যে হাজার চেষ্টা করিয়াও সকল লোকের খাদ্য সঙ্কুলান হইয়া উঠিবে না। তাহার ফলে দুর্ভিক্ষ, মহামারী বা পরস্পরের যুদ্ধের ফলে কতক লোককে মরিতেই হইবে। ম্যালথাস্ একমাত্র সংযমকে এ রোগের ন্যায়-সঙ্গত ঔষধ ঠিক করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে পণ্ডিতপ্রবর জনষ্টুয়ার্ট মিল্ প্রমুখ আরও অনেকে ঠিক সেই কথা বলিয়াছেন। কিন্তু মিল আশা করিয়া-

ছিলেন যে মানুষের বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও বাণিজ্য দ্বারা পরস্পরের প্রীতি বৃদ্ধির ফলে এই সমস্যার অনেকটা মীমাংসা হইতে পারে। স্পেন্সারও ভবিষ্যতে এইরূপ উপায়ে যুদ্ধ থামিতে পারে অনুমান করিয়াছিলেন। কিন্তু-বিদের বা স্পেন্সারের আশা সফল হয় নাই। বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে মানুষের অসংযম ও বিলাস উত্তরোত্তর বাড়িয়া আসিয়াছে ও লোক সংখ্যাও সেই সঙ্গে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহার পরিণামে পেটের জ্বালায় অন্ধ হইয়া পাশ্চাত্য জাতিসমূহ পৃথিবীর নানা স্থান কলে ও কৌশলে দখল করিয়াছে। তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকিতে না পারিয়া কোন কোন আদিম জাতি ধরা পৃষ্ঠ হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়াছে। বাণিজ্যের প্রসার হইয়াছে বটে; কিন্তু তাহাতে প্রীতি বর্দ্ধিত হয় নাই,—বিশ্বসমস্যারও মীমাংসা হয় নাই। বরং আরও নূতন নূতন সমস্যা তাহার ফলে বাড়িয়া চলিয়াছে। আর তাহারই ফলে আজ "যদুবংশের মূষল" রূপে এই যুদ্ধ দেখা দিয়াছে। "যদুবংশ" কিয়ৎ পরিমাণ ধ্বংস না করিয়া এ "মূষল" নিবৃত্ত হইবে না। ইহাতে পরিতাপ করিবারও কিছু নাই। ব্যাধি আত্মকৃত। তীব্র ঔষধ না হইলে তীব্র রোগের উপশম হয় না। এই মহাযুদ্ধ সেই তীব্র ঔষধ রূপেই আসিয়াছে।

কিন্তু ইহাতে রোগ আপাততঃ বন্ধ হইবে বটে, রোগের মূল উৎপাটন করিবে না। কুইনাইনের মত ইহা জ্বর কিছুদিনের জন্য আটকাইবে, কিন্তু রোগের গোড়া মারিতে পারিবে না। সে "গোড়া" রহিতেছে, মানুষের ভিতরে,—মানুষের পশু-ভাবের মধ্যে;—এক কথায় **কাম ও হিংসায়।** মানুষ জীবজগতের যত উর্দ্ধেই স্থাপিত হোক্ না কেন, তাহার মধ্যে সাধারণ পশুধর্ম্ম যে বারো আনা তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আদিম বর্ব্বরাবস্থা হইতে যেমন পশুদিগের সঙ্গে তেমনই নিজের ভিতরকার পশু-ভাবের সঙ্গেও মানুষকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। এই চেষ্টাতেই তাহার মনুষ্যত্বের পরিচয়, ইহাই তাহার সভ্যতার মাপকাঠী। কোন বিশেষ যুগে মানুষ কেমন সভ্য ছিল, তাহা বুঝিতে হইলে, সেই যুগের মানুষ তাহার ভিতরকার পশুভাব কতটা পরিমাণ ফুটাইয়া তুলিয়াছে, তাহাই দেখিতে হইবে। মানুষ জ্ঞান বিজ্ঞানে যতই উন্নতি করুক না কেন, বিলাসভোগের উপযোগী বা জীবন-যাত্রার সহায়ক যতই সুন্দর সুন্দর পন্থা আবিষ্কৃত হোক্ না কেন, তাহাকে কখনই সভ্য বলা যায় না যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার হৃদয়ের

পশুভাবগুলা,—তাহার কাম ও হিংসা প্রবৃত্তি প্রায় সমভাবেই বর্ত্তমান থাকে। এই যে লোক সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীতে মনুষ্য জাতির আর স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না; এই যে তথা-কথিত সভ্যনামধারী সমাজসমূহে ব্যভিচারের প্রাদুর্ভাব, নানারূপ আধিব্যাধিতে, দুঃখ দারিদ্র্যে লোকসমাজ পরিপূর্ণ,—কামই প্রধানতঃ তাহার মূল; পশুর ন্যায় মানুষের অতিরিক্ত ভোগাসক্তি—ইন্দ্রিয়-পরায়ণতারই এই সকল পরিণাম। আর হিংসার ত কথাই নাই। ইউরোপের বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ, মানবহৃদয়ের অন্তর্নিহিত পাশব হিংসার—একটা বিরাট অভিব্যক্তি। শৃগাল কুক্কুরের ন্যায় পরস্পরের মুখের অন্ন কাড়িয়া, ছোটকে বড় গ্রাস করিয়া, অন্যের রুধির ও মাংসে নিজের দেহের পুষ্টি করিয়া —মানুষ চিরকালই তাহার হিংসাবৃত্তির পরিচয় দিয়া আসিয়াছে, আর আজও তেমনই দিতেছে। এই হিংসা ও কামকে যদি কোন দিন মানুষ জয় করিতে পারে, তবেই সে মনুষ্যত্বের সোপানে আরোহণ করিতে সক্ষম হইবে; আর তখনই প্রকৃত সভ্যতার কিঞ্চিৎ সূচনা হইবে।

একমাত্র সংযম ও প্রেমদ্বারাই কেবল সেই পশুভাবগুলাকে দমন করা যাইতে পারে; —আধুনিক যুগের প্রাকৃত বিজ্ঞানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার দ্বারা নহে। সংযম ও প্রেমের দ্বারাই কেবল সর্ব্বপ্রকার সমাজ সমস্যা ও বিশ্বসমস্যার সমাধান হইতে পারে; মানুষের দুঃখ দারিদ্র্য দূর হইয়া পৃথিবীতে আনন্দের রাজ্য গড়িয়া উঠিতে পারে। যে ধর্ম্ম সেই সংযম ও প্রেমের সাধনা শিক্ষা দেয়, মানুষের ভিতরকার সেই আসল মানুষটাকে জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করে, তাহাই হইতেছে আধুনিক মানবের যথার্থ যুগধর্ম্ম। সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য এই যুগধর্ম্মের দেহ, সেবা ইহার প্রাণ, আর প্রেম ইহার আত্মা। ইহাতেই মানবে মানবে কলহ দূর হইবে; দুঃখ দারিদ্র্য আধিব্যাধি শোক তাপের হাহাকার কমিয়া যাইবে; বিলাস ব্যভিচারের মধ্যে নির্ম্মল মনুষ্যত্বের শ্রী ফুটিয়া উঠিবে। ভারতীয় সভ্যতার আধুনিক স্তরে এই যুগধর্ম্ম অভিব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে ইহা উপদিষ্ট হইয়াছে; আর পতিতপাবন শ্রীগৌরাঙ্গ নিজজীবনে মূর্ত্তিমান্ করিয়া ইহার প্রচার করিয়াছেন। মানবজাতির ইহা অমূল্য সম্পদ, ভবিষ্যতের ইহাই নবধর্ম্ম। ভারতবর্ষকেই এই নবধর্ম্ম প্রচার করিতে হইবে; আর তাহাতেই তাহার দীর্ঘকালব্যাপী জাতীয় জীবনের সার্থকতা সম্পাদিত হইবে।

যে নিকটবর্ত্তী, বিশ্বমানবের ইতিহাসে সেই নূতন দিনের অরুণালোক যে ফুটিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে,—তাহাই সূচনা করিতেছে।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

অবসান।

বরষে প্রখর কর হরষে প্রভাকর,
নাচিছে গ্রীষ্ম প্রচণ্ড,
উঠিছে 'হাহা' রব ধরণী বক্ষঃ 'ভেদি'
অবয়ব খণ্ড বিখণ্ড।
শুষ্ক সরসী যত, তটিনী কৃশাঙ্গী,
সপ্ত সিন্ধু জল তপ্ত,
দিগন্ত ধূসর, অম্বর পিঙ্গল,
দিবস যামী অভিশপ্ত ;
পবন রুদ্ধ গতি,— ক্রুদ্ধ মত্ত কভু,
নিয়ত অনলময় অঙ্গ,
মুদিত নেত্র পাখী বিথারি পক্ষ শাখে
বসিয়া অলসে গীতিভঙ্গ।
দগ্ধ ধরাধর, বিষণ্ণ মহীরুহ,
ছায়া শীতল নহে আজি,
ক্ষীণ কণ্ঠনাদ দুর্ব্বল দর্দ্দুর
চাহিছে অম্বুদ রাজি।
নৃত্য বিরত শিখী, হরিণী হতাশে
মুমূর্ষু মরিচীকা পাশে,
ঘন বারি যাচক চাতক কাতরে
ফুকারে সঘনে বারি আশে।
মানব কর যোড়ে ডাকে ভকতি ভরে,—
'হে দেব ! দাও কৃপা দৃষ্টি,
হে পরমেশ্বর ! দেহি অভ্রধারা
রক্ষ রক্ষ তব সৃষ্টি ;

জগন্নাথ শুনি, আকুল প্রার্থনা,
নিরখিয়া ভীষণ দুঃখ,
সদয় দয়াময় নীরদে আদেশিলা
জুড়াইতে তাপিত বিশ্ব।
শূন্য পূর্ণ; হেরি শ্যামল জলধরে
হরষিত সবে নিঃশঙ্ক;
আসিল 'বরষা,'-অই সভয়ে গ্রীষ্ম ধায়
বাজিল মঙ্গল শঙ্খ।

শ্রীমৃণালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

"তুমি"

(গান)

তুমি ভ্রান্ত-পথ-শ্রান্ত-জন-ক্লান্তি-হর নাথ,
নিত্যমম চিত্তবঁধু মত্ত তব সাথ;
কাম্যতুমি রম্যতুমি সৌম্যতুমি স্বামি!
তব প্রেম-মধু-স্নিগ্ধ-চির-মুগ্ধ-চিত আমি;
হের নীলসিন্ধু মিহির ইন্দু
গ্রহতারক রঙ্গে,
শ্যামভুবন তুঙ্গভূধর
প্রেম-লহরী ভঙ্গে;
করুণা তব গাহিছে নাথ মধু-উৎসবে মাতি,
ঐ নবনীসম নবনীরদে হাসে নন্দন-ভাতি;
গরিমা তব অম্বরে প্রভো! কোটিজগত বন্দে—
মহিমা তব ধরণীপরে ভাসে কুসুম-গন্ধে;
তুমি গাহিছ মম অন্তরে নিতি কি মোহন ছন্দে!
নম, নিত্য-নয়ন-নন্দন, নব-সুন্দর-নর নাথ।

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণভক্তি রসকদম্ব। (১১)

অথ বংশী
সপ্তদশাঙ্গুল দীর্ঘে স্থুলাঙ্গুষ্ঠ সমান।
অষ্টরন্ধ্র সুশোভিত তারকাপ্রমাণ॥
চতুরঙ্গুল ছাড়ি মুখ রন্ধ্র অগ্রভাগে।
পশ্চাতে ত্র্যঙ্গুল ছাড়ি এই ক্রমলাগে॥
নবরন্ধ্রান্বিতা বংশী জগত মোহন।
পুন ভেদ কহি শুন বংশীর লক্ষণ॥
দশাঙ্গুল পর অষ্ট রন্ধ্র সুশোভিত।
মহানন্দা সেই বংশী মুখ রন্ধ্রযুত॥
সংমোহনী আনন্দিনী পুন তার নাম।
জগত মোহিনী বংশী গোপীকার প্রাণ॥
বংশীকা ত্রিবিধ রূপে তাহাতে গঠন।
মণিময়ী স্বর্ণময়ী বৈনবী কথন॥

অথ শৃঙ্গম্
শিঙ্গা হয়ে দ্বিধা রূপ কর অবধান।
মন্দ্র ঘোষ তথা আর গরল আখ্যান॥
মহিষের শৃঙ্গ তারে গরল কহিয়ে।
স্বর্ণ বন্ধ দুই পাশ যাহার দেখিয়ে॥
নানা রত্ন মণি বন্ধ ধাতুময়ী যাথে।
মন্দ্র ঘোষ বলিয়া আখ্যান কহি তাথে॥

অথ নূপুরম্
স্বর্ণাদি নির্ম্মিত হয় নূপুর চরণে।
নূপুরের ধ্বনি পুনঃ হয়ে উদ্দীপনে॥
কম্বু শব্দে শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খ পঞ্চজন্য হন।
দ্বারকা ভক্তের হয়ে সেহ উদ্দীপন॥

অথ পদাঙ্ক
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ রেখা ভূমিতে দর্শন।
অক্রূর দেখিয়া পথে পুলকাঙ্গ হন॥
কৃষ্ণ পদ চিহ্ন ধূলায়ে দেখিল।
অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব তাহার উপজিল॥

শ্রীদশমে
তদ্দর্শনাহ্লাদ-বিবৃদ্ধ সংভ্রমঃ।
প্রেম্ণোর্দ্ধ রোমাশ্রু কলাকুলেক্ষণঃ।
রথাদবস্কন্দ্য স তেষ্বচেষ্টত॥
প্রভো রমূন্যঙ্ঘ্রি্ণ রজাংস্যহো॥ ইতি।

অথ ক্ষেত্রম্
কৃষ্ণক্ষেত্র মথুরা দ্বারকা আদি করি।
পুরুষোত্তম ক্ষেত্রাদি যাথে হন সদা হরি॥

অথ তুলসী—
কৃষ্ণ দত্ত তুলসী গন্ধ হয় উদ্দীপন।
তুলসী সৌরভে করায় শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ॥

অথ ভক্তঃ—
কৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গ হয় পরম কারণ।
ভক্ত সঙ্গে মহাসুখ শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ॥

অথ তদ্বাসরঃ—
শ্রীকৃষ্ণ বাসর জন্মাষ্টমী আদি করি।
উদ্দীপন যত্র এই সংক্ষেপ বিচারি॥
বিভাবের মধ্যে হইল দুই নিরূপণ।
আলম্বন সূত্র তথা আর উদ্দীপন॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্য্য।
অভিরাম সুন্দরানন্দ সর্ব্বগুণ ধৈর্য্য॥
শ্রীপর্ণি গোপাল প্রভু গোপাল চরণ।
যাঁর পদে কায় মনে লইঞা শরণ।
কৃষ্ণ ভক্তি রস কদম্ব শরণ উল্লাস।

কাতরে বর্ণিল এই নয়নানন্দ দাস ॥

ইতি নবম প্রকরণ—

দশম প্রকরণ

শ্রীরামকৃষ্ণৌ জয়তাং

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য অবতার।
জয় নিত্যানন্দ প্রভু অগ্রজ তাহার ॥
গৌর ভক্ত জয় জয় সুন্দর গোপাল।
শ্রীপর্ণি গোপাল প্রভু পরম দয়াল ॥
বিভাব লক্ষণা আগে হইল লিখন,
অনুভব সূত্র পরে করহ শ্রবণ ॥

অথ অনুভাবা

শ্রীকৃষ্ণের অনুভাব হয় চিত্তগত।
বাহে বিক্রিয়ার প্রায় দেখিয়ে যেকত
ভাবনার অবরোধে যথন যেমন।
শ্রীকৃষ্ণের লীলা গুণ হয়ত স্মরণ ॥
নৃত্য গীত বিলুঠন নানা চেষ্টা দেখি।
কভু হাস্য ঘূর্ণা কভু হয় অনপেক্ষি ॥

যথা

অনুভাবাস্ত চিত্তস্থ ভাবনামব বোধ কাঃ। তেবহির্বিক্রিয়া প্রায়াঃ প্রোক্তা উদ্ভাস্বরা খ্যয়া ॥

তে যথা

নৃত্যং বিলুঠিতং গীতং ক্রোশনং তনুমোটনং
নুঙ্কারো জৃম্ভনং শ্বাস ভূমা লোকানপেক্ষিতা
লালা স্রাবোঽট্টহাসশ্চ ঘূর্ণা হিক্কাদয়োপিচ

তাহে অনুভাব পুনঃ ভেদ হয় দুই।
শীতা আর ক্ষেপণা বলিয়া পুনঃ সেই ॥

শীতাঃ স্যুর্গীতঃ জৃম্ভাদ্যা নৃত্যাদ্যা ক্ষেপণাভিধাঃ

তত্র নৃত্যং যথা

একদা শ্রীমহেশ্বর নাচে উর্দ্ধ পথে।
পরম হরিষে শিব গনেশের সাথে ॥
মুরলী বাদন মুখ শ্রীকৃষ্ণের হেরি।
আনন্দে নাচয়ে হর সকল পাসরি ॥
সঘনে গগনে হর ডুম্বুর বাজায়।
অন্তরে ভাবের চেষ্টা বাহিরে নাচায় ॥

যথা

মুরলী খুরলী সুধা কিরং
হরি বক্ত্রেন্দুমবেক্ষ্য কম্পিতঃ
গগনে সগনেশ ডিণ্ডিম
ধ্বনিভিঃ সতাণ্ডব মাশ্রিতোহরঃ ॥

বিলুঠিতং যথা

অক্রূর পথি পদাঙ্কিত মার্গ পাংশুস্থ অচেষ্টত বিলুঠিত রাগোৎ কর করম্বিতচেতা শ্রীরাধা গীতং গাবতি।

ক্রোশনং যথা

একদা নারদ শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনেন চুক্রোশ তত্তস্মাৎ দানবাঃ পলায়িতবান্ ॥

তনুমোটনং যথা

শ্রীকৃষ্ণ নাম শ্রবণে প্রাণিতে মনষি বপুরুদ্ভট মোটনং
হুঙ্কার হুঙ্কৃতিঃ ॥
জৃম্ভনং প্রসিদ্ধং ॥

শ্বাস ভূমা যথা

নিশ্বাস রূপ ঝঞ্ঝা বায়ুঃ ॥

লোকাহনপেক্ষিতা যথা ব্রজনারীণাং শ্রীকৃষ্ণে

গাঢ় ভাব নতু গুরুজন লোকাপেক্ষা
পরিষদতু জনো যথা তথায়ং।
নস্থ মুখরোহয়ম্ নবিচারয়াম॥
হরিরস মদিরা মদাতি মত্তো
ভুবি বিলুঠাম নটাম নির্বিশাম
লালাস্রাবো যথা।
কৃষ্ণপ্রেমমদ মত্তস্য জনস্য অচেষ্টস্য
মুখাৎ লালাস্রাবঃ॥
অট্টহাসো যথা।
হাসাত্তিমোহট্টহাসোহয়ং চিত্তবিক্ষেপ
সম্ভবঃ॥
ঘুর্ণা যথা মুরলীগান শ্রবনেন চেতো
ভ্রমং॥
হিক্কা যথা হরি প্রণয় বিক্রিয়া আকুল
তয়া রোদনেন হিক্কাভবৎ॥
সংক্ষেপে কহিলা অনুভাব লক্ষণা।
তারপর কহি শুন সাত্বিক বর্ণনা॥
অথ সাত্বিকাঃ॥
সাত্বিককহিতে আগে সত্বরূপ কহি।
সত্ব উৎপন্নভাব সাত্বিক বলি তহি॥
কৃষ্ণ সম্বন্ধি ভাব রয়ে সাক্ষাত ক্রমে।
কিম্বা শ্রীকৃষ্ণ ভাব কিছু ব্যবধানে॥
ভাবক্রমে চিত্ত আক্রান্ত বাথে হয়।
সত্ব বলিয়া নাম তাহাকারে কয়॥
সেই সত্বে উৎপন্ন ভাব সাত্বিক বলি
তারে।
তাহা দেখ গোসাঞের গ্রন্থ অনুসারে॥
যথা
কৃষ্ণসম্বন্ধিভিঃ সাক্ষাৎ কিঞ্চিদ্বা
ব্যবধানতঃ।

ভাবৈশ্চিত্তমিহাক্রান্তং সত্বমিত্যুচ্যতে
বুধৈঃ॥
সত্বাদস্মাৎ সমুৎপন্না যে ভাবাস্তেতু
সাত্বিকাঃ।
সাত্বিক ভাব পুন ত্রিবিধ আখ্যান।
স্নিগ্ধা দিগ্ধা রুক্ষা তথা ত্রিবিধ বিধান॥
স্নিগ্ধা দিগ্ধা স্তথা রুক্ষা ইত্যমী ত্রিবিধ
মতাঃ॥
তত্র স্নিগ্ধাঃ॥
তেদ্বিধা মুখ্যা গৌণাশ্চ তত্রমুখ্যাঃ
কৃষ্ণে সম্বন্ধঃ সাক্ষাৎ মুখ্যরত্যাক্রমণাৎ
মুখ্যাস্তে সাত্বিকাঃ॥
যথা।
কুন্দৈমু কুন্দায় মুদা সৃজন্তী
স্রজং বরং কুন্দবিড়ম্বি দন্তা।
বভুব গান্ধর্ব্ব রসেন বেণো॥
গান্ধর্ব্বিকা স্পন্দন শূন্যগাত্রী।
মুখ্যা স্তম্ভোয়ং বেদাত্রুশ্চ॥
অথ গৌণাঃ॥
শ্রীকৃষ্ণস্য সম্বন্ধ কিঞ্চিৎ ব্যবধানতঃ
গৌণভুতয়া।
রত্যা ক্রমণতঃ গৌণাস্তে সাত্বিকাঃ॥
যথা॥
স্ববিলোচন চাতকাম্বুদে
পুরিনীতে পুরুষোত্তমে পুরা।
অতি তাম্র মুখী সগদ্গদং
নৃপমাক্রোশতি গোকুলেশ্বরী॥
ইমৌ গোণৌ বৈবর্ণ্য স্বরভেদৌ॥
অথ দিগ্ধাঃ॥
মুখ্য গৌণ রতি ছাড়া চিত্ত আক্রমণে।

যে সব উপজয়ে কৃষ্ণ সম্বন্ধ বিনে ॥
যথা ॥
পুতনা আইল ব্রজে ঐছে হৈলধ্বনি।
পুত্র হেতু কম্পিতা হইলা নন্দ রাণী ॥
অত্র কম্পরত্যনুগামিত্বাদিস্কাঃ ॥
অথ রুক্ষাঃ ॥
কৃষ্ণ মাধুর্য্য লীলাদি করিয়া স্মরণে।
রোমাঞ্চাদি যদি হয় ভাব শূন্য জনে ॥
ভোগ মোক্ষাভিলাষীর যে সত্ব উদয়।
রুক্ষা সাত্বিক ভাব তাহাকারে কয় ॥
যথা ॥
জাতা ভক্তোপমে রুক্ষাঃ রতি শূন্যে জনে কচিৎ ॥
অষ্ট প্রকার হয় সাত্বিক লক্ষণা।
স্তম্ভ স্বেদ রোমাঞ্চাদি কহিয়ে লক্ষণা ॥
স্বর ভেদ বেপথু বৈবর্ণ অশ্রু প্রলয়।
এইত কহিল কৃষ্ণ সাত্বিক নির্ণয় ॥
কিরূপ এই সব ভাব দেহে উপজয়ে।
শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্য রসে চিত্তাক্রান্ত হয়ে ॥
চিত্ত যবে প্রাণ বায়ু সমাগত হয়।
সেই প্রাণ বিক্রিয়া প্রায় দেহে উপজয় ॥
তবে দেহে শূন্য হয় স্তম্ভাদিক চিহ্ন।
প্রাণের বিক্রিয়া হয় স্তম্ভাদির জন্য ॥
যথা ॥
চিত্তং সত্বীভবৎ প্রাণে ন্যস্যত্যাত্মান মুদ্ভটং।
প্রাণস্তু বিক্রিয়াং গচ্ছন্দেহং বিক্ষোভয়ত্যলং ॥
তদা স্তম্ভাদয়ো ভাবা ভক্তদেহে ভবন্ত্যমী।

তে স্তম্ভ স্বেদ রোমাঞ্চাঃ স্বর ভেদোথ বেপথুঃ ॥
বৈবর্ণ্যমশ্রু প্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্বিকাঃ স্মৃতাঃ।
পঞ্চ ভৌতিক দেহ হয়েত নির্ম্মাণ ॥
পঞ্চ ভূতগণ কহি কর অবধান।
পৃথিব্যপতেজ বায়ু আকাশাদিক্রমে ॥
দেহ নির্ম্মাণ হয় অবয়ব বিধানে।
চতুর্ব্বিংশতি তত্বসহ জীবের অধিষ্ঠান ॥
ইন্দ্রিয়গণ সহ করে বিবিধ বিধান।
পৃথিব্যপ তেজ আকাশাদি চারি স্থানে।
প্রাণ বায়ু যখন যাথে করে আলম্বনে ॥
তখন তেমতে বাহ্যে হয়ত দর্শন।
ভূমি গত প্রাণ হৈলে স্তম্ভ দেহে হন ॥
জলস্থিত প্রাণে হৈলে অশ্রুপাত হয়ে।
তেজগত হৈলে স্বেদ বৈবর্ণ্য উপজয়ে ॥
আকাশ আশ্রয় হৈলে প্রলয় উপস্থিতি।
স্বস্থানে থাকিয়া হয় ত্রিবিধ রূপ তথি ॥
রোমাঞ্চ কম্প বৈবর্ণ্য তিন উপজয়।
কনিষ্ঠ মধ্যম তীব্র রূপ তায় কয় ॥
চত্বারি ক্ষ্মাদিভূতানি প্রাণো জাত্বলম্বতে।
কদাচিৎ স্বপ্রধানঃ সন্ দেহে চরতি সর্ব্বতঃ ॥
স্তম্ভং ভূমিস্থিতঃ প্রাণস্তনোত্যশ্রু
তেজঃস্থ স্বেদবৈবর্ণ্যে প্রলয়ং বিয়দাশ্রিতঃ ॥
স্বস্থ এব ক্রমান্মন্দ মধ্যতীব্রত্ব ভেদভাক্।

রোমাঞ্চ কম্পবৈবর্ণ্যাস্তত্রত্রীণি
তনোত্যসৌ ॥

তত্রস্তম্ভঃ

হর্ষভয় আশ্চর্য্য বিষদেরোষ হৈতে।
বাক্যের রাহিত্য হয় স্তম্ভবলি তাথে ॥

যথা

স্তম্ভো হর্ষভয়াশ্চর্য্য বিষাদমর্ষসম্ভবঃ।
তত্র বাক্যাদি রাহিত্যং নৈশ্চল্য
শূন্যতাদয়ঃ ॥

তত্র ভয়াৎ স্তম্ভো যথা দেবক্যাঃ
কংসরঙ্গস্থলে মল্লযুদ্ধকালে।
শিথিলম্বিত মল্লচক্রকুন্ধং
পুরতঃ প্রাণপরার্দ্ধতঃ পরার্দ্ধং।
তনয়ং জননী সমীক্ষ্যতত্যায়নয়া হন্ত বভূব
নিশ্চলাঙ্গী ॥

ইত্যাদয়ঃ।

অথ স্বেদঃ।

হর্ষভয় ক্রোধ হৈতে স্বেদ উপজয়ে।
দেহ ক্লেদ করে ঘর্ম্ম তারে স্বেদ কহে ॥

যথা।

স্বেদোহর্ষভয়ক্রোধাদিজঃ ক্লেদকর-
স্তনৌ।

অথ রোমাঞ্চঃ।

আশ্চর্য্যদর্শন আর হর্ষ উৎসাহতে
রোমাঞ্চ জন্ময়ে তথা ত্রাসভয় হৈতে।

যথা

রোমাঞ্চোয়ং কিলাশ্চর্য্য হর্ষোৎসাহ
ভয়াদিজঃ।
রোমামভ্যূদগমস্তত্র গাত্র সংস্পর্শনা-
দয়ঃ ॥

অথ স্বরভেদঃ ॥

বিষাদ বিস্ময়রোষ হর্ষ ভয়ে জানি।
দেহের গদ্গদিকায় স্বরভেদ মানি ॥

বিস্ময়াৎ যথা ব্রহ্মা শ্রীদশমে।
শনৈরথোত্থায় বিমৃজ্য লোচনে
মুকুন্দমুদ্বীক্ষ্য বিনম্রকন্ধরঃ।
কৃতাঞ্জলিঃ প্রশ্রয়বান্ সমাহিতঃ
স বেপথু গদ্গদয়ৈলতে লয়া ॥

অথ বেপথুঃ।

বিত্রাস অমর্ষ হর্ষ জন্য কম্প হয়।
গাত্র লোলতাকৃত বেপথু নামকয় ॥

যথা

বিত্রাসাঽমর্ষহর্ষাদৈর্বেপথুর্গাত্রলৌল্যকৃৎ
ত্রাসেন যথা শ্রীমত্যা শঙ্খচূড়েন সহ
শ্রীকৃষ্ণস্য বিক্রমং দৃষ্ট্বা।
শঙ্খচূড়মধিরূঢ় বিক্রমং।
প্রেক্ষ্য বিস্তৃতভুজং জিঘৃক্ষয়া
হা ব্রজেন্দ্র তনয়েতি বাদিনী
কম্পসম্পদমধ্যত্তরাধিকা ॥

অথ বৈবর্ণ্যং।

বিষাদ আর রোষ ভয়ে বৈবর্ণ্য
আসিহয়।
মলিনাঙ্গকৃশতাদি দেহে উপজয় ॥

যথা

বিষাদরোষ ভীত্যাদেবৈবর্ণ্যং
বর্ণবিক্রিয়া।
ভাবজ্ঞৈরত্র মালিন্য কার্শ্যাদ্যাঃ
পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥
বিষাদে শ্বেতিমা শোর্য্যং কালিমা-
কচিৎ।

রোষেতু রক্তিমা ভীত্যাং কালিমা
ক্কাপি শুক্লিমা ॥

অথ অশ্রু।

হর্ষরোষ বিষাদাদ্যে নেত্রে অশ্রুপাত
নয়নমার্জ্জন রাগ হয়েত বিখ্যাত।

যথা

হর্ষরোষবিষাদাদ্যৈরশ্রুনেত্রে
জলোদ্গমঃ।

হর্ষে অশ্রুণি শীতত্বং উষ্ণত্বং রোধেন
যথা শ্রীরুক্মিনী দেবী শ্রীদশমে।

পদা সুজাতেন নখারুণ শ্রিয়া
ভুবং লিখন্ত্যাশ্রুভিরঞ্জনাসিতৈঃ
আসিঞ্চতী কুঙ্কুমরূষিতৌস্তনৌ
তস্থাবধোমুখ্যহতি দুঃখরুদ্ধবাক্ ॥

অথ প্রলয়

সুখ আর দুখ হৈতে প্রলয় উপজয়ে।
চেষ্টাজ্ঞানরহিত যাহাতে সে হয়ে ॥
ভূমিপতনাদি তাহে অনুভাবদর্শন।
তাহার কারিকাসূত্রে করহ শ্রবণ ॥

যথা

প্রলয়ঃ সুখ দুঃখাভ্যাঞ্চেষ্টাজ্ঞান
নিরাকৃতিঃ।
তত্রানুভাবাকথিতা মহীনিপতনাদয়ঃ।

তত্র সুখেন যথা

একদা শ্রীমতীরাধা সখিভিঃ সহ
পুষ্পচয়নছলেন কুঞ্জবনাৎ
শ্রীকৃষ্ণং দৃষ্টা নিশ্চলাঙ্গী বভুবা
মিলিতং হরিমালোক্যলতা
পুঞ্জাদতর্কিতং।
জ্ঞপ্তিশূন্যমনারেজে নিশ্চলাঙ্গী ব্রজাঙ্গনা।

এইত কহিল অষ্টসাত্বিক লক্ষণ।
তাহা মধ্যে কহি শুন ছোটবড় ক্রম ॥
সত্বে উৎপন্নভাব সাত্বিক তার নাম।
তারতম্য ক্রমে হয় চতুর্দ্ধা আখ্যান ॥

যথা

সত্বস্য তারতম্যাৎ প্রাণতনুক্ষোভ-তারতম্যং ভবতি অতএব সাত্বিক ভাবানাং সর্ব্বেষাং তারতম্যং ভবতি। অনেন সাত্বিকাভাবাশ্চতুর্ব্বিধাঃ। ধূমায়িতা জ্বলিতা দীপ্তা' উদ্দীপ্তাশ্চ এষাং উত্তরোত্তরঃ শ্রেষ্ঠত্বং বৃদ্ধিং যান্তি। সা বৃদ্ধিস্ত্রিধা যথা বহুকালব্যাপিত্বং বহু অঙ্গ ব্যাপিত্বং স্বরূপেণ উৎকর্ষত্বং ইতি ত্রিধা ॥

তত্রধূমায়িতা

অদ্বিতীয়া অথবা সদ্বিতীয়া ঈষদ্ব্যক্তা গোপয়িতুং শক্যা ধূমায়িতা।

অথ জ্বলিতা।

দ্বৌত্রয়ো বা একদা যুগপৎ সুপ্রকটাং দশাং যান্তঃ বহু কষ্টেন গোপয়িতুং শক্যা স্তে জ্বলিতাঃ ॥

অথ দীপ্তাঃ ॥

একদা প্রৌঢ়াং ত্রিচতুরাং পঞ্চ বা ব্যক্তিং সম্বরিতুং অশক্যাস্তে দীপ্তাঃ ॥

অথ উদ্দীপ্তাঃ।

একদা ব্যক্তিমাপন্নাঃ পঞ্চধাঃ সর্ব্ব এব বা। আরূঢ়াঃ পরমোৎকর্ষ মুদ্দীপ্তা ইতি শব্দিতাঃ ॥ মহাভাবাদৌ। উদ্দীপ্তা এব সুদীপ্তা ভবন্তি ॥ অথ সাত্বিকা ভাসা চতুর্ব্বিধাঃ ॥ রত্যাভাস-

ভবাঃ সত্বাভাসভবাঃ নিঃসত্বা প্রতীপাশ্চ ইতি যথা পূর্ব্বং অমী শ্রেষ্ঠাঃ ॥
তত্র রত্যাভাস ভবা যথা ॥
মুমুক্ষু প্রভৃতীনাং দৃশ্যতে কদাচিৎ।
অথ সত্বাভাসভবাঃ ॥
মীমাংসকমতাবলম্বিকানাং শ্রীকৃষ্ণ গুণাদি শ্রবণেন পুলকাদয়ো যে তে সত্বাভাসভবাঃ ॥
অথ নিঃসত্বাঃ।
শ্রীকৃষ্ণচরিত্রং নিশম্য নহি সুখদুঃখাদয়ো ভাবাঃ কিন্তু অনভিনিবেশাৎ অশ্রুজলং পততি ইতি নিঃসত্বাঃ ॥
অথ প্রতীপাঃ
শ্রীকৃষ্ণস্য হিতাদন্যত্র ক্রুদ্ধরাদিভিঃ প্রতীপাঃ ॥ যথা কংসস্য তথাহি
তস্য প্রস্ফুরিতৌষ্ঠস্যারক্তাধরতটস্য চ।
বক্ত্রং কংসস্যরোষেণ রক্তসূর্য্যায়তে তদা।
ইতি চতুর্ব্বিধা সত্বাভাস কথনং।
সংক্ষেপে কহিলা অষ্ট সাত্বিক লক্ষণ
সম্যক কহিবার শক্তি মোর নাহি হন ॥
শ্রীরূপের লিখন গ্রন্থ বৈষ্ণব মুখে শুনি।
তাহার আভাস কিছু ভাষাতে বাখানি ॥
শ্রীচৈতন্যপদ দ্বন্দ্ব মকরন্দ আশে।
কৃষ্ণ ভক্তিরসকদম্ব করিল প্রকাশে ॥
শ্রীমৎসুন্দরানন্দ গোপাল পদে আশ।
দশম প্রকরণ কহে নয়নানন্দ দাস ॥

একাদশ প্রকরণ ।

পীতাম্বরং কনকযষ্টিবিষাণপানিং
লীলাব্জ বেত্রজলদপ্রভমচ্যুতং তং।
গোবিন্দমিন্দুবদনং শিশুভির্ব্বয়স্যৈঃ
ক্রীড়ারতং নবকিশোর বরংনতোঽস্মি
জয় জয় শচীরতনয় দ্বিজরায়।
যাহার করুণাবলে কৃষ্ণভক্তি পায়!
নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত অভিরাম সুন্দর।
গোপাল মহান্তসহ জয় বিশ্বম্ভর ॥
স্থায়ীরতিরসরূপ সামগ্রীমেলনে
রসোপযোগ্য সামগ্রী ব্যভিচারিনামে ॥
তেত্রিশ প্রকার হন ব্যভিচারিগণ।
স্থায়ীরতি প্রতি সভে করিছে গমন ॥
বাক্য অঙ্গ জনেত্রাদি ক্রমে শূচ্যমান।
সত্বক্রমে জাতভাব হইছে বিধান ॥
নির্বেদাদিক ত্রেত্রিশ হয় ব্যভিচারী
ভাবগতি সঞ্চারিয়া বলিয়ে সঞ্চারী ॥
স্থায়ীভাব রস সিন্ধু এ সব মিলনে
উন্মজ্জ্য নিমজ্জ্য করে ব্যভিচারীগণে ।
অথোচ্যন্তে ত্রয়স্ত্রিংশদ্ভাবা যে ব্যভিচারিণঃ।
বিশেষণাভিমুখ্যেন চরন্তি স্থায়িনং প্রতি ॥
বাগঙ্গসত্বসূচ্যা যে জ্ঞেয়াস্তে ব্যভিচারিণঃ।
সঞ্চারয়ন্তি ভাবস্যগতিং সঞ্চারিণোপিতে ॥
উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি স্থায়িন্যমৃতবারিধৌ।
উর্ম্মিবদ্বর্দ্ধয়ন্ত্যেনং যান্তি তদ্রূপতাঞ্চতে
তে যথা।
নির্ব্বেদ ১ বিষাদ ২ দৈন্য ৩ গ্লানি শ্রমমদ।
গর্ব্ব শঙ্কাত্রাস তথাবেগ উন্মাদ ॥

অপস্মৃতী ব্যাধি মোহ মৃতি আলস্য আর।
জাড্য ব্রীড়া অবহিত্থা স্মৃতি পরচার।
বিতর্ক চিন্তা মতি ধৃতি হর্ষ উৎসুক।
ঔগ্র্য অমর্ষ অসূয়া চাপল্যনিদ্রাদিক॥
সুপ্তিবোধ এই হয় ব্যভিচারিগণ।
তেত্রিশ প্রকার এই কহিল বর্ণন॥

অথ তত্র নির্ব্বেদঃ।

মহার্ত্তিবিপ্রয়োগে ঈর্ষ্যাসদ্বিবেকা। দিভ্য আত্মনঃ অবমানং নির্ব্বেদঃ। ইষ্টানবাপ্তি প্রারব্ধ কার্য্যস্য অসিদ্ধি বিপত্তি অপরাধাদিভ্যঃ অনুতাপঃ। বিষাদঃ অত্র উপায় সহায় অনুসন্ধি চিন্তারোদন বিলাপ শ্বাস বৈবর্ণ্য মুখ শোষাদয়োভবন্তি।

অথ দৈন্যং

দুঃখত্রাসাপরাধাদ্যৈরনৌর্জিত্যন্ত দীনতা চাটুহম্মান্দ্য মালিন্যচিন্তাঙ্গ জড়িমাদিকৃৎ ত্রাসেন জড়িমা যথা উত্তরায়া প্রথমে।

অভি দ্রবতি বামীশশারস্তপ্তায়াসর প্রভে
কামং দহতু মাং নাথ মামে গর্ভো নিপাত্যতাং॥

অথ গ্লানিঃ।

শ্রম আধি রিত্যাদ্যৈ ওজসঃ ক্ষয়ঃ গ্লানিঃ। তত্র অঙ্গাঙ্গে জাড্য বৈবর্ণ কৃশত্বদৃক্ ভ্রমণাদয়ঃ॥ ৪

অথ শ্রমঃ

অধ্বনৃত্যরতাদ্যুত্থঃ খেদশ্রম ইতীর্য্যতে।
অত্র নিদ্রা স্বেদ সমর্দ্দ জৃম্ভাশ্বাসাদয়ঃ।

অধ্বনো যথা।

কৃষ্ণং প্রতিধাবন্তী যশোদা অতিশ্রম-যুক্তা যথা।

কৃতাগসং পুত্রমনুব্রজন্তী
ব্রজাজিরান্তব্রজরাজরাজ্ঞী।
পরিস্খলৎ কুন্তলবন্ধনেয়ং
বভূব ঘর্ম্মাম্বু করম্বিতাঙ্গী॥ ৫

৫ম বর্ষ]　　　শ্রাবণ, ১৩২২　　　[৪র্থ সংখ্যা

বীরভূমি

মাসিকপত্রিকা।

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক সম্পাদিত।

সূচীপত্র।

মূল্য বার্ষিক ডাকমাশুল সহ ২৲ দুই টাকা মাত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য [illegible] তিন আনা।

১৫ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা এই ঠিকানায় প্রবন্ধ ও টাকাকড়ি সম্পাদকের নিকট প্রেরিতব্য।

১৫নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন হইতে শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন্ন্যাসান্তে শ্রীচৈতন্য।

বীরভূমি, ৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা,
শ্রাবণ, ১৩২২।

ভিখারী ভগবান।

মন ও ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা যাহার পরিচয় পাইতেছি তাহার নাম সংসার। অনেক সময়েই ইহা আমাদিগকে ভুলাইয়া রাখে, ইহা ছাড়া যে আর কিছু আছে বা থাকিতে পারে, এ প্রকারের চিন্তাই আমাদের মনে জাগে না। কিন্তু মধ্যে মধ্যে এমন মুহূর্ত্ত আসে যখন আমরা বুঝিতে পারি যেখানে রহিয়াছি তাহা সংসার অর্থাৎ বদলাইয়া যাওয়া বা ভাঙ্গিয়া যাওয়াই ইহার স্বভাব। শোক দুঃখ প্রভৃতির ন্যায় মিত্র কেহ নাই, তাহারা আমাদিগকে জাগাইয়া দেয়। মৃত্যু পরমগুরু, আমরা সকল সময়ে তাঁহার কথা ভাবি না, তাঁহার পানে চাহি না। কিন্তু তিনি সর্ব্বদাই বজ্রগর্জ্জনে ঘোষণা করিতেছেন, ইহার নাম সংসার—ইহা থাকিবে না, ইহা চলিয়া যাইবে—সরিয়া যাওয়া বা ভাঙ্গিয়া যাওয়াই ইহার ধর্ম্ম।

শোকদুঃখে অভিভূত হইয়া মৃত্যুর শিক্ষাগ্রহণ করিয়া সংসারের প্রতি চাহিয়া দেখিলাম, পরাজয়! আমরা এই সংসারে আসিয়া পদে পদে কেবল পরাজিত হইয়াই চলিয়াছি। পরাজয় যে যাতনা! দাঁড়াইবার স্থান নাই। নিশ্চল প্রস্তর বলিয়া হাসিতে হাসিতে যেখানেই দাঁড়াইতেছি, পরক্ষণেই দেখিতেছি তাহা বালুকার স্তূপ! কালের নদী প্রচণ্ডবেগে চারিদিকে ছুটিয়াছে, তাহার একটি সামান্য তরঙ্গ আসিয়া বহুযত্ন ও বহুঅন্বেষণে প্রাপ্ত দাঁড়াইবার স্থানটি ভাঙ্গিয়া দিয়া গেল। এখন দাঁড়াই কোথায়? ভাসিতেছি, তরঙ্গের আঘাতে ইতস্ততঃ বিতাড়িত হইতেছি, আর খুঁজিতেছি, দাঁড়াইবার স্থান কোথায়? আবার একটি স্থান পাইতেছি কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় তাহাও ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। এই তো জীবন! ইন্দ্রিয়ের মোহকর বিবিধ সামগ্রী যখন মোহন সুবেশে পুরোদেশে নৃত্য করে, মন যখন অহংকার আশ্রয় করিয়া অলীক স্বপ্নে ভাসিতে থাকে, তখন এ প্রকারের ভাবনা হয় না, কিন্তু যেমন চিত্ত স্থির হইয়াছে, বাহিরের কোলাহল স্তব্ধ হইয়াছে তখনই এই সমুদয় চিন্তা আসিয়া চিত্তকে কাতর করে।

জীবন যে অপূর্ণ, এ যেন একটা ছায়া—এ যেন একটা সঙ্গীতের একটি চরণ মাত্র। ইহার আদি কোথায়, ইহার শেষ কোথায়, ইহার চিরবিশ্রামের স্থান কোথায় ?

এই সমস্ত জটিল প্রশ্ন প্রাচীন আর্য্যঋষিগণের চিত্তে সমুদিত হইয়াছিল। আমাদের মনে যে এ সকল প্রশ্ন জাগে না তাহা নহে, কিন্তু আমাদের মধ্যে এই প্রশ্ন স্থায়ী হয় না। জলবুদ্বুদের মত জাগিয়া আবার তখনই মিলাইয়া যায়। প্রশ্ন স্থায়ী হয় না বলিয়াই ইহার মীমাংসা করিবার জন্যও আমরা কোনরূপ পরিশ্রম করি না। এই সকল চরম সমস্যার শেষমীমাংসায় আরোহণ করিবার জন্য যাঁহারা প্রাণপাত করিয়া নিরন্তর পরিশ্রম করিয়াছেন, তাঁহারা তপস্বী।

জগতের এই তপস্বীগণের চরণে প্রণাম! তাঁহারা আমাদিগকে মৃত্যু হইতে অমৃতে, অনিত্য হইতে নিত্যে, মিথ্যা হইতে সত্যে লইয়া চলিতেছেন। তাঁহারা এখনও রহিয়াছেন। হাত বাড়াইয়া আমাদিগকে আগাইয়া লইয়া যাইবার জন্য, নিজেদের করুণার দীপ জ্বালিয়া আঁধারে পথ দেখাইবার জন্য, দুর্ব্বলতার সময় হৃদয়ে, মনে ও দেহে বলসঞ্চার করিবার জন্য, সংশয়াকুল চিত্তকে দৃঢ় করিবার জন্য তাঁহারা রহিয়াছেন! তাঁহাদের পদাঙ্কচিহ্নযুক্ত সুপবিত্র পথ এখনও রহিয়াছে। সেই পথে চলিয়া ধন্য হইবার জন্য ভক্তিসহকারে তাঁহাদের চরণে প্রণাম করুন।

এই তপস্বীগণের তপস্যা আমাদিগকে আত্মার সংবাদ দিয়াছে। এই আত্মার সংবাদ পাইয়া মানুষ সংসার পার হইয়াছে, অপূর্ণ জীবনকে পূর্ণ করিয়া ভোগ করিয়াছে। ইহাই আমাদের তপোবনের মন্ত্র। এই আত্মার কথা শুনিতে হইবে, শুনিয়া মনন করিতে হইবে, দৃঢ়রূপে ও পবিত্রভাবে ধ্যান ধারণা করিতে করিতে আমিই আত্মা ইহাই প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে। ইহারই নাম সনাতন পথ—এই পথ জীবনে ও সত্যে লইয়া যাইবে। মৃত্যু ও মিথ্যা হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে আর দ্বিতীয় পথ নাই।

মানবজাতির ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে, যে যুগে মানব এই পথের সংবাদ লইয়াছে, এই পথে চলিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, সেই যুগে সর্ব্বত্রই মঙ্গলের পারিজাতপুষ্প ফুটিয়া উঠিয়াছে, সমাজের মঙ্গল, পরিবারের মঙ্গল, ব্যক্তির মঙ্গল। আর এই যে মঙ্গল, ইহা প্রকৃত মঙ্গল অর্থাৎ একের

মানুষ সময়ে সময়ে এই পথের কথা ভুলিয়া যায়। এই বিস্মৃতির যুগ অধিক-দিন থাকে না, কারণ থাকিতে পারে না। এই বিস্মৃতির যুগের অবসানের মুখে এমন-সব মানুষ আসেন যাঁহারা এই পথের বহুদিনের পথিক, এ পথের সংবাদ তাঁহারা সমস্তই জানেন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে কেন্দ্র করিয়া যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহারা এই পথেরই অতি প্রচীন পথিক, তাঁহারা আসিয়া সেই সনাতন পথই আমাদিগকে দেখাইয়া গিয়াছেন।

নদীয়ার নিমাইপণ্ডিত যখন নবীন যৌবনে কাটোয়া নগরে কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাসের মন্ত্র লইয়া বিশ্বহিতকামনায় একেবারে পাগলের মত ছুটিয়া বাহির হইলেন তখন জগদ্‌গুরুর আসন লইয়া সর্ব্বপ্রথমে তিনি এই পথের কথাই প্রচার করিলেন। কথাটি নূতন নহে, শ্রীমদ্ভাগবতেই এ কথা আছে কিন্তু আমরা তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, ভুলিয়া যাওয়ার জন্য আমরা মরিতে যাইতেছিলাম, তিনি আমাদিগকে তাহা স্মরণ করাইয়া দিলেন।

"এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহদ্ভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব॥"

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণের পর এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিতে করিতে চলিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

"চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘমাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥
সন্ন্যাস করি প্রেমাবেশে চলিলা বৃন্দাবন।
রাঢ়দেশে তিনদিন করিলা ভ্রমণ॥
এই শ্লোক পড়ি প্রভু ভাবের আবেশে।
ভ্রমিতে পবিত্র কৈল সব রাঢ়দেশে॥
প্রভু কহে সাধু এই ভিক্ষুক-বচন।
মুকুন্দ সেবন ব্রত কৈল নির্দ্ধারণ॥
পরাত্মনিষ্ঠা এই সারবেশ ধারণ।
মুকুন্দ-সেবায় হয় সংসার তারণ॥
সেই বেশ কৈল, এবে বৃন্দাবনে গিয়া।
কৃষ্ণ-নিষেবণ করি নিভৃতে বসিয়া॥
এত বলি চলে প্রভু প্রেমোন্মাদের চিহ্ন।
দিক্‌ বিদিক জ্ঞান নাহি চলে রাত্রি দিন।

নিত্যানন্দ, আচার্য্যরত্ন, মুকুন্দ তিনজন ॥
প্রভু পাছে পাছে তিনে করেন গমন।
যেই যেই প্রভু দেখে, সেই সব লোক ॥
প্রেমাবেশে হরি বলে খণ্ডে দুঃখ শোক ॥
গোপবালক সব প্রভুকে দেখিয়া।
হরি হরি বলি ডাকে উচ্চ করিয়া ॥
শুনি তা'সবার নিকট গেলা গৌরহরি।
'বোল বোল' বলে সবার শিরে হস্ত ধরি ॥
তা'সবারে স্তুতি করে' তোমরা ভাগ্যবান ;
কৃতার্থ করিলে মোরে শুনাঞা হরিনাম।"

পূর্ব্বে যে শ্লোকটি উদ্ধার করা হইল তাহা শ্রীমদ্ভাগবতেরই শ্লোক। একাদশ স্কন্ধের ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়ের শ্লোক। উদ্ধবকে শ্রীভগবান এক ব্রাহ্মণের ইতিহাস বলিয়া সেই ব্রাহ্মণেরই উক্তিরূপে এই শ্লোকটী বলেন। সেই উপাখ্যানের মধ্যে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য নিহিত রহিয়াছে। এ জন্য উপাখ্যানটি জানা প্রয়োজন।

অবন্তীনগরে এক ধনবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি কদর্য্য বৃত্তি আশ্রয় করিয়া অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন,। তাহার আদৌ কোনরূপ সদ্ব্যয় ছিল না। তিনি সকলের সহিত কলহ করিতেন, সকলের অপ্রিয় আচরণ করিতেন। তাঁহার ব্যবহার এতই খারাপ ছিল যে পঞ্চযজ্ঞভাগি দেবতারা পর্য্যন্ত তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ ছিলেন।

অকস্মাৎ ব্রাহ্মণের ধননাশ আরম্ভ হইল, গৃহদাহ, দস্যুতস্করের উপদ্রব, রাজপীড়ন প্রভৃতিতে ব্রাহ্মণ একেবারে দরিদ্র হইয়া পড়িলেন। এই আকস্মিক দারিদ্র্যে ব্রাহ্মণের উপকার হইল, কারণ দারিদ্র্যের সহিত বৈরাগ্য আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ অতীতজীবনের দুষ্কর্ম্মের জন্য সরলভাবে অনুতাপ করিতে করিতে ভিক্ষুকাশ্রম অবলম্বন করিলেন। দুষ্টলোকে ব্রাহ্মণের প্রতি যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিতে লাগিল। সে অত্যাচার অনির্ব্বচনীয়। ব্রাহ্মণ ক্ষুব্ধ হইলেন না, এই সমস্ত অত্যাচার তাঁহার পরীক্ষা, এইভাবে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিতেন এই দুঃখ সমুদয় আমার ভোক্তব্য।

নায়ং জনো মে সুখদুঃখহেতুর্ন দেবতাত্মা গ্রহকর্ম্মকালাঃ।
মনঃপরং কারণমামনন্তি সংসারচক্রং পরিবর্ত্তয়েদ্যৎ ॥

এই সকল মনুষ্যলোক বা দেবতাগণ, গ্রহ, কর্ম্ম ও কাল ইহারা কেহই আমার সুখ দুঃখের হেতু নহে। যে মন সর্ব্বদা সংসার চক্রে নিয়ত ভ্রমণ করিতেছে সেই মনই ইহার হেতু।

অতএব মনকে নিগ্রহ করা প্রয়োজন। তদ্ভিন্ন সমস্তই ব্যর্থ।

"দানং স্বধর্ম্মো নিয়মোযমশ্চ শ্রুতঞ্চ কর্ম্মাণি চ সদ্ব্রতানি।
সর্ব্বে মনোনিগ্রহলক্ষণান্তাঃ পরোহি যোগো মনসঃ সমাধিঃ॥"

দান, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম, যম, নিয়ম, শ্রৌতকর্ম্ম ও ব্রতাচরণ এ সমুদয় মনের নিগ্রহের উপায়মাত্র, কিন্তু মনের যে সমাধি তাহাই পরমযোগ।

"সমাহিতং যস্য মনঃ প্রশান্তং দানাদিভিঃ কিং বদ তস্য কৃত্যং।
অসংযতং যস্য মনো বিনশ্যদ্দানাদিভিশ্চেদপরং কিমেভিঃ।

যাহার মন প্রশান্তভাবে সমাহিত হইয়াছে, দানাদি দ্বারা তাহার আর কি কার্য্য হইবে, আর যাহার আলস্যাদি দ্বারা মন অসংযত হয়, তাহার দানাদি দ্বারাই বা অপর কি কার্য্য হইবে?

এই প্রকারে ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের মন যখন সমাহিত হইল, যখন বাহিরের সংসারের তরঙ্গাঘাত হইতে তিনি আপনাকে নির্ম্মুক্ত করিলেন, তখন তিনি পরাত্মনিষ্ঠার যে সনাতন পথ তাহা প্রত্যক্ষ করিলেন এবং পূর্ব্বতন মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট এইরূপ পরমাত্মনিষ্ঠা অবলম্বন করিয়া সেই ব্রাহ্মণ এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় করিলেন যে মুকুন্দ চরণপদ্ম সেবাদ্বারা আমি এই ঘোর অন্ধকার উত্তীর্ণ হইব।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করার পর এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে তিনি যেন সেই পথ দেখিতে পাইতেছেন। ইহা কল্পনা বা অনুমান নহে। পূর্ব্বতন মহর্ষিগণ এই পথ উপদেশ করিয়াছেন ও এই পথে বিচরণ করিয়াছেন। এই পথ যে সত্য, তাহা উপলব্ধি না করিলে মানব অগ্রসর হইতে পারে না। চারিদিকের ঘাত প্রতিঘাতে সে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই পথের কথা জগৎকে উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। এই পথই বৃন্দাবনের পথ।

পথ সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলা হইল যে মনের সমাধি না হইলে বা বুদ্ধি জাগ্রত ও ক্রিয়ান্বিত না হইলে এই পথের প্রকৃত সন্ধান পাওয়া যায় না। এইজন্য আমাদের প্রার্থনা করিতে হয়—আমার দম্ভ দর্প অভিমান দূরীভূত

হউক। যিনি বিশ্বাত্মা তিনি এক ও অদ্বিতীয়; তাঁহারই কর্ম্ম তিনি করিতেছেন, আমরা যন্ত্র—কিন্তু অচেতন যন্ত্র নহি, সচেতন যন্ত্র—সচেতন ভাবে যাহা উচ্চতম ও মহত্তম বলিয়া বুঝি তাহাতে আমাদের সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিব, কিন্তু অহঙ্কারের কেন্দ্রে বদ্ধ-দৃষ্টি হইয়া থাকিব না, আমার মধ্যে সেই বিশ্বাত্মা কর্ম্মরত, তিনি আপনাকে আপনি উপলব্ধি করিতেছেন, আপনার অসীম মাধুর্য্য এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডলীলার মধ্য দিয়া আপনি আস্বাদন করিতেছেন।

আমাদের এই প্রার্থনা যে পরিমাণে সফল হইবে, অর্থাৎ এই ভাবে আমরা যে পরিমাণে প্রতিষ্ঠা লাভ করিব লীলারস সেই পরিমাণে আমরা আস্বাদন করিতে পারিব। মনে করা যাউক একটি দণ্ডের একদিকে লীলাময় ভগবান আর একদিকে অহং অভিমানী 'আমি'। এই দণ্ডটি যেন একটি খুঁটির উপর ভূপৃষ্ঠের সহিত সমান্তরালভাবে অবস্থিত। এই খুঁটির একদিক যতটা নামিবে আর একদিক ঠিক ততটা উঠিবে, যেমন তুলাদণ্ডের দণ্ড। লীলার ক্রমবিকাশে পরিদৃষ্ট হইবে যে এই 'অহংকার' ক্রমে অবনত হইতেছে আর লীলাময় তাঁহার আনন্দস্বরূপে প্রকট হইতেছেন। শ্রীবৃন্দাবনে দেখা যাইবে যে ব্রজদেবীগণের আত্মনিবেদন পূর্ণ হইয়াছে আর লীলাময়ের প্রকৃত স্বরূপ প্রকট হইয়াছে, অর্থাৎ যে দণ্ডটি যেন ভূপৃষ্ঠের সহিত সমান্তরালভাবে ছিল তাহা লম্বভাবে চিরবিশ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

লীলায় এই আনন্দভাবেরই ক্রমবিকাশ দেখা যাইবে। শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায় যে শ্রীনৃসিংহ অবতারে ভগবান প্রথম ধরা পড়িয়া গেলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে এই রহস্য বর্ণিত হইয়াছে। সে স্থানে এইরূপ বর্ণনা আছে যে নৃসিংহদেবের করাললোচন ক্রোধে দুষ্প্রেক্ষ্য হইয়াছিল এবং তিনি জিহ্বা দ্বারা আপনার বিস্তারিত বদনের প্রান্তভাগ পুনঃ পুনঃ অবলেহন করিতেছিলেন। হস্তিবধ করার পর সিংহের যেরূপ হয় সেইরূপ রক্তবিন্দুতে তাঁহার কেশর ও বদন রঞ্জিত হইয়া অরুণ বর্ণ হইল এবং অন্ত্রের মালা গলদেশে দুলিতে লাগিল।

সংরম্ভ-দুষ্প্রেক্ষ্য করাললোচনো ব্যাত্তাননান্তং বিলিহন্ স্বজিহ্বয়া।
অসৃগ্লবাক্তারুণকেশরাননো যথান্ত্রমালী দ্বিপহত্যয়া হরিঃ॥

জ্যোতিঃ তাঁহার দৃষ্টি দ্বারা তিরস্কৃত এবং সাগর সকল নিশ্বাস পবনে আহত হইয়া ক্ষুভিত হইয়াছিল, দিগহস্তিসকল নিহ্রাদশব্দে ভীত হইয়া কাতরধ্বনি করিতেছিল।

সটাবধূতা জলদা পরাপতন্ গ্রহাশ্চ তদ্দৃষ্টিবিমুষ্টরোচিষঃ।
অম্ভোধয়ঃ শ্বাসহতা বিচুক্ষুভুর্নির্হ্রাদ ভীতা দিগিভা বিচুক্রুশুঃ॥

আদিদৈত্য হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করিবার জন্য শ্রীভগবান এইরূপ বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। হিরণ্যকশিপু বিনষ্ট হওয়ার পর স্বর্গবাসী দেবগণের বিমানসমূহে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইল, দেবতারা দুন্দুভিবাদন করিতে লাগিলেন, গন্ধর্ব্বেরা গান করিতেছেন, অপ্সরাগণ আহ্লাদে নৃত্য করিতেছেন আর ব্রহ্মা, ইন্দ্র, শিব প্রভৃতি প্রধান প্রধান দেবগণ, পিতৃগণ, বিদ্যাধর, মুনি, প্রজাপতি, চারণ, বেতাল, কিন্নর প্রভৃতি সকলেই মস্তকে অঞ্জলিপুট বন্ধন করিয়া দূরে দাঁড়াইয়া নৃসিংহদেবের স্তব করিতে লাগিলেন।

কিন্তু সকলেই দূরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, নিকটে যাইবার সাহস কাহারও হইতেছে না।

সাক্ষাৎ শ্রীঃ প্রেষিতা দেবৈর্দৃষ্ট্বা তং মহদদ্ভুতং।
অদৃষ্টাশ্রুতপূর্ব্বত্বাৎ সা নোপেয়ায় শঙ্কিতা॥

দেবতারা স্বয়ং নিকটে যাইতে সাহস না হওয়ায় লক্ষ্মীদেবীকে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু এ প্রকারের রূপ পূর্ব্বে কখন দৃষ্ট বা শ্রুত না হওয়ায় ঐ মহৎ আশ্চর্য্য রূপ দর্শনে লক্ষ্মীরও অত্যন্ত ভয় হইল, তিনিও নিকটে যাইতে পারিলেন না।

তখন বেদপতি ব্রহ্মা প্রহ্লাদকে শ্রীনৃসিংহদেবের নিকটে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ব্রহ্মার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া নির্ভীক প্রহ্লাদ নিকটে উপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন।

প্রহ্লাদ যেমন নৃসিংহদেবের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন অমনি এক অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার সংঘটিত হইল। এতক্ষণ যে চক্ষুদুটিতে প্রলয়ের আগুণ ধু ধু করিয়া জ্বলিয়া চতুর্দ্দশ ভুবন প্রলয়ের বিভীষিকায় বিকম্পিত করিতেছিল, সেই চক্ষুদুটি অকস্মাৎ অতিশয় কোমল ও মধুর হইয়া উঠিল, স্নেহের অশ্রুতে চক্ষুদুটি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। যে হস্তের নখর বজ্র অপেক্ষাও সহস্রগুণে কঠোর, সেই হস্ত ও সেই নখর এখন অকস্মাৎ

ফুলের অপেক্ষাও কোমল হইয়া গেল—তাঁহার গর্জ্জনে ব্রহ্মাণ্ডকটাহ স্ফুটিত হইয়াছিল এখন তাহার পরিবর্ত্তে স্নেহময় কোমল স্বর, নৃসিংহদেব প্রহ্লাদের অঙ্গ হস্তের দ্বারা স্পর্শ করিলেন। লীলায় শ্রীভগবান এই প্রথম ধরা পড়িলেন। এইবার ভগবানের যেন পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। কিন্তু প্রহ্লাদ নারদের শিষ্য এই কথাটি ভাল করিয়া মনে রাখিতে হইবে।

শ্রুতি বলিয়াছেন "প্রিয়মুপাসীত" যিনি পরমার্থ সত্য তাঁহাকে প্রিয় বলিয়া উপাসনা করিবে। কিন্তু 'ভালবাস' বলিলেই তো ভালবাসা যায় না, লাভের বা সুবিধার সম্ভাবনা আছে বলিলেও সত্য করিয়া ভালবাসা যায় না। হৃদয়ের নীরব আলিঙ্গনের দ্বারাই প্রেমের উদ্ভব। প্রেম স্বতঃস্ফূর্ত্ত। ভগবান সম্বন্ধে প্রথমে আমরা শুনিয়াছিলাম তিনি সর্ব্বাতীত, বাক্যমনের অগোচর। সে স্থানে ত হৃদয় লইয়া যাইবারই উপায় নাই সুতরাং ভালবাসিবে কে? তাহার পর দেখা গেল তিনি কেবল বিশ্বাতীত নহেন তিনি বিশ্বানুগ। তাহার পর লীলা আরম্ভ হইল। তিনি নিকটে আসিলেন বটে, কিন্তু তিনি মোটেই আমাদের মত নহেন আমাদের সঙ্গে তাঁহার কিছুই মেলেনা সুতরাং ভালবাসার মত বা আপনার করিবার মত কিছুই সেখানে নাই। এই ভাবেই দিন চলিতেছিল, আজ নারদের শিষ্য প্রহ্লাদের নিকট ঠাকুর ধরা পড়িয়া গেলেন।

এখানে একটা কথা উঠিবে নারদের শিষ্যের নিকট ধরা পড়েন কেন? ইহার একটু ইতিহাস জানা দরকার। নারদ কোঁদলের ঠাকুর বলিয়া জগতে বিখ্যাত। ঢেঁকি তাঁহার বাহন, এই বাহনে চড়িয়া নখ বাজাইতে বাজাইতে তিনি ব্রহ্মাণ্ডে পর্য্যটন করেন। যেখানে অনেকগুলি স্ত্রীলোক একত্রে মিলিত হন, সেইখানেই নারদের গতি। নারদ গেলেই কোঁদল হয়। নারদের অবশ্য অন্যরূপ বর্ণনাও আছে। তিনি দেবদত্ত বীণায় মূর্চ্ছনা দিয়া নিত্য হরিগুণ গান করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অনুপরমাণু অমৃতায়মান করিতেছেন। যাহা হউক নারদের সঙ্গে ভগবানেরই ঝগড়া। পৌরাণিক সাহিত্যে এই ঝগড়া একটি অতি প্রধান ঘটনা।

শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধের পঞ্চম ষষ্ঠ অধ্যায়ে নারদের চরিত্রের যাহা সর্ব্বপ্রথম আবশ্যকীয় ঘটনা তাহা বর্ণিত হইয়াছে। সেখানে দেখিতে পাওয়া যায় যে পুরাণে যাহাকে যোনিজ সৃষ্টি বলে অর্থাৎ পুরুষ এবং স্ত্রী মিলিত হইয়া পুত্রাদি উৎপাদন করিয়া ব্রহ্মার সৃষ্টি প্রবাহ রক্ষা করিবে, নারদ ইহার

বিরোধী। মানুষ সংসারী হইবে, সমাজ গড়িবে, জীবনসংগ্রামে আত্মহারা হইয়া আঁধারে আঁধারে বহু জন্ম পর্য্যটন করিবে, নারদ ইহার বিরোধী। নারদ চাহেন ভগবানের স্বরূপের পরমানন্দরস সকল হৃদয়ে অব্যাহতভাবে নিত্য তরঙ্গায়িত হউক এবং সকলে তাঁহার ন্যায় একমাত্র ভগবানকে আশ্রয় করিয়া থাকুক। নারদের এই মত একালের পাশ্চাত্যদেশের কোন কোন পণ্ডিতও বোধ হয় কখন কখন প্রচার করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের আলোচনায় দেখা যায় যে ভাগবতের মতে এই মত ঠিক নহে।

দক্ষ প্রজাপতির উপর ভার পড়িয়াছে, মিথুন-সৃষ্টির ব্যবস্থা করিবার জন্য। দক্ষ প্রজাপতির অযুত পুত্র, তাহাদের নাম হর্য্যশ্ব। প্রজাপতি তাহাদের উপর এই সৃষ্টি কার্য্যের ভার দিলেন। তাঁহারাও প্রজাসৃজন কামনায় তীব্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এমন সময়ে একদিন নারদ তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত। নারদ তাঁহাদের কয়েকটি বড়ই কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

উবাচ চাথ হর্য্যশ্বাঃ কথং স্রক্ষ্যথ বৈ প্রজাঃ।
অদৃষ্ট্বান্তং ভুবো যূয়ং বালিশা বত পালকাঃ॥
তথৈকপুরুষং রাষ্ট্রং বিলং বা দৃষ্টনির্গমং।
বহুরূপং স্ত্রিয়ঞ্চাপি পুমাংসং পুংশ্চলীপতিং॥
নদীমুভয়তোবাহাং পঞ্চপঞ্চাদ্ভুতং গৃহং।
ক্বচিদ্ধংসং চিত্রকথং ক্ষৌরপব্যং স্বয়ং ভ্রমি॥
কথং স্বপিতুরাদেশমবিদ্বাংসো বিপশ্চিতঃ।
অনুরূপমবিজ্ঞায় অহো সর্গং করিষ্যথ॥"

নারদ বলিলেন অহে হর্য্যশ্বগণ তোমরা মূর্খ! তোমরা পৃথিবীর পালক হইবে, প্রজা সৃষ্টি করিবে, তোমরা কি ভূমির অন্ত দেখিয়াছ? যেখানে একমাত্র পুরুষ সেই রাজা, যেখান হইতে কাহাকেও নির্গত হইতে দেখা যায় নাই সেই বিল, যাহার বহুরূপ সেই স্ত্রী, যিনি পুংশ্চলীর পতি সেই পুরুষ, সেই নদী যাহা উভয় দিকে বহিতেছে, সেই গৃহ যাহা পঞ্চবিংশতি পদার্থদ্বারা অতিশয় অদ্ভুত, সেই হংস যাহা চিত্রধ্বনিযুক্ত, সেই বস্তু যাহা স্বতন্ত্র, ভ্রমণশীল ও বজ্রদ্বারা নির্ম্মিত—এই সমুদয় না জানিয়া কিরূপে সৃষ্টি করিবে? তোমাদের পিতা সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার অনুরূপ কি, তাহাও বিশেষরূপে জানা উচিত—তাহা না জানিয়া সৃষ্টিকার্য্যে অগ্রসর হওয়া কোন মতেই সঙ্গত নহে।

নারদের এই সমুদয় প্রশ্নে হর্য্যশ্বগণের 'মাথা খারাপ' হইয়া গেল, বিশ্বের রহস্যময় মৌলিক প্রশ্ন সমূহের সমাধানের জন্য তাঁহারা ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা বলিলেন 'ভূমির অন্ত না জানিয়া' এই যে কথা বলিলেন ইহার অর্থ এই যে ঈশ্বর একমাত্র সাক্ষী, তাঁহার অন্য আশ্রয় নাই, নিজেই নিজের আধার, সেই অভব অর্থাৎ নিত্যমুক্ত ঈশ্বরকে না জানিয়া ও তাঁহাতে চিত্ত সমর্পণ না করিয়া বৃথা কর্ম্ম করিলে কি ফল হইবে? যে বিলের কথা বলিলেন তাহা পরমজ্যোতি স্বরূপ ব্রহ্ম, তাঁহাকে না জানিয়া বৃথা নশ্বর স্বর্গ-সাধন কর্ম্মসকল করিলে তাহাতে কি ফললাভ হইবে? "বহুরূপা স্ত্রী" আমাদের মোহকারিণী বুদ্ধি, যাহা রজঃ প্রভৃতি নানাগুণে সমন্বিতা—যে মানব ঐবুদ্ধির অন্ত না পায়, তাহার অশান্ত কর্ম্মসকল দ্বারা কি ফল হইবে? "পুংশ্চলীর পতি পুরুষ" মায়াসঙ্গী, ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট জীব। সৃষ্টি ও প্রলয়কারিণী মায়া—সেই নদী বাহা উভয়দিকেই বহিতেছে। পঞ্চবিংশতি পদার্থে নির্ম্মিত গৃহ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের আশ্চর্য্য আশ্রয় অন্তর্যামী পুরুষ, তিনি কার্য্যকারণ সংঘাতের অধিষ্ঠাতা, তাঁহাকে যে পুরুষ না জানে তাহার স্বাতন্ত্র্য-কৃত কর্ম্ম সকল নিষ্ফল। বিচিত্র কথাযুক্ত হংস—ঈশ্বরপ্রতিপাদক শাস্ত্র। ক্ষুর ও বজ্রাদি দ্বারা নির্ম্মিত যে স্বয়ং ভ্রমণশীল বস্তুর কথা বলিয়াছেন তাহা সুতীক্ষ্ণ কালচক্র—সেই কালচক্রের বিষয় অবগত না হইয়া অসৎ কাম্য কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করিলে কি ফল হইবে?

এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া হর্য্যশ্বগণ নারদের শিষ্য হইলেন এবং প্রজা সৃষ্টির কার্য্য অর্থাৎ সংসার ও সমাজপ্রতিষ্ঠার কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সেই পথে প্রস্থান করিলেন যথা হইতে পুনরাবৃত্তি হয় না।

দক্ষপ্রজাপতি নারদের নিকটেই সংবাদ পাইলেন ও অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তাঁহার মনে প্রজাসৃষ্টির জন্য ঔৎসুক্য প্রবল ভাবেই ছিল তিনি সবলাশ্ব নামক সহস্র সংখ্যক পুত্র উৎপন্ন করিলেন। এই পুত্রগণ পিতার আদেশে প্রজাসৃষ্টি করিবার জন্য ব্রতধারণ পূর্ব্বক নারায়ণসরোবরে গমন করিলেন ও শুদ্ধ চিত্তে তপস্যা করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে নারদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন তিনি হর্য্যশ্বগণের ন্যায় সবলাশ্বগণের চিত্তেও বৈরাগ্যভাব জাগাইয়া দিলেন।

ইহার পর নারদের অভিশাপ। দক্ষপ্রজাপতি শোকে জ্ঞানশূন্য হইলেন, নারদকে নানারূপ তিরস্কার করিয়া এই অভিশাপ দিলেন

"ত্বত্কৃন্তন যন্নস্ত্বমভদ্রমচরঃ পুনঃ।
তস্মাল্লোকেষু তে মূঢ় ন ভবেদ্ভ্রমতঃ পদং॥

তুমি সন্তানচ্ছেদক, আমাদের পুত্রগণকে স্থানভ্রষ্ট করিয়া আমাদের অভদ্রাচরণ করিয়াছ, তজ্জন্য লোকমধ্যে কুত্রাপি স্থান প্রাপ্ত হইবে না।

নারদের ত্রিলোকে স্থান নাই। সৃষ্টিচক্র ঘুরিতে লাগিল, তত্ত্বজ্ঞানহীন জীবকুল মায়াচ্ছন্ন হইয়া ভ্রমণ করিতেছে। নারদের কিন্তু নৈরাশ্য নাই। নারদ যেন ভগবানকে বলিলেন তুমি ভগবান্, তোমার সুস্পষ্ট অনুভূতি হইতে জীব-গণকে বিচ্যুত করিয়া আপনার স্বরূপ গোপন করিয়া রাজরাজেশ্বর হইয়া যজ্ঞের অগ্রভাগ গ্রহণ করিতেছ। জগৎ তোমায় চেনে না, কিন্তু আমি জানি তুমি ভিখারীর রাজা, তুমি পরম ভিখারী! তুমি ভক্তের দ্বারে দ্বারে প্রেমবিন্দু ভিক্ষা করিয়া ঘুরিয়া বেড়াও। নারদ এখন প্রতিজ্ঞা করিলেন ভগবানকে ধরিয়া দিব। সৃষ্টির প্রবাহ রুদ্ধ হইবার নহে, এই সংসারকে উপেক্ষা করিয়া বা অস্বীকার করিয়া নহে, ইহাকে স্বীকার করিয়া ইহারই মধ্যে ভগবানের স্বরূপের যে ভিখারীভাব তাহা প্রতিষ্ঠা করিব। ইহাই নারদের প্রতিজ্ঞা।

প্রহ্লাদ যখন মাতৃগর্ভে, তখন ইন্দ্র, হিরণ্যকশিপু তপস্যা করিতে যাওয়ায় সুবিধা পাইয়া, তাঁহার পুরী আক্রমণ করেন এবং প্রহ্লাদের মাতাকেও বন্দিনী করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। নারদ আসিয়া ইন্দ্রকে তিরস্কার করেন এবং প্রহ্লাদের মাতাকে আপনার আশ্রমে রাখেন। নারদ যোগবলে দৈব সহস্র বৎসর প্রহ্লাদকে গর্ভমধ্যে রাখিয়াছিলেন, প্রসব হয় নাই কারণ সন্তান প্রসূত হইলে ইন্দ্র অনিষ্ট করিতে পারেন। এই দৈব সহস্র বৎসর কাল নারদ প্রহ্লাদকে ভক্তির উপদেশ করেন। নারদের শিষ্য প্রহ্লাদ, প্রহ্লাদের নিকটেই ভগবান প্রথম ধরা পড়িয়া গেলেন।

নারদ শুদ্ধাভক্তির প্রচারক, শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের রচনাও নারদের প্রেরণাতেই হইয়াছে, এই শুদ্ধাভক্তির দ্বারাই ভগবানের স্বরূপ ধরা পড়িয়া যায় অন্য উপায়ে নহে।

নৃসিংহ অবতারে ভগবান প্রথম ধরা পড়েন। তাহার পর একটা ঘোষণা পড়িয়া গেল। সেই ঘোষণা এই। আমরা ভাবিতাম ভগবান কোন অংশেই আমাদের মত নহেন। তিনি কেবল বজ্রের মত কঠিন, এখন দেখা গেল শুধু তাই নহে তিনি আবার ফুলের মত কোমল। তাহা হইলে বোধ হয় ভগবানের সহিত আমাদের মিলিতে পারে। কারণ আমরা যে

ভিখারী। আমাদের চৈতন্তের যাহা মূল তাহার সফলতা, সার্থকতা ও পূর্ণতা যদি তাহাতে থাকে তবেই তো তাঁহার সহিত আমাদের প্রেমের সম্বন্ধ হইতে পার নতুবা অসম্ভব।

ভগবান ধরা পড়িয়া যাওয়ার পর ভাবিলেন, আবার যদি বড়লোক হইয়া যাই তাহা হইলে লোকে গায়ে ধূলি দিবে। এইবার বামন রূপে আবির্ভাব! কশ্যপের উপদেশে অদিতি যখন পয়োব্রত অবলম্বন করিয়া ভগবানের পূজা করিতেছেন, তখন ভগবান আসিলেন—চতুর্ভুজে শঙ্খচক্র-গদাপদ্ম লইয়া নবীন নীরদশ্যাম শ্রীভগবান আসিলেন। ভগবান বলিলেন "আমি তোমার পুত্র হইয়া আসিব।" অদিতি ভাবিলেন তুমি পুত্র হইয়া আসিলে আমার লাভ কি? আমি তো পুত্রের মত তোমাকে ভাল বাসিতে পারিব না, তোমার যে রূপ দেখিলেই প্রণাম করিতে ইচ্ছা হইবে! ভগবান বলিলেন আমি এমনভাবে আসিব যে তুমি আমায় ঠিক পুত্রের মত ভাল বাসিতে পারিবে।

ভগবান্ বামনরূপে আসিলেন। বামনদেবের উপনয়ন শ্রীমদ্ভাগবতের একটি বড় ঘটনা। ভাগবতে নাই কিন্তু অন্যত্র আছে যে নারদ ত্রিলোকের সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন এবং ভগবানের এই ভিখারীভাব দেখাইয়াছিলেন। ভিখারীভাবই যে ভগবানের স্বরূপ! তাহার পরেই দেখিতে পাই বামনমূর্ত্তি ভগবান ভিক্ষায় চলিয়াছেন। বড় কঠিন স্থানে ভিক্ষায় চলিয়াছেন। প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন, বিরোচনের পুত্র বলি। বলি বৃহৎযজ্ঞ করিয়াছেন তাহার নাম বিশ্বজিৎ। ভিখারীর বেশে ভগবান উপস্থিত। ত্রিপাদভূমি ভিক্ষা করিলেন। বলি তাহা দিলেন। অনেকে নিষেধ করিলেন কিন্তু বলি তাহা শুনিলেন না। তখন ভগবান দুইপদে বলির সমুদয় রাজ্য গ্রহণ করিলেন। ভগবান বলিলেন, এখন তৃতীয় চরণ রাখি কোথায়? বলি বলিলেন তৃতীয় চরণ আমার মস্তকে রাখুন।

ভগবান এই যে ভিক্ষা করিলেন ইহাতে তাঁহার কি লাভ হইল তাহাই ভাবিবার কথা। ত্রিলোকের রাজ্য তো ইন্দ্র পাইলেন, তাঁহার লাভ এই হইল যে তিনি বলির দ্বারে চিরদিনের মত দ্বারীভাবে বন্দী হইয়া থাকিয়া গেলেন। এ বড় মন্দ কথা নয়। প্রথমে এমন ভাবে আসিতেন যেন মোটেই আমাদের মত নহেন, শেষে প্রহ্লাদের নিকট ধরা পড়িয়া ভিক্ষা আরম্ভ হইল। গৃহস্থের দ্বারে আসিয়া বলিলেন "ওগো আমি ভিখারী,

আমায় ভিক্ষা দাও” গৃহস্থ ভিক্ষার থালা হস্তে আসিয়া বলিল “এই ধর, ভিক্ষা লও” ভিক্ষার থালা পড়িয়া থাকিল তিনি বলিলেন “ওগো তুমি আমাকেই তবে লও।” এই বলিয়া ভিখারী আত্মদান করিলেন।

ইহার পর ভগবান যে দুই মূর্ত্তিতে আসিলেন তাহার একটিতে ঐশ্বর্য্য-বলদৃপ্ত ক্ষত্রিয়ের বিনাশ—দ্বিতীয়টিতে ঐশ্বর্য্যে মাধুর্য্যে মিলন—একাধারে রাজাও ভিখারী। তাহার পর বৃন্দাবন লীলা—এই বৃন্দাবনে ভিখারী-ভাবের পরিপূর্ণতা।

মন সংযত হউক, হৃদয় নির্ম্মল হউক, অহঙ্কার দূরীভূত হউক ; সংসার ছাড়িয়া নহে সংসারের অশ্রুতে ভাসিয়া সংসার-সংগ্রামে ক্ষত ও বিক্ষত হইয়া আমরা সেই বৃন্দাবনপুরন্দর, ভিখারী ভগবানের সাক্ষাৎ পাইব।

শ্রীভগবানের এই ভিখারীভাবই মূল ও প্রধান ভাব। আমরা তাহা প্রথমে ধারণা করিতে পারি না, তাঁহার ঐশ্বর্য্যভাবই আমরা বুঝিতে পারি। শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীনন্দনন্দনকে ভগবান বলিয়া ধারণা করা বড় কঠিন, কারণ জগৎ ঐশ্বর্য্যের উপাসক। কিন্তু ঐশ্বর্য্যে ভগবানের স্বরূপের প্রকাশ হয় না, মানুষও ঐশ্বর্য্য উপাসনায় আপনার জীবনের শেষ চরিতার্থতা প্রাপ্ত হয় না। বৃন্দাবনের লীলা বাহির হইতে দেখিলে অবশ্য ঐশ্বর্য্যের অন্ত নাই। পূতনাবধ, অঘাসুর, বকাসুর, বৎসাসুর বধ, গোবর্দ্ধন ধারণ প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ—কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনের যাহা প্রাণ তাহার অভিব্যক্তি এই সমস্ত লীলা নহে। সাধারণ বহির্ম্মুখ মানব এই সমস্ত অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক ঘটনার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা অনুভব করে কিন্তু তাহারা ভাগবতধর্ম্মের তত্ত্ব জানে না এবং মানবাত্মার প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা ও তাহার পরিতৃপ্তি কি তাহাও জানে না।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশানুযায়ী যাঁহারা শ্রীবৃন্দাবনলীলা উপলব্ধি করেন তাঁহাদের এই মত যে শ্রীকৃষ্ণ অসুর সংহার করেন না। “বিষ্ণুদ্বারে কৃষ্ণকরে অসুর সংহারে” বিষ্ণু ভগবানের একটি বিশেষ প্রকাশ, বিশ্বপালন তাঁহার উদ্দেশ্য—এখানে ভগবানের স্বরূপে প্রকাশ নাই—এখানে অর্থাৎ বিষ্ণুতে তাঁহার যেন একটি আত্মকৃত বা স্বেচ্ছাকৃত সীমাবদ্ধতা (Self-imposed limitation) আছে। যেমন একজন মানুষ বন্ধুগণ সঙ্গে যখন আমোদআহ্লাদ করে অথবা স্ত্রীপুত্র লইয়া প্রেমের সংসার পাতিয়া জীবনের

আবার যখন কর্ম্মক্ষেত্রে যাইয়া বিচারাসনে উপবেশন করে, তখন তাহার আর একভাব প্রকাশিত হয়। তখন তাহার প্রাণ যদি হাসিতেও চায় তাহা হইলে তাহাকে জোর করিয়া এই হাসি চাপা দিয়া গম্ভীরভাবে বিচারকার্য্য চালাইতে হইবে। ইহারই নাম স্বেচ্ছাকৃত সীমাবদ্ধতা।

বিশ্বের ও মানবের অসংখ্য প্রয়োজনের মধ্যে আমরা ভগবানকে দেখিতে শিখিয়াছি বলিয়া তাঁহার স্বরূপের মাধুর্য্যলীলা আস্বাদন করিতে পারি না—এই জন্যই শ্রীবৃন্দাবনের অনেক ব্যাপার আমাদিগের দুর্ব্বোধ্য হয়।

জগতের দিক হইতে ভগবানকে দেখা আর ভগবানের দিক হইতে জগৎকে দেখা, এ দুইয়ের মধ্যে অনেক তফাৎ। 'ভগবানের দিক হইতে যে জগৎ দেখা' তাহাতে জগৎ নিতান্ত গৌণ হইয়া পড়ে। ইহারই নাম ভগবানের স্বরূপ দেখা। স্বরূপ দেখাকে As He is in His own nature বলা যায় আর জগতের দিক হইতে দেখাকে As He seems to us when inferred from the manifested universe of ours বলা যায়। শ্রীবৃন্দাবনতত্ত্ব ও তাহার উপসংহার শ্রীচৈতন্যলীলা আমাদের এই 'গৌড়-মণ্ডলভূমি'র ভক্ত আচার্য্যগণের মতানুযায়ী বুঝিতে হইলে শ্রীভগবানকে তাঁহার স্বরূপে দেখিতে হইবে। এই স্বরূপে দেখার অভ্যাস না থাকিলে কিছুতেই শ্রীবৃন্দাবন-রহস্য হৃদয়ঙ্গম হইবে না।

স্বরূপে যাঁহারা শ্রীভগবানের আনন্দভাব ধারণার চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারাই শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহার ভিখারীভাবের পরিপূর্ণতা দেখিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনেও যেন এই ভিখারীভাব কিছু গোপন ছিল, সেই জন্য শ্রীনবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা।

শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুকে ভক্তগণ 'স্বয়ং ভগবান' বলিয়াছেন। 'ভগবান' ও 'স্বয়ং ভগবান' এই দুইয়ের মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে। স্বরূপে দর্শন করিলেই স্বয়ং ভগবানকে পাওয়া যায়। ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গকান্তি, পরমাত্মা যাঁহার অংশবিভব তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যে পূর্ণ ভগবান—আর শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সেই স্বয়ং ভগবান!

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে যাঁহারা ভগবান বলিলেন তাঁহারা ভগবানকে কোথায় কি ভাবে দেখিলেন—আজ জগৎ যদি তাহা চিন্তা করিতে পারিত, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তেই জগতের যুদ্ধকোলাহল, জীবনসংগ্রামের ভীষণ ও তীব্র প্রতিযোগীতা থামিয়া যাইত। আমরা দেখিতাম ভগবান আমাদের

দুয়ারে ভিখারীর বেশে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, অশ্রুসজল নেত্রে পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার এই ভাব প্রত্যক্ষ করিলে আর কি কেহ শক্তি লইয়া ঘরে বসিয়া স্বার্থসাধন করিতে পারিত? শক্তির কি অপব্যবহার হইত? তাহা হইলে প্রত্যেক বলবানের বল দুর্ব্বলকে সবলতায় উন্নীত করিবার জন্য নিযুক্ত হইত—জ্ঞানী অজ্ঞানের কুটিরে কুটিরে ঘুরিয়া ডাকিয়া বলিতেন তুমি আমার সেবা গ্রহণ কর, নতুবা আমার জীবন বিফল হইয়া যাইতেছে, ধনী ধন লইয়া দরিদ্রের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া 'সেবা-লও' বলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। মানবের হৃদয়ের অন্ধকার দূরীভূত হইলে মানব স্বয়ং ভগবানকে ভিখারীর বেশে দেখিতে পায়।

ভিখারী-ভাবের মধ্য দিয়া শ্রীবৃন্দাবনলীলার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে ইহা আমরা জানিতাম না। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে দেখিয়া এই রহস্য আমরা উপলব্ধি করিলাম। কেবল যে ভগবান ভিখারী তাহা নহে, যাঁহারা ভগবানের স্বগণ তাঁহারা সকলেই ভিখারী। আবার তাঁহাদের ভিক্ষাও এক আশ্চর্য্য ব্যাপার, বামনদেবের ভিক্ষার মত—ভিক্ষা দিতে কেহ অগ্রসর হইলে নিজেকেই ভিক্ষা দিয়া ফেলেন। বৃন্দাবনে ঠিক তাহাই হইয়াছিল—ব্রজগোপীগণের নিকট তিনি ঋণী হইয়াছিলেন। গোপীকাগণ দৃশ্যতঃ অনেক হইলেও তাঁহারা শ্রীরাধার গণ। শ্রীমতী রাধিকার নিকট ভগবান ঋণী হইয়াছিলেন, সেই ঋণ পরিশোধের জন্যই তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গরূপে আবির্ভাব, ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য্যগণের অভিমত, লীলায় তিনি কি প্রকারে ঋণী হইলেন তাহা আমাদিগকে দেখিতে হইবে, তাহা হইলে নদীয়ার শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় অতীতকালের যাবতীয় লীলা কি প্রকারে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা আমরা বুঝিতে পারিব।

পূর্ব্বে বলা হইল যে আনন্দময় পরমপুরুষকে তাঁহার স্বরূপে উপলব্ধির চেষ্টার দ্বারাই শ্রীবৃন্দাবনলীলা বুঝিতে পারা যাইবে। এইভাবে লীলার স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে যখন শ্রীবৃন্দাবনে আসা গেল তখন দেখি ভগবান যেন মানুষকে হাতে চাপিয়া ধরিয়াছেন। মানুষ তো ভগবানের দিকে চাহিবে না, কারণ তাহার ভয় পাছে ভগবানের দিকে চাহিলে তাহার বড়সাধের সংসারস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়। কাজেই সে চোক বুঁজিয়া হাত ছাড়াইয়া পলাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে।

শ্রীবৃন্দাবনে দেখা গেল যে সাধারণজ্ঞানে আমরা যাহাকে ভগবৎ-

প্রাপ্তির বিরোধী ও সংসার বন্ধনের হেতু বলিয়া বিবেচনা করি এখানে তাহাই ভগবানকে আস্বাদন করিবার উপায়। তাহারই মধ্য দিয়া ভগবান ভক্তের হইয়াছেন। নাম আর রূপ এই দুই ভববন্ধনের প্রধান রজ্জু। আর শ্রীবৃন্দাবনলীলায় এই দুই তাঁহাকে পাইবার উপায়—তবে নাম জগন্মঙ্গল হরিনাম আর রূপ শ্যামসুন্দর মদনমোহন রূপ।

এই জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের প্রথম অধ্যায় শ্রীবৃন্দাবনলীলার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ বলা হইয়াছে

"স্বমূর্ত্ত্যা লোক-লাবণ্যনির্ম্মুক্ত্যা লোচনং নৃণাং।
গীর্ভিস্তাঃ স্মরতাং চিত্তং পদৈস্তানীক্ষতাং ক্রিয়াঃ॥
আচ্ছীর্য্য কীর্ত্তিং সুশ্লোকাং বিতত্যহ্যঞ্জসা নু কৌ।
তমোঽনয়া তরিষ্যন্তীত্যগাৎ স্বং পদমীশ্বরঃ॥

এই শ্লোক দুইটিতে ভগবান কিজন্য আসিয়াছিলেন তাহাই বলা হইতেছে। তাঁহার মূর্ত্তি লোকলাবণ্যনির্ম্মুক্তিকর। শ্রীধরস্বামী তাঁহার টীকায় এই নির্ম্মুক্তি পদটির দুইরূপ অর্থ করিলেন। এক অর্থ করিলেন "লোকানাং লাবণ্যস্য নির্ম্মুক্তিস্ত্যাগো যয়া যামপেক্ষ্য লোকেষু লাবণ্যং নাস্তীত্যর্থঃ। যদ্বা লোকেভ্যো লাবণ্যস্য নির্ম্মুক্তির্দানং যতঃ যৎসংপর্কেণ লোকা লাবণ্যবন্তো ভবন্তি॥" অর্থাৎ যেরূপ দেখিলে আর অন্য কোন বস্তুর রূপ রূপ বলিয়া মনেই হইবে না, আর জগতে যে রূপ রহিয়াছে তাহা তাঁহারই রূপের সম্পর্কে। এইরূপ ভগবানের রূপ। এই রূপের দ্বারা তিনি মানবের নয়ন আকর্ষণ করিলেন, নিজের বাক্যের দ্বারা স্মরণকারীর চিত্ত হরণ করিলেন, নিজের পাদপদ্মের দ্বারা মানবের সংসার গমনাদি ক্রিয়া নিবৃত্ত করিলেন এবং পৃথিবীময় শোভন কীর্ত্তি বিস্তার করিলেন। এই সকল করার পর তিনি ভাবিলেন নিশ্চয় ইহার দ্বারা লোকে পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে গমন করিলেন। এই শ্লোকই বিশেষরূপে আলোচ্য। শ্রীকৃষ্ণলীলার তাৎপর্য্য এই শ্লোকের আশ্রয়ে আলোচনা করিলে ভিখারী ভগবানকে বুঝিতে পারা যাইবে।

খিদিরপুরের ইতিবৃত্ত।

"বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী তাহাকেই লিখিতে হইবে। মা যদি মরিয়া যান, তবে মার গল্প করিতে কত আনন্দ! আর এই আমাদের সর্ব্বসাধারণের জন্মভূমি বাঙ্গালাদেশ, ইহার গল্প করিতে কি আমাদিগের আনন্দ নাই? আইস আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি। যাহার যতদূর সাধ্য সে ততটুকু করুক।"

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের এই মহাবাণী হৃদয়ে জাগাইয়া আমরা আমাদের জন্মভূমি এই খিদিরপুর উপনগরের অতীত ও বর্ত্তমান কথা লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াসী হইয়াছি। কারণ নিয়তির নির্ম্মম বিধানে নিয়তই খিদিরপুরের অঙ্গহানি হইতেছে। নিত্য পরিবর্ত্তনের ভ্রূকুটি সহ্য করিয়া কবে আমাদের এই প্রিয় জন্মভূমিটী হয়ত আপনার অস্তিত্বও হারাইয়া ফেলিবে। উত্তর কালের মানব ইহার কথা জানিবে না, শুনিবে না, পাছে এই শোচনীয় পরিণাম ঘটে তাই আমাদের এই আকাঙ্ক্ষা।

কিন্তু কার্য্যটী অতি গুরু। যে শক্তি ও অভিজ্ঞতা লইয়া কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছি তাহাও অতি সামান্ত। হইলে কি হয়, সাফল্য লাভের ভরসা হৃদয়ে পোষণ করি না। আশা এই, আরব্ধ কার্য্যে ভ্রম প্রমাদ দর্শন করিয়া যদি কোনও মহাত্মার হৃদয়ে আগ্রহ জাগিয়া উঠে তাহা হইলেই এ প্রিয়ভূমির একটী কাহিনী স্থায়ী হইয়া যাইতে পারিবে। ইহার স্মৃতিও জাগ্রত থাকিবে। ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা কখনও কখনও তাহাদের পিতা পিতামহের অধ্যুষিত স্থানের কথা আলোচনা করিয়া আনন্দলাভ করিবে।

স্মরণের অতীত কালে খিদিরপুর মৃগব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ সঙ্কুল গহন সুন্দরবনের কোনও অংশভাবে অবস্থিত ছিল অথবা মকর-কুম্ভীর-সমন্বিত জলধির গর্ভে নিমজ্জিত ছিল, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। এবম্বিধ জটিল প্রশ্নের সঠিকরূপে সমাধানভার প্রত্নতত্ত্ববিদগণের উপর। ইতিহাস নির্ব্বাক হইলেও কূপ, সরোবরাদি খননের কালে ভূগর্ভে স্থানে স্থানে নৌকার অংশ বিশেষ প্রাপ্ত হওয়ায় মনে হয় যে কোনও দূর অতীতে খিদিরপুর আখ্য এই ভূমিখণ্ড গঙ্গার

* খিদিরপুর সাহিত্য-সমিতির বাৎসরিক অধিবেশনে পঠিত।

গর্ভেই অবস্থিত ছিল। আনুমানিক পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে খিদিরপুরের অধিকাংশই হোগলবন ও বেতবনরূপে দৃষ্ট হইত। তাহারই মধ্যে মধ্যে দুই চারি স্থলে ধীবর, মোলো, কাওরা, মুচি, ডোম প্রভৃতি নিম্ন জাতীয়গণ মাত্র কতিপয় পর্ণকুটীর রচনা করিয়া বসবাস করিত।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে পর্তুগীজেরা সর্ব্বপ্রথমে বাণিজ্য ব্যপদেশে বাঙ্গালাদেশে আগমন করে। উক্ত শতাব্দীরই মধ্যভাগে তাহাদের বাণিজ্য-পোতসমূহ "সাতিগাঁও" অর্থাৎ সপ্তগ্রামের সহিত ব্যবসায়ের জন্য খিদিরপুরের দক্ষিণপ্রান্তে গার্ডেনরিচে আসিয়া অবস্থান করিত; জলের অগভীরতার জন্য অগ্রসর হইতে পারিত না। এই কারণে গার্ডেনরিচের পরপারস্থ বেতড়নামক স্থানটী অবিলম্বে ব্যবসায়-কেন্দ্র হইয়া উঠিল। কালের কুটিল গতিতে সরস্বতী নদীর গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায় হৃতবাণিজ্য সপ্তগ্রামের শেঠ ও বসাকবংশীয় বণিকগণ ব্যবসায়ের জন্য খিদিরপুরের পরপারে আদিগঙ্গা-তীরস্থ গোবিন্দপুর নামক গ্রাম স্থাপন করিয়া সেইস্থানে বাস করিতে লাগিলেন। এই অধ্যবসায়ী বণিকগণ দ্বারাই অল্পকালের মধ্যে সুতানুটীর হাট স্থাপিত হইল এবং তাহা হইতেই ক্রমে ভবিষ্যৎ কলিকাতার ও সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের এই খিদিরপুরের অবস্থার উন্নতির সূত্রপাত হয়।

"খিদিরপুর" এই নামের সৃষ্টি কি প্রকারে হইল সে বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন ইহার পূর্ব্বনাম ক্ষেত্রপুর ছিল। কিন্তু কেবল কল্পনার উপর নির্ভর করিয়াই এই মতের প্রতিষ্ঠা বলিয়া বোধ হয়।

ইংরাজ ইতিহাসকারেরা একবাক্যে বলিয়া থাকেন যে বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট ডকের পূর্ব্ব-স্বত্বাধিকারী কর্ণেল কিডের নামানুসারেই এ স্থানের নাম খিদিরপুর হয়। ইংরাজ লেখকদিগের নকলনবীশগণও এই মতটী শিরোধার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু সূক্ষ্ম বিবেচনায় মতটী অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কর্ণেল কিড্ সাহেব বর্ত্তমান ছিলেন সেত আজ মাত্র দেড়শত বৎসরের কথা। তবে কি এই দেড় শত বৎসর মাত্র এই স্থানের এবম্বিধ নামকরণ হইয়াছে? তাহা হইলে ইতিপূর্ব্বে ইহার কি নাম ছিল? মাত্র দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে নাম পরিবর্ত্তন হইলে ইহার পূর্ব্বনাম সহজেই জানিতে পারা যাইত। কিন্তু ইংরাজ ইতিহাসকার এ বিষয়ে নিরুত্তর। আমাদের মনে হয় যদি আদৌ কোন ইংরাজের নামানুসারে এ স্থানের নামকরণ হইত, তাহা হইলে, কর্ণেল কিডের পরিবর্ত্তে ডকের অধিকারী চিফ-ইন্‌জিনিয়ার দানশীল মহাত্মা কর্ণেল ওয়াটসনই

এই যশঃলাভ করিতেন। আর Kyd সাহেবের নাম অনুসারে ইহার নামকরণ হইলে ত Kydpore এইরূপ হইত। সাহেবের নাম Kidder হইলে তবেই Kidderpore হইতে পারিত। উপরন্তু ইংরেজের নামের সহিত "পুর" যোজিত হইয়া স্থানের নাম হইতে প্রায়ই দেখা যায় না। বরং "গঞ্জ" যোগ করিয়া ওয়াটগঞ্জ, টালিগঞ্জ প্রভৃতি হইয়াছে।

পক্ষান্তরে প্রাচীন মুসলমানগণ "খিজির খাঁ" নামক একজন অবস্থাপন্ন মুসলমানের নামানুসারেই ইহার নামকরণ হইয়াছে, লোকে-পরম্পরায় এইরূপ শুনিয়া আসিতেছেন, এবং ইহাই ধ্রুব সত্য বলিয়া মনে করেন। পার্শী ও উর্দ্দু ভাষায় অনেকেই "খিদিরপুরের" পরিবর্ত্তে 'জাল' অক্ষর দ্বারা খিদিরপুর লিখিয়া থাকেন। ইহাও দেখা যায় যে আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলি সবই মুসলমানদিগের নামানুসারে, মোমিনপুর, একবালপুর, আলিপুর প্রভৃতি হইয়াছে। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া এবং ইতিহাস পক্ষপাত-দুষ্ট হইলে জনশ্রুতিকেই সমাদর করা উচিত মনে করিয়া স্থির করা যাইতে পারা যায় যে খিজির খাঁ নামক কোনও মুসলমানের নাম অনুসারেই ইহার নাম খিজিরপুর, বাঙ্গালায় খিদিরপুর এবং ইংরাজীতে Kidderpore এইরূপ হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি যে বিক্রমপুরের ইতিহাসকার ভ্রমবশতঃ খিদিরপুরকে মহাত্মা কেদাররায়ের নামানুসারে কেদারপুরের অপভ্রংশ বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন।

অতীতকালে খিদিরপুরের যে চতুঃসীমা ছিল, বর্ত্তমানে তাহার বিস্ময়জনক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইতিহাসে দেখা যায়, যে তিনশত বৎসর পূর্ব্বেও ভাগীরথী খিদিরপুরের উত্তর প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইত। উত্তর দিক হইতে এই উপনগরের প্রান্ত পর্য্যন্ত সরল ভাবে আসিবার পর ভাগীরথী বক্রভাবে অগ্রসর হইয়া কালীঘাটের অঙ্গ স্পর্শ করতঃ সুন্দরবনের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া সমুদ্রে মিশিয়াছিল। তৎকালে ইহাই সমুদ্রে যাইবার একমাত্র জলপথ ছিল। প্রায় চারি শতাব্দী পূর্ব্বে কবি-কল্পিত সুপ্রসিদ্ধ চাঁদসদাগর বাণিজ্য-ব্যপদেশে এই পথেই সমুদ্র যাত্রা করিয়াছিলেন। ভাগলপুর হইতে বহির্গত হইয়া গঙ্গার উভয় পার্শ্বস্থ তাৎকালিক প্রাচীন স্থান সমূহ অতিক্রম করিয়া তিনি এই অঞ্চলে আসেন। অতঃপর কালীঘাট বারুইপুর ও ছত্রভোগ পশ্চাতে ফেলিয়া বঙ্গোপসাগরে উত্তরিত হ'ন। ইহার একশত বৎসর পরের কথা বলিতেছি। এই সময়ে বঙ্গের শেষবীর প্রতাপাদিত্য

কালীঘাটের সন্নিকটস্থ এই আদিগঙ্গার বক্ষেই মোগল সেনাপতি মানসিংহের সহিত সংগ্রাম করিয়া বাঙ্গালীর ভুজবল প্রদর্শন করেন। তিনশত বৎসর পূর্ব্বে আমাদের এই ক্ষীণা স্রোতস্বতী কিরূপ বিপুল-কলেবরা ছিল তাহা তাহার বক্ষে যুদ্ধ সংঘটন হইতেই অনুমিত হয়। এক্ষণে যে স্থানে গভর্ণমেণ্ট ডকইয়ার্ড অবস্থিত—বহুদিবস হইতে যে স্থান বংশাল নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে—সেইস্থান হইতেই গঙ্গা বক্রভাবে আধুনিক সাহেব-পুকুর ও তৎসংলগ্ন সুবৃহৎ জলাভূমির উপর দিয়া ৺পঞ্চানন দেবের মন্দিরের পশ্চাতে আসিয়া তৎপরে বর্ত্তমান পথেই গমন করিত। কালক্রমে সরলভাবে খোদিত একটি খাল দ্বারা খিদিরপুরের পার্শ্বস্থ গঙ্গার সহিত রাজগঞ্জের নিকটস্থ সরস্বতী নদীর সংযোগ ঘটাইয়া দেওয়া হয়। ইহাতেই কলিকাতার দক্ষিণস্থ হুগলিনদীর অংশটুকুর সৃষ্টি হয়। দেখা যায় যে তাহার পর হইতে হুগলীনদীপথেই সমুদ্রে যাতায়াত হইতেছে। ফ্রেঞ্চ, ডাচ, ইংরাজ সকলেই এই পথে কলিকাতায় আসিয়াছে। এই খাল খোদিত হওয়াতেই খিদিরপুরের গঙ্গা—এই আদিগঙ্গা, ক্ষীণদশাগ্রস্ত হইয়া "গোবিন্দপুরের খাল" নাম ধারণ করতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অস্তিত্ব হারাইতে বসিয়াছিল। এই সময়ে Surman সাহেব প্রথমতঃ ইহার শুষ্ক ও পঙ্কিল বক্ষ খোদিত করেন, ও কিছুদিনের জন্য ইহার নাম Surman নালা হয়। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল টালি আদিগঙ্গার নবজীবন দান করেন এবং এইরূপেই ভগীরথের ভাগীরথী "টালীস নালা" এই নাম গ্রহণ করিয়াছে। ত্রেতাযুগের ভগীরথ ভাগীরথী আনিয়া কোন আর্থিক লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায় নাই, কিন্তু এই কলিযুগের ভগীরথ টালি সাহেব বোটের টোল আদায় করিয়া মাসিক প্রায় ৪,৩০০ টাকা করিয়া লাভবান হইয়া গিয়াছেন। সেই আদিগঙ্গা এক্ষণে কালীঘাট পর্য্যন্ত যাইয়াই আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছেন। দক্ষিণে কোথাও কোথাও ইহার অংশ বিশেষ আজিও দেওয়ান গঙ্গা, বোসগঙ্গা প্রভৃতি নামে অভিহিত হইতেছে। গঙ্গার এই কাহিনী হইতেই বুঝা যায় যে ১২৫ বৎসর পূর্ব্বে স্থানীয় মুন্সীগঞ্জ নামক স্থানটী পূর্ব্বে গঙ্গার গর্ভেই ছিল অথবা ইহার কিয়দংশ হয়ত খিদিরপুরের পরপারস্থ গোবিন্দপুরের সহিত সংলগ্ন ছিল। আর খিদিরপুরের পুলের পশ্চিম পার্শ্বস্থ মুসলমানদিগের প্রাচীন ও ভগ্ন স্নানের ঘাটটী পূর্ব্বে হিন্দুদিগেরই স্নানের ঘাট ছিল।

অতঃপর পূর্ব্ব সীমার কথা বলিতেছি। পূর্ব্বকালে প্রাচীন জিরেট ও বেগুনবাড়ী নামক গ্রামদ্বয় খিদিরপুরকে পূর্ব্বদিকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। মাত্র "জিরেটের পুল" ও বেগুনবাড়ীর জেল" এই দুইটী এখনও সেই গ্রাম দুইটির বিদ্যমানতার পরিচয় দিতেছে। মনুষ্য সমাকীর্ণ জিরেট গ্রামটী এক্ষণে বন্যপশুর বাসভূমি হইয়াছে; আলিপুরের পশুশালাটি ভূতপূর্ব্ব জিরেট গ্রামেই স্থাপিত। স্বর্গীয় সপ্তম এডওয়ার্ড, প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স্ থাকা অবস্থায় ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক স্থাপিত পশুশালার প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। আলিপুর নামটী যে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ক্লাইব কর্ত্তৃক মসনদচ্যুত মুরশিদাবাদের নবাব বংশীয় জাফর আলির নামানুসারে হইয়াছে এবং বর্ত্তমান Belvedore প্রাসাদটীও যে তাঁহারই বসতবাটী ছিল সে বিষয় সকলেই জ্ঞাত আছেন।

দক্ষিণ উপকণ্ঠে খিদিরপুর পূর্ব্বে সোনাই ও গার্ডেনরিচের সহিত সংলগ্ন ছিল। আজ প্রায় ৩০ বৎসর হইল পোর্ট কমিশনরের ডক উক্ত গ্রাম দুইটীর সহিত খিদিরপুরের বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিয়াছে। এক্ষণে আবার তাহাদেরই অঙ্গহানি করিয়া শনৈঃ শনৈঃ খিদিরপুর বন্দরের কলেবর বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাদের দেহপাতেরও আর বিলম্ব নাই।

এইবার পশ্চিম সীমার কথা বলিব। হুগলী নদীর যে অংশ বর্ত্তমান কালে খিদিরপুরের পশ্চিম প্রান্ত সিক্ত করিয়া রহিয়াছে, বিগত তিন শতাব্দীর অধিককাল এইভাবে বিরাজমান থাকিলেও ইহা একটী কাটা খাল ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং এককালে শিবপুর ও খিদিরপুর যে পরস্পর আলিঙ্গিত হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু এক্ষণে এই দুইটী গ্রামের মধ্যে "একানদী বিশকোশ" ব্যবধান হইয়া পড়িয়াছে।

খিদিরপুরের বর্ত্তমান অবস্থিতির বিষয় উল্লেখ করিয়া স্থানীয় প্রত্যেক অধিবাসীই অতিমাত্র গৌরব অনুভব করিয়া থাকেন। গৌরবেরই ত কথা। ভাবিয়া দেখুন ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজধানী ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট, ভূতপূর্ব্ব বঙ্গেশ্বরের আবাসভূমিকে ইহার সঙ্গিনী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ ও আলিপুরের সৈন্যাবাস যেন ইহারই রক্ষারূপে বিরাজিত। কুচবিহারের অধীশ্বর, বৰ্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ এবং ময়ূরভঞ্জের রাজাও ইহার প্রতিবেশী। যশোহরের স্বনামধন্য মহারাজ বসন্তরায় ও অযোধ্যার উদারচেতা নবাব ওয়াজিদালি সাও এককালে এই উপনগর

বসতি করিয়াছেন। সর্ব্বোপরি হিন্দুর চক্ষে যাহা পবিত্রতম সেই ভাগীরথী ইহার কলুষ হরণ করিয়া ইহার উত্তর পশ্চিম প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত এবং কলিকাতার অধিষ্ঠাত্রী কালীদেবীও ইহার সমীপবর্ত্তী।

প্রাকৃতিক বিষয়ের আলোচনা করিলেও দেখা যায় যে একদিকে উত্তর প্রান্তে জনাকীর্ণ কলিকাতার কঠোর জীবন সংগ্রামজনিত বাণিজ্য ব্যবসায়ের, যান বাহনের কর্ণপটহভেদী বিপুল কোলাহল, বিপরীত প্রান্তে দুর্গাপুরের নয়নরঞ্জন শস্যশ্যামল প্রান্তর এবং স্বচ্ছ-বাপী-সমন্বিত ছায়াস্নিগ্ধ শান্তিনিকেতন রম্য উপবন; একদিকে পূর্ব্ব প্রান্তে আলিপুরের মদগর্ব্বিত গম্ভীর রাজ-প্রাসাদশ্রেণী মস্তক উত্তোলন করিয়া ইহার দিকে চাহিয়া আছে আর অন্য দিকে পশ্চিম প্রান্তে জীবগণের শ্রান্তি অবসাদ দূর করণোদ্দেশে পুণ্যসলিলা ভাগীরথী কুল কুল শব্দে বহিয়া যাইতেছেন। এমন অতুলনীয় অবস্থান যাহার, সেই পুণ্যভূমির সন্তান বলিয়া আমরা কি আপনাদিগকে ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিতে পারি না ?

বিস্ময়জনক এই ইংরাজ জাতির ইতিহাসপ্রিয়তা! তাহারই ফলে আমরা ইহাদিগের আগমনের পর হইতে এই স্থানের ধারাবাহিক ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান পাই। ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে বণিকবেশী ইংরাজগণের বাণিজ্যতরী হুগলী নদী পথে সর্ব্বপ্রথমে এই অঞ্চলে আগমন করে। ইহার ৪০ বৎসর পর পর্য্যন্তও আরাকান প্রদেশের মগদস্যুগণ এই প্রদেশে আগমন করিয়া স্থানীয় অধিবাসীগণকে ধরিয়া লইয়া দাসরূপে আরাকানে বিক্রয় করিয়া ফেলিত। এই কারণে গঙ্গার তীরভূমি লোকালয়ের পরিবর্ত্তে জঙ্গলাকীর্ণ ছিল।

১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ফোর্ট উইলিয়ম কেল্লা নির্ম্মিত হয়। যেস্থানে দুর্গটী নির্ম্মিত হইয়াছে প্রাচীন গোবিন্দপুরের ঐস্থানেই ভূকৈলাস রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় মহাত্মা জয়নারায়ণ ঘোষালের পিতামহ ৺কন্দর্প ঘোষাল মহাশয় বাস করিতেন। গোবিন্দপুর ত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়ায় ১৭৫৩ সালে তিনি খিদিরপুরে আসিয়া বাসস্থান নির্ম্মান করেন। উক্ত কারণে, আরও কতকগুলি সম্ভ্রান্ত পরিবার গোবিন্দপুর পরিত্যাগ করিয়া খিদিরপুরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংসের মন্ত্রীসভার অন্যতম সদস্য বারওয়েল সাহেব স্থানীয় Kiddrpore House এ বাস করিতেন। এই প্রাসাদতুল্য

অট্টালিকাটী সেই সময়ে উচ্চপদস্থ ইংরাজদিগের Ball Room রূপে ব্যবহৃত হইত। তৎকালে কলিকাতা অস্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া অনেক ইংরাজমহিলাই বিলাত ছাড়িয়া স্বামীর সহিত এদেশে আসিতে চাহিত না। সুতরাং সহধর্ম্মিনী-হীন ইংরাজগণ এমন কি ৫০০ মাইল দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও এইস্থানে আসিয়া নৃত্যগীতের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গিনী নির্ব্বাচন ক্রিয়া সমাধা করিত। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে আলিপুর হইতে এই খিদিরপুর হাউসে আসিবার পথের একস্থানেই হেষ্টিংশের সহিত তাঁহার মন্ত্রীসভার সদস্ত ফ্রান্সিস সাহেবের দ্বন্দযুদ্ধ হইয়াছিল। পথটি এক্ষণে Duel Aveune নামে খ্যাত। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে Major General Kirkpatrik হাওড়া হইতে উঠাইয়া আনিয়া এই বাটীতে Military Orphan School স্থাপন করেন। এই Orphan School এর জন্যই East India Companyর স্থানীয় ক্ষুদ্র বাজারটীকে পরিবর্দ্ধিত করা হয়। তদবধি কোম্পানীর বাজার Orphangunge Bazar নামে অভিহিত হইতেছে।

ইতিহাসোক্ত বর্ব্বরোচিত দ্বন্দযুদ্ধ ব্যতীত ওয়ারেন হেষ্টিংশ আরও এক অনন্ত সাধারণ কীর্ত্তিজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তাঁহারই কার্য্যসূত্রে খিদিরপুরের উত্তরস্থ কুলিবাজার গ্রামটী ১৭৭৫ সালের ৫ই আগষ্ট তারিখে ব্রাহ্মণ সন্তান নন্দকুমারের রক্তে কলুষিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণবধ জনিত এই কলুষিত স্থানত্যাগী অধিবাসীগণ কর্ত্তৃকই বর্ত্তমান "বালি"নগর প্রতিষ্ঠিত।

এইবার খিদিরপুর যে সম্পত্তির অধিকারী হওয়ায় সমগ্র ভারতবর্ষে পরিচিত সেই খিদিরপুর ডকের কথা বলিতেছি। গভর্ণমেণ্ট ডকের কথা প্রথমে বলিব। যেস্থলে এই ডকটী হইয়াছে ঐ স্থলটী এককালে William Surman সাহেবের বাসস্থান ও উদ্যান ছিল। খিদিরপুরের এই Surman সাহেবই ১৭১৪ সালে দিল্লীর সম্রাটের নিকট দৌত্যকার্য্যে প্রেরিত হইয়াছিল। উত্তরকালে ইনিই যে সর্ব্বপ্রথমে আদিগঙ্গাটীকে খোদিত করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বর্ত্তমান খিদিরপুর Bridge এক সময়ে Surman Bridge নামেই অভিহিত হইত।

১৭৮০ সালে এই Surman সাহেবের বাস্ত ভিটাতেই Col. Watson কর্ত্তৃক জাহাজ নির্ম্মানের কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। স্থানীয় Watgunge ষ্ট্রীট এবং Watsons Ber অপভ্রংশে অষ্টমীবেড় আজিও Watson সাহেবের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে। কিছুদিবস পরে Col. Kyd সাহেবের পুত্রেরা এই ডকটি ক্রয় করিয়া লয়। পুনশ্চ, অধিকারীগণের মৃত্যুতে এই স্থাবর

সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইয়া Government Dock এ পরিণত হইয়া পড়ে। এই ডকে নির্ম্মিত রণতরী এককালে গঙ্গাবক্ষে ভাসমান হইয়া খিদিরপুরকে ভারতের Liverpool করিয়া গিয়াছে। ডকের সন্নিহিত John Teil কোম্পানীর চর্ম্ম ব্যবসায়টীও ডকের সমসাময়িক। John Teil কোম্পানীর ব্যবসায়টী এখনও রহিয়াছে। বড়ই দুঃখের বিষয় খিদিরপুরের পুরাতন গেঞ্জীর কলটি নষ্ট হইয়া গেল। এই কলেই ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথমে গেঞ্জি মোজা প্রস্তুত হইয়াছিল। খিদিরপুরের গেঞ্জী মোজাই উল্লেখযোগ্য স্বদেশী শিল্পের অগ্রজ।

পোর্ট কমিশনার ডকের সূত্রপাত হইয়াছে সেও আজ প্রায় তিরিশ বৎসরের কথা। ডকের বিপুল কলেবর ক্রমশঃই রাহুর ন্যায় উভয় পার্শ্ব গ্রাস করতঃ অসীমতার দিকে অগ্রসর হইতেছে! শস্য, চা, চিনি, চামড়া, লবণ প্রভৃতির বৃহৎ বৃহৎ গুদাম ও কয়লার বিরাট ক্ষেত্র থাকা সত্ত্বেও শনৈঃ শনৈঃ ইহার আয়তন বর্দ্ধিত হইতেছে। প্রতিনিয়তই দেশদেশান্তর হইতে বিভিন্ন জাতীয় অর্ণবপোত সমূহ এই স্থানে আসিয়া আমদানী রপ্তানি এবং প্রয়োজন হইলে সংস্কৃত হইয়া চলিয়া যাইতেছে। আর আমরা বাঙ্গালীগণ তাহাদের বাণিজ্য ব্যাপারে দাসত্ব করিয়া বা দাসত্বের উমেদারী করিয়াই জীবন যাপন করিতেছি। ক্রমশঃ

শ্রীপান্নালাল দে।

চ্যবন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অপরাধ স্বীকার

মহারাজ শর্য্যাতি মহিষীগণের উত্তর শ্রবণপূর্ব্বক কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সভাস্থলে মন্ত্রী ও পারিষদবর্গসহ মন্ত্রণা আরম্ভ করিলেন। তিনি সকলকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "এই দুরূহ ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিবার ত কোন উপায় দেখিতেছি না। এক্ষণে আমার জ্ঞান হইতেছে উপবন-যাত্রীদিগের একজনও রক্ষা পাইবে না। কারণ জানিলে তাহার প্রতিকারের উপায় চেষ্টা করিতে পারিতাম, কিন্তু যখন কারণই পাইলাম না, তখন ইহাই ভাগ্য বলিয়া মানিতে হইবে যে, পুত্র আনর্ত্ত অমাদের অনুগমন করেন

নাই। তিনি যদি আমাদের সহযাত্রী হইতেন তাহা হইলে রাজসিংহাসন শূন্য হইত সন্দেহ নাই।"

পারিষদ। মহারাজ! প্রতিদিন বৈদ্য আসিয়া যে আপনাকে ও মহিষী-গণকে ঔষধ দিতেছেন, তাহাতে কি পীড়ার কোনই উপশম বোধ করিতে-ছেন না?

রাজা। এ ত প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যাধি নহে সুতরাং ঔষধে কি করিবে? এ পীড়া কোন দেব কি ঋষিরোষে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। কোন্ দেবতা বা কোন্ ঋষিরোষে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে তাহা জানিতে পারিলে তাঁহার ক্রোধ শান্তিই ইহার ঔষধ।

মন্ত্রী। মহারাজ! যখন আপনাদের সকল চেষ্টাই বিফল হইতেছে, বিশেষতঃ কাহার রোষে এই ব্যাধির উৎপত্তি যখন জানিতে সম্পূর্ণ অক্ষম হইলেন, তখন আমার নিবেদন একবার দৈবউপায় অবলম্বন করাই শ্রেয়।

রাজা। কি দৈব উপায় অবলম্বন করিতে বল তাহা প্রকাশ কর।

মন্ত্রী। মহারাজ! আমার মতে মহামায়ার মন্দিরে ষোড়শোপচার পূজা দিয়া তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করুন।

মহামায়ার আশ্রয় গ্রহণ সর্ব্ববাদিসম্মত হইলে সভাভঙ্গ হইবার উপক্রম হইল, এমন সময়ে সংবাদ আসিল যে নৃপনন্দিনী পিতৃসাক্ষাৎকার লালসায় সভামধ্যে আগমন করিতেছেন। রাজা শ্রবণমাত্রেই ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। রাজকুমারী কি জন্য সভাস্থলে আগমন করিবেন? ব্যগ্রতা হইতে ক্রমে ঔৎসুক্য আসিল। সভাস্থ পাত্র মিত্র সকলেই ঔৎসুক্যের সহিত অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে সখীগণ-পরিবেষ্টিতা রাজনন্দিনী সভামধ্যে প্রবেশ করিয়াই পিতৃদেবকে প্রণতিপুরঃসর কহিতে লাগিলেন, "আপনি স্বয়ং, মাতা ও বিমাতাগণ ও সৈনিক এবং যানবাহকগণ যে দুরারোগ্য পীড়ায় যন্ত্রণাভোগ করিতেছেন, তাহার মূলীভূত কারণই আমি। আমি সেই উপবনস্থ সরোবরের পশ্চিমপ্রান্তে পুষ্পচয়ন ও ক্রীড়াকৌতুকে নিযুক্ত হইয়া একটী প্রকাণ্ড বল্মীকস্তূপের নিকট উপনীত হইলাম। সেই বল্মীকস্তূপের ঊর্দ্ধভাগে দুইটি রন্ধ্রপথে অপূর্ব্ব জ্যোতি স্ফুরিত হইতে দেখিয়া, উহা কি জানিবার নিমিত্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইলাম এবং দুইটি খর্জ্জুর-কণ্টক আনয়ন পূর্ব্বক সেই বল্মীক-রন্ধ্রের ভিতর সজোরে প্রবেশ করাইয়া দিলাম। পরে কণ্টক দুইটী বহির্গত করিয়া দেখিলাম উহা রক্তাক্ত। দেখিবামাত্র আমার

ধ্রুব জ্ঞান হইল, আমি যেন কাহারও সর্ব্বনাশ করিলাম। ভয়ে ভীতা ও কম্পিতকলেবরা হইয়া তথা হইতে পলায়ন করিলাম। পরে অনুসন্ধানে জানিলাম উনি তপস্যানিরত মহাত্মা চ্যবন। সেই অবধি আমার মনে আর শান্তি নাই। আমাদের সকলেই যে এই ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে তাহাও তাঁহারই কোপানলে, তাহা সম্যক উপলব্ধি করিলাম। প্রথমত আমি সখীগণসহ এই দারুণ ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছি, দ্বিতীয়তঃ উপবনযাত্রী যাবতীয় লোক যে আমারই অপরাধহেতু এই অসহনীয় পীড়া ভোগ করিতেছে এই জ্ঞানে আমি শোকে তাপে জীবন্মৃতা হইয়াছিলাম। যখন মনস্তাপ অসহনীয় হইয়া উঠিল তখন সখীগণসঙ্গে দেবী মহামায়ার শরণাপন্না হইলাম। তাঁহারই আদেশে আমি আপনার নিকট সমস্ত ব্যক্ত করিলাম। অতঃপর আপনি সেই মুনিপ্রবর বৃদ্ধ চ্যবনের সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক অনুনয় বিনয় দ্বারা তাঁহার কোপ শান্তি করিলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া যাহা আদেশ করিবেন তাহাই সম্পন্ন করিলে সকলেই ব্যাধিনির্ম্মুক্ত হইয়া পরমসুখে কালযাপন করিবেন।”

পরমধার্ম্মিকা আদরিণী যে কন্যা মুনিধর্ষণরূপ আচরণে অশক্তাজ্ঞানে রাজা শর্য্যাতি তাঁহার নিকট কোন কথাই জিজ্ঞাসা করেন নাই, সেই কন্যাই ঈদৃশ গার্হিতাচরণ করিয়াছে শ্রবণ করিয়া তিনি একান্ত অধীর হইলেন। বৃদ্ধ সমাহিত ভৃগুনন্দন কুপিত হইলে কি না করিতে পারেন? তিনি যে এই সামান্য কষ্ট ভোগ দিয়া শান্ত আছেন ইহাই তিনি ভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করিলেন। বিশেষতঃ কোপনস্বভাব ইহারই পিতা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিয়াছিলেন। স্বয়ং নারায়ণ যখন ব্রাহ্মণহস্তে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন তখন তাঁহাদের কথা কি? মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া রাজা আদরিণী কন্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “দেবীর আদেশ মত আমি সেই সমাধিনিরত চ্যবন সমক্ষে যাইতেছি, কিন্তু আমার দর্শনলাভে তিনি যদি ক্রোধপরায়ণ হইয়া অভিসম্পাত করেন তাহা হইলে আমরা সবংশে নিধন প্রাপ্ত হইব সন্দেহ নাই।”

সুকন্যা। হে পিতঃ! আপনি দ্বিধা করিবেন না। মহামায়া যখন আদেশ করিয়াছেন তখন তাহাতে কুফল ফলিবে না। বিশেষতঃ মহর্ষিগণ সততই ক্ষমাবান হইয়া থাকেন, নতুবা আমি যে মুহূর্ত্তে তাঁহার এই দারুণ অনিষ্ট সাধন করিয়াছিলাম তখনই ত আমাকে তিনি ভস্মীভূত করিতে পারিতেন।

সুকন্যার এই জ্ঞানগর্ভ বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া রাজা লজ্জিত হইলেন। তিনি অচিরেই তপোনিধি সন্নিধানে গমন করিবেন প্রতিশ্রুত হইয়া সভাভঙ্গ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পাণ্ড্যরাজ পরন্তপ।

নৃপসত্তম শর্য্যাতি বরবর্ণিনী কন্যাকে ঈষৎ সূচিতযৌবনা অবলোকন করিয়া ও তাঁহাকে নিরুপম সৌন্দর্য্যশালিনী দেখিয়া উপযুক্ত পাত্রানুসন্ধানে দেশ-দেশান্তরে লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের উপবন যাত্রার বহুপূর্ব্ব হইতে ভারতের শীর্ষস্থানীয় রাজন্যবর্গ শর্য্যাতি রাজধানীতে কন্যা-দর্শনার্থ আগমন করিতেছিলেন। অপরূপ কন্যারত্নলাভাশায় যাহারা এই প্রকারে শর্য্যাতি রাজধানীতে আগমন করিতে লাগিলেন তাঁহারা সকলেই উৎসাহসম্পন্ন হইয়া অধ্বশ্রম অনুভব করিলেন না। কিন্তু কন্যার অলৌকিক লাবণ্য ও দিব্যপ্রভা অবলোকন করিয়া তাঁহাকে দেবযোগ্যজ্ঞানে কেহই বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন না, সুতরাং তখন পথশ্রান্তিজনিত ক্লেশে অভিভূত হইয়া নিরুৎসাহসহকারে নিজ নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

নৃপতিশ্রেষ্ঠ শর্য্যাতি তখন সুন্দরী কন্যার বিবাহসম্বন্ধে একান্ত নিরুৎসাহ ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। সরলস্বভাবা সুকন্যাও বার বার অভিনব নৃপতিগণকে দর্শন দিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। একারণ তিনি মহারাজকে বিষাদিত অবলোকন করিয়া মাতৃসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক পিতার দুঃখ-কারণ জ্ঞাপন করিয়া কহিলেন, "মাতঃ! সামান্য কারণে পিতৃদেবকে বিষাদজড়িত অবলোকন করিয়া আমি বড়ই অস্থির হইতেছি। আমাদিগের মঙ্গলামঙ্গল শুভাশুভ সকল বিষয়েরই কর্ত্রী দেবী মহামায়ার শরণাগত হওয়াই কর্ত্তব্য।"

রাজমহিষী সুকন্যার বাক্য শ্রবণ করিয়া মহারাজের নিকট কন্যার জ্ঞানগর্ভ বাক্যাবলী বিবৃত করিয়া সকল বিপদাপদ-বারিণী মহামায়ার পূজা প্রদান পূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই শরণাগত হইবার আদেশ দিলেন।

মহিষীর পরামর্শানুসারে মহারাজ শর্য্যাতি শুভদিনে ষোড়শোপচারে মহাদেবী মহামায়ার পূজা সমাপন পূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেন, "মা! আপনিই আমাদিগের সকল বিপদাপদ ও বিঘ্নবিপত্তির প্রতিহর্ত্রী। আপনারই

প্রসাদে আমরা পরমসুখে রাজ্যশাসন ও সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি। আমরা একণে কন্যা বিবাহরূপ দায়ে পতিত। এ দায় হইতে আপনি রক্ষা না করিলে আমাদের আর অন্যগতি নাই। সুতরাং যাহাতে আমাদিগের দয়াদাক্ষিণ্যাদিগুণযুক্তা সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্তা কন্যা সুকন্যা উপযুক্ত পাত্রে সমর্পিতা হয় তাহার বিধান করুন।"

মহাদেবীর অনুকম্পায় রাজা শান্তিসুখ লাভ করিলেন। তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিল যে, দেবী মহামায়ার প্রসাদে তাঁহার কন্যাললাম উপযুক্ত সর্ব্বগুণসমন্বিত নৃপকুমারে অর্পিত হইবে। সুতরাং উদ্বেগশূন্যহৃদয়ে তাহারা কয়েক বৎসর পরমসুখে অতিবাহিত করিলেন।

একদা পাণ্ড্যদেশের অধিপতি পরন্তপ পদ্মোদরকান্তিসমধিকগুণসম্পন্ন বিধাতার মধুরনির্ম্মাণ শর্য্যাতিতনয়াকে প্রাপ্তিকামনায় তদীয় রাজধানীতে উপনীত হইলেন। রাজা শর্য্যাতি তখন অমাত্য ও পারিষদগণ পরিবেষ্টিত হইয়া সভাস্থলে বিরাজ করিতেছিলেন। সহসা সভামধ্যে প্রতিহারী আসিয়া পাণ্ড্যরাজের আগমনবার্ত্তা জানাইল। শর্য্যাতি সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পাণ্ড্যরাজ পরন্তপকে প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক সাদরে হস্তধারণ করিয়া অপর একটি সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। অনন্তর পাণ্ড্যরাজের অভিপ্রায় অবগত হইয়া মহারাজ শর্য্যাতি দ্রুত অন্তঃপুর মধ্যে দূত প্রেরণপূর্ব্বক সুকন্যাকে সভাবিতানে আগমন করিবার আদেশ দিলেন।

পূর্ণেন্দুমুখী বালা সুকন্যা পিত্রাদেশানুসারে সভাবিতানে গমন করিয়াই অগ্রে পাণ্ড্যরাজ ও তৎপরে পিতৃদেবকে প্রণাম করিলে নরপতি তাঁহাকে অন্য এক সিংহাসনে উপবেশন করিবার আদেশ দিলেন। দেবপ্রভাসমন্বিত পাণ্ড্যরাজ দেবোপমজ্যোতির্বিশিষ্টা শর্য্যাতিতনয়াকে অবলোকন করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন। অনন্তর মাগধকুল রাজপুঙ্গব পরন্তপের বংশকীর্ত্তন করিয়া কহিল, "হে রাজন্! হে রাজকুমারি! ইনি পাণ্ড্যদেশের অধীশ্বর, নাম পরন্তপ। ইনি প্রজারঞ্জন বিষয়ে বিচক্ষণ, শরণার্থিগণের শরণ্য ও গম্ভীরস্বভাব। ইনি শত্রুদমনকারী বলিয়াই সার্থক পরন্তপ নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। রজনী যেমন নক্ষত্রতারকা ও গ্রহগণ সমাকীর্ণা হইলেও কেবল কুমুদিনীনায়ক দ্বারাই জ্যোতির্ম্মতী হইয়া থাকেন, তদ্রূপ এই ধরাধামে বহু অবনীপাল বিদ্যমান থাকিলেও এই পাণ্ড্যরাজ দ্বারাই পৃথিবী রাজন্বতী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। এই মহারাজ পরন্তপ ইন্দিবরতুল্য শ্যামকলেবর এবং

কুমারী সুকন্যাও গোরোচনাসদৃশ গৌরবর্ণা, অতএব এতদুভয়ের সমাগম জলধর ও বিদ্যুৎ সমাগমতুল্য পরস্পরের শোভাবর্দ্ধনকারী হইবে সন্দেহ নাই।"

মাগধগণের বংশকীর্ত্তন শ্রবণানন্তর নৃপনন্দিনী সুকন্যা, পাণ্ড্যরাজ ও মহারাজ শর্য্যাতির নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক অন্তঃপুরী মধ্যে গমন করিলেন। তথায় মাতৃসন্নিধানে সমস্ত নিবেদন করিয়া কহিলেন, "মা, আপনি একখানা পত্র লিখিয়া রাজসভায় পিতার নিকট প্রেরণ করুন। তাহাতে দেবী মহামায়ার সম্মতি না পাইলে বিবাহ হইতে পারে না, ইহাই বিজ্ঞাপন করুন।"

কন্যার পরামর্শমত রাজমহিষী মহারাজ শর্য্যাতিকে নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রেরণ করিলেন।

"মহারাজ!

কন্যার বিবাহার্থে লালায়িত হইয়া আপনি দেবী মহামায়ার ষোড়শোপচারে পূজা সমাপনপূর্ব্বক, তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। এক্ষণে সেই দেবীর প্রতি হতশ্রদ্ধাপ্রদর্শন পূর্ব্বক পুনরায় স্বমতে বিবাহকার্য্যে লিপ্ত হওয়া কদাচ যুক্তিযুক্ত নহে।"

পত্রখানি প্রাপ্ত হইয়া প্রথমত রাজা স্বয়ং তাহা পাঠ করিলেন, পরে সভাস্থ সকলের শ্রুতিগোচর হয় এরূপভাবে পাঠ করিলেন। সচিবশ্রেষ্ঠ মহারাণীর পক্ষ সমর্থন করিয়া মহাদেবীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক বিবাহে সম্মতি দান না করিতে মহারাজকে পরামর্শ দিলেন।

পাণ্ড্যরাজ পরন্তপ এই সকল পরামর্শ শ্রবণগোচর করিয়া ক্রোধান্বিত হইলেন এবং রাজাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! আপনিই কন্যার বিবাহের জন্য সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়াছিলেন। তচ্ছ্রবণে অনেকানেক রাজপুঙ্গব তদীয় রাজ্যে আগমন করিয়া ব্যর্থমনোরথ ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছেন। আমাকেও অকারণে প্রত্যাখ্যান করিতেছেন, একারণ আমি এই অভিসম্পাত করিতেছি যে, আপনার কন্যা পরমাসুন্দরী হইলেও অবশেষে বৃদ্ধবরে সমর্পিত হইবেন।" এই বলিয়া পরন্তপ সভাস্থল হইতে বেগে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ক্ষমা প্রার্থনা।

উপবন হইতে প্রত্যাগত হইয়া অবধি সৈনিক, যানবাহক, রাজমহিষী-গণ ক্ষুধামান্দ্যবশত অতীব কষ্টভোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আর আহারে রুচি নাই, পানীয়দ্রব্যে অভিলাষ নাই, পুষ্টিকরদ্রব্য পানভোজনা-ভাবে সকলেরই শরীর অস্থিকঙ্কালে পর্য্যবসিত হইল। এই অদ্ভুত ব্যাধির প্রশমনের উপায়ান্তর নাই দেখিয়া মহারাজ শর্য্যাতি মহাত্মা চ্যবনের ক্রোধ-শান্তির জন্য উদ্যুক্ত হইলেন। তিনি কন্যার নিকট প্রতিশ্রুত ছিলেন যে, অচিরে যতিশ্রেষ্ঠ চ্যবন সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক সেবাশুশ্রূষা দ্বারা তাঁহার ক্রোধ শান্তি করিবেন ও এতাদৃশ কষ্টকর ব্যাধিবিমুক্ত হইবার উপায় বিধান করাইয়া লইবেন। আর গৌণ করিলে সকলের জীবন সংশয় অনুমান করিয়া তিনি রাজমহিষী সুকন্যার মাতাকে সমভিব্যাহারে লইয়া উপবন যাত্রা করিলেন। উপবনসমীপে উপনীত হইয়া মহারাজ শর্য্যাতি নগ্নপদে মহিষীসমভিব্যাহারে বল্মিকসন্নিধানে গমন করিলেন। অনন্তর মহাত্মা চ্যবনের অঙ্গ হইতে মৃত্তিকা অপসারিত করিয়া অনেক সেবাশুশ্রূষা দ্বারা তাঁহার সমাধিভঙ্গ করিলেন। পরে তাঁহার পদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক বিনয়নম্রস্বরে কহিলেন "হে মহাভাগ! আমি সর্ব্বতোভাবে আপনার শরণাপন্ন হইলাম। আমার কন্যা ক্রীড়া করিতে করিতে বালস্বভাববশত অজ্ঞাতসারে আপনকার অহিতাচরণ করিয়াছে। বালিকার অজ্ঞানকৃত এই কুকার্য্য আপনার ক্ষমা করা উচিত। আমি শুনিয়াছি ক্ষমাই তাপসগণের তেজ, ক্ষমাই তাঁহাদের তপ, অতএব মুনিগণ কদাচ ক্রোধের বশীভূত হন না। আপনার মনে ক্রোধের উদ্রেক হইলে কি আমার অবোধ বালিকা জীবন লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিত? আপনার অহিতাচরণ করিবামাত্রই সে ভস্মীভূত হইত তাহার আর সন্দেহ নাই। হে মুনে! বালিকার কুকার্য্যবশত আমার সৈনিক যানবাহক প্রভৃতি সকলেই ক্ষুধামান্দ্য পীড়ায় অভিভূত হইয়াছে। আপনি ক্ষমা করিলে তাহারা সকলে নীরোগ হইয়া জীবন যাপন করিতে পারে।"

রাজাকে একান্ত কাতর ও বিনয়ান্বিত দেখিয়া মহর্ষি চ্যবন কহিলেন, "হে রাজন্! আমি কদাচ কাহারও উপর অণুমাত্র ক্রোধ করি না। বিশেষ রাজার উপর ক্রোধ প্রকাশ কখনই সঙ্গত নহে। রাজা আমাদিগকে রক্ষা না

করিলে আমরা নির্ব্বিঘ্নে তপস্যা করিতে সমর্থ হই না। রাজা রাজ্য রক্ষা করেন, রাজার আশ্রয়ে দ্বিজগণ যজ্ঞ করিয়া থাকেন এবং যজ্ঞ দ্বারা দেবলোক সন্তুষ্ট হইয়া বৃষ্টি প্রদান করেন তবে পৃথিবী শস্যশালিনী হয়েন। আপনার কন্যা নিরপরাধে আমার নেত্রপীড়া উৎপাদন করিয়াছে ইহাই আমার বিশ্বাস। এখন আমার যদি অণুমাত্র ক্রোধের উদ্রেক হইত তাহা হইলে আপনার কন্যা ভস্মসাৎ হইতেন। তবে যাহাতে এই সংবাদ আপনার কর্ণগোচর হয় এই জন্যই আপনার সৈনিক যানবাহক ও উপবনযাত্রিগণ সকলেই ক্ষুধামান্দ্য দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। এবং সেই হেতু আপনি অদ্য তাহা হইতে মুক্তি কামনায় মৎসকাশে উপনীত হইয়াছেন।

রাজা। হে মুনে! আপনি যখন ক্রোধ করেন নাই এবং আমার এই অবোধ বালিকার অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন, তখন অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে এই দারুণ ব্যাধি হইতে মুক্তিদান করুন।

চ্যবন। রাজন্! যদি স্বয়ং ভগবান মহেশ্বর রক্ষাকর্ত্তা হয়েন তথাপি তাপসগণের অপকার করিয়া কেহ সুখী হইতে পারে না। আপনি কেবল আপনার সুখের নিমিত্তই ব্যগ্র হইয়াছেন, কিন্তু বলুন দেখি, এই জরাগ্রস্ত অন্ধের কি উপায় হইবে? কেই বা তাহার পরিচর্য্যা করিবে?

রাজা। হে তাপসপ্রধান! তপস্বিগণের ক্রোধ ক্ষণস্থায়ী, অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনি আমাদিগকে ক্ষমা করুন। আমি বহুল সেবক আপনার পরিচর্য্যার নিমিত্ত নিযুক্ত করিয়া দিব।

চ্যবন। মহারাজ! আমার আত্মীয় স্বজন কেহই নাই, তদুপরি অন্ধ হইয়া কি প্রকারে তপোনুষ্ঠানে সমর্থ হইব? আপনার সেবকগণ আসিয়া আমার কি প্রিয়কার্য্য সাধন করিবে? হে রাজন্! আপনি স্বার্থপরতায় অন্ধ হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন। যদি ক্ষমাপ্রাপ্তি একান্ত বাঞ্ছনীয় হয় তবে আপনার সেই কমললোচনা কন্যাকে আমার পরিচর্য্যার্থে নিযুক্ত করুন। আপনার সেই কন্যাকে পাইলে আমি সন্তুষ্টহৃদয়ে তপোনুষ্ঠানে সমর্থ হইব। তাহা হইলে আপনি ও আপনার সৈনিক, যানবাহক সকলেই স্বচ্ছন্দতা প্রাপ্ত হইবে।

মহারাজ শর্য্যাতি তপোধন চ্যবনের এতাদৃশ বাক্য বজ্রসদৃশ কঠিন বিবেচনা করিয়া সহসা তাঁহার সেই বাক্যের উত্তরদানে সমর্থ হইলেন না। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "আমি কেমন করিয়া দেবকন্যাসদৃশী

লক্ষ্মীপ্রতিমা প্রিয়তমা তনয়াকে কুরূপ বৃদ্ধ বিশেষতঃ অন্ধ মুনিবরের হস্তে সমর্পণ করিব? রাজোপচারে প্রতিপালিত সর্ব্বসুখাভ্যস্তা আমার সেই তনয়া কি প্রকারেই বা সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া মৌনব্রতধারী বৃদ্ধ পতির সেবা করিয়া সুখী হইবে? যাহার দেবপ্রভা দর্শন করিয়া ভারতের শীর্ষস্থানীয় রাজন্যবর্গ যাহাকে পতিরূপে গ্রহণ করিতে সাহস পায় নাই এবং অবশেষে দেবোপম রাজা পরন্তপ যাহার পাণিগ্রহণে সম্মত হইলেও বিফলমনোরথ হইয়া মদীয় কন্যা বৃদ্ধবরে সমর্পিত হইবে বলিয়া অভিসম্পাত করেন সেই বরবর্ণিনী কি সত্য সত্যই বৃদ্ধ অন্ধ কদাকার এক মুনিবরের ভার্য্যা হইবে? আমি গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলে সেই নিরুপমা সৌন্দর্য্যশালিনী কন্যা আমার প্রমুখাৎ এই বজ্রপাতসম নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া নিশ্চয়ই স্তম্ভিত ও হতজ্ঞান হইয়া পড়িবে। হায়! আমার কন্যার ভাগ্যে কি আছে বলিতে পারি না। এক দিকে রাজরোষ, অন্যদিকে ঋষিরোষ এই উভয় রোষে পতিত হইয়া তাহাকে চিরকাল দুঃখে জীবন যাপন করিতে হইবে। এইরূপ চিন্তাগ্রস্ত হইয়া মহারাজ শর্য্যাতি কন্যার অভিমতগ্রহণব্যপদেশে পত্নীসহ তথা হইতে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

স্বপ্নদর্শন।

মহারাজ শর্য্যাতি মহিষী সমভিব্যাহারে মুনিপ্রবর চ্যবন সকাশে গমন করিলে ধার্ম্মিকা সুকন্যা স্নানান্তে সখীগণ সমভিব্যাহারে মহামায়ার মন্দিরে গমনপূর্ব্বক ষোড়শোপচারে তাঁহার পূজা দিলেন। অনন্তর রাজপ্রাসাদে আগমনপূর্ব্বক আহারাদি সমাপন করিয়া নিদ্রাগতা হইলেন। মহারাজ চ্যবনের নিকট গমন করিয়াছেন, তিনি পিতাকে কি বলেন কি আদেশ করেন এইরূপ চিন্তামালায় আকৃষ্ট হইয়া ক্রমশঃ নিদ্রাভিভূতা হইলেন। তিনি তপোধন চ্যবনের অহিতাচরণ করিয়া অবধি শান্তিলাভ করেন নাই। মাহামায়ার আদেশানুসারে পিতাকে অদ্য চ্যবন সন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছেন। এক্ষণে পিতার আগমন প্রত্যাশায় ব্যাকুল হইয়া গাঢ় নিদ্রাকৃষ্টা হইলেন। যাহার হৃদয়ে চিন্তাই প্রবল সে নিদ্রিত হইয়াও শান্তিলাভ করে না। সুকন্যা নিদ্রাভিভূতা হইয়াও স্বপ্ন দেখিলেন। তাঁহার বোধ হইল যে, দীর্ঘশ্মশ্রুরাজি-বিরাজিত-বদন জটাধারী জনৈক পুরুষ হসিতাধরে মৃদুমন্দস্বরে তাঁহাকে

সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "রাজকুমারি! তোমার পিতৃদেব মহাত্মা চ্যবন সকাশে গমন করিয়াছেন। ক্ষমাশীল চ্যবন নিশ্চয়ই তোমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিবেন, কিন্তু রাজকুমারি! তোমাকে এক বিষয় সাবধান করিবার জন্ত আমি এথানে আগমন করিয়াছি। তপোধন চ্যবন তোমার কণ্টকাঘাতে অন্ধ হইয়াছেন। এক্ষণে তপঃ সাধন তাহার পক্ষে দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। তিনি এক্ষণে তপঃসাধনোপায় তোমারই পাণিগ্রহণে প্রার্থনা করিবেন। তোমার পিতা এই প্রস্তাব শুনিবামাত্র দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইবেন সন্দেহ নাই। তিনি কোনপ্রকারেই তোমাকে বৃদ্ধ তপস্যারত চ্যবনহস্তে সমর্পণ করিতে স্বীকৃত হইবেন না। তখনই তোমার সাহসিকতার প্রয়োজন হইবে এবং যাহাতে তোমার সেই সাহসের অভাব না হয় এজন্য আমি অদ্য তোমার নিকট উপনীত হইলাম। এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে মহামায়ার আদেশ কি তোমার স্মরণ আছে?

সুকন্যা। আজ্ঞে হা, আছে, তাঁহারই আদেশমত আমি পিতাকে মহাত্মা চ্যবন সন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছি।

পুরুষ। তাহা ভালই করিয়াছ। মহামায়া কি চ্যবন সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলেন নাই?

সুকন্যা। হাঁ বলিয়াছেন বৈ কি।

পুরুষ। কি বলিয়াছেন?

সুকন্যা। মহাত্মা চ্যবন পিতৃদেবের অনুনয়ে সন্তুষ্ট হইয়া কোন কিছু আদেশ করিবেন। সেই আদেশ প্রতিপালন করিলেই সকলে শান্তিপ্রাপ্ত হইবে।

পুরুষ। সেই আদেশ কি বুঝিয়াছ?

সুকন্যা। আজ্ঞে আপনার কথায় বুঝিলাম যে পিতৃদেবকে স্বীয় কন্যা বৃদ্ধ মুনিবরের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে।

পুরুষ। তুমি যখন বুঝিয়াছ, ভালই হইয়াছে। তোমার পিতা নিশ্চয়ই একার্য্যে অস্বীকৃত হইবেন। কিন্তু তুমি মহামায়ার দোহাই দিয়া তাঁহাকে চ্যবনের আদেশ প্রতিপালনে স্বীকার করাইবে।

সুকন্যা স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষের এতাদৃশ বাক্য শুনিয়া ও আপনার ভাগ্য পর্য্যা-লোচনা করিয়া ভয়ে ভীতা ও দুঃখে বিবর্ণবদনা হইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন কে ইচ্ছাপূর্ব্বক অনলকুণ্ডে ঝম্পপ্রদান করিতে চাহে?

কিন্তু আবার ইহাও সম্যক জ্ঞান হইল যে, আমি আত্মত্যাগ স্বীকার করিলে অনেকগুলি লোক অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা পায়। তাহা কি আমার কর্ত্তব্য নহে? দোলায়মান চিত্তে রাজকুমারী এইরূপ আন্দোলন করিতেন আর তাহার সুকুমার বদনমণ্ডল মুহমুর্হু বিবিধ রঙ্গে রঞ্জিত হইতেছে, কখন উৎকণ্ঠা হেতু মালিন্য, কখন লজ্জাহেতু রক্তিমা, হর্ষহেতু উজ্জ্বলতা ও ভয় হেতু পাণ্ডুরিমা প্রকাশ পাইতে লাগিল। জটাধারী পুরুষ তাঁহার এতাদৃশ অবস্থা অবলোকন করিয়া কহিলেন, "রাজকুমারি! আমি তোমার অনিষ্ট করিতে আসি নাই এবং যাহাতে তোমার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হয় তাহার জন্যই আমার আগমন। তুমি যাহাকে বৃদ্ধ বলিয়া ঘৃণা করিতেছ, যাহাকে অর্থহীন বলিয়া তুচ্ছ করিতেছ, ও যাহাকে কদাকার বলিয়া অশ্রদ্ধা করিতেছ সেই তপোধন চ্যবন তোমার সহিত বিবাহান্তে অদ্ভুত উপায়ে দিব্যবপু ও যৌবন প্রাপ্ত হইয়া তপরূপ ধনসমৃদ্ধি বশতঃ তোমার মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইবেন।"

রাজকুমারী এতদূর স্বপ্ন দেখিয়াছেন এমন সময়ে নিদ্রাভিভূতা রাজকুমারী গাত্রোত্থান করিয়াছেন কি না দেখিবার জন্য সঙ্গীগণ সেই প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইল। তাহাদিগের সকলের কলস্বরে ও পদশব্দে রাজনন্দিনী জাগ্রতা হইলেন। তাহার বিদীর্ণ ও বিশীর্ণবদনকমল অবলোকনপূর্ব্বক সখীগণ ভীতা হইল এবং প্রণয়ের ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, কি হইয়াছে, রাজনন্দিনি! প্রভাত শশাঙ্কবৎ নিষ্প্রভ তোমার বদনকমল দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। তোমার পিতা মাতা কি উপবন হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন?

রাজকু। না তাঁহারা প্রত্যাগত হইয়াছেন কি না জানি না।

সখী। তবে তোমার বদনকমল এমন বিবর্ণ হইল কেন? কোন কি স্বপ্ন দেখিয়াছ?

রাজকু। বিশ্রী স্বপ্ন দেখিয়া বড় ভীত হইয়াছি।

সঙ্গী। স্বপ্ন অলীক, উহা লইয়া অকারণে মন খারাপ করা উচিত নহে। চল আমরা দেবীর মন্দিরে যাই।

দেবী-মন্দিরের কথা শ্রবণ করিয়াই নৃপনন্দিনী ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সঙ্গীগণ কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসিতা হইয়া কহিলেন, "সখী! প্রথমে যখন আমরা দেবীমন্দিরে গিয়া পূজা সমাধানপূর্ব্বক তাঁহার পদতলে প্রণত হইয়া রোগমুক্তির প্রার্থনা করি, তখন তিনি বলিয়াছিলেন তোমার পিতাকে মহর্ষি চ্যবন সন্নিধানে পাঠাইয়া দাও তোমার পিতা তাঁহাকে বিনয়

নম্রভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিলে মহাত্মা চ্যবন যাহা আদেশ করিবেন তদনু-সারে কার্য্য করিলে তোমাদের সকলেই রোগমুক্ত হইবেন। একথা কি স্মরণ হয়?

সখী। কেন স্মরণ হইবে না? সে ত এই সে দিনকার কথা।

রাজকু। অদ্য স্বপ্ন দেখিলাম যেন এক জটাধারী পুরুষ আসিয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তোমার কণ্টকাঘাতে মহাত্মা চ্যবন অন্ধ হইয়াছেন, তপঃ সাধন এক্ষণে তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং তাঁহার তপঃ সাধনোপায় তোমাকেই তিনি তোমার পিতার নিকট প্রার্থনা করিবেন। তোমার পিতা ইহাতে কখন সম্মতা হইবেন না।

সখী। কি সর্ব্বনাশ! রাজা পরন্তপের অভিসম্পাত হাতে হাতে খাটিল।

রাজকু। আরও একটু আছে। সেই মহাপুরুষ আরও কহিলেন, যে যাহাকে তুমি বৃদ্ধ, কদাকার বলিয়া ঘৃণা করিতেছ সেই তপোধনই তোমার বিবাহান্তে অদ্ভুত উপায়ে দিব্য বপু ও যৌবন প্রাপ্ত হইয়া তপঃসমৃদ্ধিবশতঃ তোমার সন্তোষসাধন করিতে সমর্থ হইবেন।

সখী। এ অদ্ভুত স্বপ্ন। সকলই মহামায়ার কার্য্য। আমাদের পরামর্শ তুমি তাহাতেই চিত্ত অর্পণ করিয়া কার্য্য কর।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অদ্ভুত রহস্য

মহর্ষি চ্যবনের মুখে এতাদৃশ মর্ম্মভেদী বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা শর্য্যাতি ও মহিষী পুনরায় গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। মহারাজের মনে সুখ নাই, তিনি সর্ব্বদাই মহর্ষিকে কন্যাদানরূপ দুরূহকার্য্যে কিরূপে সম্মতি দান করিবেন তাহাই ভাবিতেছেন। তিনি একাকী অন্তঃপুরী মধ্যে মহিষীর সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। মহিষী উপবন মধ্যে চ্যবনের বাক্য শুনিয়া অবধি যে ক্রন্দন আরম্ভ করিয়াছেন এখনও সেইরূপ ক্রন্দন করিতেছেন। রাজা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেবি! ক্রন্দন করিয়া কি ফলোৎপাদন হইবে? তোমার ক্রন্দন দেখিয়া আমারও দুঃখসিন্ধু উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে এবং লাভের মধ্যে আমাকেও তোমার ন্যায় হিতাহিতজ্ঞান শূন্য করিয়া ফেলিতেছে।"

রাণী। ক্রন্দন না করিয়া আর কি করিব? আমার সোনার পুত্তলী

ওই কদাকার বৃদ্ধের হস্তে পড়িলে ক্রন্দন করিয়া করিয়াই জীবনপাত করিবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

রাজা। কদাকার বৃদ্ধকে যে কন্যাদান করিতে হইবে তাহার অর্থ কি ?

রাণী। একে বৃদ্ধ, তাহাতে আপনার কন্যাই ত তাঁহার চক্ষু দুটী নষ্ট করিয়াছে। সেই কন্যাই তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিবে বলিয়া তাঁহাকেই তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন। যদি কন্যাকে না পাইয়া পুনরায় ক্রোধ বশতঃ অভিসম্পাত করেন তবে সকলেরই জীবন সংশয়।

রাজা। জীবন সংশয় ত হইয়াই আছে। যে ব্যাধি প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতে ক্রমে ক্রমে শমন ভবনে গমন করিতে হইবে। তাহা অপেক্ষা তাঁহার ক্রোধাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করি তাহা কি সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ নহে ?

রাণী। তাহা শ্রেয়ঃ বটে, কিন্তু যদি আমাদিগকে বিনষ্ট না করিয়া সেই কন্যাটীকেই বিনষ্ট করেন ?

রাজা মহিষীর এতাদৃশ বজ্রকঠিন বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া ক্রোধে অধীর হইলেন। তদ্দর্শনে মহিষী অনুনয় বিনয় সহকারে কহিলেন, "মহারাজ! ক্রোধ করিবেন না। মুনিগণের উপর ক্রোধ প্রদর্শন অকারণ। আপনি ক্রোধের বশীভুত হইয়াও যাহা করিতে অসমর্থ হইবেন মুনিগণ বিনা ক্রোধে বাক্য দ্বারা তাহা অপেক্ষা গুরুতর অনিষ্ট সাধন করিতে পারেন। সুতরাং ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক যাহাতে সেই যোগিশ্রেষ্ঠ কুলকামিনী গ্রহণে বিরত হয়েন, তাহারই উপায় বিধান করুন।"

মহিষীর, সদর্থযুক্ত বাক্য শ্রবণ মাত্রেই রাজার ক্রোধ প্রশমিত হইল, তখন তিনি কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া তথা হইতে সভাস্থলে গমন করিলেন, মনে করিলেন সভাস্থ বিদ্বজ্জনমণ্ডলী অবশ্যই ইহার কোন না কোন উপায় নিরুপন করিতে সমর্থ হইবেন। রাজপুরুষকে ম্রিয়মান ও তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া ধারা বিগলিত হইতে দেখিয়া মন্ত্রী ও পারিষদবর্গ ম্লানবদনে দণ্ডায়মান হইলেন। গগনে প্রকাণ্ড মেঘখণ্ডের উদয়ে কেবল যে শশধরকে ম্লান করে এমন নহে, নক্ষত্ররাজিকেও ম্লান করিয়া তুলে। অনন্তর রাজা উপবিষ্ট হইলে সকলে উপবেশন করিলেন। মহারাজ শর্য্যাতি অশ্রুধারা-খিন্ননয়নে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গদগদ বচনে মন্ত্রী ও পারিষদবর্গকে সম্বোধন পূর্ব্বক মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে যাইবেন, এমন সময়ে সভাগৃহের

দ্বারদেশে মহা গণ্ডগোল শ্রুতিগোচর হইল। রাজা অনিমেষ নয়নে ব্যগ্রভাবে সেই দিকে নিরীক্ষণ করিয়া জানিতে পারিলেন যে কয়জন লোক সভাগৃহে প্রবেশ লাভার্থে চেষ্টা করিতেছে, দ্বারবান তাহাদিগকে পথ ছাড়িতেছে না। রাজাজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র দ্বারবান তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে পাঁচ ছয় জন অস্ত্রধারী পুরুষ প্রণাম পুরঃসর জানাইল, "মহারাজ! আপনকার আদেশ ক্রমে যে সকল দীন দুঃখী অন্নাভাবে পথিপার্শ্বে অথবা অন্যত্র ক্রন্দন করিতে থাকে তাহাদিগকে আমরা আপনকার প্রতিষ্ঠিত পান্থশালায় স্থানদান করিয়া থাকি। অদ্য আমরা অদূরবর্ত্তী উপবনস্থ সরোবরের পশ্চিম পার্শ্বে জনৈক বৃদ্ধ অন্ধ দীনজন দেখিয়া আপনকার পান্থশালায় আনয়ন করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে কত বুঝাইলাম। তিনি অন্নাভাবে ক্লিষ্ট ও শীর্ণকায় হইলেও আমাদের কথায় ভ্রুক্ষেপ করিলেন না দেখিয়া তাঁহাকে বধির বিবেচনায় আমরা অধীন কর্ম্মচারিগণকে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক আনয়ন করিবার পরামর্শ দিলাম। কিন্তু মহারাজ! বড় বিস্ময়ের কথা! তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই এক অদ্ভুত-পূর্ব্ব জ্যোতিঃ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া বহির্গত হইতে দেখিলাম। দগ্ধ হইবার ভয়ে কেহ তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিতে সাহস পাইল না। এক্ষণে আমা-দিগের কর্ত্তব্য বিষয়ে আপনকার আদেশ প্রার্থনীয়।"

রাজা শ্রবণ মাত্রেই বুঝিতে পারিলেন মহাপুরুষ ব্যতীত এতাদৃশ জ্যোতিঃ আর কাহারও অঙ্গদিয়া বহির্গত হইতে পারে না। সুতরাং সরোবরের পশ্চিমভাগে চ্যবন ব্যতিরেকে আর কোন মহাপুরুষ ত নাই। এজন্য রাজা শ্রবণ মাত্রেই ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা তাঁহার প্রতি কোন অত্যাচার কর নাই ত?"

প্রহরী। না মহারাজ! আমরা তাঁহার এতাদৃশ জ্যোতি নিরীক্ষণ করিয়া মহাপুরুষ জ্ঞানে তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সাহস পাই নাই।

রাজা। উত্তম কার্য্য করিয়াছ। তিনি যে স্থানে উপবিষ্ট আছেন তথায় অচিরে একটী পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দেও। কারণ মহর্ষিগণের সন্তোষের উপরই মদ্বিধ ব্যক্তিবর্গের শুভাশুভ নির্ভর করে।

রাজাজ্ঞা পাইয়া কর্ম্মচারী সাহ্লাদে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

ক্রমশঃ

শ্রীভূধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মোৎসব।

অসীম কৌশলময় জগন্নির্ম্মাতা করুণাময়ের শান্তিময় রাজ্যে প্রাকৃতিক নিয়মবশতঃ যখন কোন পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হয়, তখন জগতের প্রত্যেক অণুপরমাণুর অন্তরে অন্তরে অলক্ষ্যভাবে যেন এক মহান্ সংঘর্ষ চলিতে থাকে। এ সূক্ষ্ম জগতের ঈদৃশ বিশাল সংঘর্ষের অপ্রতিহত বেগে স্থূল জগতের নিয়ন্ত্রা শক্তিও নানারূপ বিশৃঙ্খল হইয়া থাকে, ঐ বিশৃঙ্খলের ফলে রজস্তমের উপচয় বশতঃ দেবাসুরে, ব্রহ্ম ক্ষত্রে, জাতিতে জাতিতে, জাতিতে জাতিতে এমন কি সহোদরে সম্প্রদয়েও নানারূপ বিরোধ উপস্থিত করিয়া হিতাহিত বিবেক-শূন্যতা বশতঃ শান্তির রাজ্যকে অশান্তিপিশাচের রঙ্গভূমি করিয়া তুলে।

নৃপনামধারী রাক্ষসগণের নিরন্তর কদাচরণের দ্বারা পাপভারপীড়িতা ধরণী তাদৃশ দুর্ব্বৃত্তগণের দুর্ব্বহভার বহনে অসমর্থ বশতঃ রসাতলে যাইবার উন্মুখ হইলে, জগদ্ধিতৈষী মহানুভব দেবঋষিগণের স্তবে সন্তুষ্ট ভগবান্ নারায়ণ ভূভার হরণের নিমিত্ত যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। বহুকালিক যাগ-যজ্ঞাদি-বিশোধিত দানধর্ম্মপ্রধান এই অবনীমণ্ডলে পুণ্যবানদিগের গৃহে স্বীয় অসাধ্য-সাধনী শক্তি যোগমায়াও সাঙ্গোপাঙ্গের সহিত মায়িক জন্ম পরিগ্রহ করেন। উপাসকের উপাসনা সিদ্ধির নিমিত্ত, অধর্ম্মের নিরাকরণ ও ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের জন্য, দুষ্টের দণ্ডবিধান ও শিষ্টের পালনার্থ, অসাধুর বিনাশ ও সাধুর রক্ষার্থে- -ফলতঃ প্রলয়সাগর নিমজ্জনোন্মুখ জগতে প্রকৃতির সামঞ্জস্য বিধানের জন্যই ভগবানের আবির্ভাব। এইরূপে তিনি যে যেসময়ে এই অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া জগতের অশেষ কল্যাণসাধন করিয়াছেন সেই অনন্ত কল্যাণময়ের আবির্ভাব তিথির স্মরণ ও অর্চ্চনার্থ আর্য্যশাস্ত্রে নানারূপ বিধিব্যবস্থা উল্লিখিত হইয়াছে। মহাপুরুষের জন্মতিথি অপার মহত্ত্বে পরিপূর্ণ, আনন্দময়ের জন্মোৎসব অপরিসীম আনন্দপ্রবাহে প্রবহমান, তাই আজ সেই আনন্দবার্ত্তা ভক্তজগতে প্রচারের জন্য প্রকৃতিদেবী নবসাজে সুসজ্জিত। জল, স্থল, নভোমণ্ডল, অনল, অনিল সকলেই যেন আজ মহাপুরুষের আগমন প্রতীক্ষায় প্রশান্ত ভাব ধারণ করিয়া তাঁহার প্রীতি-বিধানের জন্য নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্প-আভরণে সুশোভিত হইল।

বর্ষার ও শরতের সন্ধিক্ষেত্রে জন্মাষ্টমীর অবস্থান, প্লাবনের ও শোষণের

মধ্যে উপচয় ও অপচয়ের মিলনক্ষেত্রে, বপন ও পোষণের শেষে জন্মাষ্টমীর স্থিতি। অম্বুবাচির পরে বীজ বপন হইল। ধরিত্রী সগর্ভা হইলেন, ভগবানও পূর্ণরূপে দেহ ধারণ করিলেন। এইটুকুই শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীর মাহাত্ম্য।

নূতন আগমন করিলেই এইরূপই হয়। বাধা-বিরোধ অত্যাচার উৎপীড়নের মধ্যে নূতনের উদ্‌গম, কিন্তু সে নূতনকে রক্ষা করিতে হইলে পূর্ব্বাপর-প্রসারিণী কালরূপিণী কালিন্দী পার হইয়া নন্দালয়ে গিয়া রাখিয়া আসিতে হইয়াছিল। সেই জন্যই যখন ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে নিশাকালে কংশ-কারাগারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেহ ধারণ করেন, তখন ভগবানেরই আদেশে বসুদেব নিজপুত্র ক্রোড়ে ধারণ করিয়া সেই ঘোর নিশাতে যমুনা পার হইয়া গোকুলে গমন করেন। সেই নন্দালয়ে নন্দরাণী যশোদার ক্রোড়ে সেই সন্তানটী রাখিয়া আসিলেন। স্বয়ং ভবানী শিবারূপে পথ দেখাইয়া গিয়াছিলেন, এবং কুলপ্লাবিনী তরল তরঙ্গিনী কালিন্দী হঠাৎ হাঁটুজল হইয়া পার হইবার পথ দিয়াছিলেন।

সেই স্থানে—সেই গোকুলে গোপাল সঙ্গে রাখাল সাহচর্য্যে মধুর বৃন্দাবনে সেই নূতন পরিপুষ্ট হন। সে পরিপুষ্টির পক্ষে পুতনা বধ, যমলার্জ্জুন উদ্ধার, বৎসাসুর নাশ, কালীয় দমন প্রভৃতি। তৎপরে কাল পূর্ণ হইলে সেই নূতন —শ্রীকৃষ্ণ কংশ বধ করেন, তাহার পরে মথুরা অধিকার করিয়া উগ্রসেনের প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বাপর যুগের ৮৬৩৮৮০ বৎসর গত হইলে ৮ই ভাদ্র কৃষ্ণপক্ষীয়। শুভ অষ্টমী তিথিতে, ছচল্লিশ দণ্ড অর্থাৎ রাত্রির চতুর্দ্দশ দণ্ড গত হইলে যখন আকাশে রোহিণী নক্ষত্র উদিত ও তাহার সহিত অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্র সকল ও গ্রহগণ প্রসন্ন হইল, দিক সকল শান্তভাব ধারণ করিল, গগনে বিমল তারকা রাজি উদিত হইল, গ্রাম ও নগর সকলের বিবিধ মঙ্গলে পৃথিবী মঙ্গলময়ী হইলেন। নদী সকল নির্ম্মলসলিলা, হ্রদ সকল পদ্মশোভায় সুশোভিত ও বৃক্ষ স্কন্ধে স্তবক স্ফুরণ হইল, বিহগগণ আনন্দে কূজন ও ভ্রমরগণ ঝঙ্কার করিতে লাগিল। সুখস্পর্শ পবিত্র সৌরভবাহী নির্ম্মলবায়ু বহমান হইল, দ্বিজাতিগণের নির্ব্বাণপ্রায় যজ্ঞাগ্নি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, অসুর-নিপীড়িত সাধুগণের মন প্রসন্ন হইল, স্বর্গে দুন্দুভি সকল একতালে ধ্বনিত হইতে লাগিল। কিন্নর গন্ধর্ব্বগণ ও সিদ্ধচারণগণ স্তব এবং বিদ্যাধরগণ অপ্সরাগণের সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। দেব ও ঋষিগণ সহর্ষে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। জলধরগণ সাগরের ন্যায় মন্দ মন্দ গর্জ্জন করিতে লাগিল।

এই শুভ সময়ে পূর্ব্বদিক হইতে পূর্ণচন্দ্রের উদয়ের ন্যায় কংশকারাগারে দেবকীর গর্ভ হইতে সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান সাক্ষাৎ বিষ্ণু আবির্ভূত হইলেন। ভগবানের অঙ্গকান্তি দ্বারা সূতিকাগৃহ আলোকিত হইতে লাগিল। বসুদেব জাত পুত্রের স্বরূপ অবলোকন করিয়া তাঁহাকে পরমপুরুষ জ্ঞানে কৃতাঞ্জলীপুটে স্তুতি করিতে লাগিলেন। বসুদেব বলিলেন ভগবন্! আপনাকে সাক্ষাৎ পরমপুরুষ, আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম এবং সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মারূপে জানিলাম। আপনি সর্ব্বস্বরূপ, সর্ব্বব্যাপক পরমার্থবস্তু অতএব অসীম; সুতরাং আপনার অন্তরও নাই বাহিরও নাই। হে বিভো! তত্ত্বদর্শিগণ বলিয়া থাকেন— আপনা হইতে এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে অথচ আপনি গুণবিকারাদি রহিত। হে জগৎপতে! আপনি নিজ মায়া দ্বারা ত্রিলোকের পালনের নিমিত্ত সত্ত্বগুণাত্মক শুক্লবর্ণ, সৃষ্টির নিমিত্ত রজোগুণসংবর্দ্ধিত রক্তবর্ণ; এবং ধ্বংসের নিমিত্ত তমোগুণযোগে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়া থাকেন। হে জগৎ-পালক আপনি এই সমস্ত লোকের রক্ষাভিলাষে কৃষ্ণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং দুষ্ট অসুররাজগণ কর্ত্তৃক ইতস্ততঃ অসৎ কার্য্যে প্রেরিত সৈন্যসকল সংহার করিবেন। হে সুরেশ্বর! দুষ্ট কংশ আপনার অগ্রজদিগকে নিধন করিয়াছে এক্ষণে আপনার অবতার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেই অস্ত্রধারণপূর্ব্বক এই স্থানে আগমন করিবে।

যথা:—স ত্বং ত্রিলোকস্থিতয়ে স্বমায়য়া বিভর্ষি শুক্লং খলু বর্ণমাত্মনঃ।
সর্গায় রক্তং রজসোপবৃংহিতং কৃষ্ণঞ্চ বর্ণং তমসা জনাত্যয়ে॥
ত্বমস্য লোকস্য বিভো বিরক্ষিষুর্গৃহেঽবতীর্ণোঽসি মমাখিলেশ্বর।
রাজন্য সংজ্ঞাসুরকোটী যূথপৈর্নিব্যূহ্যমানা নিহনিষ্যসে চমূঃ॥

অতঃপর দেবকীও স্তব আরম্ভ করিয়াছিলেন,—হে ভগবন্! বেদ সকল যে ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা অপ্রকাশিত, যিনি বিশ্বের কারণ, সর্ব্বব্যাপক, চেতন, নির্গুণ, নির্ব্বিকার, বিশ্বেশ্বর, শাশ্বত অর্থাৎ পূর্ব্বে ও পরে বর্ত্তমান, দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণাদির প্রকাশস্বরূপ আপনিই সেই বিষ্ণু। কালবেগে দ্বিপরার্দ্ধ পরিমিত ব্রহ্মার আয়ুর অবসানে চতুর্দ্দশ ভুবন বিনষ্ট হইলে, মহাভূত পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয় নিজ নিজ কারণে লীন হইলে, অহঙ্কার মহতত্ত্বে লয়প্রাপ্ত হইলে, প্রকাশিত বিশ্ব প্রকৃতিতে গমন করিলে, একমাত্র আপনিই অবশিষ্ট থাকেন। কিন্তু সেই আপনি আজ আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইহা মনুষ্যলোকের বিড়ম্বনা।

যথা ঃ—

রূপং যত্তৎ প্রাহুরব্যক্তমাদ্যং ব্রহ্মজ্যোতির্নির্গুণং নির্ব্বিকারম্।
সত্তামাত্রং নির্ব্বিশেষং নিরীহং স ত্বং সাক্ষাদ্বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ ॥
নষ্টেলোকে দ্বিপরার্দ্ধাবসানে মহাভূতেষ্বাদি ভূতং গতেষু।
ব্যক্তেঽব্যক্তং কালবেগেন যাতে ভবানেকঃ শিষ্যতেঽশেষসংজ্ঞঃ ॥
যোঽয়ং কালস্তস্যতেঽব্যক্তবন্ধো চেষ্টামাহুশ্চেষ্টতে যেন বিশ্বম্।
নিমেষাদির্ব্বৎসরান্তো মহীয়াং স্তংত্বেশানং ক্ষেমধাম প্রপদ্যে ॥
মর্ত্ত্যো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্ লোকান্ সর্ব্বান্ নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ।
ত্বৎপাদাব্জং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য সুস্থঃ শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি ॥

কিন্তু ভক্ত-বৎসল ভগবান ভক্তবর বসুদেবের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া দেবকীকে সান্ত্বনা বাক্যে বলিলেন, আর আপনাদের কোন ভয় নাই, আমি সত্বরেই দুরাচার কংশকে শমন-সদনে প্রেরণ করিতেছি ; আমার কার্য্যের সহায়তার জন্য অচিন্ত্যশক্তি যোগমায়া বৃন্দাবনে গোপরাজ নন্দের পত্নী যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ; আমি তাঁহার সহকারিতায় অচিরেই আপনাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিব, আপনারা আশ্বস্ত হউন।

ভগবান পুনরায় বলিতে লাগিলেন—তোমরা তোমাদের তৃতীয় পূর্ব্ব-জন্মের উগ্র তপস্যা দ্বারা আমাকে পরিতুষ্ট করিলে আমি তোমাদিগকে অভিলষিত বর প্রদানে সম্মত হওয়ায় তোমরা মৎসদৃশ পুত্র প্রার্থনা করিয়াছিলে, আমিও সেই সময় হইতে তোমাদিগের পুত্রত্ব স্বীকার করিয়া আসিতেছি। কিন্তু এতদিনে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাই আজ তোমাদিগের এই তৃতীয় জন্মে পূর্ব্ব-প্রদর্শিত চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে আমিই আবার প্রাদুর্ভূত হইয়াছি। অতঃপর ভগবান দেবকীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন—হে সতি! আমার বাক্য এইরূপে সত্য হইল প্রথমতঃ আমার জন্ম জানাইয়া দিবার নিমিত্ত আমার এই নিজমূর্ত্তি চতুর্ভুজাদি বিশিষ্টরূপ তোমাদের দেখাইলাম। নচেৎ অন্য কোন প্রকারে মনুষ্যশরীর দ্বারা মদ্বিষয়ক জ্ঞান জন্মাইয়া দিবার সম্ভাবনা নাই। পুত্রভাবেই হউক অথবা ব্রহ্ম ভাবেই হউক পুনঃ পুনঃ আমাকে চিন্তা করিতে করিতে আমাতে বদ্ধস্নেহ হইয়া তোমরা উভয়ে পরিণামে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মদ্‌গতি প্রাপ্ত হইবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া নিস্তব্ধ হইয়াছিলেন এবং দেবকী ও বসুদেবের সমক্ষেই, স্বেচ্ছানুসারে সদ্যই প্রাকৃত শিশুর সদৃশ ভাব ধারণ করিয়াছিলেন।

যথাঃ— তৃতীয়ে২স্মিন ভবে২হং বৈ তেনৈব বপুষাথ বাং।
জাতোভূয়স্তয়োরেবং সত্যং মে ব্যাহৃতং সতি॥
এতদ্বাং দর্শিতংরূপং প্রাগ জন্মস্মরণায় মে।
স্নান্যথা মদ্ভবং জ্ঞানং মর্ত্যলিঙ্গেন জায়তে॥
যুবাংমাং পুত্রভাবেন ব্রহ্মভাবেন বাসকৃৎ।
চিন্তয়ন্তৌ কৃতস্নেহৌ যাস্যেথে মদ্গতিং পরাং॥

এবৎসর অর্দ্ধরাত্রিতে অষ্টমী তিথি এবং রোহিণীনক্ষত্র মিলিত হইয়াছে; এজন্য মহাযোগ হইয়াছে। এরূপ যোগ সকল বৎসর হয় না। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে রোহিনী নক্ষত্রযোগে অর্দ্ধরাত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মপুরাণে কথিত আছে;—

"অথ ভাদ্রপদে মাসি কৃষ্ণাষ্টম্যাং কলৌযুগে।
অষ্টবিংশতিমে জাতঃ কৃষ্ণোহসৌ দেবকীসুতঃ॥

ভাদ্রমাসে কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে কলির অষ্টাবিংশতি পরিমিত যুগে দেবকীগর্ভে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

জন্মাষ্টমী ব্রতে সকলেরই উপবাস করা কর্ত্তব্য। অতএব গৃহীগণও পূর্ব্বকালে গুরুগৃহে উপস্থিত হইতেন এবং গুরু-কৃপায় প্রসাদ গ্রহণ করিয়াই ব্রত সমাপন করিতেন। শাস্ত্রকারগণও তাই বলিয়া গিয়াছেন যাঁহারা এরূপ সুযোগ না পান, তাঁহাদিগকে অর্দ্ধরাত্রে বিধিপূর্ব্বক ভগবানের পূজা বসুধারা প্রদান এবং তদীয় জন্ম ভাবনা করিতে হইবে।

শাস্ত্রকারগণ ভূয়োভূয়ো বলিয়া গিয়াছেন যে, এই জন্মাষ্টমী ব্রত স্ত্রীপুরুষ সকলেরই অনুষ্ঠেয়, ইহা সন্ধ্যাবন্দনাদির ন্যায় নিত্য কর্ম্ম। আবার এই জন্মাষ্টমী ব্রত করিলে নানারূপ ফললাভ হয় বলিয়া ইহা কাম্যকর্ম্ম বলিয়াও পরিগণিত। ভবিষ্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—"হে কুরুনন্দন, এই জন্মাষ্টমীতে একটীমাত্র উপবাস করিলে লোকে সপ্তজন্মকৃত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে, ইহাতে কোনরূপ সন্দেহ নাই।

যথা একনৈবোপবাসেন কৃতেন কুরুনন্দন।
সপ্তজন্ম কৃতাৎপাপাৎ মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।

এই তিথিতে তীর্থস্নান ও পিতৃতর্পণাদি করিলে বিশেষ ফললাভ হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে কথিত হইয়াছে—"মন্বন্তরাদিকালে তীর্থ স্নান ও পূজাদি দ্বারা যে ফললাভ হয়, ভাদ্রমাসে জন্মাষ্টমীতে সেইরূপ স্নান পূজাদি অনুষ্ঠান করিলে

তাহার কোটিগুণ ফললাভ হয়। অতএব এই জন্মাষ্টমী তিথিতে যে ব্যক্তি পিতৃলোকদিগের উদ্দেশ্যে বারিমাত্রও প্রদান করেন, শতবর্ষব্যাপী গয়াশ্রাদ্ধ করিলে যে ফল, তাঁহার তাহাই লব্ধ হইবে, ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

যথা :—"যথাদি দিবসে প্রাপ্তে যৎফলং দানপুণ্যজৈঃ।
ফলং তাম্রশতেহষ্টম্যাং ভবেৎ কোটিগুণং দ্বিজ॥
তস্যাং তিথৌ বারিমাত্রং পিতৃণাং যঃ প্রযচ্ছতি।
গয়াশ্রাদ্ধং কৃতং তেন শতাব্দং নাত্র সংশয়ঃ॥"

একণে নন্দোৎসবের কথা। নিরবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও গোপরাজনন্দের সৌভাগ্যের সীমা নাই। ভক্তিপ্রতিমা যশোমতী ধর্ম্মপ্রাণ নন্দরাজের মহিমার ইয়ত্তা করে কার সাধ্য? দূর—অতিদূর কোনও স্মরণাতীত যুগে গোপরাজ নন্দের নিকেতন পবিত্র করিতে, আশা চরিতার্থ করিতে, জীবন ধন্য করিতে, ভূতভাবন ভগবান্ নারায়ণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সেই সাধের মুহূর্ত্তে সেই সাধের উৎসব, সেই সাধের আনন্দোচ্ছ্বাস এখনও পৃথিবী আনন্দে যতনে পুরিয়া রাখিয়াছে। পাপের সহস্র কশাঘাতে, দুঃখের অজস্র আক্রমণে, দৈবের প্রচণ্ড প্রতাড়নে হৃদয়ের সমস্ত তন্ত্র ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে, ধর্ম্মগ্রন্থিনিচয় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তথাপি আর্য্যভূমি অতি সযত্নে আজও সেই সাধের স্মৃতি হৃদয়ে পুরিয়া রাখিয়াছে। এখনও পরিত্যাগ করে নাই, বুঝি কখনও সেই স্মৃতি ছাড়িতে পারিবে না।

সেই অতীত যুগের নন্দোৎসব! যে দিন আকাশে দেব যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর সকল জগন্মোহন তানে পৃথিবী প্লাবিত করিয়া ভগবৎস্তব কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, যখন কৈলাসে মহেশ্বর, ব্রহ্মলোকে বিরিঞ্চি অনন্ত আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন; সেই নন্দোৎসব কি অপূর্ব্ব ব্যাপার! ব্রজে গোপকুল আনন্দহিল্লোলে নৃত্যপরায়ণ, গোপীসকলের, জনককল্প পাবিত্রগণের অদ্ভুত বিকাশে উচ্ছ্বসিত, দিগঙ্গনাগণ স্মিতস্ফারিতবদনা, পৃথিবী কুসুমবিকাশে হাস্যমুখী—নন্দযশোদার অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র এক অনন্ত আনন্দের অন্তঃস্রোতঃ বহিয়া গিয়াছিল। কোথায় সেই প্রাণপ্রহ্লাদিনী অপূর্ব্ব উৎসবলীলা! আজ কি সেই উৎসবের স্মৃতি লইয়া আমাদিগকে উৎসবপরিতুষ্ট হইতে হইবে! তাই এখনও আর্য্যসন্তানগণ জন্মাষ্টমী করেন।

সনাতন-ধর্ম্মপ্রচারিণী সভায় এই উৎসবে যাঁহারা যোগদান করিতে পারিয়াছিলেন তাঁহারাই বলিতে পারেন শ্রীব্রহ্মর্ষি নগেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী

মহোদয়ের যত্নে তথায় কিরূপ প্রেমোদ্দীপক মহোৎসবে ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, এবং এই উৎসব উপলক্ষে তিনি যে দীন-দুঃখী, কাঙ্গালীকে সুভোজ্যে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া নয়ন সার্থক করিতে পারিয়াছিলেন।

পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা উক্ত মহাপুরুষের এবং তদীয় সনাতন ধর্ম্মপ্রচারিণী সভার এই মহোৎসবের কিঞ্চিৎ আভাস এস্থলে উল্লেখ করিব। এই সভাগৃহের দ্বারদেশে প্রবেশ করিবামাত্র আমরা অপার আনন্দলাভ করিলাম। দ্বারে দ্বারে সুগন্ধি পুষ্পমালা, আম্রপল্লবশ্রেণী সুশোভিত এবং সশীর্ষ নারিকেল ফল ও আম্রপল্লবসহ মনোহর মঙ্গলঘটসকল বারিপরিপূর্ণ। কোন গৃহে সমবেত ভক্তমণ্ডলী সুমধুর স্বরে হরিগুণগান কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তআকর্ষণ করিতেছিলেন।

ক্রমে উপরে উঠিয়া দেখিলাম ত্রিতলে এক সুবিস্তৃত কক্ষের মধ্যে সুচারুভূষণে ভূষিত মহামূল্য মখমলমণ্ডিত অপূর্ব্ব একখানি সুউচ্চ সিংহাসনে ভগবান আসীন। সম্মুখে সুচারু আসন প্রসারিত—তদুপরি, সেই ধর্ম্মার্থে উৎসর্গীকৃতজীবন নিখিল জনগণমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পরদুঃখকাতর অলৌকিক প্রতিভাশালী প্রাতঃস্মরণীয় পূজ্যপাদ মহাপুরুষ সমাসীন। আকর্ণবিস্তৃত অক্ষিযুগল স্থির নিশ্চল-নিমীলিত, যেন অন্তরে কি এক অপূর্ব্ব মোহনমূর্ত্তি অবলোকন করিতেছেন! অধর ওষ্ঠ অতি মৃদুভাবে কম্পিত, ধীরে অতি ধীরে ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত! মহাপুরুষ যেন মহাধ্যানে মগ্ন!

এই মহাত্মাকে যিনি একবার দর্শন করিয়াছেন, তিনিই বিমুগ্ধ হইয়াছেন। এই ধূর্জ্জটিপ্রতিম তপোধন যেন নিমীলিত নেত্রে তপোনিরত রহিয়াছেন: তদীয় পরিধানে বারাণসী বস্ত্র, সম্মুখে সুদীর্ঘ শ্মশ্রু, স্বল্প মারুতস্পর্শে ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া যেন সাক্ষাৎ সেই ভূতভাবন কৈলাসবিহারী পরম পিতা পরমেশ্বরের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছিলেন। স্বামীজির এই স্বর্গীয় মূর্ত্তি দর্শনেই ত ভক্তিরসের আবির্ভাব হয়, তাহাতে যখন অমৃতময় উপদেশাবলী শ্রবণ করি, তখন যে কি অপার আনন্দলাভ হয় তাহা এই সামান্য লেখনী দ্বারা প্রকাশ করা যায় না; কারণ সেই অপূর্ব্ব কথামৃত যিনি একবার শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারই শ্রবণবিবর শীতল হইয়াছে সে উপদেশ জীবনে বিস্মৃত হইবার নহে। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে এই মহাপুরুষের শ্রীমুখ-নিসৃত দুই একটী কথামৃত প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

ইন্দ্রিয়সকল কলঙ্কিত হয় বলিয়াই ইন্দ্রিয়ের অন্তরালস্থিত সেই অনন্ত জ্যোতিষ্মান্ চিদানন্দময়ের অসীম জ্যোতিঃ ইহাতে সম্যক প্রতিভাত হইতে পারে না, একথা মহর্ষি পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—যে, ইন্দ্রিয়ের কলঙ্ক মলিনতা, কালিমা বা আবিলতা বলিলে আমরা কি বুঝিয়া থাকি ? কোনও দ্রব্যের স্বচ্ছতাআচ্ছাদন অপ্রীতিকর, কুৎসিত কৃষ্ণবর্ণ দ্রব্যবিশেষকে বুঝা যায়। তীক্ষ্ণধার তরবারিতে কলঙ্ক পড়িয়াছে বলিলে আমরা বুঝি তরবারিতে মরিচা পড়িয়া তাহার ঔজ্জ্বল্য হ্রাস করিয়াছে। এইরূপ ইন্দ্রিয় কলঙ্কিত বলিলেও আমাদিগকে বুঝিতে হইবে ইন্দ্রিয়ের উপর আবিলতাময়, কালিমা বা অন্ধকারময় কোনও অপ্রীতিকর মলিন পদার্থ পতিত হইয়া তাহার ঔজ্জ্বল্য, স্বচ্ছতা বা শুভ্রতা আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। সেই মলিন আবিল পদার্থই পাপ। ইন্দ্রিয়গণ পাপ-বিদ্ধ হয় বলিয়া তাহাতে জ্যোতির্ম্ময়ের চির নির্ম্মল জ্যোতিঃ প্রতিভাত হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়ের এই আবল্য এই কলঙ্ক কি উপায়ে নিবারণ করা যাইতে পারে, তাহারও কিছু আভাস নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

ঈর্ষা, দ্বেষ, হিংসা, ঘৃণা, কাম, ক্রোধ লোভ, মোহ, দম্ভ, অসূয়া, জিঘাংসা অশৌচ, অভিমান, অহঙ্কার ইত্যাদি পাপবৃত্তি গুলাকে ইন্দ্রিয়ের আবল্য, কালিমা, কলঙ্ক বা দাগ বলে। আমাদের ইন্দ্রিয় হইতে ঐ সকল কৃষ্ণবর্ণ চিহ্নগুলি সম্পূর্ণরূপে অপনীত হইতে পারে না, তবে শমদম, ধৃতি ক্ষমা তপঃ শৌচ, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, দাক্ষিণ্য তিতিক্ষা, ধ্যান, ধারণা, পূজা ও অর্চ্চনাদি শুভবর্ণ বিশিষ্ট ইষ্টপ্রদ বৃত্তিসমূহের ক্রিয়াধিক্য দ্বারা হিংসা দ্বেষাদি ইন্দ্রিয়ের কলঙ্ক সকল ক্রমে ক্রমে সঙ্কোচ হইয়া যায়। মলিন বৃত্তি সঙ্কুচিত হইতে পারে বটে, কিন্তু একেবারে বিলুপ্ত কখনই হইয়া যায় না, প্রত্যেক কলঙ্কের একটু করিয়া চিহ্ন হৃদয়ক্ষেত্রে থাকিয়া যায়, সেই চিহ্নের নাম সংস্কার। এই সংস্কারকে হৃদয়ের গ্রন্থি বলে। শত শত, সহস্র সহস্র এমন কি কোটি কোটি জন্মের সংস্কার সমস্ত আমাদের হৃদয়ক্ষেত্রে নিহিত আছে। দয়া-দাক্ষিণ্যাদি সদ্বৃত্তিগুলি যৎকালে বিপরীত গুণবিশিষ্ট নিকৃষ্ট বৃত্তিনিচয়ের অনুশীলনাধিক্য বশতঃ সঙ্কুচিত হইয়া বিলুপ্তপ্রায় হয় তখন তাহাদের সংস্কার হৃদয়ে গ্রন্থিবৎ থাকিয়া যায়। শুভাশুভ সংস্কারকে শুভাদৃষ্ট ও দুরদৃষ্ট বলে। এই সুসংস্কার বা শুভাদৃষ্ট এবং কুসংস্কার বা দুরদৃষ্ট জন্যই জীবের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক যাবতীয় সুখ দুঃখ সংঘটিত হয়।

এস্থলে আর একটী বিষয়ের আলোচনা না করিলে বিষয়টি যেন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। "বাসনা" নামে একটী শব্দ বোধ হয় আপনারা সকলেই অবগত আছেন, এই শুভাশুভ অদৃষ্ট জন্য মনে যে পুণ্য বা পাপের চিন্তা উপস্থিত হয়, তাহাকেই বাসনা কহে। এই বাসনাই জীবের বন্ধনের হেতু—অর্থাৎ বাসনা হইতে জীবের পুনর্জ্জন্ম লাভ হইয়া থাকে।

আমরা যদি আমাদের ইন্দ্রিয়ের কলঙ্ক বা হিংসা দ্বেষাদিকে সঙ্কুচিত করিবার চেষ্টা না করিয়া ক্রমাগত উহাদিগকে পরিস্ফুরিত করিতে যত্নশীল হই, তাহা হইলে কিরূপ ইষ্ট বা অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে, তদ্বিষয়েও একটু আলোচনার প্রয়োজন। হিংসাদি নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলির অত্যধিক অনুশীলনে কেবল যে তদ্বিপরীত গুণবিশিষ্ট সদ্‌বৃত্তিসমূহ পরাভূত হইয়া সঙ্কুচিত ও অকর্ম্মণ্য হয় তাহা নহে, আমাদের দৈহিক ক্রমাবনতিও সাধিত হয়। পুরুষানুক্রমে যদি আমরা ক্রমাগত পাপপুঞ্জেরই পর্য্যালোচনা ও অনুশীলন করিতে থাকি, তাহা হইলে দুইচারি পুরুষে না হউক, পঞ্চাশ ষাট পুরুষ পরে আমাদের এত আদরের এই মানবদেহ বনমানুষ বা বানরের দেহে পরিণত হইবার সম্ভব। ইহা কবির কল্পনা বা পাগলের প্রলাপ নহে, দার্শনিক পণ্ডিতগণের অখণ্ডনীয় সিদ্ধান্ত।

ডারুইন প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বহুতর গবেষণা দ্বারা সৃষ্টির ক্রমোন্নতি মাত্র স্থির করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে মানুষ বানরের বংশধর, আমাদের আর্য্য দার্শনিক পণ্ডিতগণ কিন্তু ক্রমোন্নতি ও ক্রমাবনতি দুইটী সিদ্ধান্তই স্থির করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। সদসৎ কর্ম্মফলানুযায়ী দেবতা হইতে মানবে এবং মানবও দেবতায় পরিণত হইতে পারেন। অদ্য যে নিকৃষ্ট তির্য্যক্ যোনি লাভ করিয়া জীবসমাজে অতি অগণ্য, অতি হেয় বলিয়া ঘৃণিত, যুগযুগান্তে ক্রমোন্নতি প্রভাবে সেও একদিন ইন্দ্রত্ব লাভ করিতে পারে। অবার অদ্য যিনি পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করতঃ সমগ্র ত্রিদশ রাজ্যের একাধিপত্য লাভ করিয়া ইন্দ্রত্ব করিতেছেন, কলুষিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে কাল-ক্রমে তিনি কৃমি কীটরূপে পরিণত হইতে পারেন। আর্য্যশাস্ত্রকারগণের ইহা অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত।

মনোভাবের সঙ্গে সঙ্গে যে শরীরগত আকারের বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় সামান্য অনুসন্ধান করিলেই সকলে তাহা লক্ষ্য করিতে পারেন। এক্ষণে কি উপায়ে ইন্দ্রিয়ের কলঙ্ক, ইন্দ্রিয়ের দাগ অপনীত হইতে পারে, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আমরা এক্ষণে দেখিব কেবলমাত্র গঙ্গা প্রভৃতি তীর্থ স্নানাদিতে

এই দাগ বিধৌত হইতে পারে কি না? বাহ্য স্নানে আভ্যন্তরিক পাপ বিধৌত হওয়া সম্ভব বলিয়া বিবেচনা হয় না। হরিনাম সংকীর্ত্তন করিলে অথবা দুর্গা-নাম মুখে উচ্চারণ করিয়া বলিলে ইন্দ্রিয়ের কলিমা বিদুরিত হইতে পারে না। উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে কর্ম্ম করার প্রয়োজন। কার্য্য কর্ম্ম করিতে করিতেই গৃহীর কামনার ক্ষয় হইয়া থাকে। নিষ্কাম কর্ম্ম শুক নারদাদি ঋষিগণেরই জন্য ব্যবস্থেয়, গৃহীর কিন্তু তাহা নহে। নতুবা তুমি ঘোর সংসারী ধন ধান্য স্ত্রী পুত্র, মান প্রতিপত্তির কামনা প্রতিনিয়ত করিতেছ তোমার প্রতি লোমকূপ হইতে কামনার পূতিগন্ধ নির্গত হইতেছে, তুমি যদি বল মা জগজ্জননি আমি কিছুই চাহি না। অন্তর্য্যামী মা তোমার অন্তর বাহির দেখিতেছেন, মা তোমার মৌখিক প্রার্থনায় এরূপ বাচনিক নিষ্কাম ধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে হাস্য করিবেন। তাই বলিতেছিলাম এই জন্মাষ্টমী প্রভৃতি বিধি বিহিত কাম্য কর্ম্মের নিত্য নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান করিতে করিতে যে সময়ে মনে সত্ত্বগুণের বিকাশ হইয়া রজঃ ও তমোগুণ ক্ষীণ হইয়া আসিবে, তখন মানব প্রকৃত মনুষ্যপদবাচ্য হইবার যোগ্য হইবে এবং পরমার্থ চিন্তায় চিত্ত ধাবিত হইবে। সেই সময়ে ভগবান শ্রীহরির মধুর নাম যে কোনরূপে গ্রহণ করিলেই ও ঐ পবিত্র নাম হৃদয়মন্দিরে স্থান দিলে আমরা একবারমাত্র স্মরণ করিলেই মানবের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইবে। কলিকালের অল্পায়ুঃ মানবের সাধনের অতি সুলভ পন্থা জানিয়া সকলেই এই পথাবলম্বন করাই মঙ্গল।

শ্রীউপেন্দ্রমোহন চৌধুরী কবিভূষণ।
মহাকালী পাঠশালা।

আগমনী গীতি।

আসিছে জগত-জননী,
ভূলোকে দ্যুলোক-বিভূতি
ছড়ায়ে কষিত-কনক বরণী।
শান্ত-শারদ-শ্যামলকুঞ্জে
ভকত-হৃদয় রাণি গো!
উঠুক ভরিয়া ভুবনে ভুবনে
তব মঙ্গল-বাণী গো;

এস উৎসবময় বিশ্বে,
দীপ্ত হিরণ কান্তি বিতরি'
উজলি নিখিল দৃশ্যে ;
গেছে গগনে তোমার জলদ-নিচয়
স্বপনের মত চলিয়া
ঐ সঘনে চকোর চাঁদিনী বিহাসে
উঠিছে কাহারে ডাকিয়া !
আজি দিকে দিকে কম-কোরক-নিচয়
সরসীর হৃদে সরোরুহ চয়
ওগো আপনা হারায়ে লুটাইতে চায়
তোমার রাতুল চরণে,
তুমি বাতুল করেছ তাদের জননি !
কি স্নেহ তোমার মরমে !
আজি চঞ্চল তব অঞ্চল মাতঃ
লুটায়ে পড়িছে ভুবনে
শত-বাঞ্ছিত শশ-লাঞ্ছিত হর
শোভিছে কিরীট-কিরণে
মর্দ্দিত মদ-মত্ত-মহিষ
মঙ্গল পদ-কমলে,
বন্দিছে প্রেম-চন্দন দিয়ে
নন্দন তব সকলে ;
ঐ অযুত-কোটী-কণ্ঠ সঘনে
"মা" "মা" রবে ডাকে,
আজ নিখিলের মাঝে হাসিছে জননী
আয়রে নেহারি মাকে ;
দাওমা সতত সন্তানে তব
প্রেম ভকতি না চাহি বিভব
শান্তির বারি পড়ুক ঝরিয়া
নাচুক পুলকে অবনী ;
ঐ আমার শরতে আমার প্রভাতে
দাঁড়ায়ে আমার জননী।

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য,
সংস্কৃত কলেজ।

৫ম বর্ষ] ভাদ্র, ১৩২২ [৫ম সংখ্যা

বীরভূমি

মাসিকপত্রিকা।

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক সম্পাদিত।

সূচীপত্র।

মূল্য বার্ষিক ডাকমাশুল সহ ২৲ দুই টাকা মাত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ তিন আনা।

১৫ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা এই ঠিকানায় প্রবন্ধ ও টাকাকড়ি সম্পাদকের নিকট প্রেরিতব্য।

১৫নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন হইতে শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

নবদ্বীপ নিদাঘ-বিদ্যালয়ে জাপানী পণ্ডিত কীমুরা।

বীরভূমি, ৫ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা,
ভাদ্র, ১৩২২।

ব্রজের পথে।

জগতের দিক হইতে ভগবানকে দেখা মানুষের সাধারণ অভ্যাস, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু মানবের পুরোদেশে যে আনন্দের বৃন্দাবন প্রকাশিত করিলেন, তাহার চিন্ময় মাধুর্য্যের সহিত মানবহৃদয়ের পরিচয় প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে এই অভ্যাসের পরিবর্ত্তন একান্তভাবে আবশ্যক। ভগবানের দিক হইতে এই জগৎ ও এই জীবন দেখিতে ও বুঝিতে পারা যায়, ইহাই সম্যক্ দর্শন। এই দর্শনের অভ্যাস বর্ত্তমান বহির্মুখ জগতের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন; আবার ভগবানের ভূমিতে দাঁড়াইয়া বিশ্বদর্শন করারও স্তরভেদ আছে। ভগবানকে আমাদের শাস্ত্রে সচ্চিদানন্দ বলা হইয়া থাকে। সত্তা জ্ঞান ও প্রেম এই তিন দিক হইতে আমরা সেই পরম তত্ত্বকে উপলব্ধি করিতে পারি; এই তিন দিক হইতে তাঁহাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা যথাক্রমে জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি পথ বলিয়া পরিচিত। প্রথমটা মনে হয় যে সত্তা চৈতন্য ও আনন্দ ইহারা বুঝি তিনটী পৃথক বস্তু। পরতত্ত্ব সম্বন্ধে যখন এইরূপ মনে হয়, তখন কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তি, সাধনার এই তিনটী পথকেও পৃথক বলিয়া মনে হয়, কিন্তু সচ্চিদানন্দও যেমন অখণ্ডতত্ত্ব জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তিও তেমনি একই পথ।

ভগবানের দিক হইতে বিশ্ব দেখিবার অভ্যাস আরম্ভ করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে তাঁহার সত্তাকে মূল ধরিয়া জগৎ ও জীবন দেখা যায়। তাঁহার চৈতন্যকে মুখ্য ধরিয়া জগৎ ও জীবন দেখা যায়, আবার তাঁহার আনন্দকে মুখ্য ধরিয়া জগৎ ও জীবন দেখা যায়। শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার ষট্‌সন্দর্ভ গ্রন্থে এই "সৎ" ভাবকে ব্রহ্মভাব, "চিৎ" ভাবকে পরমাত্ম ভাব, ও "আনন্দ"ভাবকে ভগবানভাব বলিয়াছেন। গৌড়ীয়বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণের ইহাই মত।

আনন্দভাবের মধ্যদিয়া জগৎ ও জীবন অর্থাৎ লীলা দর্শন কিরূপ, ভগবদ্‌গীতা আশ্রয় করিয়াও তাহা বুঝিতে পারা যায়। ভগবদ্‌গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবদ্-আবির্ভাবের হেতু নির্ণায়ক শ্লোক কয়টী সকলের জানা

আছে। সেখানে ভগবান বলিয়াছেন যে সাধুদিগের পরিত্রাণ, অসাধুগণের বিনাশ ও ধর্ম্মসংস্থাপন—এই তিনটী উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য ধর্ম্মের গ্লানির সময় আমি জগতে অবতীর্ণ হই। সাধারণ মানবের এইরূপ ধারণা,—কিন্তু ইহা প্রকৃত হেতু নহে। ইহা বহিরঙ্গ জনের জন্য। ভিতরের কথা যাহারা ঠিক বুঝিতে পারিবে না অর্থাৎ ভগবানের স্বরূপের সঙ্গে পরিচিত হইতে হইলে হৃদয়বৃত্তির যে অনুশীলন আবশ্যক, সে অনুশীলন যাহাদের নাই, তাঁহারা এই পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিবেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের মত এই যে এখানে বিষ্ণুর আবির্ভাবের কথা বলা হইয়াছে। বিষ্ণু ভগবানের অংশ, তিনি স্বয়ং ভগবান নহেন। ভগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু নমে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।

অর্থাৎ আমার কেহ প্রিয় বা দ্বেষ্য নাই, আমি সর্ব্বভূতে সমান। চতুর্থ অধ্যায়ে বলিয়াছেন 'দুষ্কৃতিকারীদের বিনাশ করি আর সাধুদের পরিত্রাণ করি'। কিন্তু এখানে বলিলেন আমার দ্বেষ্য বা প্রিয় কেহ নাই। এই দুই উক্তির মধ্যে যে একটা বিরোধ রহিয়াছে তাহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এই বিরোধের সামঞ্জস্য কি? টীকাকারগণ অনেকেই সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—রামানুজাচার্য্যের সামঞ্জস্যই অতি সুন্দর। শ্রীধরস্বামী অগ্নির উদাহরণ দিয়া বিষয়টি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। যেমন একজন লোক আগুণে হাত দিল তাহার হাত পুড়িয়া গেল, সে যাতনা পাইতে লাগিল, আর একজন, আগুণে অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিল, তাহার ক্ষুধার নিবৃত্তি হইল, আর একব্যক্তি আগুণ লইয়া যজ্ঞ করিল সে ব্যক্তি স্বর্গে গেল, আর একব্যক্তি আগুণ লইয়া প্রতিবেশীর ঘরে লাগাইয়া দিয়া নরকে গেল। এখন আগুণ কি বলিবে? আগুণ বলিতেছে "সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু নমে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ" আমি সর্ব্বভূতে সমান আমার কেহ দ্বেষ্যও নাই, কেহ প্রিয়ও নাই। যিনি যেরূপ ব্যবহার করিবেন তিনি সেইরূপ ফল পাইবেন। এই গেল গীতার দ্বিতীয় স্তর।

এইবার বিশ্বের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ বিষয়ক এই ধারণা দুইটী তুলনা করিয়া দেখা যাউক। প্রথমস্তরে যে ভাব বলা হইয়াছে তাহাতে ভগবান যেন আমাদের বাহিরে আপনার অসীম জ্ঞান ও অনন্তশক্তি লইয়া

বসিয়া আছেন—জগতে যেমন আমরা রাজা দেখিতে পাই তিনিও ঠিক সেইরূপ, তবে পৃথিবীর রাজার শক্তির ও জ্ঞানের একটা সীমা আছে আর তাঁহার তাহা নাই। তিনি বিশ্বপালনের জন্য কতকগুলি বিধি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, বিশ্ব সেই বিধি অনুসারে চলিতেছে। এই ভাবে চলিতে চলিতে বিশ্বব্যবস্থায় গোলযোগ উপস্থিত হয়—দানবকুলের আবির্ভাবে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়—সাধুগণ নিপীড়িত হন, সেই সময়ে পৃথিবী আর পাপ ভার সহ্য করিতে পারেন না—তিনি ব্রহ্মাকে সঙ্গে লইয়া ক্ষীরোদসাগর তীরে গমন করিয়া বিশ্বের পালনকর্ত্তা বিষ্ণুকে দুঃখের কথা নিবেদন করেন। তখন ভগবানের আবির্ভাব হয়। এই যে অবতারবাদের তত্ত্ব—ইহাকে যদি ভগবানের অবতার বলা যায় তাহা হইলে ভগবান বলিতে বিশ্বের স্থিতি বা পালন কর্ত্তাকে বুঝায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যেরা ভগবানের এই প্রকাশকে (Aspect) বিষ্ণু বলেন। সুতরাং গীতার ৪র্থ অধ্যায়ে বিষ্ণুর ভূমি হইতে অবতারতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। এখানে সচ্চিদানন্দের 'সৎ'ভাবকে আশ্রয় করিয়া তাহারই সাহায্যে অবতারবাদের রহস্য নিরূপণ করার চেষ্টা করা হইয়াছে।

ভগবানের এই অবতরণের বা আবির্ভাবের হেতু শুনিয়া আমাদের মনে অনেকগুলি প্রশ্নের উদয় হইতে পারে। প্রথমতঃ এই কথা মনে হইবে যে ভগবান অসাধুদিগকে বিনাশ করেন, তাহা হইলে অসাধু বা অসৎ বলিয়া যে পদার্থ, তাহা আছে—আমার কাছে আপনার কাছেই যে কেবল আছে তাহা নহে, ভগবানের কাছেও আছে? দ্বিতীয়তঃ তিনি যদি দুষ্কৃতিকারীদিগকে বিনাশ করেন তাহা হইলে তাহাদের আর পরিত্রাণ নাই? এই দুইটি কথা প্রথমেই মনে হইবে। আরও মনে হইবে যে মানুষ প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ যখন সে খুব উন্নত-হৃদয় নহে, সে সময়ে অপরাধীকে শাস্তি দেয়, এমন কি বিনাশও করিয়া থাকে কিন্তু সাধুব্যক্তি তো তাহা করেন না। যিনি সাধু যাঁহার হৃদয় হইতে প্রেমের মন্দাকিনীধারা নিত্য প্রবাহিত হইতেছে তিনি অত্যাচারী ব্যক্তিকেও ভালবাসেন, ক্ষমা করেন। মানব প্রকৃতিতে যাহা উচ্চতম ও মহত্তম তাহারই সাহায্যে আমরা ভগবানের স্বরূপের ধারণা করিয়া থাকি। সাধুগণ যখন দুষ্কৃতিকারীকে বিনাশ না করিয়া তাহার কল্যাণ করেন,

তখন ভগবান কি দুস্কৃতিকারীগণকে, সত্যই বিনাশ করেন? অথবা এই বিনাশ আমাদের একটা প্রতীতিমাত্র এই প্রশ্নও মনের মধ্যে উদিত হয়।

এই প্রশ্নের দ্বারা চিত্ত যখন নিপীড়িত সেই সময়েই যেন ভগবান বলিলেন আমি সর্ব্বভূতে সমান। দ্বিতীয় স্তরে যাহা বলা হইল তাহার তাৎপর্য্য এই যে জীব নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে, আর যিনি জগতের কর্ত্তা ঈশ্বর তিনি নির্লিপ্ত ও উদাসীন, তিনি সাক্ষী ও দ্রষ্টামাত্র। এই স্থানে আমরা দেখিতেছি যে সচ্চিদানন্দের 'চিৎ'ভাবের ভূমি হইতে তত্ত্বের আলোচনা করা হইতেছে।

এইবার আমার তৃতীয়স্তরের বা সচ্চিদানন্দের আনন্দভাবের ভূমিতে আসিতেছি। দ্বিতীয়স্তরে যাহা বলা হইল তাহাতে এইরূপ মনে হইবে যে জীবের কর্ম্মসম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রহিয়াছে—যিনি জগতের কর্ত্তা বা ঈশ্বর তিনি বিধি-স্বরূপ—যেমন মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম—যে ব্যক্তি বুদ্ধিমানের মত এই বিধি মানিয়া চলিবে তাহার মঙ্গল হইবে, তাহার উন্নতি হইবে আর যে ব্যক্তি এই বিধির বিরুদ্ধে যাইবে সে তাহার অজ্ঞানতার ফলস্বরূপে বিপদাপন্ন হইবে। তাহা হইলে প্রথমস্তরে God is lookd upon as the moral Governor of the universe দ্বিতীয় স্তরে God is regarded as Law Eternal and Immutable আর তৃতীয়স্তরে God is regarded as Love Eternal, Love which is not against His moral Governorship—but it justification—Love which is not against The Law—but sts fulfilment.

এইবার তৃতীয় স্তরের কথা বলিতেছি। ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের একটি শ্লোকে শ্রীভগবান বলিতেছেন

"মন্মনা ভব মদ্ভক্ত মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥"

এই শ্লোকের পূর্ব্বে যেন ভক্ত বলিতেছেন "ঠাকুর তোমার মনের কথা এখনও বুঝিলাম না, আমার হৃদয়ের আঁধার এখনও গেল না, আমার সমস্তার মীমাংসা এখনও হইল না। প্রথমে বলিলে তুমি রাজার মত দণ্ডহস্তে বিশ্বের পালনকার্য্যে রত। দ্বিতীয়স্তরে বলিলে আমি উদাসীন, সাক্ষী চৈতন্য মাত্র। কিন্তু এখনও বুঝিতে পারিতেছি না।" এই কথা শুনিয়া যেন ভগবান বলিতেছেন "তুমি আমার মনের কথা জানিতে চাও—আমার

স্বরূপের প্রকৃত পরিচয় পাইতে চাও। কিন্তু কেহ কি কাহাকেও মনের কথা সহজে বলে? মনের কথা জানিতে হইলে মন দিতে হয়। মন দিলে মন মিলে। তুমি বাহিরের শত শত অলীক বিষয়ে আসক্ত হইয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইবে, শেষে তোমার আর কিছুই ভাল লাগিবে না, সেই নিতান্ত অবসরের সময় আমার কাছে আসিয়াই আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে তোমার মনের কথা কি? মনের কথা জানিতে হইলে এমন করিয়া প্রশ্ন করিলে চলে না। "মন্মনা ভব" আমায় তোমার মন সমর্পণ কর—"মদ্ভক্ত" আমার ভক্ত হও—অর্থাৎ তোমার শ্রেষ্ঠ অনুরাগ আমাতে সমর্পিত হউক—আমার জন্য যাবতীয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর, স্বর্গ, সিদ্ধি, বা মুক্তির জন্য নহে—আমিই সকল যজ্ঞের ভোক্তা এই ভাবে আমায় আশ্রয় কর—"মাং নমস্কুরু" তোমার মস্তক সর্ব্বদা আমার চরণে নত হইয়া থাকুক—"মামেব এষ্যসি" আমাকেই পাইবে, "সত্যং প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে"—সত্য সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি তুমি আমার প্রিয়।"

এই শ্লোকে বলা হইল যে ভগবানের সঙ্গে মানবের সম্বন্ধ ভয়ের বা লাভালাভের নহে—প্রেমের সম্বন্ধ। ইহাই গীতার শেষ কথা।

এই কথা বলিবার পূর্ব্বে—অর্থাৎ ঠিক ইহার পূর্ব্ব শ্লোকে অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬৪ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন—যে এই কথা "সর্ব্বগুহ্যতম"। শ্রীধরস্বামী, মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি টীকাকারগণ এই স্থানের তিনটী শ্লোককে গীতাশাস্ত্রের সার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—যেমন স্বামীকৃতটীকায় রহিয়াছে—"অতি গম্ভীরং গীতশাস্ত্রমশেষতঃ পর্য্যালোচিতুমশক্নুবতঃ কৃপয়া স্বয়মেব তস্যসারং সংগৃহ্য কথয়তি সর্ব্বগুহ্যতমমিতি ত্রিভিঃ।" মধুসূদন সরস্বতী বলিতেছেন "অতিগম্ভীরস্য গীতশাস্ত্রস্যাশেষতঃ পর্য্যালোচনক্লেশ-নিবৃত্তয়ে কৃপয়া স্বয়মেব তস্যসারং সংক্ষিপ্য কথয়তি। পূর্ব্বং হি যস্মাৎ গুহ্যাৎ কর্ম্মযোগাৎ গুহ্যতরং জ্ঞানমাখ্যাতমধুনা তু কর্ম্মযোগাত্তৎফলভূতজ্ঞানাচ্চ সর্ব্বস্মাদতিশয়েন গুহ্যং রহস্যং গুহ্যতমং পরমং সর্ব্বতঃ প্রকৃষ্টং মেমম বচোবাক্যং ভূয়ঃ তত্র তত্রোক্তমপি ত্বদনুগ্রহার্থং পুনর্ব্বক্ষ্যমানং শৃণু।"

যে শ্লোকটি বলা হইল তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকটি এই

"সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততোবক্ষ্যামি তে হিতং॥"

আর পরের শ্লোকটি—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ॥

পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী এই শ্লোকটির এইরূপ টীকা করিয়াছেন—"মদ্ভক্ত্যৈব সর্ব্বং তরিষ্যতীতি দৃঢ়বিশ্বাসেন বিধিকৈঙ্কর্য্যং ত্যক্ত্বা মদেকশরণোভব এবং বর্ত্তমানঃ কর্ম্মত্যাগনিমিত্তং পাপং স্যাদিতি মা শুচঃ শোকং মা কার্ষীঃ, যতস্ত্বাং মদেকশরণং সর্ব্বপাপেভ্যোঽহং মোক্ষয়িষ্যামি।" অর্থাৎ আমার প্রতি ভক্তির দ্বারা সমস্ত উত্তীর্ণ হইবে, এই দৃঢ়বিশ্বাসে বিধির দাসত্ব ত্যাগ করিয়া আমাকেই একমাত্র আশ্রয় বলিয়া গ্রহণ কর। এরূপ করিলে কর্ম্মত্যাগনিমিত্ত পাপ হইতে পারে বলিয়া কোনরূপ ভয় করিওনা, কারণ মদেকশরণ যে তুমি, তোমাকে আমি সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব। এই শ্লোকটির পরে আরও ২৪টি শ্লোক আছে বটে, কিন্তু এই শ্লোকেই গীতার যাহা বক্তব্য তাহা শেষ হইয়া গেল। এই তিনটি শ্লোকে ভগবানের স্বরূপের যে পরিচয় পাওয়া গেল সেই পরিচয়টুকু দৃঢ়রূপে হৃদয়ে ধারণ করিলে পর আমরা শ্রীবৃন্দাবন তত্ত্ব বুঝিতে পারিব। একটী উদাহরণ দিতেছি। শ্রীবৃন্দাবনলীলার একটী শ্লোক আছে—

"পূতনা-লোক-বালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা।
জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্বাপ সদ্গতিং॥"

শ্লোকটী পূতনা-বধের। ইহার অর্থ এই যে পূতনা রাক্ষসী, শিশুহত্যা করা ও রক্তপান করা তাহার কার্য্য, সে হত্যা করিবার জন্য বালকমূর্ত্তিতে প্রকাশিত শ্রীহরির মুখে স্তনদান করিয়াও সদ্গতি লাভ করিল। এই শ্লোকটিতে বৃন্দাবন লীলার যাহা রহস্য তাহা নিহিত আছে। পরবর্ত্তী বৈষ্ণবগ্রন্থে এই জন্য শ্লোকটী পুনঃ পুনঃ উদ্ধৃত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই শ্লোকটী বিশেষ ধীরতার সহিত আলোচ্য। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে আমরা জগতের সহিত ভগবানের সম্বন্ধবিষয়ক ধারণার তিনটি স্তর দেখিয়াছি। তাহার প্রথম স্তরে বলা হইয়াছে যে ভগবান সাধুদিগের পরিত্রাণ ও অসাধুদিগের বিনাশ করিয়া থাকেন—এই ধারণার সাহায্যে যদি পূতনার অদৃষ্টে কি হইবে তাহা চিন্তা করা যায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে পূতনাকে ভগবান এইমাত্র গদা ও চক্রের আঘাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবেন—কারণ দৈত্যকে বিনাশ করাই তাঁহার আবির্ভাবের হেতু। কিন্তু ভাগবতকার বলিলেন পূতনা বিনষ্ট হইল না। তাহা হইলেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে

যে এই ধারণা হৃদয়ে লইয়া বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলে আমরা বৃন্দাবনলীলার প্রকৃত রহস্য বুঝিতে পারিবনা।

দ্বিতীয়স্তরে বলা হইয়াছে যে ভগবান সাক্ষীমাত্র ও উদাসীন এবং প্রত্যেক জীব নিজ নিজ কর্ম্মফল অনুসারে সুখ দুঃখ প্রভৃতি ভোগ করিয়া থাকে। ভগবানের সহিত জগতের বা জীবের সম্বন্ধ বিষয়ক এই ধারণা হৃদয়ে লইয়া আমরা যদ্যপি পূতনার অদৃষ্টে কি হইবে তাহা আলোচনা করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলেও পূতনাকে বিনষ্ট হইতে হইবে। পূতনা অসৎ ইচ্ছা লইয়া আসিয়াছে। কর্ম্মের একটী বিধান এই যে যদি আমি কোন সাধু ব্যক্তির প্রতি অসৎ ইচ্ছা পোষণ করি, তাহা হইলে সেই সাধু ব্যক্তির তাহাতে কোনই ক্ষতি হইবে না। পক্ষান্তরে একটী রবারের গোলা একটি শক্ত ও দুর্ভেদ্য থামে নিক্ষেপ করিলে যেমন ঐ গোলা থামকে বিদীর্ণ করিতে পারে না, প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে এবং যে ব্যক্তি উহা নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহারই কপালে আসিয়া আঘাত করে, সেইরূপ কোন সাধু ব্যক্তির বিরুদ্ধে অসৎ ইচ্ছা পোষণ করিলে যে ব্যক্তি উহা পোষণ করে, সেই ব্যক্তিই নিজের পাপে নিজে ধ্বংস হইয়া যায়। কর্ম্মের এই বিধান শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রেই পুনঃপুনঃ উদাহৃত হইয়াছে। যেমন দৈত্যপুরোহিতগণ দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর আদেশে প্রহ্লাদকে বধ করিবার জন্য অভিচার ক্রিয়ার দ্বারা এক কৃত্যাদেবী সৃষ্টি করিলেন, এই কৃত্যাদেবী পুরোহিতগণের আদেশে ত্রিশূল-হস্তে প্রহ্লাদকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু প্রহ্লাদ ভগবদ্ভক্তির অভেদ্য দুর্গের মধ্যে নিশ্চিন্তভাবে ও আনন্দিত মনে অবস্থিত। কৃত্যাদেবীর ত্রিশূল দুর্গের কিছুই করিতে পারিল না। তখন কৃত্যাদেবী ফিরিলেন এবং ত্রিশূল হস্তে দৈত্যপুরোহিতগণকেই আক্রমণ করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে অন্যত্র কর্ম্মের এই বিধান উদাহৃত হইয়াছে। দুর্ব্বাসা ঋষি অকারণ রাজর্ষি অম্বরীষের উপর রুষ্ট হইলেন। অম্বরীষের কোনই অপরাধ ছিল না। ঋষি ক্রুদ্ধ হইয়া মস্তকের এক জটা উৎপাটন করিলেন এবং ঋষির ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে সেই জটা হইতে এক কৃত্যাদেবীর উদ্ভব হইল। কৃত্যাদেবী প্রথমে অম্বরীষকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার লক্ষ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল এবং তিনি দুর্ব্বাসা ঋষিকেই আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন।

যাঁহারা ভগবানের আশ্রিত তাঁহাদের বিরুদ্ধে অসৎ বাসনা পোষণ করিলে

এইরূপ হইয়া থাকে, সুতরাং স্বয়ং ভগবানের বিরুদ্ধে এইরূপ হত্যা করিবার বাসনা পোষণ করিলে যিনি ঐ বাসনা পোষণ করেন তাঁহার যে বিনাশ হইবে ইহা বলাই বাহুল্য। পূতনা কিন্তু আজ ঠিক তাহাই করিয়াছে, সুতরাং তাহার নিস্তার নাই—তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু বৃন্দাবনে তাহাও হইল না।

কাজেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবানের সহিত জগতের সম্বন্ধ বিষয়ক যে তিনটি ধারণা তিন ষটকে বলা হইয়াছে, তাহার প্রথম দুইটি ধারণা দ্বারা চালিত হইয়া বৃন্দাবনতত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করা নিরর্থক।

তৃতীয় স্তরে ভগবান তাঁহার স্বরূপের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিয়া বলিলেন, হে অর্জ্জুন আমি সত্য সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি তুমি আমার প্রিয়। তখন কুরুক্ষেত্রপ্রাঙ্গণে অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সেনা সমবেত হইয়াছে। ভারতের যুদ্ধ করিতে সক্ষম প্রত্যেক ব্যক্তিই সেখানে। পরমুহূর্ত্তে যুদ্ধ আরম্ভ হইবে, মানবের লালসা পৈশাচিকী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাণ্ডবনৃত্য আরম্ভ করিবে, সোণার ভারত শ্মশান হইয়া যাইবে—বড় বড় রাজবংশে বাতি দিতে আর কেহ থাকিবে না। শোকের আর্ত্তনাদ ধ্বনিতে ভারতগগন বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। এই আসন্ন বিভীষিকার পুরোদেশে দাঁড়াইয়া গুরু ভগবান, ভক্ত ও সাধক অর্জ্জুনকে সাধনায় দীক্ষা দিয়া সদুপদেশে তাঁহার হৃদয় মার্জ্জন করিয়া বলিতেছেন—মৃত্যু আছে, শোকদুঃখ হাহাকার আছে কে তাহা অস্বীকার করিবে—কিন্তু তথাপি ভগবানের সহিত মানবের সম্বন্ধ প্রেমের সম্বন্ধ, আনন্দের সম্বন্ধ। তবু হরি প্রেমময়, স্বরূপে তাঁহার, প্রেম ছাড়া আর কিছু নাই।

এইবার হয়ত আমাদের মনে প্রশ্ন হইবে, সত্য সত্য পুতনার কি হইল—পুতনার কি মৃত্যু হয় নাই? বৈষ্ণবশাস্ত্রে আছে "বিষ্ণুদ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর সংহারে"। এই পূতনার ব্যাপারকে যাঁহারা মৃত্যু বা বিনাশ বলিয়া ধারণা করিতেছেন তাঁহাদের এখনও "কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান" হয় নাই। তাঁহাদের ভগবান সম্বন্ধীয় ধারণা বিষ্ণু পর্য্যন্ত। আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মকে জানিতে হইলে চৈতন্যের যে অবস্থায় উপস্থিত হওয়া আবশ্যক তাঁহারা এখনও সে অবস্থায় উপস্থিত হয়েন নাই।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের যে রহস্য জগতের জীবকে শিখাইলেন

এবং যে রহস্যের আশ্রয় ব্যতিরেকে শ্রীচৈতন্যলীলা কিছুতেই বুঝিতে পারা যাইবে না—তাহার মর্ম্মানুসারে—

"স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।"

ব্রহ্মসংহিতাতেও ঠিক এই কথাই বলা হইয়াছে—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণঃ॥"

বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত স্বরূপের পরিচয় না পাওয়ায় পূর্ব্বে তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের দেশে নানারূপ মত প্রচারিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় এই মত প্রচারিত হইল যে এই সমুদয় মতের কোনটিই ভুল নহে—কারণ কৃষ্ণ "অবতারী"—"সর্ব্বঅবতারী সর্ব্বকারণ প্রধান"
আর—

"অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি।
কেহ কোনরূপে কহে যেমন যার মতি॥"

অর্থাৎ তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার যাঁহার যেমন শক্তি ও অধিকার তিনি সেইরূপই বলিয়াছেন—এই জন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিলেন

"কৃষ্ণেরে কহে কেহো নরনারায়ণ।
কেহো কহে ক্ষীরোদশায়ী কেহো তো বামন॥
কেহো কহে পরব্যোম নারায়ণ করি।
সকল সম্ভবে তাতে যাতে অবতারী॥"

সুতরাং দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে স্থানে দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও শ্রীবৃন্দাবনতত্ত্ব আলোচনা করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন, সেই স্থান পূর্ব্ব পূর্ব্ব আলোচনার স্থান হইতে পৃথক হইলেও তাহাদের বিরোধী নহে—পরন্তু তাহাদের সকলের সমন্বয়ের ভূমি—The standpoint of the highest synthesis. এই স্থান হইতে দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে পূর্ব্বে যে সমস্ত কথা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—তাহার কোনটিই মিথ্যা নহে, তবে তৎসমুদয় আংশিক সত্য।

অন্ধের হস্তি-দর্শনের উদাহরণের দ্বারা ইহা বেশ বুঝিতে পারা যাইবে। অন্ধেরা যে যে অঙ্গের উপর হাত দিয়া দেখিয়াছিল সে সেই অঙ্গের বর্ণনা করিয়া বলিয়াছিল ইহাই হস্তির রূপ। চক্ষুস্মান ব্যক্তি যখন সমস্ত

অন্ধের উক্তি শুনিলেন, তখন তিনি বলিলেন তোমরা সকলেই সত্য কথা বলিয়াছ। এই বলিয়া তিনি যখন হস্তীর প্রকৃতরূপ অন্ধদিগকে বুঝাইয়া দিলেন, তখন তাহারাও বুঝিতে পারিল।

পূর্ব্বে বলা হইল যে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের কার্য্য অসুরসংহার করা বা পৃথিবীর ভারহরণ করা নহে। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকার এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবনে নিত্যলীলা প্রকট করার তাৎপর্য্য কি তাহা বলিতেছেন—

"স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভারহরণ।
স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করে জগতপালন॥
কিন্তু কৃষ্ণের যেই হয় অবতার কাল।
ভারহরণ কাল তাতে হৈল মিশাল॥
পূর্ণ ভগবান অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥
নারায়ণ চতুর্ব্যূহ মৎস্যাদি অবতার।
যুগ মন্বন্তরাবতার বিষ্ণু যত আছে আর॥
সভে আসি কৃষ্ণ অঙ্গে হয়ে অবতীর্ণ।
ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান পূর্ণ॥
অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণু দ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর সংহারে॥
আনুসঙ্গ কর্ম্ম এই অসুরমারণ।
যে লাগি অবতার কহি সে মূল কারণ॥
প্রেমরস নির্য্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥
রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু দুই ইচ্ছার উদ্গম॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে সব জগত মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
আমাকে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥

আমাকে ত যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে।
তারে সেই ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে॥

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবনে আবির্ভাবের ও লীলার উদ্দেশ্য—প্রেমরসনির্য্যাস আস্বাদন ও রাগমার্গের ভক্তি প্রচার। এই দুইটি উদ্দেশ্য বাহির হইতে দেখিতে পৃথক্ বলিয়া প্রতীত হইলেও দুইটি উদ্দেশ্যই এক। একই কথা, স্বরূপ ও তটস্থ এই উভয়বিধ সংজ্ঞার সাহায্যে বর্ণনা করা হইয়াছে মাত্র। ভগবানের নিজের প্রকৃতির মধ্যে এই হেতু দেখিলে অর্থাৎ কেবল মাত্র ভগবানই তাঁহার স্বরূপ লইয়া রহিয়াছেন, আর কিছু নাই, অন্ততঃ পক্ষে তাঁহার প্রকৃতি হইতে পৃথক হইয়া আর কিছু নাই, এই ভাবে যদি আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে ভগবান নিজের প্রেমরস নিজেই আস্বাদন করিবার জন্য এই লীলা করিয়াছেন। তাহা হইলে বৃন্দাবনলীলা self-realization of the God of Infinite Love 'অসীম আনন্দময় পরমপুরুষ আপনিই আপনার আনন্দ আস্বাদন করিতেছেন' এই ব্যাপারের নাম বৃন্দাবন, ইহা লীলার নিত্য বা অপ্রকট ভাব। ইহা সম্পূর্ণরূপে মানবের জ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে, কিন্তু এক সময়ে ভগবান তাহাও করিলেন অর্থাৎ Brought it down as it were to the conscious understanding of the manifested universe—এইবার মানবের বা বিশ্বের দিক হইতে যদি ব্যাপারটি দেখা যায় এবং জিজ্ঞাসা করা যায় ইহাতে শ্রীভগবানের অভিপ্রায় কি, তাহা হইলে বলিতে হয় রাগমার্গের ভক্তি প্রচার। এই যে রাগমার্গের ভক্তি, ইহা কি তাহাও জানা দরকার।

স্থূলভাবে আলোচনা করিলে রাগমার্গ বিধিমার্গের বিপরীত বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে রাগমার্গই বৈধমার্গের প্রাণ ও তাৎপর্য্য। ইংরাজীতে বলা যায় The Religion of Law and the Religion of Love প্রেম বস্তুটি স্বাধীন, এইজন্য রাগমার্গও স্বাধীন মানবের ধর্ম। The Religion of Love is for the spiritual man not for the natural man অর্থাৎ মানুষ যতক্ষণ প্রাকৃত মলিন ভাবের সহিত যুক্ত ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রেমধর্ম্ম বা রাগমার্গ সাধনায় তাহার অধিকার নাই। মানব-প্রকৃতির প্রাকৃত মলিন ভাব সম্পূর্ণ রূপে দূরগত হইলে পর মানব এই রাগমার্গের যে স্বাধীন পথ, স্বতঃস্ফূর্ত্তি হৃদয়ের স্বাধীন আবেগের

দ্বারা জীবনের পথে যে অগ্রসর হওয়া, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে।

শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে রাগানুগা ভক্তির যে বর্ণনা আছে, তাহা পাঠ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিলে বৃন্দাবন লীলার রহস্য উপলব্ধি করার সুবিধা হয়। আমরা নিম্নে তাহার মর্ম্ম প্রদান করিলাম। ব্রজবাসীগণের চরিত্রে যে ভক্তি প্রকাশ্যরূপে বিরাজমান তাহাকে রাগাত্মিকা ভক্তি বলে। এই রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগতা যে ভক্তি তাহাকে রাগানুগা ভক্তি বলে। রাগানুগা ভক্তির প্রকৃত পরিচয় পাইতে হইলে প্রথমে রাগাত্মিকা ভক্তি কি তাহা জানা প্রয়োজন। ইষ্টে অর্থাৎ অভিলষিত বস্তুতে যে স্বাভাবিকী পরম আবিষ্টতা অর্থাৎ প্রেমময় তৃষ্ণা তাহার নাম রাগ, সেই রাগময়ী যে ভক্তি তাহাকে রাগাত্মিকা ভক্তি কহে। কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা ভেদে এই রাগাত্মিকা ভক্তি দুই প্রকার। গোপীগণ কাম হেতু, কংস ভয় হেতু, শিশুপালাদি রাজন্যগণ দ্বেষ হেতু, যাদবগণ সম্বন্ধ হেতু, পাণ্ডবেরা স্নেহহেতু এবং নারদাদি ঋষিগণ ভক্তি হেতু পরমাগতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

গোবিন্দে পিতৃত্বাদি অভিমান অর্থাৎ আমি শ্রীকৃষ্ণের পিতা, আমি শ্রীকৃষ্ণের মাতা এইরূপ মননই সম্বন্ধ-রূপা ভক্তি।

এইবার প্রশ্ন এই যে এই রাগানুগা ভক্তির অধিকারী কে? ইহার উত্তরে ভক্তিরসামৃত সিন্ধুকার বলিতেছেন

"রাগাত্মিকৈক নিষ্ঠা যে ব্রজবাসিজনাদয়ঃ।
তেষাং ভাবাপ্তয়ে লুব্ধো ভবেদত্রাধিকারবান্॥
তত্তদ্ভাবাদি মাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণং॥

কেবল রাগাত্মিকা ভক্তিনিষ্ঠ যে সকল ব্রজবাসীজন, তাঁহাদের ভাব পাইবার জন্য যাঁহাদের চিত্ত লুব্ধ, তাঁহারাই এই রাগানুগা ভক্তিতে অধিকারী। শাস্ত্র ও যুক্তিকে অপেক্ষা না করিয়া কেবল নন্দ যশোদাদির ভাব ও মাধুর্য্য শ্রবণ করিয়া বুদ্ধিবৃত্তি যাহার অপেক্ষা করে অর্থাৎ সেই সেই ভাব কবে প্রাপ্ত হইব এই বলিয়া ঔৎসুক্যাকুল হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকেই লোভোৎপত্তির লক্ষণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

"বৈধ ভক্ত্যধিকারীতু ভাবাবির্ভাবনাবধিঃ।
অত্রশাস্ত্রং তথা তর্কমনুকূলমপেক্ষতে॥"

যে পর্য্যন্ত ভাবের আবির্ভাব না হয়, সেই পর্য্যন্ত বৈধী ভক্তির অধিকার। বৈধীভক্তিতে যাঁহারা অধিকারী তাঁহাদের শাস্ত্র ও অনুকূল তর্কের অপেক্ষা করা উচিত। তাহা হইলে বৈধী ও রাগানুগা ভক্তির প্রভেদ এই যে শাস্ত্রের বিধি অনুসারে যে ভজন তাহার নাম বৈধী আর লোভপ্রযুক্ত যে ভজন তাহার নাম রাগানুগা ভক্তি।

রাগাত্মিকা ভক্তি কি তাহা প্রকটিত করিয়া মানবকে রাগানুগা ভক্তিতে দীক্ষিত করিয়া মানবের ধর্ম্মজীবনকে সত্য ও সবল করার জন্যই এই শ্রীবৃন্দাবন লীলা। মানুষ যে ভগবানকে চিনিতে পারিতেছে না, কোন্ পথে অগ্রসর হইলে যে ভগবানকে চিনিতে পারা যাইবে, তাহাও কেহ ভাল করিয়া মানুষকে বলে না। ধর্ম্মের কথা, ভগবানের কথা, চিরস্থায়ী সুখ অথবা জীবনপ্রহেলিকার মীমাংসার কথা জিজ্ঞাসা করিলে পণ্ডিতেরা আমাদিগকে কতকগুলি অর্থহীন ক্রিয়ার কথা বলেন, কতকগুলি দুর্ব্বোধ্য বাক্য বলেন, আমরা তাহা বুঝিতেই পারি না, তাহাতে আনন্দ পাওয়া তো দূরের কথা, এই ভাবে মানবের ধর্ম্মজীবন চলিতেছিল অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণ আসিলেন।

ভগবান মধুর—কেবল কঠোর নহেন। তাঁহার একটি কঠোর ভাব বা ঐশ্বর্য্যভাব জগতে প্রকাশিত হইতেছে সত্য, সে দিক হইতে দেখিলে তিনি বাক্যমনের অগোচর কিন্তু এই ঐশ্বর্য্যভাব তাঁহার স্বরূপ নহে—সত্য সত্য বলিতে গেলে তিনি মধুর। তিনি পুত্র হইতে প্রিয়, তিনি বিত্ত হইতে প্রিয় যাহা কিছু আমরা এখানে দেখিতেছি সর্ব্বাপেক্ষা তিনি প্রিয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে—পুত্র পুত্রের জন্য প্রিয় নহে আত্মার জন্য প্রিয়, অর্থ অর্থের জন্য প্রিয় নহে আত্মার জন্য প্রিয়, স্ত্রী স্ত্রীর জন্য প্রিয় নহে আত্মার জন্য প্রিয়, স্বামী স্বামীর জন্য প্রিয় নহে আত্মার জন্য প্রিয়। ইহাই জীবনের আদি রহস্য—এক যিনি এই বহুর মধ্যে, সত্য যিনি এই মিথ্যার মধ্যে, সেই পরমবস্তু দূরে নহেন, বেদ বলিয়াছেন তিনি দূরে ও নিকটে, ইহার মধ্যে তিনি যে নিকটে তাহাই অনুভব করিতে হইবে। বেদ যে বলিয়াছেন পুত্র পুত্রের জন্য প্রিয় নহে আত্মার জন্য প্রিয় শ্রীমদ্ভাগবত তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কেবল যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা নহে শ্রীবৃন্দাবন লীলায় তাহা প্রত্যক্ষ করাইয়াছেন—

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র আমাদিগকে—যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা আমরা যদ্যপি দৃঢ়রূপে ধারণা করিতে পারি তাহা হইলে লীলা বুঝিতে

আর কোনরূপ কষ্ট হইবে না। প্রেমতত্ত্বের মধ্য দিয়াই শ্রীমদ্ভাগবত আমাদিগকে এই তত্ত্বে আনয়ন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

"সর্ব্বেষামপি ভূতানাং নৃপ স্বাত্মৈব বল্লভঃ।
ইতরেঽপত্যবিত্তদ্যা স্তদ্বল্লভতয়ৈব হি॥
তদ্রাজেন্দ্র যথা স্নেহঃ স্ব স্বাকত্মনি দেহিনাং।
ন তথা মমতালম্বি পুত্রবিত্তগৃহাদিষু॥
দেহাত্মবাদিনাং পুংসামপি রাজন্যসত্তম।
যথা দেহঃ প্রিয়তমস্তথা ন হ্যনু যে চ তং॥
দেহোঽপি মমতাভাক্ চেত্তর্হ্যসৌ নাত্মবৎ প্রিয়ঃ।
যজ্জীর্য্যত্যপি দেহেঽস্মিন্ জীবিতাশা বলীয়সী॥
তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্ব্বেষামপি দেহিনাম্।
তদর্থমেব সকলং জগদেতচ্চরাচরম্॥
কৃষ্ণমেন মবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥"

প্রথম পাঁচটি শ্লোকে দেখাইয়াছেন যে স্বতঃ অর্থাৎ আপনা হইতেই বা নিজের স্বভাব বশতঃ আত্মাই আমাদের প্রিয়বস্তু। অন্য যাহা কিছু আমরা প্রিয় বলিয়া মনে করি, সে সমস্তের প্রতি যে প্রীতি তাহা ঔপাধিক অর্থাৎ আত্মার প্রকাশক উপাধি বলিয়া "হে রাজন্! আত্মাই যাবতীয় ভূতের প্রিয়; পুত্র সম্পত্তি প্রভৃতি অন্যান্য যাবতীয় বস্তু আত্মার প্রিয় বলিয়াই প্রিয়। এই জন্য নিজ নিজ অহঙ্কারাস্পদ যে দেহ সেই দেহের প্রতি শরীরিগণের যেমন স্নেহ হয়, এই মমতা অর্থাৎ আমার দেহ এই মৌলিক অভিমান এই অভিমানকে আশ্রয় করিয়া যাহারা আপনার হইয়া রহিয়াছে অর্থাৎ পুত্র, ধন, গৃহ প্রভৃতিতে সেরূপ হয় না।" আত্মাধ্যাসের তারতম্যে প্রীতিরও তারতম্য হইয়া থাকে অর্থাৎ যাহাকে যতটুকু আপনার বলিয়া মনে করি তাহাকে ঠিক ততটুকু ভাল বাসি। এইটুকু দেখাইবার জন্য পরের দুইটী শ্লোকে মূঢ় ও অমূঢ়ভেদে প্রীতির কিরূপ তারতম্য হয়, তাহাই দেখাইতেছেন। "যাহারা দেহাত্মবাদী অর্থাৎ যাহারা এই দেহকেই আমি বলিয়া মনে করে, দেহাতীত কোন কিছু আছে বা থাকিতে পারে, ইহা যাহারা জানে না

তাহারা আপনার দেহটিকে যেমন ভালবাসে, এই দেহের যাহারা অনুবর্ত্তী অর্থাৎ এই দেহের সম্পর্কে যাহারা সম্পর্কিত হইয়া 'আমার' বলিয়া প্রতীত হয়—যেমন পুত্র প্রভৃতি—তাহারা সেরূপ প্রীতিভাজন নহে। তাহার পর দেখা যাইতেছে যে এই যে দেহ ইহার যখন আর আশা নাই, অর্থাৎ ইহার বিনাশ যখন অবশ্যম্ভাবী, সে সময়েও বাঁচিয়া থাকিবার আশা অত্যন্ত প্রবলভাবেই থাকে। আর বাঁচিবার কোনই সম্ভাবনা নাই, দেহ নিশ্চয়ই যাইবে ইহা যখন স্থির হইল তখনও যখন বাঁচিবার ইচ্ছা রহিয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে যে এই যে প্রীতি ইহা দেহগত বলিয়া এতদিন প্রতীত হইলেও সত্য সত্য তাহা দেহগত নহে, তাহা আত্মাগত।" শ্রীধরস্বামী এই শ্লোকটির আর একরূপ অর্থও করিয়াছেন, তাহা এই। "যখন মানুষের অবিবেকের বা অজ্ঞানের অবস্থা সে সময়ে দেহ ধ্বংশ হইতেছে দেখিয়াও মানুষ বাঁচিয়া থাকিবার জন্য আশা করে। এই জীবিতাশা বিবেকী বা জ্ঞানী ব্যক্তির প্রীতির বিষয় যদিই বা হয় তাহা হইলেও আত্মার ন্যায় প্রীতির বিষয় হয় না। অর্থাৎ যিনি জ্ঞানী তাঁহার দেহ যাইতেছে, কিন্তু ইচ্ছা হইতেছে দেহ থাকুক, এই যে ইচ্ছা বা দেহপ্রীতি অবিবেকীর ন্যায় তাঁহার ইহা দেহের জন্য নহে, আত্মার জন্য।" "অতএব বুঝিতে পারা যাইতেছে যে নিজের আত্মাই সর্ব্বদেহীর প্রিয়তম। এই চরাচর জগৎ সমস্তই আত্মার জন্য প্রিয়।" এইবার শ্রীকৃষ্ণের কথা বলিতেছেন। তাঁহাকে কিরূপে দেখিতে হইবে। সাধারণ মানুষ বলিবে তিনি আমাদের ন্যায় দেহী। তিনি একজন ঐতিহাসিক মহাপুরুষ মাত্র। ভাগবত বলিতেছেন ইহা ভুল। "কৃষ্ণকে যাবতীয় আত্মার আত্মা বলিয়া জানিবে, তিনি জগতের মঙ্গলের জন্য মায়াযোগে দেহীর ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন।" তাহা হইলে দেখা গেল যে দেহের সঙ্গে আত্মার অর্থাৎ জীবাত্মার বা প্রকৃত জীবের যে সম্পর্ক, এই আত্মার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সেই সম্পর্ক।

তাহার পর এই প্রসঙ্গে ভাগবতকার আরও অনেক কথা বলিতেছেন। দেহকে আমরা ভালবাসি, তাহা আত্মার অধ্যাসের জন্য অর্থাৎ আত্মার জন্যই দেহ প্রিয় অর্থাৎ দেহ যে নাই তাহা নহে কিন্তু দেহের এই যে থাকা বা প্রিয় হওয়া ইহা আত্মার দ্বারাই সাধিত হইতেছে। সেইরূপ আত্মার আত্মা কৃষ্ণ। কৃষ্ণ বলিলে এই সমস্ত দেহী ব্যতিরিক্ত একটা কিছু যদি

আমরা মনে করি তাহা হইলে লীলাতত্ত্বের প্রকৃত মাধুরী হৃদয়ঙ্গম হইবে না।

বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ।
ভগবদ্রূপমখিলং নান্যদ্বস্ত্বিহ কিঞ্চন॥

কৃষ্ণ সকল জগতের কারণ। এই তত্ত্ব যিনি জানেন তাঁহাদিগের সমক্ষে চরাচর সমস্তই ভগবদ্রূপ। তদ্ভিন্ন অন্য কোন বস্তু নাই।

সর্ব্বেষামপি বস্তূনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ।
তস্যাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমতদ্বস্তু রূপ্যতাম।

সকল বস্তুর পরমার্থ কারণে অবস্থিত। কৃষ্ণ সেই কারণের কারণ, অতএব শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরিক্ত কোন বস্তু নাই।

ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব। আমি যখন কোন বস্তুকে ভালবাসি তখন প্রকৃত প্রস্তাবে আমি ভগবানকেই ভালবাসি। এই প্রকারে আমরা আনন্দের কাঙ্গাল হইয়া জীবনের পথে পর্য্যটন করিতেছি। আমাদের প্রত্যেক আনন্দ-ভোগেই সেই পরম কারণ শ্রীভগবান, তিনি আমাদিগকে স্পর্শ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন কিন্তু আমরা তাঁহাকে ধরিতে পারিতেছি না। মনে করিতেছে তিনি দূরে অতি দূরে, এই প্রকারে নিকটকে দূর করিয়া আমরা দুঃস্বপ্নে পীড়িত হইতেছি।

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীরাসলীলায় মহারাজ পরীক্ষিত যখন শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি সন্দেহ প্রকাশ করিলেন তখন শ্রীশুকদেব বলিলেন,

"নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতোনৃপ।"

হে নৃপ মানবসমূহের নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধির জন্য সেই ভগবানের আজ 'ব্যক্তি' বা প্রাকট্য হইয়াছে।

ইহাই বৃন্দাবনের তত্ত্ব। নিত্যলীলা চিরদিনই হইতেছে—অথচ আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছিনা। অদ্য সেই চিরদিনের লীলা আমাদের নিকট প্রকাশিত হইল।

বৃন্দাবনে ভগবান যেন মানুষকে বলিতেছেন "মানুষ তুমি আমায় কেন ডাক না।" মানুষ বলিল তুমি অরূপ, আর আমি রূপের কাঙ্গাল তোমায় ডাকিব কি? ভগবান তখন বহির্মুখী মানবকে বলিলেন "তুমি এই কত জন্ম জন্মান্তর কত স্থানে কত রূপে এই যে রূপের অন্বেষণ করিতেছ—রূপ কি পাইয়াছ।" মানুষ হঠাৎ অন্তর্মুখী হইল, হৃদয়ের গভীর প্রদেশে

প্রবেশ করিয়া কাতর স্বরে বলিল—না কিছুই পাই নাই। রূপ শুধু লালসার শিকলে বাঁধিয়া বিশ্বের দুয়ারে দুয়ারে নাচাইয়া নাচাইয়া ঘুরাইয়াছে—কিছুই পাই নাই—এই দেখ, কেবল কাঁদিতেছি। জগতের রূপ যেন পাহাড়ের শোভা—দূর হ'তে চেয়ে দেখি পত্রময়, ফুলময়, চিত্রিত সুন্দর, কাছে গিয়ে দেখি নীরস কর্কশ নিষ্ঠুর প্রস্তরের স্তূপ। তখন ভগবান বলিলেন, চাও চাও আমার পানে চাও, এই বলিয়া হরি দাঁড়াইলেন—

"বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োকর্ণিকারং।
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাং॥
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়াপূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ—
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্ত্তিঃ॥"

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের এই যে রূপ ইহার সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বদিন বলিয়াছি যে ইহা লোকলাবণ্যনির্মুক্তি কর—অর্থাৎ যে রূপ দেখিলে আর কোন রূপ রূপ বলিয়া মনেই হইবে না, আর জগতে যে রূপ রহিয়াছে তাহা তাঁহারই সম্পর্কে।

এই রূপ দেখিয়াই শ্রীবিল্বমঙ্গলঠাকুর বলিয়াছিলেন,—

"মারঃ স্বয়ং নু মধুর দ্যুতিমণ্ডলং নু।
মাধুর্য্যমেবনু মনোনয়নামৃতং নু।
বেণীমৃজোনু মম জীবিতবল্লভো নু
কৃষ্ণোঽয়মভ্যুদয়তে মম লোচনায়॥

"কিবা সাক্ষাৎকাম,　　দ্যুতিবিম্ব মূর্ত্তিমান,
কি মাধুর্য্য স্বয়ং মূর্ত্তিমন্ত।
কিবা মনোনেত্রোৎসব,　　কিবা জীবিতবল্লভ
সত্য কৃষ্ণ আইলা নেত্রানন্দ॥"

এই রূপ দেখিয়াই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—

"শ্রীকৃষ্ণরূপাদি-নিষেবণং বিনা।
ব্যর্থানি মেঽহান্যখিলেন্দ্রিয়াণ্যলং।
পাষাণ-শুষ্কেন্ধন-ভারকাণ্যহো
বিভর্ম্মি বা তানি কথং হতত্রপঃ॥"

বংশীগানামৃতধাম,　　লাবণ্যামৃত জন্মস্থান
যে না দেখে সে চাঁদ বদন।

সে নয়নে কিবা কাম, পড়ুক তার তার মুণ্ডে বাজ
সে নয়ন রহে কি কারণ ॥
সখি হে শুন মোর হতবিধি বল ;
মোর বপু চিত্ত মন, সকল ইন্দ্রিয়গণ,
কৃষ্ণ বিনা সকল বিফল।
কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিনী,
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কাণাকড়ি ছিদ্র সম, জানিহ সে শ্রবণ,
তার জন্ম হৈল অকারণে ॥
কৃষ্ণের অধরামৃত কৃষ্ণগুণ চরিত.
সুধাসার স্বাদু বিনিন্দন,
তার স্বাদু যে না জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে,
সে রসনা ভেকজিহ্বা সম ॥
মৃগমদ নীলোৎপল, মিলনে যে পরিমল
যে হরে তার গর্ব্বমান,
হেন কৃষ্ণ অঙ্গগন্ধ, যার নাহি সে সম্বন্ধ
সেই নাসা ভস্ত্রার সমান ॥
কৃষ্ণকর পদতল, কোটিচন্দ্র সুশীতল,
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমনি,
তার স্পর্শ নাহি যার, সে যাউক ছারখার,
সেই বপু লৌহসম জানি ॥

এই বার অনেকেই হয়ত প্রশ্ন করিবেন, এইরূপ কোথায় দেখিব ? এই যে দর্শন, জগতের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অন্যান্য বস্তুর ন্যায় ইহা কি না ? এই প্রশ্নের মীমাংসার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হওয়া দরকার।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থেই, পূর্ব্বে যে অংশ উদ্ধৃত হইল ঠিক তাহার পরেই এই দর্শন কি প্রকারের দর্শন তাহা বলিতেছেন—যথা

"যে কালে বা স্বপনে, দেখিনু পদ্মলোচনে,
সেইকালে আইলা দুই বৈরী।
আনন্দ আর মদন, হরি নিল মোর মন
দেখিতে না পাইনু নেত্র ভরি।"

দর্শন ব্যাপারে কি হয়? আমি আমার সম্মুখে এই ছবিখানি দেখিতেছি, এই ব্যাপারে প্রথমতঃ আমি আমার বাহিরে যাইতেছি, ছবি হইয়া যাইতেছি, তাহার পর ছবি হইয়া আবার আমি আমার আমিতে ফিরিয়া আসিতেছি—তখন আমি ছবি হইতে অন্যদিকে চাহিয়াও বলিতেছি, আমি ছবি দেখিতেছি। এই প্রকারে ছবিখানি জানিবার সময় প্রকৃতপ্রস্তাবে আমি আমার আমিকেই ছবির জ্ঞাতারূপে জানিতেছি! In knowing the picture I actually know my own self as the knower of the picture—তাহা হইলে একটা জিনিষ দেখিয়া, দেখিয়াছি ইহা বলিতে হইলে ফিরিয়া আসা চাই—কিন্তু কৃষ্ণদর্শনে গিয়া আর ফিরিয়া আসা নাই—দৃষ্টবস্তুর বাহিরে তো আর কিছু নাই, এমন কি দ্রষ্টা তিনিও তো সেই দৃষ্টের মধ্যেই রহিয়াছেন, তাহা হইলে এ দেখা কেমন, এ যে যত দেখা তত না দেখা!

এইপ্রকারে কৃষ্ণকে ভালবাসিয়া, এমন কি প্রেমে তন্ময় হইয়াও কেহ বলিতে পারিবে না যে আমি তোমায় ভালবাসি! যেমন মূর্ত্তিমান শ্রীকৃষ্ণপ্রেম যিনি—সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উক্তি বলিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্।
বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা।
বিভর্ম্মি যৎপ্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা॥

দূরে শুদ্ধ প্রেমবন্ধ,　　কপট প্রেমের গন্ধ
সেহ মোর নাহি কৃষ্ণ পায়।
তবে যে করি ক্রন্দন,　　স্বসৌভাগ্য প্রখ্যাপন
করি ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
যাতে বংশীধ্বনিসুখ,　　না দেখি সে চাঁদমুখ,
যদ্যপি নাহিক আলম্বন।
নিজদেহে করি প্রীত,　　কেবল কামের রীত,
প্রাণকীটের করিয়ে পোষণ॥
কৃষ্ণপ্রেম সুনির্ম্মল,　　যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল
সেই প্রেমা অমৃতের সিন্ধু।

নির্ম্মল সে অনুরাগে, না লুকায় অন্য দাগে
শুক্ল বস্ত্রে যৈছে মসী-বিন্দু ॥
কৃষ্ণপ্রেম সুখ-সিন্ধু, পাই তার এক বিন্দু
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়।
কহিবার যোগ্য নহে, তথাপি বাউলে কহে
কহিলে বা কেবা পাতি যায়।

শ্রীবৃন্দাবন-লীলার প্রারম্ভে একটি শ্লোক আছে তাহাতে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন যে অখিলে যত দেহধারী আছে, তাহাদের সকলের অন্তরে ও বাহিরে ভগবান বিদ্যমান। তিনি বাহিরে কালরূপে, আছেন আর ভিতরে পুরুষরূপে আছেন। যাহারা বাহিরে তাঁহাকে খুঁজিতেছে, তাহারা মৃত্যু পাইতেছে, আর যাহারা ভিতরে খুঁজিতেছে তাহারা অমৃত পাইতেছে। শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকের টীকায় বলিলেন অতএব অন্তর্মুখী হইয়া এই লীলা উপলব্ধি করিতে হইবে—সুতরাং—

"কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণলীলাবৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ॥'

সুতরাং এইরূপ কেবল বাহিরে নহে—প্রধানতঃ এইরূপ ভিতরে কিন্তু তাই বলিয়া বাহিরেও যে নহে তাহাও নয়। ইহাই রহস্য। নিজে চিন্তা করিয়া, হৃদয়কে জাগ্রত করিয়া ইহা অনুভব করিতে হইবে—কেবল কথার সাহায্যে ইহা কি করিয়া বুঝান যাইতে পারে? আর "কহিলে বা কেবা পাতি যায়?" অর্থাৎ প্রত্যয় করে কে?

"অন্যের যে দুঃখ মনে, অন্য তাহা নাহি জানে,
সত্য এই শাস্ত্রের বিচারে।
অন্য জন কাঁহা লিখি, নাহি জানে প্রাণসখী
যাতে কহে ধৈর্য্য ধরিবারে॥"

খিদিরপুরের ইতিবৃত্ত। (২)

ইংরাজদিগের কথা বলা হইল। এইবার আমরা স্থানীয় মুসলমান-জাতি সংক্রান্ত কথার আলোচনা করিব। পারস্য রাজবংশীয় মির্জা শালেউদ্দিন নামক একব্যক্তি হুগলীর স্বনামধন্য দানবীর মহম্মদ মসিনের অতুল রূপগুণান্বিতা ভগ্নী মুন্নাজান খানামের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। সাধারণতঃ মির্জ্জাশাল নামে পরিচিত এই মীর্জ্জা শালেউদ্দিন স্ত্রীধনস্বরূপে খিদিরপুর, মুচিখোলা, মেটিয়াবুরুজ, ধোবাপাড়া প্রভৃতি জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অধিক দিন গত হয় নাই বিসম্বাদিত ভূস্বত্ব লইয়া এই মীর্জ্জাশালের ইজারাদার ইস্মাইল খাঁ। মহম্মদ কর্ত্তৃক খিদিরপুরবাসী অনেককেই সন্ত্রস্ত হইতে হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে Privy Councilএ অনুকূল বিচারফল লাভ করায় তাঁহারা উদ্বাস্ত হওয়ার দায় হইতে রক্ষা পাইয়াছেন।

১৭৯২ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিশের সহিত টিপু সুলতানের যে সন্ধি হয় তদনুসারে টিপুর দুই পুত্র প্রতিভূস্বরূপ ইংরাজ সরকারের নিকট থাকিতে বাধ্য হইয়া কিছুকালের জন্য খিদিরপুরের অন্তর্গত রামচন্দ্রপুরে অর্থাৎ বর্ত্তমান মোমিনপুরে বাস করেন। এই ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে একজন, গোলাম মহম্মদ সাহাজাদা কর্ত্তৃক স্থাপিত সুবৃহৎ মসজিদটি আজিও মোমিনপুরে ডায়মণ্ডহারবার রোডের পার্শ্বে বর্ত্তমান রহিয়াছে। একবালপুরে মুসলমান-দিগের যে সমাধি ক্ষেত্র আছে তাহাও প্রায় এক শতাব্দী হইল স্থাপিত হইয়াছে।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাব উদারহৃদয় ওয়াজেদ আলি সাহ ডেলহাউসী কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়া মেটিয়াবুরুজে অবস্থিত হন। তাঁহার সময়ে মেটিয়াবুরুজ ও মুচিখোলা গ্রামদ্বয় অতি সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। নবাবের রাজ্যে এক্ষণে কুলিডিপো, নাগপুর রেল আফিস ও চটের কলগুলি রাজত্ব করিতেছে। নবাব-বংশীয় মীর্জা কুমার কাদের স্থানীয় "ফক্করমহল" নামক বাটীতে বাস করিতেছেন। আজ পর্য্যন্ত তিনি ইংরাজ সরকারের বৃত্তি ভোগ করিয়া থাকেন।

এইবার হিন্দু অধিবাসীগণের কথা বলিবার পূর্ব্বে আমরা অন্যান্য দুই একটী জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা করিব। খিদিরপুর স্থানটী প্রধানতঃ

মুন্সীগঞ্জ, ওয়াট্‌গঞ্জ, বেনেপাড়া, ষষ্ঠীতলা, পদ্মপুকুর, বেড়াপুকুর, ভূকৈলাস, হরবাস, একবালপুর, মোমিনপুর, কোন্দোনবাগান এবং গড়বাড়ী ও মনসাতলা এই কয়ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে ওয়াট্‌গঞ্জ, ওয়াট্‌সন সাহেবের নামে এবং পদ্মপুকুর ও বেড়াপুকুর নামক পল্লী দুইটীর উক্ত দুই নামের পুষ্করিণীর নামেই নামকরণ হইয়াছে। কথিত আছে গড়বাড়ীটি পদ্মনাভ নামক "রাজা" আখ্যাধারী এক ব্যক্তির গড় ছিল। পরে গড়সমন্বিত তদীয় বাসভবনটী আলিপুরের সেরেস্তাদার রামচন্দ্র মিত্রের সম্পত্তি হয়। কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও সেই গড়ের শেষ চিহ্ন এবং মিত্রজ মহাশয়ের গৃহদ্বারের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান ছিল। এক প্রাচীন মনসাগাছ হইতেই মনসাতলার নামকরণ হইয়াছে। এখনও প্রতি বৎসর এই পল্লীদেবীর পূজা হয়। পোর্ট কমিশনারের ডক খিদিরপুরকে বেনেপাড়ার অধিকাংশ, পাকুড়তলা, মিটেপুকুর, নলোপাড়া, এবং কাঁটাপুকুর এই কয়টী স্থান হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। কাঁটাপুকুরটী ৫।৭ বৎসর পূর্ব্বেও জঙ্গলময় শিশুসমাধিক্ষেত্র এবং দস্যু-তস্করের আবাস ছিল। পান-বাজারটী পূর্ব্বে পানেরই বাজার ছিল এবং আধুনিক রামকমল মুখোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীটপার্শ্বস্থ পল্লী চাষাধোবাপাড়া বলিয়া খ্যাত ছিল। পুরাতন ঘোঁড়ামারার বাগান, মুন্‌সির বাগান, নারিকেল বাগান প্রভৃতি স্থানগুলিকে আমরা ভুলিতে বসিয়াছি।

হিন্দু অধিবাসীগণের কথা বলিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে ভূকৈলাশ রাজ-পরিবারের কথাই বলিতে হইবে। কীর্ত্তিমান দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালের পরবর্ত্তী স্বর্গীয় মহারাজা বাহাদুর জয়নারায়ণ ঘোষাল এই রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি ১৭৫১ সালে গোবিন্দপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল। মহাত্মা জয়নারায়ণ অল্প বয়সেই ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও পার্শী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া মুরশিদাবাদের নবাবের অধীনে কর্ম্ম করেন। পরে ইংরাজসরকারে কাজ করিয়া এরূপ দক্ষতা প্রদর্শন করেন যে তাঁহাতে প্রীত হইয়া ওয়ারেন হেষ্টিংশ ১৭৮৮ সালে দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ জেহান্দার সার নিকট হইতে ইহাকে একটী সনন্দ আনাইয়া দেন। সেই সনন্দের বলে ইনি মহারাজ বাহাদুর উপাধি ও তিন হাজারী মনসবদারী প্রাপ্ত হ'ন। বাণিজ্য ব্যবসায়ে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। পক্ষান্তরে ভূকৈলাসে ৺পতিতপাবনী ও অন্যান্য দেবদেবী প্রতিষ্ঠায়, কালী-মাতাকে অলঙ্কার প্রদানে এবং কাশীধামে করুণা-নিধান নামক রাধাকৃষ্ণ

মূর্ত্তি স্থাপনে এবং বিদ্যালয় ও পুষ্করিণী আদি প্রতিষ্ঠায় উপার্জ্জিত অর্থের মুক্ত-হস্তে সদ্ব্যয়ও করিয়া গিয়াছেন। ইনিই ভূকৈলাসের রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। ইঁহার একমাত্র পুত্র কালীশঙ্কর ইংরাজসরকার কর্ত্তৃক রাজা বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হ'ন। ইঁহার চতুর্থ পুত্র সত্যচরণও এই উপাধি প্রাপ্ত হয়েন এবং পঞ্চম পুত্র এই উপাধি ব্যতীত সি, আই, ই উপাধিও লাভ করেন। বড়ই দুঃখের বিষয় সত্যচরণ ব্যতীত পরবর্ত্তী আর কেহই রাজা বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হ'ন নাই। বঙ্গদেশের অনেকস্থলে বিশেষতঃ পূর্ব্বাঞ্চলে ইঁহাদের সুবৃহৎ জমিদারী আছে। বরিশালের সুবিখ্যাত রাজা বাহাদুরের হাভেলি এবং কাশীর গুরুধামও এই রাজ বংশের সম্পত্তি। প্রসঙ্গ-ক্রমে, ভূকৈলাস পরিবারের যোগীপুরুষ সংক্রান্ত যে অপবাদ আছে "শিব সংহিতা" নামক একটি পুরাতন গ্রন্থ হইতে আমরা সে বিষয়টি উদ্ধৃত করিতেছি।

"মহানগরোপান্তে ভূকৈলাসাখ্য গ্রামে রাজভবনে...আনীত অদ্ভুতদর্শন যোগী পুরুষের...ক্ষমতা বাহ্যে কিঞ্চিৎমাত্র প্রকাশ ছিল না। তদ্দৃষ্টে অনেকানেক অদান্তভ্রান্ত পুরুষেরা তাঁহার যোগান্তকরণাশয়ে বহুবিধ যোগ-বিঘ্নোপায় দ্বারা তাঁহার যোগাবস্থার কিঞ্চিন্মাত্র হানি করিতে পারেন নাই। পরিশেষে কুৎসিত অত্যাচারে চৈতন্য হওয়ায় মুমূর্ষু কালে বলিয়াছিলেন মদ্দেহকে জাহ্নবীজলে বিসর্জ্জন করিহ। ফলে মহানুভবেরা তাহাই করিয়া-ছিলেন।"

উক্ত ঘটনা রাজ পরিবারের কলঙ্কজনক হইলেও প্রতিবেশীরূপে আমরা যতদূর জ্ঞাত আছি, তাহাতে নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে কর্ত্তৃপক্ষের অজ্ঞাত-সারেই এইরূপ মর্ম্মপীড়াদায়ক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল।

প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে স্বর্গীয় এটর্ণী গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় খিদিরপুরে বাস করিতেন। ভারতের মুখোজ্জ্বলকারী ইঁহার পুত্র উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে গর্ভে ধারণ করিয়া খিদিরপুর গৌরবান্বিত হইয়াছে। এই মহাত্মা ১৮৪৪ সালের ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে খিদিরপুরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতি অল্প বয়সে ব্যারিষ্টার হইয়া, ইনি কলিকাতা হাইকোর্টে W. C. Bonerjee নামে পরিচিত হইয়া মাসিক প্রায় ১০০০০ টাকা উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। উত্তরকালে Privy Council এও ইঁহার ব্যবসায়ের যথেষ্ট প্রসার হইয়াছিল। ইনি চারিবার Standing Council হইয়াছিলেন. এবং দুইবার High Courtএর Judge হইবার প্রস্তাব

প্রত্যাখ্যান করেন। উমেশচন্দ্র ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং ১৮৯৪ ও ৯৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হন। ভারতবাসীর পক্ষে যে সম্মান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহাও খিদিরপুরের উমেশচন্দ্র সর্ব্বপ্রথমে লাভ করেন। ইনিই ১৮৮৫ সালে জাতীয় মহাসভার সর্ব্বপ্রথম সভাপতি। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ইনি দ্বিতীয়বার এই সম্মান লাভ করেন এবং মহাসমিতির উন্নতিকল্পে ভারতে ও বিলাতে যথেষ্ট চেষ্টা করেন। শেষজীবনে বিলাতের যে বাটীতে ইনি বাস করিয়াছিলেন সে বাটী Kidderpore House নামে অভিহিত হইত ইহাতে উমেশচন্দ্রের যথেষ্ট স্বদেশ-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। আর তাঁহার ইচ্ছানুসারে মৃত্যুর পর তদীয় শবদেহটী সমাধির পরিবর্ত্তে দাহ করা হইয়াছিল ইহাও স্বজাতির প্রতি সামান্য সহৃদয়তার পরিচয় নহে। খিদিরপুরের এই সুসন্তান ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

স্বর্গীয় কাশীপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের নামও ভুলিবার নহে। যে বাটীতে রায় মনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর বাস করেন, যে বাটিতে কবি মধুসূদন দত্ত বাস করিতেন, সেই বাটীতেই কাশীপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় বাস করিয়াছিলেন, এইরূপেই খিদিরপুরের Antique House এর নামের সার্থকতা হইয়াছে। কাশীপ্রসাদ ইংরাজী ভাষায় একজন উচ্চথরণের কবি ছিলেন। ইনি বিদ্যাসুন্দরের একটী সুন্দর অনুবাদ করিয়াছেন।

স্থানীয় "বড়বাড়ী" নামক বড়বাড়ীটি হুগলী জেলার অন্তঃর্গত বাকুল গ্রামনিবাসী স্বর্গীয় রামকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় নির্ম্মাণ করেন, সেও আজ প্রায় অশীতি বর্ষের কথা। এই গোষ্ঠিপতির আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রতিবেশী অনেক পরিবার খিদিরপুরকে বাকুলের উপনিবেশে পরিণত করিয়া ফেলেন।

স্বর্গীয় রাখালদাস হালদার মহাশয়ের অধ্যবসায়ে প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে খিদিরপুরে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছিল। ৺দ্বারকানাথ ঘোষ মহাশয় এই সমাজের সম্পাদক ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই সভায় যোগদান করিতেন।

মৃত মহাত্মা কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী স্থানীয় "হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভার প্রতিষ্ঠাতা। গঙ্গাযাত্রীদিগের অবস্থানের গৃহটী তাঁহারই কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। এতদ্ব্যতীত তিনি দরিদ্রদিগের শব-বহনের জন্য একখানি নৌকাও গঠন করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু হায়, দেহ, মন, অর্থ—সাধারণের কার্য্যে

এ সমস্ত নিঃস্বার্থভাবে দান করিয়াও তিনি নিন্দুকদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন নাই।

এইবার আমরা স্থানীয় দর্শনীয় বিষয়গুলির উল্লেখ করিতেছি। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইংরাজদিগের উপাসনার জন্য St. Stephens Churchটী Military Orphan Schoolএর সংশ্লিষ্টভাবে ১৮৪৬ সালে স্থাপিত। St. Barnabas Church, William Dent সাহেবের প্রদত্ত ৪৫,০০০ হাজার টাকা ব্যয়ে Rev. মধুসূদন শীলকর্ত্তৃক বাঙ্গালীখৃষ্টানদিগের জন্য স্থাপিত। টিপুসুলতানের পুত্র কর্ত্তৃক স্থাপিত মসজিদ ব্যতীত মুসলমানিগের আরও ৭।৮টি উপাসনা গৃহে আছে। খিদিরপুর পুলের উপর অবস্থিত পীরের দরগাও মুসলমান দ্বারা রক্ষিত।

হিন্দু দেবালয়াদির কথা বলিতে হইলে প্রথমেই পঞ্চানন দেবের বিষয় বলিতে হইবে। এই স্বয়ম্ভু দেবতা বর্ত্তমান কালের মানবগণের অজ্ঞাত সময় হইতে এই স্থানে বিরাজ করিতেছেন। খিদিরপুরের কালীমাতা সম্বন্ধে কথিত আছে যে প্রায় ৮০ বৎসর পূর্ব্বে খিদিরপুরের বাজার যখন কুটীর শ্রেণীর সমষ্টিমাত্র ছিল, সেই সময়ে একটী জীর্ণ কুটীরে কালীমাতা অবস্থিত ছিলেন। Captain Becker বাজারের কলেবর বৃদ্ধির জন্য এই কালীকুটীর ভগ্ন করায় সাংঘাতিক দৈব বিড়ম্বনা ভোগ করেন। অতঃপর তাঁহাকে কালীদেবীর জন্য —গবর্ণমেণ্ট হইতে নিষ্কর জমি সংগ্রহ করিয়া দিয়া এবং নিজ খরচায় মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া দেবীকে প্রসন্ন করিতে হয়। ভূতপূর্ব্ব মোহান্তের আখড়া যেস্থানে অবস্থিত ছিল, সে স্থানটী এক্ষণে ডকের অংশীভূত হইয়াছে। দেওয়ান গোকুল ঘোষাল স্থাপিত শিবমন্দিরটী পদ্মপুকুরের পার্শ্বে আজিও বিদ্যমান আছে। প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বে "বালাবাবাজী" নামক এক যোগীপুরুষ গঙ্গাতটে অবস্থান করিতেন। তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। শারীরিক অবস্থা দেখিয়া এবং অন্যান্য প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া সাধারণে অনুমান করিতেন যে তিরোধানকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ২০০ বৎসরের অধিক হইয়াছিল। পুলের পশ্চিম পার্শ্বে এই মহাপুরুষের সমাধিটি আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। খিদিরপুরের স্নানের ঘাটের পরপারে ধর্ম্মজগতে মহার্ঘ সম্পত্তি-স্বরূপ সাধুদিগের আশ্রম কথাও অনেকে জ্ঞাত নহেন। বর্ত্তমানকালে শিবাশ্রম নামে অভিহিত এই আশ্রমটী কোন প্রাচীনকালে কোন মহাত্মা দ্বারা স্থাপিত হইয়া সাধু পুরুষ পরম্পরায় রক্ষিত হইয়া

আসিতেছে, তাহা স্মরণাতীত। আধুনিক লোকে স্বর্গীয় বাবা বদলুগিরিকেই আশ্রমের অধ্যক্ষরূপে দেখিয়াছে। আশ্রমটী পূর্ব্বে পঞ্চবটী ছিল। এক্ষণে অশ্বত্থ, বট, নিম্ব, আমলকি এবং হরিতকি-স্থলে এক বিশাল পর্কটীবৃক্ষ আশ্রমটীকে ছায়াসুশীতল করিয়া রাখিয়াছে। প্রভাতে বা সন্ধ্যায় যিনি একবার এস্থানে পদার্পণ করিয়াছেন, তিনিই সাধুপুরুষগণের স্পর্শপূত এই মঠের শান্তি ও পবিত্রতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। আর গভীর নীরব নিশীথে এই নিভৃত আশ্রমে যখন গঙ্গাবারির কুলুকুলুধ্বনি পরিশ্রুত হয় এবং প্রজ্বলিত ধুনিপার্শ্বে উপবিষ্ট জটাজুটধারী সমাগত সাধুপুরুষগণ যখন তন্ময়ভাবে ভগবৎ-গুণানুবাদ করেন—তখন নয়নাভিরাম স্থানটীকে তপোবন বলিয়া ভ্রম হয়। তীর্থযাত্রী সাধুপুরুষগণ এবং নিরাশ্রয় অতিথিগণ আশ্রমটীকে খিদিরপুরের ধর্ম্মশালা মনে করিয়া এবং আশ্রমের সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া খিদিরপুরবাসীগণের অজ্ঞাতসারে তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া যান।

এই সমস্ত সাধারণ দেবালয় ও ধর্ম্মালয় ব্যতীত ভূকৈলাসের পতিত-পাবনী ও মহাদেবদ্বয়ও এ অঞ্চলে সমধিক প্রসিদ্ধ। শিবরাত্রি ও চড়ক উপলক্ষে ভূকৈলাসে প্রতি বৎসর দুইটি সুবৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। হেমচন্দ্রের আমাদের গোষ্ঠ বিহারের মেলাটি পূর্ব্বেকার উৎসব ও আনন্দ হারাইতে বসিয়াছে। নববৎসরের এই সাদর আহ্বানটী যাহাতে ক্ষীণ হইয়া না যায় স্থায়ী অধিবাসীগণের সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকা উচিত।

স্থানীয় মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়টী ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় গঠিত হইবার দুই বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায়, যোগীন্দ্রনাথ ঘোষ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বিনায়কচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও গিরীশচন্দ্র দেব, স্বর্গীয়এই পঞ্চ মহাত্মা বিদ্যালয়টীর স্থাপয়িতা। ১৮৮৬ সালে দেশনায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের Ripon Collegiate স্কুলটী স্থাপিত হয়। বিদ্যালয়টী ক্রমে অচল হওয়ায় Kinderpore Institution এর অঙ্গীভূত হইয়া যায়। এই খিদিরপুর Institution এর জন্য খিদিরপুর-বাসীগণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ পাঠক মহাশয়ের নিকট চির-কৃতজ্ঞ। মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন পাঠক মহাশয়ের অদম্য উৎসাহেই তাঁহার ছাত্রবৃত্তি বিদ্যালয়টী এণ্ট্রান্স ইস্কুলে পরিণত হইয়াই স্থানীয় যুবকদিগকে জীবন সংগ্রামে উপযুক্ত করিয়া দিয়াছিল। Church Missionary Societyর Schoolটী পূর্ব্বে খিদিরপুরেই ছিল। বঙ্গসাহিত্য-রথী অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় বাল্যকালে

১২৩৭ সালে তাৎকালিক জয়কৃষ্ণ মাষ্টারের নিকট ইংরাজী পড়িয়া পরে এই স্কুলেই শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

পুরাতন সভা সমিতির বিষয় অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে Progressive Society, Public study ও young men's Association আমাদের পূর্ব্বকালের যুবকগণের মধ্যে প্রসার লাভ করিয়াছিল।

এইবার আমরা কতকাল পূর্ব্ব হইতে খিদিরপুরে বঙ্গসাহিত্যের অনুশীলন হইতেছে তাহারই উল্লেখ করিব। স্থানীয় রামরঞ্জন মিত্র মহাশয়ের বাটী হইতে "দুরবীক্ষণিকা" নামক মাসিক পত্রিকা তত্ত্ববোধিনী প্রেসে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল, সে আজ প্রায় ৬০ বৎসরেরও পূর্ব্বের কথা। স্বর্গীয় রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার ও মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি মহাশয়দ্বয় ইহার সম্পাদনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভূকৈলাসের তাৎকালিক রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর এবং পূর্ণিয়ার রাজা বিজয় গোবিন্দ সিংহ বাহাদুর এই পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। দুর্ভাগ্য-বশতঃ পূর্ব্ব হইতে গভর্ণমেণ্টের অনুমতি গৃহীত না হওয়ায় পত্রিকার পরিচালক রাখালদাস হালদার প্রমুখ যুবকগণকে ২৪ পরগণার ম্যাজিষ্ট্রেট Elliot সাহেবের আদালতে সোপরদ্দ হইতে হইয়াছিল। Elliot সাহেব কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া যুবকগণ পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করিতে বাধ্য হ'ন। প্রশংসার বিষয় যে ইহাতে যুবকগণের উৎসাহের বিরাম হয় নাই। অবিলম্বেই "সংসার সাগর" নামক আর একটী পত্রেই প্রকাশ যে "পত্রটী প্রতি সোমবার বুধবার ও শুক্রবার প্রত্যূষে খিদিরপুরস্থ ৺বাবু রামকমল মুখোপাধ্যায়ের স্কুল বাড়ী নামক ভাড়াটিয়া বাটী হইতে প্রকাশিত হয়।" বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিকল্পে খিদিরপুর বাসীগণের কতদূর শক্তি নিয়োজিত হইয়াছে ব্রাহ্মসভাচার্য্য শ্রদ্ধেয় শুভানুধ্যায়ী শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাষায় তাহারই পরিচয় দিতেছি "এই খানেই ভূকৈলাসের রাজবংশের বিষয়-ব্যাপারে নিযুক্ত রামপ্রসাদের হৃদয়-কন্দরে অপূর্ব্ব ভাবাবেশ হইয়াছিল। এইখান হইতেই তিনি তাঁহার অপূর্ব্ব খাঁটি দেশীয় সঙ্গীত-মাধুর্য্যে বাঙ্গালীর হৃদয়কে গলাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই খানেই মাহত্মা অক্ষয়কুমার দত্তের আবির্ভাব, এই খানেই তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষার সূচনা। এই খানেই বঙ্গ-ভাষাকে শৈশবদশায় লালিত পালিত করিবার ভার তাঁহার স্কন্ধে নিপতিত হইয়াছিল। বিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্ব প্রচারে বঙ্গভাষাকে শ্রীসম্পদ প্রদান করিবার প্রেরণা তাঁহার বিরাট-হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়াছিল। এইখানেই কবিগুরু মাইকেল মধুসূদন দত্তের

আবির্ভাব। মধুচক্র-নির্ম্মাণ-কল্পে এইখানে বসিয়াই তিনি মধুসঞ্চয় করিতে-ছিলেন। এইখানেই প্রকৃতির বরপুত্র রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব। এইখানে বসিয়াই তিনি বর্ত্তমান ভাষাকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য কাব্যরচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এইখানেই মহিমান্বিত হেমচন্দ্রের অসামান্য বিকাশ, এইখানে বসিয়াই তাঁহার সমগ্র কাব্যগ্রন্থের অপূর্ব্ব রচনা। এইখানেই পরিণত-বয়সে মিল্টনকল্প সেই অন্ধ কবির তিরোভাব। আর এইখানেই তদীয় ভ্রাতা ঈশানের প্রতিভার স্ফুরণ।"

উপসংহারে, ভ্রমপ্রমাদ পূর্ণ এই "খিদিরপুরের ইতিবৃত্ত" সুধীসমাজে প্রকাশরূপ দুঃসাহসের কার্য্য করিয়া, অল্পমতি লেখক ক্ষমা ভিক্ষা করতঃ সাধারণের নিকট বিনীত প্রার্থনা করিতেছে যে, তাঁহারা এই প্রবন্ধটীকে সূচনা মাত্র মনে করিয়া, খিদিরপুরের একটি নির্ভুল ও বিস্তারিত ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করুন। যেন খিদিরপুরবাসীগণ তাঁহাদের এই পতিত অবস্থায় অত্যুজ্জ্বল অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করিতে পারে, যেন তাহাতে আবার "দেশের দশের মাঝে" উঠিয়া দাঁড়াইবার উচ্চাকাঙ্খা তাঁহাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়। আর তদ্দ্বারা যেন সম্পদে সম্রমে, জ্ঞানে বিজ্ঞানে, শিল্পে ব্যবসায়ে, ও কাব্যে সাহিত্যে সম্পন্ন হইয়া আমাদের প্রিয়তম জন্মভূমি পুনরায় সাধারণে পরিচিত ও গৌরবান্বিত হইয়া উঠে!

শ্রীপান্নালাল দে।

চ্যবন। (৩)

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রণা।

কর্ম্মচারী সঙ্গিগণসহ প্রস্থান করিলে সময় প্রাপ্ত হইয়া মহারাজা শর্য্যাতি মন্ত্রী ও পারিষদবর্গকে কহিলেন, ইনিই মহাত্মা চ্যবন। আমি কন্যার নিনতিক্রমে তাঁহাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া অবলা ও অপরিণামদর্শিনী কন্যার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। তাহাতে তিনি কহিলেন, "আমি আপনার কন্যাকে অগ্রেই ক্ষমা করিয়াছি। ক্ষমা না করিলে তিনি ব্রহ্মাগ্নি-তেজে ভস্ম হইয়া যাইতেন, সন্দেহ নাই।"

মহাত্মার বাক্যশ্রবণে আমিও সাহসী হইয়া কহিলাম, প্রভো! আমরা ক্ষুধামান্দ্য-বশতঃ তবে কি কারণ এতাদৃশ কষ্ট অনুভব করিতেছি?

চ্যবন। সে কেবল আপনাদিগকে এখানে আনয়নের জন্য। আপনার কন্যা আমাকে অন্ধ করিয়া দিয়াই পলায়ন করিলেন, এক্ষণে আমি অনুপায় হইলাম, আমার আহারাদি ও হোমাদি কার্য্যে কে আর সাহায্য করিবে? সুতরাং আপনার সেই অনুপমা কন্যাকেই আমার পরিচর্য্যার্থ এখানে প্রেরণ করুন।

রাজা। আমার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। আমি কত অনুনয়বিনয়-সহকারে তাঁহার পরিচর্য্যার্থে দাস দাসী প্রেরণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলাম, কিন্তু মহর্ষি সে কথায় সম্মত হইলেন না। এক্ষণে হে সচিবগণ! আমার কর্ত্তব্য কি তাহাই অবধারণ করুন। আমি সেই উপবনযাত্রিগণের সহিত আমৃত্যু যন্ত্রণাভোগ করিব, না সেই রূপবতী লক্ষ্মীস্বরূপিনী কন্যারত্নকে বিপ্র চ্যবনের হস্তে সমর্পণ করিব?

মন্ত্রিগণ। মহারাজ! আপনার অতিদুস্তর উভয়সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষেত্রে আমরা মহারাজকে কি পরামর্শ দিব?

রাজা। আপনারা আমার মন্ত্রণাদায়ক। দুস্তর হউক আর সুকর হউক, রাজ্যসংক্রান্ত হউক অথবা পারিবারিক হউক, সকল বিষয়েই যথাযোগ্য মন্ত্রণা আপনারা দান করিয়া থাকেন। এক্ষেত্রেও আপনাদিগের যোগ্য পরামর্শ আমার গ্রহণ করা উচিত।

মন্ত্রিগণ। মহারাজ! একদিকে উপবন-যাত্রিগণের ক্লেশভোগ, অপরদিকে আপনার একমাত্র আদরের কন্যাকে চিরজীবন কদাকার বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের হস্তে সমর্পণ—এতদুভয়ই গুরুতর ব্যাপার। স্ফুটনোন্মুখযৌবনা পরমা সুন্দরী সুকন্যা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের হস্তে সমর্পিত হইলে, পরমরমণীয় সুবাসযুক্ত মল্লিকা নিদাঘসূর্য্য-কিরণতপ্ত হইয়া অকালশুষ্কতা প্রাপ্ত হইবে। পবিত্র বস্তু অপবিত্র স্থানে প্রক্ষিপ্ত হইলে যেমন তাহা আর আদরণীয় হয় না, তদ্রূপ আপনার কন্যা কদাকার চ্যবনহস্তে অর্পিত হইলে কখনই আদর প্রাপ্ত হইবে না। তাঁহার জীবন বিফলে অতিবাহিত হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। সুতরাং মহারাজ, আপনার কন্যারত্নকে আমরা অপাত্রে স্থাপন করিবার পরামর্শ কদাচ দিতে পারি না।

রাজা মন্ত্রিগণের এতাদৃশ খেদসূচক বাক্যলহরী শ্রবণগোচর করিয়া আক্ষেপসহকারে বলিতে লাগিলেন, "হায়, আমি বড় পাপিষ্ঠ, তজ্জন্য সেই সরলপ্রাণা সদানন্দচিত্তা বালিকাহৃদয়ে বজ্রাগ্নি-সদৃশ বৃদ্ধব্রাহ্মণসহ বিবাহরূপ

বাক্যবাণ শ্রবণ করাইতে উদ্যোগী হইয়াছি। মদীয় দুর্ব্বিসহ বাক্যবাণ শ্রবণ মাত্রেই তাহার সেই প্রফুল্ল শতদলনিভ বদনকমল নিদাঘকিরণবিশোষিত পুষ্পের ন্যায় বিষণ্ণতা প্রাপ্ত হইবে, তাহা আমি পিতা হইয়া কোন্ প্রাণে দর্শন করিব; লোকে জলসেচন পূর্ব্বক বিষবৃক্ষকেও পরিবর্দ্ধিত করিয়া ছেদন করিতে অসমর্থ হয়, আর আমি এরূপ হতভাগ্য যে আমার স্নেহময়ী কন্যাকে অন্নবস্ত্রালঙ্কারদানে পঞ্চদশবর্ষ যাবৎ প্রতিপালন করিয়া অবশেষে তাহার সুখজীবননাশে উদ্যত হইয়াছি।"

মহারাজ শর্য্যাতিকে এতাদৃশ করুণবাক্যে আক্ষেপ করিতে শ্রবণ করিয়া সমদুঃখকাতর মন্ত্রিগণও বিষণ্ণ হইয়া শোকাশ্রু বিগলিত করিতে লাগিলেন। সচিব ও পারিষদবর্গের অশ্রুবিমোচন ও শোকোচ্ছ্বাসে সেই সভাগৃহ ব্যাত্যান্দোলিত বারিবর্ষণরত স্থানের ন্যায় উপলক্ষিত হইল।

সকলে দুর্ম্মনায়মান হইয়া সেই সভাগৃহে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে রাজকুমারী সুকন্যা মাতার নিকট সমস্ত অবগত হইয়া সভাবিস্থানে গমন করিলেন। বহুদিবসবর্ষণরত মেঘমালাসমাকীর্ণ গগনমণ্ডলে সহসা চন্দ্র উদিত হইলে যেরূপ সকলে প্রফুল্লচিত্তে তাঁহাকেই দর্শন করে, তদ্রূপ সেই শোকপূর্ণ সভামণ্ডপে রাজকুমারীর আগমনে সকলেরই চক্ষু তাঁহার উপর নিপতিত হইল। প্রভাতকমলের ন্যায় প্রিয়দর্শন তাঁহার বদনকমল নিরীক্ষণ করিয়া সূর্য্যোদয়ের অন্ধকারের ন্যায় সকলের হৃদয়ান্ধকার দূরীভূত হইল। মাতৃসকাশে সর্ব্ববৃত্তান্ত অবগত হইয়াও তাঁহার বদনে বিষাদ-কালিমা নিপতিত হয় নাই। হসিতাধরে কুন্দপুষ্পবিনিন্দিত দশনরাজি বিকাশিত করিয়া তিনি চিন্তাবিমর্ষ পিতৃদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন "পিতঃ! আপনি কি নিমিত্ত অদ্য দুঃখিত ও ব্যাকুলহৃদয় হইয়াছেন? অপরাধী ব্যক্তিই দণ্ড পাইয়া থাকে। আমি যখন সেই জিতেন্দ্রিয় মুনিবরকে পীড়া দিয়াছি তখন আমিই তাঁহাকে আত্মসমর্পণ পূর্ব্ব আশ্বাসদানে প্রসন্ন করিব।"

প্রিয় তনয়ার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখান্বিত হইলেও প্রসন্নমনে যাহাতে সচিবগণের শ্রবণগোচর হয় এরূপভাবে কহিলেন, "পুত্রি! তুমি অবলা, মধুরস্বভাবা, সুখোচিতা, অতএব তুমি কি প্রকারে জরাগ্রস্ত অতিকোপনস্বভাব সেই চ্যবন মুনির পরিচর্য্যা করিবে! আমিই বা কিপ্রকারে পিতা হইয়া মদনমোহিনী রতিদেবী তুল্য সৌন্দর্য্যশালিনী তোমাকে সেই জরাগ্রস্ত অন্ধের হস্তে সমর্পণ করিব? যে সমধিক বলশালী, যাহার

বিবাহোপযুক্ত বয়স আছে ধনধান্যাদি দ্বারা সমৃদ্ধ এরূপ পাত্রেই কন্যাদান করা উচিত। এ তিনের কিছুই তাঁহার নাই। অতএব তিনি সর্ব্বথা তোমার অযোগ্য।

কন্যা। পিতঃ! আমার জন্ত যে এতলোক কষ্টভোগ করিবে তাহা কখনই আমার সহ্য হইবে না। লোকে দুঃসহ রোগে কাতর হইয়া আপনার সাক্ষাতে না পারুক অসাক্ষাতে নিশ্চয়ই আমাকে ও আপনাকে গালি দিবে। একজনের জন্ত দশজন দুঃখভোগ করে এমন জীবন ঘৃণার্হ। আপনি প্রসন্নমনে আমাকে সেই মুনিবরের হস্তে সমর্পণ করুন। আমার জন্ত সকলে সুখী হউক।

রাজা। বালিকে! তোমার মন অতীব উচ্চ, তজ্জন্য তুমি সরলহৃদয়ে এরূপবাক্য বলিতে সমর্থ হইলে। ভাবিয়া দেখ দেখি, সেই বৃদ্ধ, অন্ধ, কদাকার সামর্থ্যহীন ব্রাহ্মণ কেমন করিয়া তোমার পতি হইবার উপযুক্ত পাত্র? আজন্ম এই রাজবাটীতে সুখে ও আদরে প্রতিপালিত হইয়া কেমন করিয়া মৃত্তিকার উপর পর্ণশালায় জীবন অতিবাহিত করিবে? বহুমূল্য-বিচিত্র বসনভূষণে থাকিয়া, কেমন করিয়া বনে কর্কশস্পর্শ বল্কল পরিধান পূর্ব্বক বিচরণ করিবে? সর্ব্বদা সখীগণ-পরিবেষ্টিত ও দাসদাসী-সেবিত হইয়া জীবন যাপন পূর্ব্বক সহসা কি প্রকারে একাকিনী নির্জ্জন বন-মধ্যে আত্মরক্ষণে অসমর্থ সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইবে? যে তোমার রক্ষাভারগ্রহণে একান্ত অসমর্থ তাহার হস্তে আমি কদাচ তোমাকে অর্পণ করিতে পারিব না। ইহাতে আমার ও আমার সৈনিকগণের যদি প্রাণবিয়োগ হয়, তাহাও আমি অক্লেশে সহ্য করিব।"

রাজার এতাদৃশ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা দেখিয়া মিতভাষিণী বালিকা পুনরায় কহিলেন, "পিতঃ! ভবিতব্য অলঙ্ঘনীয়। যদি সেই অন্ধ সর্ব্বত্যাগী ব্রাহ্মণের সহিত আমার বিবাহ স্থিরীকৃত থাকে, তবে তাহা কাহারও খণ্ডন করিবার ক্ষমতা নাই। তবে কি জন্য আপনি এতগুলি লোকের ক্লেশভোগের কারণ হইয়া সকলের নিন্দনীয় হইবেন? পিতৃদেবকে সকলের নিন্দাভাজন হইতে দেখিলে কোন্ কন্যা তাহাতে দুঃখিত না হইয়া থাকিতে পারে? এরূপ নিন্দাভাজন ও পরের ক্লেশভোগের কারণ হওয়া অপেক্ষা আপনি আমাকেই সেই যোগিবরের হস্তে সমর্পণ করুন। আমি সন্তুষ্টহৃদয়ে পরমভক্তিসহকারে বিজন বনমধ্যে পরমপাবন বৃদ্ধ পতিরই সেবায় নিযুক্তা থাকিব। হে তাত!

আমার ভোগেচ্ছা নাই, আমার চিত্ত ভোগলালসার জন্য ব্যগ্র নহে। সুতরাং নিঃসন্দেহ আমি সতীধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক পতির অভিমত কার্য্য সম্পাদন করিব।"

সচিবগণ ও পারিষদবর্গ রাজতনয়ার এতাদৃশ ধর্ম্মজ্ঞান-সম্মত বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। অনন্তর রাজকুমারীকে বিদায় দিয়া রাজা সভাভঙ্গ করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

কন্যাদান

মহারাজ শর্য্যাতি কন্যাকে এতাদৃশ স্থির-প্রতিজ্ঞা অবলোকন করিয়া মন্ত্রী, পারিষদ, স্বজনবর্গ, বরবর্ণিনী তনয়া সুকন্যা ও রাজমহিষী সমভিব্যাহারে উপবনস্থ মহামুনি চ্যবনসন্নিধানে গমন করিলেন। তথায় রাজকর্ম্মচারিগণনির্ম্মিত পর্ণশালায় তপোধনকে উপবিষ্ট অবলোকন করিয়া প্রণিপাত-পুরঃসর মুনিপ্রবর ভৃগুনন্দনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "স্বামিন্! আপনার আদেশ-অনুসারে মদীয় অলোকসামান্যা তনয়াকে আপনার সেবার্থে আনয়ন করিয়াছি, গ্রহণ করুন।" অনন্তর বিবাহবিধি অনুসারে নৃপবর শর্য্যাতি নিজ অলোকসামান্যা সেই তনয়াকে অন্ধ চ্যবন-হস্তে সমর্পণ করিলেন। ভৃগুনন্দন চ্যবন রাজার এতাদৃশী সদাশয়তা দেখিয়া পরমপ্রীতিলাভ করিলেন, কিন্তু মহারাজ যখন বিবাহের যৌতুক দানে উদ্যত হইলেন, তখন তিনি তাঁহাকে কহিলেন, "মহারাজ আমি আপনার কন্যারত্নদানে বড়ই প্রীত হইয়াছি। মদীয় তপস্যার সহায়ভূতা ও মদীয় পরিচর্য্যা-রতা হইবেন বলিয়া আমি আপনার তনয়াকে গ্রহণ করিলাম। কিন্তু অর্থ তো তপঃসাধনোপায় নহে, বিশেষ ফলমূলাহারী বনবাসীর অর্থে কোনই প্রয়োজন নাই।"

ভৃগুনন্দন প্রসন্ন হইবামাত্র বৃদ্ধ অন্ধের হস্তে কন্যাসম্প্রদান-ক্লেশ অপগত হইয়া রাজা ও রাজমহিষীর হৃদয়ে অপার আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইল। তাঁহাদিগের উভয়ের এবং যানবাহনাদি ও সৈনিকগণের ক্ষুধামান্দ্যদোষ প্রশমিত হইল। সকলেই যেন অদ্ভুত আনন্দসাগরে সন্তরণ দিতে লাগিলেন।

এই প্রকারে কন্যাদান কার্য্য সমাপন করিয়া শর্য্যাতি মুনিপ্রবরের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক রাজধানী প্রত্যাগমনোন্মুখ হইলে, তাঁহার স্নেহপালিতা আদরিনী সুকন্যা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "পিতঃ! এই সকল বহুমূল্য বস্ত্রাভরণে আর আমার কোন প্রয়োজন নাই। মুনিবরের নিকটই

ত শুনিলেন এ সকল তপঃ-কার্য্যের সহায়ভূত নহে, অতএব এ সমস্ত আপনিই গ্রহণ করুন। আমাকে তপস্বিনীর উপযুক্ত বল্কল ও অজিন প্রদান করুন। তাত! আমি আপনার কন্যা হইয়া যখন স্বেচ্ছায় বৃদ্ধ মুনিবরকে পতিরূপে গ্রহণ করিলাম, তখন জানিবেন আমি মুনিপত্নীদিগের বেশধারণ পূর্ব্বক পরলোকের সুখাবহ স্বামিপরিচর্য্যারূপ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিব। সুন্দরী যুবতী অন্ধপতিকরে সমর্পিত হইল বলিয়া আমার চরিত্র বিষয়ে কোনরূপ দোষ সম্ভাবনা করিয়া চিন্তাযুক্ত হইবেন না। বরং জানিবেন যাহাতে স্বর্গে মর্ত্ত্যে ও রসাতলে আপনার অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষিত হয় আমি তদ্বিষয়ে যত্নবতী থাকিব। বশিষ্ঠের ধর্ম্মপত্নী অরুন্ধতী ও অত্রিপত্নী অনুসূয়া যেরূপ সাধ্বীগণের অগ্রগণ্যা বলিয়া প্রসিদ্ধা, আপনার কন্যা আমিও সেইরূপ সতীধর্ম্ম পালন পূর্ব্বক আপনার কীর্ত্তিকরী হইব। পিতঃ! অধিক আর কি বলিব বাল্যকাল হইতেই আমার এইরূপ জীবন-যাপনে অভিলাষ ছিল। স্বয়ং ভগবতী যেমন ত্রিলোচন-সকাশে আগম পুরাণ বেদ প্রভৃতি শ্রবণ করিয়া নিজেকে চরিতার্থ করেন, আমিও তদ্রূপ আমার পরমারাধ্য যোগিশ্রেষ্ঠ স্বামীর নিকট হইতে ধর্ম্ম-তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া সুখী হইব।

ধর্ম্মবিদ্ রাজা শর্য্যাতি প্রিয়তমা সুকন্যার মুখে এতাদৃশ ধর্ম্মসংযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বল্কল ও মৃগচর্ম্ম পরিধানার্থে দান করিলেন। সুকন্যা তখন রত্নখচিত বসনভূষণ পরিত্যাগ করিয়া বল্কল পরিধানপূর্ব্বক মুনিপত্নী-বেশ ধারণ করিলেন। অনবদ্যাঙ্গী কন্যার তপস্বীবেশ দর্শন করিয়াই রাজা শর্য্যাতি বিবর্ণবদন ও হতজ্ঞান হইয়া ভূতলে বসিয়া পড়িলেন। রাজপত্নীগণও তদ্দর্শনে শোকার্ত্তহৃদয়ে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সুকন্যার মাতা সহসা কম্পান্বিত-কলেবরা ও হতজ্ঞানা হইয়া বাতাভিহত কদলীর ন্যায় ভূতলশায়িনী হইলেন। সেবাশুশ্রূষা দ্বারা রাজমহিষী সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলে সুকন্যা তাঁহাদিগকে নানাপ্রকারে প্রবোধ দান করিলেন। সুকন্যার ধর্ম্ম-সঙ্গত বাক্যে সকলেই আশ্বাসিত হইলে বহুক্ষণের পর রাজা ও রাজমহিষীগণ তনয়াকে সম্ভাষণপূর্ব্বক শোকাকুলহৃদয়ে বাষ্পাকুললোচনে মন্ত্রিগণসহ নিজ নগরাভিমুখে গমন করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

পতিসেবা।

মহারাজ শর্য্যাতি যানবাহন ও মন্ত্রিগণসঙ্গে নিজ রাজধানীতে উপনীত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয় এক্ষণে ব্যাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গায়মান সমুদ্রবৎ আন্দোলিত। তাঁহার মনে আর শান্তি নাই, মুখে আর হাস্য নাই, চক্ষুতে আর সে পূর্ব্বেকার ন্যায় জ্যোতিঃ নাই, মুখমণ্ডল সর্ব্বদাই অন্ধকারাবৃত। রাজা পরন্তপের দাম্ভিকতাপূর্ণ অভিসম্পাতবাণী যতই তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইতে লাগিল, ততই দারুণক্লেশে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। মহা-মায়ার অনুগ্রহে আর তাঁহার বিশ্বাস রহিল না। বিনয়াবনতা ধর্ম্মানুরক্তা দর্শন-লোভনীয়া কন্যা যখন অন্ধ কদাকার তপস্যানিরত ব্রাহ্মণহস্তে পতিতা হইল তখন আর তাঁহার দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা রহিল না। মহারাজ যখন কন্যার অনুরোধে চ্যবন-সকাশে গমন করিয়াছিলেন, তখন স্বপ্নযোগে বালিকা যে জটাধারী পুরুষের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন, এবং সেই জটাধারী পুরুষ তাঁহাকে পরমহিতকর যে যে উপদেশ দান করিয়াছিলেন, তাহার বিন্দুবিসর্গও সুকন্যা পিতৃসকাশে প্রকাশ করেন নাই। সুতরাং বৃদ্ধ বরে কন্যা সম্প্রদান করিয়া তাঁহার যে এতাদৃশ মানসিক উদ্বেগ হইবে তাহার আর বিচিত্রতা কি? বিবাহাদি কার্য্য সম্পন্ন হইলে তাহার আর প্রতিকারের উপায়ান্তর থাকে না। দারুণ মানসিক উদ্বেগে প্রপীড়িত হইলে লোকে তাহা অপরের নিকট জানাইয়া কথঞ্চিৎ শান্তি প্রাপ্ত হয়। মহারাজের এ মানসিক উদ্বেগ কাহাকেও জানাইবার কথা নহে। নৃপবর পরন্তপের অভিসম্পাৎবাণী এখনও পারিষদবর্গের হৃদয়ে জাগরুক রহিয়াছে, বিশেষতঃ তাঁহারই কন্যা স্বেচ্ছায় বৃদ্ধ বরে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি পিতার মন এতাদৃশ গর্হিত কর্ম্ম করিয়া আর প্রবোধ মানিতেছে না। রাজকার্য্য মন্ত্রিগণের হস্তে ন্যস্ত করিয়া তিনি কিছুদিন অন্তঃপুরেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

কালের কি অপার মহিমা! কালে সমস্তই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অদ্য যিনি উপযুক্তপুত্রবিয়োগ জনিত দুঃখে ভূমিতে বিচেষ্টমান ও ধূলিধূসরিত অঙ্গে হাহাকার করিতেছেন, কাল তিনি সমস্ত বিস্মৃত হইয়া আবার প্রফুল্ল চিত্তে বিচরণ করেন। যে মানসিক উদ্বেগ অদ্য অসহনীয় হইয়া উঠিল কল্য না হয় পরশ্ব তাহার প্রকোপ প্রশমিত হইল। রাজা শর্য্যাতিরও হৃদয়বেগ কালে প্রশমিত হইল। তিনি পুনরায় রাজকার্য্যাদি পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন।

এদিকে চ্যবন-পত্নী সুকন্যা তপস্বিনীবেশে বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতীর ন্যায় শোভমানা হইয়া পতীর চরণকমলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। গুণবতী বালিকা জানিতেন যে, পতিসেবাই স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্ম্ম। এজন্য তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে বৃদ্ধ পতির শুশ্রূষায় মনোনিবেশ করিলেন। বৃদ্ধ সমাহিত তপোধন তাঁহারই দোষে অন্ধ হইয়াছেন, একারণ তিনি এক্ষণে সেই অন্ধের যষ্টিস্বরূপ হইলেন। তিনি স্বয়ং প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক স্বামীকে শয্যা হইতে উত্থাপিত করিতেন এবং তাঁহাকে শৌচস্থানে লইয়া গিয়া হস্ত পদাদি প্রক্ষালনার্থ জল রাখিয়া স্বয়ং অনতিদূরে তাঁহার প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মানা থাকিতেন। অনন্তর পতির শৌচক্রিয়া সমাধা হইয়াছে জানিয়া তিনি হস্তধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে আশ্রমে আনয়ন করিতেন ও মৃত্তিকা ও জলদ্বারা তাঁহার হস্তপদাদি উত্তমরূপে প্রক্ষালন করিয়া দিতেন। তৎপরে নৃপনন্দিনী দন্তধাবন কাষ্ঠ ও জলপূর্ণ পাত্র দিয়া তাঁহার মুখাদি প্রক্ষালন কার্য্যে সাহায্য করিতেন। তাহার পর পবিত্র উষ্ণজল আনয়ন পূর্ব্বক প্রণয়পূর্ণমানসে তাঁহাকে সমন্ত্রক স্নান-কার্য্য সম্পাদনে অনুরোধ করিতেন, স্নানান্তে তাঁহাকে মৃগচর্ম্ম পরিধান ও পবিত্র কুশাসনে উপবেশন করাইয়া তিনি কুশ ও কমণ্ডলু আনয়ন-পূর্ব্বক পতিকে কহিতেন, "মুনিবর! এক্ষণে নিত্যকর্ম্ম সমাধা করুন।" নিত্যকর্ম্ম সম্পাদিত হইলে পরম যত্নে আহৃত সুমিষ্ট ফলমূল ও সুসংস্কৃত নীবারান্ন আনিয়া মুনিবরকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইতেন। পতিকে ভোজনে পরিতৃপ্ত দেখিয়া সাদরে তাঁহার মুখপ্রক্ষালন পূর্ব্বক মুখশুদ্ধিকর গুবাক তাম্বুল প্রদান করিতেন ও সুকোমল আসনে উপবেশন করাইয়া পতির অনুমত্যানুসারে স্বয়ং স্নানাদি করিতেন। নিজের ভোজন অবসানে পুনরায় পতির নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার পদসেবায় নিযুক্ত হইতেন। সন্ধ্যা সমাগত হইলে পতির হোমসজ্জা করিয়া দিতেন এবং হোমাবসানে পুনরায় সুস্বাদু ফল-মূল তাঁহাকে ভক্ষণার্থ প্রদান করিতেন। তাঁহার আহারান্তে তদীয় ভুক্তা-বশিষ্ট ফল সকল স্বয়ং ভোজন করিয়া সুখস্পর্শ শয্যা রচনা পূর্ব্বক তাঁহাকে শয়ন করাইতেন। এইরূপে প্রিয়তম পতি সুখে শয়ন করিলে কৃশোদরা নৃপনন্দিনী পতিপদসেবা করিতে করিতে কুল-কামিনীগণের কর্ত্তব্য ধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেন। পতি নিদ্রিত হইয়াছেন জানিতে পারিলে তিনিও তাঁহার চরণপ্রান্তে শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইতেন। গ্রীষ্মকালে বৃদ্ধ তপোধনকে ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর দেখিলেই সুকন্যা সর্ব্বকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক তালবৃন্তব্যজনদ্বারা

তাঁহার ক্লেশাপনোদন করিতেন ও শীতকালে কাষ্ঠনিচয় সংগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার সমীপে প্রজ্জলিত অগ্নি সংস্থাপন করিয়া তাঁহার শীতক্লেশ দূরীভূত করিয়া দিতেন।

সর্ব্বজনপ্রশংসনীয়া সুকন্যা তপস্বী পতিলাভে এতাদৃশ নিয়ম ও তপোনুষ্ঠান সহকারে প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে প্রত্যহ স্বামিসেবারত হইলেন। সেই শুভাননা রাজতনয়া যেরূপভাবে আরাধনা করিতেন, সেইরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধা-সহকারে অগ্নিদেব ও অতিথিদিগেরও শুশ্রূষা করিতে ক্রটী করিতেন না। তাহার যত্ন ও আতিথেয়তা গুণে বন্য পশু পক্ষী প্রভৃতি প্রাণিগণ তাঁহার সহচর ও সহচরী হইয়া উঠিল, এমন কি মৃগগণ রাত্রিকালেও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিত না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

শিষ্য-গ্রহণ।

সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়। ভগবান মরীচিমালী সমস্ত দিবস স্বীয় কিরণজালে জগৎ উদ্ভাসিত করিয়া বিশ্রামার্থ পশ্চিমাচলে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন। বিহঙ্গকুল সুললিতকণ্ঠে দিগন্ত মাতাইয়া নিজ নিজ নীড়ে প্রত্যাগমন করিতেছে। উপবনশোভী সন্ধ্যাহিল্লোলপ্রস্ফুটিত কুসুমসমূহ সমন্তাৎ সুগন্ধ বিস্তার করিতেছে। হিমশীকরসিক্ত স্নিগ্ধ সমীরণ সেই সকল কুসুমসৌরভ বহন করিয়া বৃক্ষপত্র ও পল্লবরাজি দোলাইয়া মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইতেছে। গৃহপালিত গাভী ও অন্যান্য জন্তুসকল শ্যামল শষ্যক্ষেত্রে বিচরণ ও নবতৃণ-ভক্ষণে উদরপূর্ণ করিয়া হেলিয়া দুলিয়া আশ্রমের দিকে ধীরে ধীরে গমন করিতেছে। বালকেরা দিনান্তে ক্রীড়াবসানে সঘন করতালি দিয়া গান করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহাভিমুখে গমন করিতেছে। পতিপদসেবানিরতা সুকন্যা সন্ধ্যাসমাগত দেখিয়া পতির সায়ংসন্ধ্যার উপযোগী আয়োজন সম্পাদিত করিয়া কুটীর দ্বারে দণ্ডায়মানা হইলেন। দেব দিনমনি গগনমণ্ডল পরিত্যাগপূর্ব্বক সাগরগর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করিলে তাঁহার স্নেহপালিত মাতৃহীন হরিণ-শিশুও কুটীরে তাঁহার নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইত। অদ্য সেই হরিণ-শিশুর প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব দেখিয়া মাতাস্বরূপা সুকন্যা আর স্থির হইতে পারিতেছেন না। উদ্বিগ্ন-চিত্তে একবার পতির নিকট ও আরবার কুটীরদ্বারে গমনাগমন করিতেছেন। এই মৃগশিশুর মাতা ইহাকে প্রসব করিয়া তিন দিবস পরে পরলোক গমন করিয়াছিল। তদবধি সুকন্যা ইহাকে স্বপত্যনির্ব্বিশেষে লালনপালন

করিয়া আসিতেছেন। স্নেহ পাপশঙ্কী। এজন্য মৃগশিশুসম্বন্ধে বহু দুশ্চিন্তা সুকন্যার হৃদয়াকাশ সমাচ্ছন্ন করিল। হয় ত কোন হিংস্র পশু তাহার প্রাণবধ করিয়াছে; কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল এই দ্বেষহিংসাবর্জ্জিত মুনিপ্রবর চ্যবনোপসেবিত উপবনে হিংস্রজন্তুর আবির্ভাব সম্ভবপর নহে। তবে কি কোন নির্দ্দয় ব্যাধ তাহাকে শরজালে বিদ্ধ করিয়াছে? অথবা আশ্রমপথ-ভ্রষ্ট হইয়া সে দুস্তর কান্তারে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে? এই প্রকার দুশ্চিন্তা-মালা সুকন্যার কোমল অন্তঃকরণ উদ্বেজিত করিতে লাগিল। তাঁহার চক্ষু দিয়া অবিরল ধারা পতিত হইতে লাগিল। হায়! যে রাজকন্যা স্বেচ্ছায় পিতা মাতা বন্ধু পরিজন ও রাজ্যসুখ জলাঞ্জলি দিয়া বৃদ্ধ পতিকে বরণপূর্ব্বক তাহার সেবা-নিরতা হইয়াছেন, তিনি এক হরিণশাবকের জন্য কাঁদিয়া আকুল হইলেন। স্নেহের কি অপূর্ব্ব মহিমা! স্নেহের এই অপূর্ব্বশক্তিবলে মহারাজ পুণ্যাত্মা ভরত রাজ্য-পরিত্যাগপূর্ব্বক বনবাসী ও তপস্বী হইয়াও একটী পালিত হরিণশিশুর প্রতি মমতাকৃষ্ট হইয়া পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

চ্যবনপত্নী সুকন্যা হরিণশিশুর আগমনে বিলম্ব দেখিয়া এইরূপ চিন্তাগ্রস্ত হইয়া বারংবার কুটীরাভ্যন্তর হইতে বহির্ভাগে আগমন করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন জনৈক ঋষিকুমার তাঁহারই হরিণশাবকটী ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক ভগবান চ্যবনের আশ্রমাভিমুখে আসিতেছেন। ঋষিকুমারের রূপপ্রভায় বন আলোকিত হইয়াছে। তাঁহার বলিষ্ঠ সুগঠিত আজানুলম্বিত ভুজ,উন্নত তিলফুলবিনিন্দিত নাসিকা, আকর্ণবিশ্রান্ত কৃষ্ণতার নয়নযুগল অতীব মনোহর। তাঁহার সুকোমল, হর্ষোৎফুল্ল বিকশিত শতদলনিভ আনন ঈষৎ শুক্ল রেখা দ্বারা চিহ্নিত হওয়ায় ভ্রমররাজিত শ্যামলশোভা ধারণ করিয়াছে। সন্ধ্যাকালে সহসা মৃগক্রোড়ে জলন্তপাবকসদৃশ ঋষিকুমারের আবির্ভাব সুকন্যার নিকট সাক্ষাৎ মৃগাঙ্ক পূর্ণচন্দ্রের উদয় বলিয়া প্রতীয়মান হইল। ব্রাহ্মণকুমার নৃপনন্দিনীর সমীপবর্ত্তী হইয়া ক্রোড়স্থিত মৃগশিশুকে অবতারণপূর্ব্বক জিজ্ঞা-সিলেন ভগবতি! এই মহর্ষি চ্যবনের আশ্রম? সুকন্যা প্রত্যুত্তরে ইহাই চ্যবনের আশ্রম জ্ঞাপন করিয়া ব্যগ্রভাবে হরিণশাবকটীকে ক্রোড়ে ধারণ ও বারংবার তাহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। প্রথম আনন্দবেগ প্রশমিত হইলে পর তিনি ঋষিকুমারের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "এই হরিণশাবকটী আমারই পালিত এবং ইহার আগমনে বিলম্ব দেখিয়া বড়ই উৎকন্ঠিতা হইয়াছিলাম। সুতরাং অতিথিসৎকার আশ্রমধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া ইহারই প্রতি

অত্যাশঙ্কা হইয়াছি। মহাশয় আপনি কোন মুনিবংশ সমুজ্জ্বল করিয়াছেন, কোথা হইতে সহসা এই উপবনে আগমন করিলেন এবং আমার স্নেহনীড়ে পালিত এই হরিণশাবকটীকেই বা কোথায় পাইলেন ?" উত্তরে ঋষিকুমার কহিলেন, "আমি এই হরিণশিশুটীকে ত্রস্তভাবে ইতস্ততঃ ধাবমান দেখিয়া আশ্রমপালিত ও পথভ্রষ্ট বিবেচনায় উহাকে ক্রোড়ে করিয়া লইয়া আসিয়াছি। আর আমার পরিচয় ভগবান চ্যবনের চরণতলে নিবেদন করিলে জানিতে পারিবেন।" সুকন্যা কহিলেন, "অদ্য আপনি আমাদের অতিথি, আশ্রমে প্রবেশ করুন।" এই বলিয়া সুকন্যা ঋষিকুমারের সহিত কুটীরে প্রবেশ করিলেন।

ঋষিশ্রেষ্ঠ চ্যবন তখনও ধ্যাননিরত দেখিয়া অজিনাসন বিস্তারপূর্ব্বক সুকন্যা ঋষিকুমারকে বসিতে দিলেন এবং স্বয়ং অতিথি-সৎকারের আয়োজনে ব্যাপৃতা হইলেন।

অতঃপর চ্যবনের ধ্যানভঙ্গ হইলে ঋষিকুমার ভূমিতলে নিপতিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে তাঁহার পদবন্দনা করিলেন। আশীর্ব্বাদ ও স্বস্তি-বচনান্তে চ্যবন ঋষিকুমারের নাম ও আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিলে মুনিকুমার কহিলেন, "ভগবন্! এ সেবকের নাম দেবদত্ত, বহুদূর হইতে আপনার তপঃপ্রভাব শ্রবণান্তর, আপনকার শিষ্য হইয়া ও পদসেবা নিরত থাকিয়া জন্ম সফল করিব এই মানসে সিন্ধুদেশ হইতে আপনকার চরণসকাশে উপনীত হইয়াছি। অতএব আমাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করুন।"

মুনিকুমারের বাক্য শ্রবণানন্তর চ্যবন ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "বৎস! তোমার সঙ্কল্প অতি মহৎ ও উদার, কিন্তু সম্প্রতি আমি তোমার বাসনাপূর্ণ করিতে সমর্থ নহি। তুমি বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে যে, আমি বৃদ্ধ ও অন্ধ হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছি, সুতরাং শিক্ষকতা কার্য্য এক্ষণে আমাদ্বারা সম্পাদিত হওয়া অসম্ভব, তদুপরি সম্প্রতি আমি এক অলোকসামান্যা যুবতী রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়া পুনরায় আশ্রমধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। তুমি দেখিতেছি অজ্ঞাতকুলশীল এবং অনুমানে বোধ হইতেছে তুমি মধুরাকৃতি যুবা পুরুষ, আমি নিজে অন্ধ অতএব তোমাদিগের একত্রবাস কখনই যুক্তিযুক্ত নহে। আমাপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ অনেক তপস্বী আছেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে তোমাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিতে পারেন, সুতরাং আমার পরামর্শ, তুমি তাঁহাদের কাহারও নিকট গমন কর।"

ঋষিতনয় কোন মতেই অন্যত্র গমনে সম্মত হইলেন না। তিনি বারংবার শিষ্যরূপে গৃহীত হইবার জন্য মহাত্মা চ্যবনকে অনুনয় করিতেছেন। অদূরে নৃপনন্দিনী সুকন্যা অজিনাসনে উপবিষ্টা হইয়া উভয়ের কথোপকথন শ্রবণ করিতেছেন। যখন দেখিলেন মহর্ষি চ্যবন যুবকের চরিত্র বিষয়ে সন্দিহান হইয়া তাহাকে আশ্রমে স্থান দান করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন, তখন সুকন্যা পথভ্রষ্ট হরিণশিশুর প্রত্যর্পণ জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এই সুযোগ ও ঋষিকুমার আশ্রমে থাকিলে স্বামিসেবা উত্তমরূপ হইতে পারে ভাবিয়া তাঁহাকে রাখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। ঋষিকুমারকে প্রত্যাখ্যান করিলে পাছে সুকন্যা মনে ব্যথা পান এই ভাবিয়া চ্যবন তাঁহার আশ্রমাবস্থানের অনুমতি দান করিলেন।

মধুর হরিনাম,—কঠোর কেন ?

হরিনাম কি মধুর নাম ! এ নাম যেমন মধুর, যেমন সর্ব্বসন্তাপহারী শান্তি-প্রদ, তেমনই প্রাণোন্মাদী আনন্দদায়ক। মৃদঙ্গ-করতালের তালেতালে, নাম-সঙ্কীর্ত্তনের আনন্দরঙ্গ, যখন লহরে লহরে উচ্ছ্বলিত হইতে থাকে ; তখন সে আনন্দতরঙ্গে, কাহার হৃদয় না আনন্দে নাচিয়া উঠে ? সেই অপার আনন্দোচ্ছ্বাসে, পাপতাপ যেন কোথায় উড়িয়া যায়, মুহূর্ত্তের জন্য মায়া-মোহের কঠিন বন্ধন শিথিল হয় এবং ধনজনাদি সংসারসুখ ভুলিয়া, দেহেন্দ্রিয় মনঃপ্রাণ, এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় অপার্থিব আনন্দ-উন্মাদনায় বিভোর হইয়া উঠে। জগতে এমন মধুময় আর কিছুই নাই। এনাম যে লইতে শিখিয়াছে, যে এই হরিনামের মধুরতার আস্বাদ বুঝিয়াছে, সে এনাম ত্যাগ করিতে চাহে না বা পারে না। পুরাণাদিতে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। দৈত্যরাজ হরিদ্বেষী হিরণ্যকশিপু, পর্ব্বত হইতে প্রক্ষেপ, প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড, হস্তিপদতলাদিতে নিঃক্ষেপ প্রভৃতি প্রাণান্তকর যাতনা দিয়াও স্বীয় পুত্র প্রহ্লাদকে হরিনাম ত্যাগ করাইতে পারেন নাই। ইহা সত্বময় সত্যযুগের কথা, আর এই ঘোর পাপাচ্ছন্ন কলিকালে, সাড়েচারি শত বৎসর পূর্ব্বে, যবন-রাজত্বকালে, হিন্দুদ্বেষী ম্লেচ্ছশাসনকর্ত্তা কাজী, মর্ম্মন্তুদ যাতনা দিয়াও, হরিভক্ত হরিদাসকে, হরিনাম ত্যাগ করাইতে পারে নাই। কাজীর

তাড়নভৎর্সনায়, হরিদাস, কাফের হিন্দুদেবতার নাম ত্যাগ করিল না দেখিয়া কাজী ক্রোধান্ধ হইয়া আদেশ দিয়াছিল ;

"হাতে গলে বেড়ি দিয়া বাঁধি দুরাচারে।
কোরা প্রহার কর বাইশ বাজারে ॥"

আজ্ঞামাত্র, কাজীর আদেশ প্রতিপালিত হইল। অজস্র বেত্রাঘাতে, হরিদাসের সর্ব্বশরীর, ক্ষত বিক্ষত হইয়া আপাদমস্তক, রক্তরঞ্জিত হইয়া গেল। কিন্তু, হরিভক্ত হরিদাসের, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। রক্তাক্ত-কলেবর হরিদাস, অম্লানবদনে, উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলেন,—

"খণ্ড খণ্ড কর দেহ যায় যদি প্রাণ।
তথাপি না ছাড়িব কভু হরিনাম ॥"

ভক্তশ্রেষ্ঠ দেবর্ষি নারদ, হরিনামের মধুরাস্বাদ বুঝিয়া, সংসারবিরাগী হইয়া অহর্নিশি বীণাযন্ত্রে এই নাম গান করিয়া থাকেন। হরিনাম সুধাপানে উন্মত্ত হইয়া, দেবাদিদেব মহাদেব, সর্ব্বত্যাগী শ্মশান-বাসী হইয়াছেন। এনামের গুণ অসীম। যখন ত্রিতাপ জ্বালায়, দেহ জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক হইতে থাকে, যখন উৎকট দুঃখ-যন্ত্রণায় মনঃপ্রাণ ছটফট করে, বিষম বিপদ বিড়ম্বনায়, ব্যাকুলান্তঃকরণে, যখন হাহাকার করিতে হয় ; যে জ্বালা, যে দুঃখ, যে বিপদ নিবারণ করিতে স্বীয় বলবীর্য্য বিত্তবিভব, স্ত্রীপুত্রাদি আত্মীয়স্বজন, অসমর্থ হওয়ায়, ভয়ে ক্ষোভে ও নিরাশায়, যখন অবসন্ন হইতে হয় ; তখন যদি একবার প্রাণ ভরিয়া উচ্চৈঃস্বরে "হরিবোল" বলিতে পারা যায়, তবে তৎক্ষণাৎ, সকল জ্বালা, তাবৎ দুঃখ নিখিলবিপদ, দূর হইয়া যেন পরম শান্তি লাভ হইয়া থাকে।

কিন্তু এমন সর্ব্বসন্তাপহারী, শান্তিপ্রদ, মধুর হরিনাম, আবার কঠোর হয় কেন ? শববাহকদিগের উচ্চারিত "হরিবোল" ধ্বনি শুনিয়া, প্রাণ কেন চমকিয়া উঠে ? নাম-সঙ্কীর্ত্তনের হরিবোল ধ্বনিতে, মনঃপ্রাণ, আনন্দে নাচিয়া উঠে, আর শববাহকের উচ্চারিত, হরিবোল শব্দে, প্রাণ শিহরিয়া উঠে কেন ? স্ত্রীপুত্রাদি স্বজনপরিবৃত হইয়া গৃহমধ্যে থাকিলেও, পথি-মধ্যে ঐ হরিবোলধ্বনি উচ্চারিত হইতে শুনিয়া, আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতে হয়। একজন, একদা ঐ হরিবোল শব্দ শুনিয়া, যথার্থ ই বলিয়াছিল,— "বেটারা মধুর হরিনামকে, কি কঠোরই করেছে।" শববহনে উচ্চারিত হরিবোলধ্বনি, কঠোর ও ভীতিপ্রদ বোধ হয় কেন ? মানবের মৃত্যুভয়ই

ইহার কারণ বলিয়া মনে হয়। একজন মরিয়াছে, তাহাতে দাহ করিতে লইয়া যাইতেছে, ঐ হরিবোলধ্বনিতে ইহা জানিয়া মানব, নিজের আশু মৃত্যু চিন্তা করিয়া ভীত হয়। তখন সে মনে করে "যেন, এখনই আমার মৃত্যু হইবে, এখনই আমাকে ঐ রূপ করিয়া লইয়া যাইবে" এইপ্রকার বৃথা মরণাশঙ্কায়, সাধারণতঃ মানব, ঐ হরিবোলশব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠে। কিন্তু সকলেই যে ঐ রূপ মরণাশঙ্কী হয়, সকলেই যে, ঐ হরিবোল শব্দ কঠোর বোধ করে এমত নহে। ভগবদ্ভক্ত সাধুগণ, মৃত্যুভয়ে ভীত নহেন। সাধুগণ, বরং বলিয়া থাকেন ;—

"ওহে মৃত্যু তুমি মোরে কি দেখাও ভয়।
সে ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়॥"

ভগবদ্বিমুখ আত্মহাগণ নামে বিশ্বাসহীন বলিয়া ঐ হরিবোলধ্বনিতে ভীত হওয়ায় উহা কঠোর মনে করে।

মুক্ত, মুমুক্ষু, বিষয়ী ও আত্মহা, সংসারে এই চারি প্রকারের লোক দেখিতে পাই। যাঁহারা, মায়া মোহের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া, সকল বাসনা শূন্য হইয়া, ভগবদেকশরণ হইয়াছেন, তাঁহারা মুক্ত ; যাঁহারা মুক্তির আশায়, ভগবদুপাসনা-পরায়ণ, তাঁহারা মুমুক্ষু ; যাঁহাদের ভগবানের নাম, শ্রবণ কীর্ত্তনে আনন্দ হয়, তাঁহারা বিষয়ী ; আর যাহারা শাস্ত্রবিশ্বাস-হীন, ভগবদ্বিমুখ, তাঁহারা আত্মহা। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন ;—

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং, প্লবং সুকল্পং গুরু কর্ণধারং।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং, পুমান্ ভবাব্ধিং নতরেৎ সআত্মহা॥"

আত্মহাগণ, মায়া মোহবশে সর্ব্বদা বিষয়ভোগে বিভোর থাকে, ক্ষণকালের জন্যও তাহাদের পরকালের কথা মনে হয় না। তাহারা ধনজনাদি অনিত্য ঐহিক সুখসম্পদে সম্যক্ প্রকারে আবিষ্ট থাকে ; ভ্রমেও ভগবন্নাম শ্রবণ কীর্ত্তন করিতে চাহে না। এজন্য ঐ সকল শাস্ত্রবিশ্বাসহীন বিষয়বিমূঢ় জনগণ, ভগবন্নামের গুণ, মাহাত্ম্য এবং মধুরতা বুঝিতে বা জানিতে না পারায়, ভয়-নিবারণ হরিনাম শ্রবণ করিয়াও, মৃত্যুভয়ে কাঁপিয়া উঠে।

যে নামাভাসে, মহাপাপী অজামিল, অনায়াসে নিত্যধামে গমন করিয়াছিল, সেই সর্ব্বভয়াস্তক হরিনামই, অন্তকভয়ের কারণ হয়, ইহা অপেক্ষা বিড়ম্বনার বিষয় আর কি আছে! কথাপ্রসঙ্গে একটী গল্প মনে হইতেছে ;—

কোন ধনবান ব্যক্তি, বাটীর রক্ষণাবেক্ষণ জন্য একজন দ্বারবান নিযুক্ত করিয়াছিলেন। দ্বারবান, উপযুক্তবেশে সজ্জিত হইয়া ঢালতরবারি হস্তে, রাত্রিকালে, পাহারা দিতেছে, এমন সময় একদা, একজন চোর, সেই ধনবানের বাটীতে প্রবেশ করিয়া, দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়া লইয়া গেল। বাটীতে চুরি হওয়ায়, গৃহস্বামী, দ্বারবানকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ;

গৃহস্বামী। কেঁউসিংজী, রাতমে তোষাখানামে, চোরি হোগিয়া, তোমরা মালুম নেহি হ্যায় ?

দ্বারবান বলিল, হুজুর, হাম সব কুছ ওয়াকিব হ্যায়। হামারা সাম্‌নে দেকর চোট্টা, চিজ্ বছ্‌লেকে ভাগ্‌গিয়া।

গৃহস্বামী, তোম্ চোরকো পাকৃড়ো নাই কাহে ?

দ্বারবান, হুজুর, হামারা বাঁউ হাতমে ঢাল, ডাহিনেমে তলোয়ার, দোনো হাত বন্ধ রহা ; চোরকো পাকৃড়ায়েঙ্গে ক্যায় সে !

দস্যুভয় নিবারণ করিবার জন্য ঢালতলোয়ার পাইয়াও, দুই হাত বন্ধ থাকায়, দ্বারবান যেমন চোর ধরিতে পারে নাই ; ঢালতলোয়ারই তাহার প্রতিবন্ধক হইয়াছিল ; সেইরূপ যে নামের ধ্বনিতে, মৃত্যুপতি শমন, দূরে পলায়ন করে, সেই শমনদমন নাম-শ্রবণে, নামে বিশ্বাসহীন, মোহমুগ্ধ মানবগণ, মৃত্যুভয়ে শিহরিয়া উঠে। মায়া মোহের বন্ধনই মৃত্যুভয়ের প্রধান কারণ। এই সুখের সংসার, প্রাণাধিক পুত্র কন্যা, প্রিয়তমা পত্নী, স্নেহময় পিতামাতা প্রভৃতি সকলকে, জন্মের মত ছাড়িয়া যাইতে হইবে ; আর তাহাদিগকে দেখিতে পাইব না, আমার অভাবে, কে তাহাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করে, তাহাদের দশা কি হইবে, ইত্যাদি ভাবিয়া, লোকে মৃত্যুভয়ে ভীত হয়। কিন্তু মৃত্যু হইলে, তাহার নিজের কি দশা হইবে, ইহা একবারও চিন্তা করে না, কেন না, ধনজন স্ত্রীপুত্রাদির বিচ্ছেদ আশঙ্কায়, মৃত্যুকে স্মরণ করিতেও ভীত হয়। কিন্তু চিরদিন কেহই বাঁচিবে না। আজ হউক, কাল হউক, শতবৎসর পরে হউক, মৃত্যু হইবেই হইবে। মৃত্যুর হাত হইতে নিস্কৃতি পাওয়ার উপায় নাই। সকলকেই একদিন মরিতে হইবে। শাস্ত্র বলেন—

"অদ্যবাব্দ শতান্তে বা মৃত্যুর্ভবতি নান্যথা।

সুতরাং অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুকে ভয় না করিয়া, তজ্জন্য প্রস্তুত থাকাই কর্ত্তব্য। যাহাতে, মৃত্যুকে সর্ব্বদা মনে রাখিয়া, তজ্জন্য প্রস্তুত হইবার সুবিধা হয়, সেই জন্য, সর্ব্বনিয়ন্তা করুণাময় বিধাতা, কৃত্রিমমৃত্যু, নিদ্রাদেবীকে, আমাদের জীবনের

চিরসঙ্গিনী করিয়া দিয়াছেন। প্রত্যহই, আমাদের নিদ্রারূপ মৃত্যু ঘটিতেছে; কিন্তু তথাপি আমরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া দূরে থাক, তাহার স্মরণ করিতেও চাহি না, এবং কেহ দয়া করিয়া, মৃত্যুর কথা স্মরণ করাইয়া দিলে, বরং ক্রোধের উদ্রেক হইয়া থাকে।

মানব, যাহাদিগকে আপনার ভাবিয়া, তুমি, প্রকৃত আপনার ভাবনা ভাবিলে না, সেই ধনজনাদির কিছুই তোমার আপনার নহে। অধিক কি, যে দেহকে আপনার ভাবিয়া, তাহার বলবীর্য্য ও সৌন্দর্য্যে গর্ব্বে ধরাকে সরাজ্ঞান করিয়া থাক, যে দেহের তুষ্টিপুষ্টির জন্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম খাদ্যাখাদ্য বিচার কর না, সে দেহও তোমার নহে। দেহ হইতে প্রাণ চলিয়া গেলে, এই দেহ ও ধনজন স্ত্রীপুত্রাদি সকলের সম্বন্ধ ঘুচিয়া যাইবে। তোমার যাবার দিন, কেহই তোমার সঙ্গে যাইবে না ধনজনাদি সকল ছাড়িয়া, তোমাকে একাকী যাইতে হইবে। তাই মানব, তোমার সেই যাবার দিনের কথা, একবার ভাবিয়া দেখ। শাস্ত্র বলেন ;—

"নীত্বা বহির্ভবনতোহথবপুংসিহত্বা,
দত্ত্বাঞ্জলিং সপদি বন্ধুজনো নিবৃত্তঃ।
একাকিনস্তপনন্দন মন্দিরেষু,
গোবিন্দো বন্ধুরখিলেষু বিনিশ্চিতং মে॥"

দেহ হইতে প্রাণ চলিয়া যাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই, তোমাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিবে। চিরসুখে বাস করিব বলিয়া, কত যত্নে, কত কষ্টার্জ্জিত অর্থব্যয়ে, মনোমত করিয়া যে ঘর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলে, সেই ঘরে, তখন তোমার থাকিবার অধিকার নাই। ঝড়বৃষ্টি আদি মহা দুর্যোগ উপস্থিত হইলেও, তখন তোমাকে ঘরের বাহির করিয়া, আঙ্গিনায় রাখিয়া দিবে। তোমার ঘরে তোমাকে সুখে মরিতে দিবে না। আর দেহ হইতে প্রাণ চলিয়া গেলে, তোমার দেহ, শ্মশানে লইয়া গিয়া আগুণে পোড়াইয়া ছাই করিবে, তোমার দেহের চিহ্নমাত্র রাখিবে না। অহো কি আশ্চর্য্য! তোমার দেহ দাহব্যাপারে, তোমার প্রিয় পুত্রই আবার অগ্রণী। যাহাকে তুমি, জীবন-সর্ব্বস্ব বলিয়া জানিতে, বহু যত্নে বহু কষ্টে, যাহাকে লালনপালন ভরণপোষণ করিয়াছিলে, নিজে না খাইয়া, যাহাকে আহার করাইয়াছিলে, তোমার সেই প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র, তোমার প্রতি বিমুখ হইয়া বামহস্ত দ্বারা তোমার বিবর্ণ ও বিশীর্ণমুখে, জ্বলন্ত পলিতা প্রদান পূর্ব্বক, পুত্রেরা

অবশ্যকর্ত্তব্য পালন করিয়া, কৃতজ্ঞতা ও পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিবে। আর দাহক বাহকগণ, স্নানান্তে তোমার উদ্দেশে, এক এক অঞ্জলি জল প্রদান করিয়া, তোমার সম্বন্ধে কর্ত্তব্য শেষ করিয়া গৃহে আসিবে। মানব, তখন তেমার দশা কি হইবে, একবার ভাবিয়াছ কি ? জীবিতাবস্থায়, আত্মীয়স্বজন পরিবৃত থাকিয়াও, যে মৃত্যুকে স্মরণ করিতে ভয় পাইতে, তখন সেই মৃত্যুপতি শমনের দ্বারে তুমি একাকী দণ্ডায়মান! ভাবিয়া দেখ, তোমার কি বিষম সঙ্কট তখন উপস্থিত! যাহাদিগকে, অপনার ভাবিয়া আজীবন, যাহাদের দুঃখদূর ও সুখ সম্পাদনের জন্য প্রাণপণে যত্ন করিয়াছ ; তখন, তাহারা তোমার কোনই উপকার করিবে না। তখন দেখিবে, তখন বিশেষরূপে বুঝিতে পারিবে, তাহারা তোমার কেহই নহে। অন্তিমের সে বিপদ হইতে, তাহারা কেহই তোমাকে উদ্ধার করিতে পারিবে না। জীবিতাবস্থায়, অনিত্য সংসারমোহে, যে নাম গ্রহণ কর নাই, যে নামগ্রহণ করিবার অবকাশ পাওনাই, সেই জগন্মঙ্গল হরিনাম ভিন্ন সে বিপদ হইতে, উদ্ধার পাইবার আর উপায় নাই।

অখিলের বন্ধু শ্রীহরিভিন্ন, সে সঙ্কটে পরিত্রাণকর্ত্তা আর কেহ নাই। হরিনামই, সে তরীহীনা ভবনদীপারের তরণী। হরিনামাশ্রয়ে, সেই বিভী-ষীকাময়ী বৈতরণী ভবনদী, অনায়াসে পার হওয়া যায়, হরিনামোচ্চারণে শমনভয় নিবারিত হয়,—ইহা জানাইয়া, হরিনাম আশ্রয় করিবার জন্য, মানবকে আসন্ন মৃত্যু সময়ে, তারকব্রহ্ম হরিনাম, শ্রবণ করান হয় এবং মানবের মৃত্যু হইলে, সেই ধনজনসহায়সম্বলহীন, ভবনদীকূলে যমদ্বার-স্থিত, ভয়-ব্যাকুল প্রেতাত্মাকে, আশ্বাস ও অভয় দিবার জন্য, শববাহকগণ উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিয়া থাকে। ঐ হরিধ্বনি, ইহাই জ্ঞাপন করে যে, হে অন্তকদূতকবলিত ভয়ব্যাকুল প্রেতাত্মন্, তোমার ভয় কি ? একবার উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম উচ্চারণ কর,—যমদূতগণ, দূরে পলায়ন করিবে, সকল ভয় নিবারিত হইবে, এবং অনা-য়াসে ভীষণ ভবনদীপার হইয়া নিত্যধামে চলিয়া যাইবে। আর সেই ধ্বনিতে পরকালের চিন্তাহীন, মোহান্ধ মানবকে, মৃত্যুর কথা স্মরণ করাইয়া, অন্তিম দিনের অনন্তগতি, হরিনাম আশ্রয় করিতে ইঙ্গিত করে।

এ সংসার অনিত্য, এই দেখ ধনজনাদি কিছুই সঙ্গে যাইতেছে না, ইহা ইঙ্গিতে জানাইয়া, মানবকে সংসারে অনাসক্ত ও ভগবন্নামে আসক্ত

প্রবুদ্ধ করিবার জন্য, শববহনকালে হরিধ্বনি করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে; মানবকে, ভীত করিবার জন্য নহে। সর্ব্বভয়-নিবারণ হরিনামে, মৃত্যুভয় আসিতেই পারে না। শ্রুতি বলেন, "গোবিন্দাৎ মৃত্যুর্বিভেতি।" গোবিন্দ নামে, মৃত্যুই ভীত হইয়া পলায়ন করে। নামমাহাত্ম্যবিদ্ ভক্তগণও বলিয়া থাকেন;

"শুনিয়া গোবিন্দরব, আপনি পলাবে সব;
সিংহরবে যেন করিগণরে, ভাই হরি বল।"

কলিহত অল্পায়ু মানব, যোগসমাধি, ধ্যানধারণা তপস্যাদি, কৃচ্ছ্রসাধ্য কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা, ভবার্ণবতরণে অক্ষম জানিয়া, অধমতারণ দয়ালগৌরহরি, পারের তরী, শমনদমন মধুর হরিনাম, আচণ্ডাল সর্ব্বজনে বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছেন। এই হরিনামেই সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হইয়া থাকে। শাস্ত্র বলেন;

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুস্ত্রেতায়াং যজতেমখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌতদ্ধরি কীর্ত্তনাৎ॥"

ভক্তিপূর্ব্বক হরিনাম গ্রহণেই ফল আছে, নচেৎ কোন ফল নাই" অনেকে এই সিদ্ধান্ত করিয়া, হরিনাম গ্রহণ করে না এবং ভক্তিলাভের চেষ্টা করে না। কেবল আহারনিদ্রাভয়েন্দ্রিয়পরতন্ত্র পশুধর্ম্ম হইয়া, সুরদুর্ল্লভ মানবজন্ম, বৃথায় যাপন করে। এই সকল শিশ্নোদরপরায়ণ জনগণই প্রকৃত আত্মহা। অবশ্যই স্বীকার করিবে, ভক্তিপূর্ব্বক নামগ্রহণে যেমন আশু ও প্রত্যক্ষ ফল লাভ হয়, সাধারণতঃ সেরূপ হয় না। কিন্তু ভক্তিলাভ করা সুকৃতি-সাপেক্ষ। জন্মান্তরীণ সুকৃতির ফলে, সাধুসঙ্গ লাভ হইলে ভক্তি পাওয়া যায়। সুতরাং ভক্তিলাভ করিতে হইলে, সুকৃতি অর্জ্জন আবশ্যক। অন্নগত প্রাণ, অল্পায়ু মানবের যোগাদি কঠোর কর্ম্মদ্বারা সুকৃতি সঞ্চয় করা কঠিন; এমন কি অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। হরিনাম গ্রহণই সকল সুকৃতির সার। হরিনামে, সকল দুষ্কৃতির ধ্বংস হইয়া, পরম সুকৃতি সঞ্চিত হয়। অতএব যে কোন অবস্থায়, হরিনাম, আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। হরিনামের গুণে, পাপতাপ বিষয়াশক্তি, আত্মাভিমানাদি সকল মোহ দূর হইয়া, হৃদয় শুদ্ধসত্ত্ব ও নির্ম্মল হইয়া যায়। মানব যত পাপী হউক না কেন, বজ্রলেপময় পাপ কালিমায়, হৃদয় যতই কঠিন, যতই মলিন হউক না কেন; হরি নাম গ্রহণ করিতে পারিলে, সমস্ত পাপ ধ্বংস হইয়া' হৃদয় মন, সুনির্ম্মল ও কোমল হইয়া যায়। নরঘাতক দস্যু পাপাকর রত্নাকর, পাপাধিক্যবশতঃ

রাম নাম উচ্চারণ করিতে না পারায় "মরা" মন্ত্র জপ করিয়াও, সর্ব্বপাপ-মুক্ত সাধুত্তম এবং কবিকুলচূড়ামণি হইয়াছিলেন। নদীয়ায়, নামসংকীর্ত্তনের হরিধ্বনি শুনিয়া, দুর্দ্দান্ত দস্যু মহাপাপী নিষ্ঠুর জগাই এর কলুষকালিমাক্লিন্ন-কুলিশকঠোর হৃদয়ও নির্ম্মল এবং কোমল হইয়াছিল। তাই জগাই, তুল্যধর্ম্মী কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাধাইকে বলিয়াছিল, "ভাই মাধাই, আজ কি মধুর নাম শুনিলাম। এমন সুধামাখা এমন প্রাণারাম, এমন পাষাণগলান নামত, কখন শুনি নাই। কত গো-হত্যা ব্রহ্মহত্যা করিয়াছি, কত শিশুকে পিতৃ-মাতৃহীন, কত নারীকে পতিহীনা করিয়াছি, কত পথিক, কত অসহায়কে, শৃগালকুক্কুরবৎ হত্যা করিয়া, তাহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছি, তাহাতে যে হৃদয়, কখনও বিচলিত হয় নাই, এবং সেই সকল পিতৃমাতৃহীন বালকের মর্ম্মঘাতী আকুল ক্রন্দনে, পতিহীনা রমণীগণের হৃদয়বিদারক হাহাকারে, এবং আর্ত্তগণের ভয়ব্যাকুল সকরুণ চীৎকারে, যে হৃদয় কখন মুহূর্ত্তের জন্য দমিত বা নমিত হয় নাই, আমার সেই বজ্রাদপি কঠিন হৃদয় আজ, এই নামের গুণে দ্রবীভূত হইয়াছে। যে পাপ-কঠোর নয়নে কখনও কোন প্রকারে বিন্দুমাত্র জল আসে নাই,—এই দেখ্ ভাই; সেই চিরশুষ্ক পাপ-চক্ষু জলে ভাসিয়া যাইতেছে। প্রাণের ভাই, তাইতে বলি,—

"হরি বল মাধাই মধুর স্বরে। হরিনাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে॥
হরিনামের গুণে গহন বনে, মৃততরু মুঞ্জরে॥"

অশেষ শাস্ত্রদর্শী, বিশ্ববিখ্যাত বৈদান্তিক, প্রসিদ্ধ অদ্বৈতবাদী, জ্ঞানগর্ব্বী পণ্ডিত প্রখ্যাতনামা শ্রীল প্রকাশানন্দ সরস্বতী, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নিকট হরি-নাম শ্রবণ করিয়া, হরিনামের মধুরআস্বাদ পাইয়া বলিয়াছিলেন;—

"এমন সুধামাখা হরিনাম নিমাই কোথা হতে এনেছে।
এনাম, একবার শুনে, হৃদয়বীণে আপনি বেজে উঠেছে॥
অনেকবার শ্রবণে শুনেছি এনাম, কখনত এমন করে নাই পরাণ,
আজ কি জানি কি এক নবভাবোদয়, আমার হৃদয় মাঝারে হতেছে।১॥
কে যেন বলিছে মোর কাণে কাণে, তোদের পারের উপায় হ'লো এতদিনে,
(ঐ দেখ্) প্রেমের পশরা লয়ে নিজশিরে প্রেমের ঠাকুর
এসেছে। ২॥
কেটে গেছে আমার নয়নের ঘোর, গলে গেছে কঠিন পাষাণ হৃদয় মোর,
আজ কি জানি কি এক উজ্জ্বল জগতে, আমায় নিয়ে চলেছে। ৩॥

আজ হতে নিমাই তোমার সঙ্গে রব, জ্ঞানের গরব আমি কভু না করিব,
আজ সব ছেড়ে ফেলে, হরি হরি ব'লে, (আমার) নাচিতে বাসনা
হ'তেছে। ৪ ॥

হরি নামের গুণে, জ্ঞানগুরু পরমহংস প্রকাশানন্দের,জ্ঞানগর্ভ পাণ্ডিত্যাভিমান, চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া, তাঁহার জ্ঞানশুষ্ক হৃদয়-মরুতে প্রেমভক্তির প্রবল বন্যা বহিয়াছিল। সুতরাং ভক্তি লাভ করিয়া হরিনাম গ্রহণ করিতে অপেক্ষা করিবার আবশ্যক নাই। নাম গ্রহণ করিলে নামের গুণে, ক্রমে প্রেম-ভক্তি লাভ হইয়া থাকে। অতএব হরিনাম গ্রহণ করিতে অবহেলা করা উচিত নহে। সর্ব্বসন্তাপহারী সুমধুর হরিনাম কখনই ভয়ঙ্কর বা কঠোর নহে। পিত্তরোগী, যেমন সুমিষ্ট মিছরিতে তিক্তানুভব করে, সেইরূপ, ভগবদ্বিমুখ, নামে বিশ্বাসহীন আত্মহাগণ, মধুর হরিনামে, কঠোরতা অনুভব করিয়া থাকে।

মানব স্বীয় কর্ম্মজস্বভাব, ধর্ম্ম, বুদ্ধিবৃত্তি এবং জ্ঞান অনুসারে, একপদার্থই বিভিন্নভাবে দেখিয়া ও ভাবিয়া থাকে। মথুরাধিপতি ভোজরাজ কংশের ধনুর্যজ্ঞের নিমন্ত্রণ উপলক্ষে, শ্রীকৃষ্ণ মথুরা গমন করিয়া, যজ্ঞস্থলালয়ে প্রবেশ করিলে, যজ্ঞশালাস্থিত জনগণের, যাহার যেরূপ মনের ভাব, সে শ্রীকৃষ্ণকে সেইভাবে দেখিয়াছিল।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন ;—

"মল্লানামশনির্নৃ ণাং নরবরঃ স্ত্রীণাংস্মরোমূর্ত্তিমান্।
গোপানং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাংশাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ ॥
মৃত্যুর্ভোজপতে বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং।
বৃষ্ণীণাংপরদেবতেতিবিদিতো রঙ্গংগতঃ সাগ্রজঃ ॥

অর্থাৎ মল্লগণ শ্রীকৃষ্ণকে বজ্রের ন্যায় কঠিন ; সাধারণ জনগণ, তাঁহাকে প্রজাপালক রাজা ; স্ত্রীগণ, সাক্ষাৎ কামদেব ; গোপগণ, আত্মীয় ; দুষ্টরাজগণ শাসনকর্ত্তা ; দেবকী বসুদেব স্বীয় পুত্র ; কংশরাজ সাক্ষাৎ মৃত্যু ; অবিদ্বানগণ বিরাট পুরুষ ; যোগিগণ পরতত্ত্ব ; এবং বৃষ্ণিবংশীয়গণ, তাঁহাকে পরদেবতাস্বরূপে দেখিয়াছিলেন। যাঁহার নাম, তিনি যদি, লোকের আন্তরিক ভাব অনুসারে, ভিন্নরূপে প্রতীয়মান বা অনুভূত হয়েন, তবে তাঁহার নামও যে, সেইরূপ ভাবে অনুভূত হইবে, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি ? পরন্তু কৃষ্ণদ্বেষী কংশ, কৃষ্ণকে, মৃত্যুস্বরূপ ভীষণ দেখিলেও, শ্রীকৃষ্ণ যেমন সেরূপ নহেন ; সেইরূপ আত্মহাগণ, তাঁহার জগন্মঙ্গল মধুর হরিনাম, কঠোর বোধ করিলেও,

মধুর হরিনাম কখন কঠোর নহে। বস্তুতঃ হরিনাম, সর্ব্বভয়হারী, শমন দমন, শান্তিপ্রদ এবং চিরমধুর। ওঁ হরিরোম্‌তৎসদিতি।

কবিরঞ্জন শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

"বরণ"

গান—সুর "মোর সন্ধ্যায় তুমি…এসেছ"—রবীন্দ্রনাথ।

মোর গোধূলি-গগনে কি শুভ লগনে এসেছ—
তোমায় করি প্রণিপাত,
মোর সুপ্ত-বীণার অন্তর-তারে বেজেছ
তোমায় করি প্রণিপাত।
এই সারাদিবসের চয়িতকুসুম মাঝারে
তোমায় করি প্রণিপাত,
এই চির-বাঞ্ছিত মধুর আলোক আঁধারে
তোমায় করি প্রণিপাত।
এই নির্ম্মল-মহ-গরিমা-দীপ্ত গগনে
তোমায় করি প্রণিপাত,
এই সুরভিত-মধু-শান্ত-শীতল পবনে
তোমায় করি প্রণিপাত।
এই দিক্-বধূ সাথে আঁধার সাগর-বেলাতে
তোমায় করি প্রণিপাত,
এই তব তপোবনে তোমারি রচিত মালাতে
তোমায় করি প্রণিপাত।

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য।
সংস্কৃত কলেজ

৫ম বর্ষ] আশ্বিন, ১৩২২ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

বীরভূমি

মাসিকপত্রিকা।

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক সম্পাদিত।

সূচীপত্র।

—:•:—

মূল্য বার্ষিক ডাকমাশুল সহ ২৲ দুই টাকা মাত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ তিন আনা।

১৫ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা এই ঠিকানায় প্রবন্ধ ও টাকাকড়ি সম্পাদকের নিকট প্রেরিতব্য।

১৫নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন হইতে শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

গ্রাহকগণের প্রতি

সম্পাদকের বিশেষ নিবেদন।

ছয় বৎসর পূর্ব্বে বীরভূমে এক সাহিত্য পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সাহিত্য পরিষৎ হইতেই এই "বীরভূমি" মাসিক পত্র প্রচারিত হয়। এই পরিষদের প্রথমাবস্থায় যাঁহারা ইহার বন্ধু ছিলেন ও অর্থ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহারা সরিয়া পড়েন, আবার কেহ কেহ ইহার সাহায্যে নিজেদের কিছু কিছু সুবিধাও করিয়া লন। "বীরভূম সাহিত্য পরিষৎ" একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সে সাধু-সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয় নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে তাহা কার্য্যে পরিণত হইবে বলিয়া আমি এই কাগজখানি রাখিয়াছি। বীরভূমি হইতে যখন ইহা কলিকাতায় আনা হয় তখন এই কাগজের জন্য আমাকে দেড় হাজার টাকার জন্য দায়ী হইতে হয়। যাঁহারা প্রকাশ্য সভায় টাকা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলেন না; যাঁহারা কোনরূপ মতলব হাঁসিল করিবার জন্য ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন এবং কোন কার্য্য না করিয়াও কর্ম্মকর্ত্তা হইয়াছিলেন তাঁহারাও সরিয়া পড়িলেন। কিন্তু "বীরভূমি"র কোন পাওনাদার বঞ্চিত হন নাই। কাগজ সুখে দুঃখে চলিতেছে। অদূর ভবিষ্যতে আবার "বীরভূম সাহিত্য পরিষৎ" প্রভৃতি পুনর্জ্জীবিত হইবে।

এতদিনে 'বীরভূমি' তাহার অভীষ্ট সাধন করিতে পারিত কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় গত দুইবৎসর নবদ্বীপ সেবাশ্রমের অতিশয় গুরুভার আমার মাথায় পড়ায় আমি "বীরভূমি"র দিকে মনোযোগ দিতে পারি নাই। এ বৎসরের কাগজ আশ্বিন পর্য্যন্ত বাহির করিয়া আর বাহির করিতে পারিলাম না। এ দিকে চৈত্র মাস যায়; এজন্য স্থির করা হইল এ বৎসরের কাগজ এইখানেই শেষ হউক; ইহার পর ১৩২৩ সালের বৈশাখ সংখ্যা বাহির হইবে।

বীরভূমির গ্রাহকগণের মধ্যে অধিকাংশের সহিতই আমার ব্যক্তিগত পরিচয় আছে কাজেই আশা করি যাঁহারা গ্রাহক আছেন তাঁহারা আমার অবস্থা ভাবিয়া এ জন্য অসন্তুষ্ট হইবেন না।

আর এক কথা, অগ্রিম মূল্য খুব কম গ্রাহকের নিকটই লওয়া হইয়াছে। প্রায় সকলের নিকটই মূল্য বাকি। যাঁহারা ২৲ টাকা দিয়াছেন তাঁহাদের এক টাকা ষষ্ঠ বর্ষে জমা করিয়া লওয়া হইবে। আর যাঁহাদের নিকট মূল্য বাকি আছে বৈশাখ সংখ্যা ভি, পি, তে তাঁহাদের নামে প্রেরিত হইবে। আপাততঃ ৫ম বর্ষের দাম একটি টাকা দিয়া তাঁহারা ষষ্ঠ বর্ষের কাগজ লইবেন।

বৈশাখ মাস হইতে যাহাতে নিয়মিত রূপে কাগজ বাহির হয় তজ্জন্য এক নূতন বন্দোবস্ত হইল। খিদিরপুর ২ নং গড়বাড়ি লেন্ নিবাসী আমার কনিষ্ঠ প্রতিম বন্ধু শ্রীযুক্ত সুধীশচন্দ্র পাল পত্রিকার পরিচালনাদির ভার লইলেন। আমি সম্পাদক থাকিলাম। পরিচালনার চিন্তা আমাকে করিতে হইবে না। সুতরাং পূর্ব্বাপেক্ষা আমার লেখা আরও অধিক বাহির হইবে। বৈশাখ মাস হইতে "শ্রীশ্রীরাসলীলা" সম্বন্ধে আমার ধারাবাহিক প্রবন্ধ ও অন্যান্য লেখা বাহির হইবে। আরও কতিপয় চিন্তাশীল লেখকের প্রবন্ধ প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।
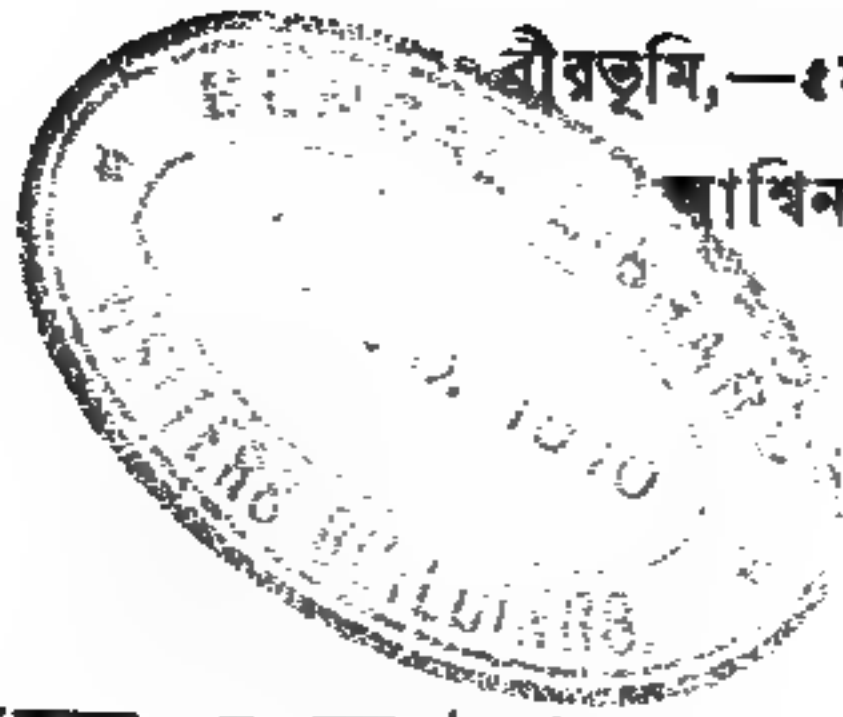
মানব ও ভগবান।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পঞ্চদশ শতাব্দীতে আমাদের এই বঙ্গদেশে যে আনন্দ-বার্ত্তা ঘোষণা করেন, শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সেই বার্ত্তা ঘোষিত হইয়াছিল। এই দুই ঘোষণার মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে। কথা এক—কিন্তু ঘোষণার পদ্ধতি অন্যরূপ। ভক্তেরা বলেন বৃন্দাবন—বন, যে-সে বন নহে, শ্রীরাধার তপোবন। আমাদের সংসার হইতে ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে দূরে না হইলেও—আমরা ইহাকে অত্যন্ত দূর করিয়া ফেলিয়াছি। বৃন্দাবনের গোপ গোপীগণের সহিত পরিচিত হইলে, অর্থাৎ তাহাদের নির্ম্মলহৃদয়ের সহিত আমাদের হৃদয়ের জানাজানি হইলে আমাদের ভয় ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহা হইবার অনেক বাধা রহিয়াছে। প্রথম বাধা কংস।—এই কংস সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত যাহা বলিয়াছেন তাহার সার শিক্ষা এই যে কংস বাঁচিতে চায়—সে জায়গায় আমাদের সঙ্গে কংসের মিল আছে—আমরাও বাঁচিতে চাই—সুতরাং কংস আমাদের রাজা। কিন্তু কংস এই দেহ লইয়াই বাঁচিতে চায়—দেহের মরণ অবশ্যম্ভাবী—এই মরণকে এড়াইতে চেষ্টা করিলে বাঁচা যায় না—এই মরণকে আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করিলে তবে বাঁচা যায়—এটুকু কংস স্বীকার করেন না।

কংসও ভালবাসিত, সংসারী মানুষ আমরা, আমরাও ভালবাসি—আর ভালবাসার পথই তো বৃন্দাবনের পথ, কিন্তু কংসের এই ভালবাসা—প্রেম নহে, ইহা কাম। এই জন্যই তাঁহার নাম কংস—এই জন্যই তাঁহার কারাকক্ষে শ্রীকৃষ্ণ আসিলেন, কিন্তু সে জানিতে পারিল না। তাঁহারই রাজ্যে প্রেম আসিলেন, গোপপল্লীর মানবমানবী স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গ সকলেই সেই প্রেমরসে ভাসিল—অমরতা পাইল—কিন্তু কংসের ভাগ্যে লাভ হইল মরণ। ইহার কারণ কংসের ভালবাসা প্রেম নহে—কাম।

কংস যে ভালবাসিত, এক কথাতেই ভাগবত আমাদিগকে তাহা বুঝাইয়া দিলেন। দেবকীর বিবাহের পর বর ও কন্যা যখন মহাসমারোহ করিয়া

যাইতেছে, সেই উৎসবে কংস আনন্দিত—কারণ সে দেবকীকে ভালবাসিত। প্রত্যেক ভালবাসাই আনন্দ—আর এই আনন্দের মধ্য দিয়াই বৃন্দাবন—এই আনন্দই বৃন্দা—জীবনের প্রয়োজন এই বৃন্দার বা আনন্দের অবন বা রক্ষণ। প্রেম তো আসেন, হৃদয়তো জাগিয়া উঠে, সুখের কৈশোর আনন্দস্বপ্নময়—সোণার বয়ঃসন্ধি কাল, শত শত কোমলবাহু প্রসারিত করিয়া হৃদয় বাহিরে ছুটিয়া যায়, যাহাকে পায় তাহাকেই আলিঙ্গন করে, যাহাকে পায় তাহাকেই ধরিয়া রাখিতে চায়—কিন্তু সমুদয় সমাজ, আমাদের যাবতীয় সংস্কার—আমাদের এই মানবজাতির যেন সমগ্র অতীত ও বর্ত্তমান এই আনন্দের রক্ষণের জন্য সাহায্য করে না। এই জন্য প্রেম অন্ধকার রাত্রিতে কারাকক্ষে জন্মাইয়াও থাকিতে পারেন না, বাড়িতে পারেন না। তখনই তাঁহাকে চলিয়া যাইতে হয়।—কিন্তু কংস ভাল বাসিতেন।

দৈববাণী হওয়ার পর হইতেই কংসের সেই ভালবাসার রূপান্তর হইল। কংস শুনিলেন "রে অবুধ আজ অতিশয় আনন্দে একেবারে আত্মহারা হইয়া যে ভগিনীকে রথে চড়াইয়া নিজে ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া হাসিতে হাসিতে রথ চালাইয়া লইয়া যাইতেছিস্, এই ভগিনীর অষ্টম গর্ভে তোর মৃত্যু আসিয়া জন্মগ্রহণ করিবে।" এই দৈববাণী শুনিয়া কংস যদি বলিতে পারিত—মরণই আমার প্রেম "মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান।" কংস যদি বলিতে পারিত, মরণ তো আসিবেই, কিন্তু মরণের ভয়ে প্রেমের প্রসার রুদ্ধ করিবে কে? প্রেম ও আনন্দ—মরণ হইতে বড়, তাহারা যে মৃত্যুঞ্জয়! প্রেমেই অমরতা, আর মরণে ধ্বংস নয়। এই কথা বলিয়া কংস যদি আরও উল্লাসে রথ চালাইয়া লইয়া যাইতেন তাহা হইলে ভারতের ভাগ্য, মানব-জাতির ভাগ্য, আজ অন্যরূপ হইত। তাহা হইলে বৃন্দাবনের কৃষ্ণই মথুরার কৃষ্ণ হইতেন। তাহা হইলে আর কুরুক্ষেত্র হইত না। কিন্তু তাহা হইবার নহে। এই জন্য দৈববাণী শুনিয়া কংস ভীত হইলেন, তিনি প্রেমের আসনে বসিয়া তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন, এক দৈববাণীতেই তাঁহার সে তপস্যা ভাঙ্গিয়া গেল। কংস ভাবিলেন, "আমি মরিয়া যাইব, তাহা হইলে আনন্দ থাকিবে কোথায়?" 'আনন্দে আমি' না 'আমিতে আনন্দ' এই প্রশ্ন যখন উঠিল তখন কংস বলিল 'আমি'তে অর্থাৎ এই দেহেন্দ্রিয় মনযুক্ত একটা কেন্দ্র, যাহা আরও লক্ষ লক্ষ কেন্দ্রের সহিত নিত্য প্রতিযোগীতা ও প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিয়া কাড়াকাড়ি মারামারি করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছে—এই

আমিটাতেই আনন্দ। সুতরাং কংস কামের পথে চলিয়া গেল। বৈষ্ণব সাধু বলিয়াছেন—

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্যমাত্র প্রেম ত প্রবল।"

প্রেম কংসের নিকট মরণের মূর্ত্তি ধরিয়া আসিতে চাহিলেন, কংস তাহা মানিয়া লইতে পারিলেন না। ইনিই কংস। তাহার পর দেবকী বসুদেবের কারা-রোধ, তাঁহাদের পুত্র নাশ, শেষে রাজ্যের মধ্যে যত সদ্য-জাত শিশু, সকলের বিনাশ! নির্ম্মল শিশুর মূর্ত্তি, যেখানে বালগোপালের স্বচ্ছন্দ অধিষ্ঠান, হৃদয় যেখানে আপনি মাতিয়া উঠে, কংসের সেইখানেই ভয়। নিজেকে বাঁচাইবার জন্য, মরণকে জয় করিবার জন্য কংস এই উল্‌টা পথ লইলেন।

এই জন্যই বলিতেছিলাম কংস আমাদের প্রথম বাধা। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন কংসই একমাত্র বাধা নহে। এই কংস বহুরূপে অর্থাৎ আপনার অনুচরগণকে পাঠাইয়া পাঠাইয়া বৃন্দাবনের প্রেমরাজ্য ধ্বংসের জন্য কত চেষ্টাই করিলেন। পূতনা, শকটাসুর, তৃণাবর্ত্ত, বৎসাসুর, বকাসুর, অঘাসুর, ধেনুকাসুর, প্রলম্বাসুর এই সমস্ত দৈত্য ইহারা কংস কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু কংসই একমাত্র বাধা নহে।

যাঁহাদের আমরা দেবতা বলি তাঁহাদের চরণে প্রণাম! আমাদের বৃন্দাবন ভাঙ্গিবার জন্য তাঁহারাও বড় কম চেষ্টা করেন নাই। তাঁহারা মানব ও ভগবান, এই দুইয়ের মধ্যখানে চিরদিন দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, তাঁহারা বলেন মানুষ ভগবানের কাছে যাইবে ইহাত সুখের কথা; কিন্তু আমরা দেবতা, আমাদের মধ্য দিয়াই তো যাইতে হইবে। দেবতারা অবশ্য কংসের মত ভীষণ বাধা না দিলেও বাধা দিয়াছেন। প্রথম বাধা দিলেন ব্রহ্মা। ব্রহ্মা দেবতাদের আদি। 'দেবানাং প্রথমঃ''। তিনি দেখিলেন যে যিনি গোপ-বালকদের সহিত স্বচ্ছন্দে আহার বিহার করিতেছেন, তিনি কিরূপ ভগবান! ব্রহ্মা বিধি। তিনি বিধির শৃঙ্খলের মধ্যে ভগবানকে দেখিয়াছেন, এই পর্য্যন্তই তাঁহার জ্ঞানের সীমা। এখানে স্বাধীন ভগবান, স্বাধীন মানব, প্রেমের রাজ্য বৃন্দাবন! ব্রহ্মা খেলা খেলিলেন, পরাস্ত হইলেন।

তাহার পরের বাধা যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ, কিন্তু ব্রাহ্মণদের আপনারা নিন্দা

করিবেন না, তাঁহারা "বেদবাদী" অর্থাৎ বেদঘোষণশীল অর্থাৎ বেদের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই। বেদের মর্ম্ম কি? আনন্দই ভগবান, প্রেমই ভগবান। ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞ করিয়াছেন আর ক্ষুধিত রাখাল বালকগণ শ্রীকৃষ্ণের কথায় নিদাঘের দিবা দ্বিপ্রহরে তৃষিত ও ক্ষুধিত হইয়া যজ্ঞশালায় অন্নভিক্ষা করিতে উপস্থিত। ব্রাহ্মণেরা অন্ন দিলেন না। যাহা হউক ব্রাহ্মণেরা দুর্ব্বল, তাঁহারা প্রেমকে পাইলেন না, কিন্তু বুঝিলেন। ব্রাহ্মণেরা বিবাহিত সংসারী। তাঁহাদের স্ত্রী আছেন। এই স্ত্রীলোকেরা স্বামীর অভাব পূরণ করিলেন, প্রেমকে স্বীকার করিলেন, গোপপল্লীর গোচারণকারী ভগবানকে বরণ করিয়া লইলেন। ব্রাহ্মণেরা স্ত্রীলোকদের বাধা দিয়াছিলেন, কিন্তু ইঁহারা মৈত্রেয়ীর জাত, ইঁহারা যাহাতে অমৃতা না হইবে, তাহা লইবে না। ফলে স্ত্রীর পুণ্যে স্বামী ধন্য, প্রথমে বাধা দিয়াও শেষে স্বীকার করিলেন। তবে একটা কথা এই, যে কথায় স্বীকার করিলেন কার্য্যে স্বীকার করিলেন না। শ্রীমদ্ভাগবতে এই কথাই আছে। ব্রাহ্মণেরা—

> "দৃষ্ট্বা স্ত্রীণাং ভগবতি কৃষ্ণে ভক্তিমলৌকিকীং।
> আত্মানঞ্চ তয়া হীনমনুতপ্তা ব্যগর্হয়ন্॥"

আপনাদের সহধর্ম্মিনীগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অলৌকিকী ভক্তি এবং নিজেদের ভক্তিহীনতা দেখিয়া অনুতপ্ত হইলেন ও অতিশয় আত্মনিন্দা করিতে লাগিলেন।

> ধিক্ জন্ম নস্ত্রিবৃদ্‌যত্তদ্ধিগ্‌ব্রতং ধিগ্বহুজ্ঞতাং।
> ধিক্ কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে॥

ব্রাহ্মণেরা বলিলেন শুক্র, সাবিত্রী ও দীক্ষা এই তিন প্রকারে আমাদের যে জন্ম হইয়াছে তাহা ধিক্। আমাদের ব্রহ্মচর্য্যকেও ধিক্, বহুজ্ঞতাকেও ধিক্, কুলকেও ধিক্, কারণ আমরা অতীন্দ্রিয় পরমতত্ত্বে বিমুখ।

> নূনং ভগবতো মায়া যোগিনামপি মোহিনী।
> যদ্বয়ং গুরবো নৃনাং স্বার্থে মুহ্যাম হে দ্বিজাঃ!

এখন আমরা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি যে ভগবতী মায়া যোগীদিগেরও মোহ জন্মাইয়া থাকে—আমরা ব্রাহ্মণ; সকল বর্ণের গুরু, আমরাও আপন বিষয়ে মুগ্ধ হইলাম।

> অহো পশ্যত নারীণামপি কৃষ্ণে জগদ্‌গুরৌ।
> দুরন্তভাবং যোঽবিধ্যন্মৃত্যু পাশান্ গৃহাভিধান্॥

নাসাং দ্বিজাতিসংস্কারো ন নিবাসো গুরাবপি।
ন তপো নাত্মমীমাংসা ন শৌচঃ ন ক্রিয়াঃ শুভাঃ॥
তথাপি হ্যুত্তমশ্লোকে কৃষ্ণে যোগেশ্বরেশ্বরে।
ভক্তির্দৃঢ়া ন চাস্মাকং সংস্কারাদিমতামপি॥

স্ত্রীলোকদিগের শ্রীকৃষ্ণে কি অপূর্ব্ব ভক্তি! গৃহ-নামে অভিহিত যে মৃত্যুপাশ, তাহা এই প্রকারের ভক্তিদ্বারাই ছিন্ন হইয়া থাকে। কি আশ্চর্য্য! এই সকল অবলার উপনয়নাদি সংস্কার হয় নাই, ইহারা ব্রহ্মচর্য্যের জন্য গুরুকুলে বাসও করে নাই, ইহাদের তপস্যা অথবা আত্মবিচার কিম্বা শৌচাচার কিম্বা সন্ধ্যোপাসনাদি শুভক্রিয়াও কিছু নাই, অথচ যোগেশ্বরদিগেরও যে ঈশ্বর ভগবান উত্তমঃশ্লোক শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার প্রতি ইহাদের দৃঢ়াভক্তি হইয়াছে, আমরা সংস্কারাদি বিশিষ্ট হইয়াও তাহা উপার্জ্জন করিতে পারিলাম না।

ব্রাহ্মণেরা এই প্রকারে আপনাদিগের মনোভাব প্রকাশ করিলেন বটে কিন্তু—

"ইতি স্বাঘমনুস্মৃত্য কৃষ্ণেতে কৃতহেলনাঃ।
দিদৃক্ষবো ব্রজমথ কংসাদ্ভীতা ন চাচলন্॥"

সেই সকল বিপ্র এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিজেদের অবহেলার জন্য অপরাধী হইয়াছেন ইহা বুঝিতে পারিলেন; শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবার জন্য ইচ্ছুকও হইলেন কিন্তু কংসভয়ে ভীত হইয়া কিছুতেই যাইতে পারিলেন না।

ব্রাহ্মণদের দুর্ব্বলতা কোথায় বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে! নির্ম্মল হৃদয়, সরল ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত আবেগের দ্বারা যাহা চাহিতেছে, নানারূপ সামাজিক সুবিধা ও অসুবিধার আলোচনার দ্বারা তাঁহারা তাহার অনুবর্ত্তন করিতে পারিলেন না।

দেবতাদের মধ্যে কেবল যে ব্রহ্মাই বাধা তাহা নহে। ইন্দ্র বৃন্দাবন ধ্বংশ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিনিও কৃতকার্য্য হইলেন না। ইন্দ্র ব্রজবাসীগণের নিকট চিরদিন পূজা পাইতেন। শাস্ত্রের বিধি-অনুসারে চিরাচরিত ব্যবস্থার অনুবর্ত্তনে এই পূজা বা যজ্ঞ চলিতেছিল। কৃষ্ণ অকস্মাৎ আপত্তি উত্থাপন করিলেন। তিনি বলিলেন যে স্বভাবস্থ হইয়া কর্ত্তব্যপরায়ণ পুরুষের কর্ম্মেরই পূজা করা কর্ত্তব্য। "তস্মাৎ সংপূজয়েৎ কর্ম্ম স্বভাবস্থ স্বকর্ম্মকৃৎ।" কৃষ্ণ আরও বলিলেন যে

"অঞ্জসা যেন বর্ত্তেত তদেবাস্ত হি দৈবতম্।"

অর্থাৎ যে যাহার দ্বারা বর্ত্তমান হয় তাহার তাহাই দেবতা। তিনি আরও বলিলেন

> "আজীব্যৈকতরং ভাবং যস্ত্বন্যমুপজীবতি।
> ন তস্মাদ্বিন্দতে ক্ষেমং জারান্নার্য্যসতী যথা॥"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের ভিতরের ভাব কি তাহা অনুধাবন না করিয়া চিরাগত বা অভ্যস্তপ্রথার অনুবর্ত্তনে চিন্তাহীন ভাবে ধর্ম্মজীবনের আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়মিত করে, সে ব্যক্তির মঙ্গল হয় না। অসতী নারীর উপপতি সেবা যেমন অমঙ্গলের হেতু, সেইরূপ এই প্রকারের ধর্ম্মানুষ্ঠান মানবকে মঙ্গলে লইয়া যায় না, অমঙ্গলে লইয়া যায়।

এই শ্লোকটীর যাহা মর্ম্ম তাহা আমাদের দেশের সকলেরই বিশেষ মনোযোগের সহিত আলোচনা করা দরকার।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—ইন্দ্র তোমাদের প্রকৃতিতে নাই। অতএব ইন্দ্রের পূজা করিতেছ কেন? যদি বল তাঁহার নিকট উপকার পাই—তাহা হইলে প্রত্যক্ষজ্ঞানে যাহাদের নিকট উপকার পাইতেছ তাহাদের পূজা কর। এই বলিয়া তিনি গোবর্দ্ধন পর্ব্বত, গাভী ও ব্রাহ্মণগণের পূজার ব্যবস্থা করিলেন। গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশানুসারে পূজার ব্যবস্থা করিলেন। তাহার পর ইন্দ্র তাঁহার মেঘগণকে আহ্বান করিলেন—ভীষণ শিলাবৃষ্টি ও বজ্রপাত আরম্ভ হইল। বৃন্দাবনবাসীগণ বিপন্ন হইলেন কিন্তু বিচলিত হইলেন না। পূর্ব্বে যে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের কথা বলা হইয়াছে—তাঁহাদের সহিত গোপগোপীগণের এইখানেই প্রভেদ। পাছে কংস রুষ্ট হয়েন, পাছে ভবিষ্যত বিপদ-সঙ্কুল হয়, এই ভয়ে ব্রাহ্মণেরা শ্রীকৃষ্ণকে বা আনন্দ ও প্রেমকে স্বীকার করিতে পারিলেন না, হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত্ত আবেগের গতিও রুদ্ধ করিলেন, আর গোপগোপীগণ বিপদের সাগরে নিমজ্জিত হইয়াও এই প্রেমকে অবজ্ঞা করিলেন না। প্রেমের জন্য যে মরিতে পারে সেই অনন্তজীবন পায়, সেই বৃন্দাবনের নিত্যলীলায় প্রবেশ করে।

গোপগোপীদের বিপদ কাটিয়া গেল। ইন্দ্রও পরাজিত হইলেন। ইহার পর আরও দেবতাদের পরাজয় আছে—রাসলীলার উদ্দেশ্য কন্দর্পের দর্পজয় বা মদন-মোহন। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা হইবে। তাহার পর বরুণেরও পরাজয় হয়।

বিজয়ী করিতে চাহিয়াছিলেন! এই প্রেমের সাধনায় দেখিতে পাই যে মানবদেহ বা মানবতাই ইহার শ্রেষ্ঠক্ষেত্র। দেবলোকে ইহার স্থান নাই। কারণ দেবলোক ভোগভূমি। আর এই নরলোক কর্ম্মভূমি। যে ধর্ম্ম অপূর্ণ, যাহা মানবের ক্লেশভোগ করার অধিকার কাড়িয়া লইয়া তাহাকে অবিমিশ্র সুখ দিতে চায়। দুঃখ, বিপদ, মৃত্যু, মানবজীবনের করুণরাগিণী, যাহার মধ্যে চিরদিন ধ্বনিত হইতেছে, তাহারা উপেক্ষণীয় নহে, আদরণীয়। এইভাবে এই পৃথিবীর মানবের ভাগ্য যাহারা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিবে— শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন তাহারাই আমাকে পাইবে। যে কাঁদিবে না, প্রিয়বস্তু হারাইয়া একেবারে পাগল হইয়া ভূমিতে গড়াগড়ি দিবে না, হারানিধির অন্বেষণে পথে পথে সকলের চরণে চরণে কাঁদিয়া বেড়াইবে না, দুঃখের আগুনে গলিয়া চোখের জলে ভাসিয়া সকলের সঙ্গে এক হইয়া সকলের ভাগ্য সানন্দে স্বীকার করিবে না, ভগবান শ্রীবৃন্দাবনে লীলা করিয়া বলিলেন, সে আমাকে পাইবে না। যজ্ঞ করিয়া স্বর্গে যাইবে—মানব কাঁদিবে, মোহের আঁধারে পথহারা হইয়া ঘুরিবে, তাহার হাসির জ্যোৎস্না, অশ্রুর মেঘে ছাইয়া যাইবে, তুমি আর তাহাদের সঙ্গে কাঁদিবে না, তুমি বড় হইলে, তুমি ধার্ম্মিক হইলে—যাও তুমি স্বর্গেই যাও—তুমি আমাকে পাইবে না। সুযোগ সুবিধা লইয়া শত শত দুর্ব্বল দরিদ্রকে পদানত করিয়া গৌরবে বৈভবে মথুরায় বসিয়া শক্তির ও অধিকারের দুঃস্বপ্নে ডুবিয়া আছ, যাও চলিয়া যাও আমাকে তুমি পাইবে না। এই বলিয়া ভগবান গোপপল্লীতে চলিলেন, রাখাল বালকদের সঙ্গে নিজে গোচারণ করিতে লাগিলেন—মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া 'শিলতৃণাঙ্কুর'-ময় পথে "নলিন-সুন্দর" চরণ ক্ষতবিক্ষত করিয়া ভগবান্ চলিলেন। তিনি "তৃণচরানুগ"—একটি গাভী যদি বিপথে যায়, কাঁটায় বা কাদায় যায়, তিনি তাহার পশ্চাতে ছোটেন। তিনি "ফণিফণার্পিতপদ"—কোনো বিপদে ভীত নহেন—ভীষণ বিষধর সর্পের মস্তকেও আনন্দে পদার্পণ করেন।

মানুষ এতদিন আপনাকে চেনে নাই, ভগবান কোথায় তাহা দেখিতে পায় নাই, কোন্ দূর স্বর্গে, কোন্ বিরজার পারে পরব্যোমে তাঁহাকে খুঁজিয়াছে। এত কাছে এত আপনার হইয়া তাঁহার যে নিত্যলীলা হইতেছে, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। আজ মানুষ তো অবাক্ হইবেই, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, বিক্রমশালী রাজা, অমৃতপায়ী দেবতারা পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিল না। ভগবান

কিন্তু অর্জ্জুনকে গীতাতে বলিয়াছেন—"হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি" অর্জ্জুন, ঈশ্বর বলিলেই মানুষ প্রত্যক্ষ ছাড়িয়া অপ্রত্যক্ষে চলিয়া যায়, পৃথিবী ছাড়িয়া স্বর্গে, বৈকুণ্ঠে বা গোলকে চলিয়া যায়, নিকট ছাড়িয়া দূরে, অতিদূরে—কোন্ এক অজ্ঞাত স্বপ্নরাজ্যের মায়াকুহেলিকার মধ্যে চলিয়া যায়, কিন্তু তিনি হৃদয়ে—যেখানে প্রেমের বাস, সেখানে ঈশ্বর—যেখানে মানুষ সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে মাতিয়া আত্মহারা হইয়া যায়—সেখানে ঈশ্বর রহিয়াছেন। "ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি" স্থাবর জঙ্গমাদি যা কিছু যেখানে আছে—তাঁর আকর্ষণে সব নিত্য ধাবমান। গীতার এই তত্ত্বই তো বৃন্দাবন। এইবার শ্রীচৈতন্যলীলার কথা বলি।

শ্রীরূপগোস্বামী রচিত শ্রীচৈতন্যাষ্টকের প্রথম শ্লোকেই যেন সকল কথা বলা হইয়াছে। এই জন্য সেই প্রথম শ্লোকটিই বলি।

"সদোপাস্যঃ শ্রীমান্ ধৃতমনুজকায়ৈঃ প্রণয়িতাং।
বহদ্ভিঃ গীর্ব্বাণৈর্গিরিশ পরমেষ্ঠি প্রভৃতিভিঃ॥
স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজভজনমুদ্রামুপদিশন্।
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥"

শ্লোকটির বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন। শ্রীরূপ গোস্বামী বলিতেছেন, সেই চৈতন্য কি পুনরায় আমার নয়ন পথের পথিক হইবেন? প্রাচীন টীকাকার শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার টীকায় আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে এই শ্লোক যখন রচিত হয়, তখন রচনা-কর্ত্তা শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীধাম বৃন্দাবনে। আর নদীয়ার প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচলে—শ্রীজগন্নাথ ধামে। শ্রীবৃন্দাবনে বসিয়া শ্রীরূপ গোস্বামী আকুল হইয়া কাঁদিতেছেন, আর বলিতেছেন "সেই চৈতন্য কি পুনরায় আমার নয়ন পথের পথিক হইবেন?" এখন আপনারা চিন্তা করুন, এই চৈতন্য কে? এবং এই নয়ন পথের পথিক হওয়া বা দর্শন করাই বা কেমন? আমরা যেমন দেখি ঠিক তেমনি? শ্রীরূপ গোস্বামী, জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর পুত্র এবং সন্ন্যাস গ্রহণেরপর শ্রীচৈতন্য নামে পরিচিত—নিমাই পণ্ডিতকে বা বিশ্বম্ভর মিশ্রকে দেখিয়াছিলেন। এই এক দেখা, সে দেখা তখনও ছিল—এবং শ্রীরূপ গোস্বামীও এই শ্লোকের রচনার কিছুদিন পূর্ব্বে বৃন্দাবনে যাইয়া সে দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন—ইহা ইতিহাসজ্ঞ মাত্রেই জানেন। সে সময়ে অবশ্য দূরদেশে যাওয়াও বড়ই কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল—কিন্তু তথাপি তীর্থযাত্রীগণ বৃন্দাবন হইতে জগন্নাথ প্রায়ই যাইতেন, বিশেষতঃ

শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুকে যাঁহারা জীবনের সর্ব্বস্বধন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন বা তাঁহার পথের পথিক হইয়াছিলেন, তাঁহারা সে সময়ে বৃন্দাবন ও জগন্নাথ প্রায়ই যাতায়াত করিতেন, তাহা হইলে শ্রীরূপ গোস্বামীর এত আর্ত্তি কেন? তিনি একা না পারেন, সঙ্গী লইয়া জগন্নাথ যাইতে পারেন, আর যদি সেই চৈতন্তের নিত্যদর্শন তাঁহার জীবন ধারণের জন্য এতই প্রয়োজন হইয়া থাকে তাহা হইলে বৃন্দাবনেই বা থাকেন কেন? নীলাচলে যাইয়া সর্ব্বদা তাঁহার অভীষ্টদেবের সন্নিধানেও তো থাকিতে পারেন। বলিতে পারেন মহাপ্রভুর আদেশ! কিন্তু কাঁদিয়া কাটিয়া চরণে ধরিয়া এ আদেশ তো খণ্ডন করাইয়াও লইতে পারিতেন, কারণ মহাপ্রভু দয়ার ঠাকুর! তাহা হইলে এ আর্ত্তি—কেবল স্থূলচক্ষুতে স্থূল বা প্রকট বা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য রূপের দর্শন নহে—(Not seeing the physical form alone with the eyes o the body—it is something higher and deeper)—এ নিত্য রূপের নিত্য দর্শন! তিনি প্রকট ব্যাপারের কথা বলিতেছেন না—তিনি শ্রীচৈতন্তলীলার কথা বলিতেছেন—লীলা অর্থাৎ প্রকটাপ্রকট অর্থাৎ প্রকটের মধ্যে অপ্রকট বা শাশ্বতকে দর্শন করিতেছেন—এ চৈতন্ত তাহা হইলে কি—সেই কৃষ্ণচৈতন্ত বা Love-cousciousness of which he appeared to be the perfect embodiment or reflection to those that lovingly came in contact with him and which consciousness throws a glimpse on the heart of every man—and which everyman knowingly or unknowingly is trying to approxi mate—সেই চৈতন্তের তিনি মূর্ত্তি বা পূর্ণাঙ্গ প্রতিবিম্বরূপে তাঁহার অনুবর্ত্তীগণের নিকট তাঁহার যুগে প্রতীত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা তাঁহার প্রকটভাব—অপ্রকটভাবে বা নিত্যলীলায় সেই চৈতন্ত প্রত্যেক মানবের হৃদয়ে উঁকি মারিয়া মানবকে চঞ্চল করিয়া তুলিতেছে। শ্রীরূপ গোস্বামী এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তের কথা বলিতেছেন।

তিনি কেমন? "গিরিশপরমেষ্ঠিপ্রভৃতিভিঃগীর্ব্বাণৈঃ" শিব ব্রহ্মা প্রভৃতি দেববৃন্দ কর্ত্তৃক—"সদোপাস্তঃ" সর্ব্বদা সেবিত বা আরাধিত হইতেছেন।' আর এই যে আরাধনা ইহা ভয়ের বা লোভের আরাধনা নহে। "প্রণয়িতাং বহুভিঃ" প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহারা আরাধনা করিতেছেন। কোনো কিছু পাইবার প্রত্যাশায় নহে, প্রেমের সহিত তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণের মধ্যেই তাঁহারা নিজেদের সার্থকতা দেখিতেছেন।

এইবার একজন প্রশ্ন করিতেছেন—যে ব্রহ্মা শিব প্রভৃতি দেবতারাই যদি আসিলেন তবে তাঁহাদের দেখিতে পাইলাম কৈ? তাঁহাদের চিনিতে পারিলাম না কেন? ব্রহ্মা আসিলে তাঁহার চারটি মুখ দেখিতে পাইতাম—তাঁহার বাহন হংসটিও সঙ্গে সঙ্গে আসিত। শিব আসিলে তাঁহার পাঁচটি মুখ দেখিতে পাইতাম এবং তাঁহার বাহন বৃষ ও অনুচর নন্দীভৃঙ্গী ও ভূত-প্রেত পিশাচাদি প্রভৃতিকেও তো দেখিতে পাইতাম—কিন্তু সে সকল কোথায়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—"ধৃতমনুজকায়ৈঃ" ইহারা দেবত্বের বিশেষ বিশেষ চিহ্ন-সমুদয় দূরীভূত করিয়া, মানবের সঙ্গে তাঁহাদের চিরদিনের পার্থক্য লোপ করিয়া মানবের রূপ ধরিয়া আসিয়াছেন—এই খানেই মানবতার গৌরব।

তাহার পর বলিতেছেন যে ভগবান, তিনি কি করিতেছেন? এই প্রকারের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে মানুষ সাধারণতঃ পৃথিবীর বড়লোকদের দেখিয়া তদনুযায়ী ভগবানের সম্বন্ধে একটা ধারণা গঠন করে। মানুষ সাধারণতঃ বলে কোটি কোটি দেবতা, ঋষি ও সিদ্ধগণ সসম্ভ্রমে ও সভয়ে দাঁড়াইয়া তাঁহার অনির্ব্বচনীয় মহিমার কিরণছটা সন্দর্শন করিয়া বেদমন্ত্রে স্তুতিগান করিতেছেন। কিন্তু এখানে আমরা শ্রীভগবানের যে ভাব দেখিতেছি তাহা মোটেই সেরূপ নহে, এখানে তিনি নিজ ভক্তগণকে নিজ ভজনমুদ্রা শিক্ষা দিতেছেন।

"স্বভক্তেভ্য শুদ্ধাং নিজভজনমুদ্রামুপদিশন্।"

এইখানে একটা প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে তিনি কেবলমাত্র নিজের ভক্তগণকেই ভগবৎ-ভজনার পথ শিখাইতেছেন, তাহা হইলে যাহারা ভক্ত নহে, যাহারা আমাদের ন্যায় বদ্ধ, মূঢ় ও পতিত জীব তাহাদের উপায় কি?

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীরাসলীলার আর একটি সুপরিচিত শ্লোকসম্বন্ধেও ঠিক এই প্রকারের আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। সেখানে বলা হইয়াছে "ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য শ্রীভগবান মানুষের রূপ আশ্রয় করিয়া এমন সব লীলা করেন যাহা শুনিয়া লোকে ভগবৎপরায়ণ হয়।" এখানেও ভগবানের অনুগ্রহকে ভক্তগণের একচেটীয়া সম্পত্তি (privilege) করিয়া রাখা হইল। ইহার তাৎপর্য্য কি?

ভক্ত কি, তাহা বুঝিতে পারিলেই ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যাইবে।

প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থ পাঠে বুঝিতে পারা যায়, ভক্তিপথের পথিক, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ে অনেক ছিলেন, কারণ, তিনি কিছু ভক্তিপথের আবিষ্কারকর্ত্তা নহেন। কিন্তু তাঁহার সময়ে "ভক্ত" এই কথাটির অর্থ সাধারণ মানুষে প্রায়ই বুঝিত না। আজ চারিশত বৎসর পরেও যে আমরা 'ভক্ত' কথাটীর অর্থ বুঝিতে পারিয়াছি তাহাও মনে হয় না। আজ কাল আমরা "ভক্ত" বলিলে কি বুঝি, তাহা এই নবদ্বীপে আসিয়া আপনারা বেশ ভাল করিয়া জানিয়া যাইতে পারেন। এখন আমরা যেমন "ভক্ত" ও "ভক্তি"র একটি ভ্রান্ত ধারণা লইয়া ধর্ম্ম ও ভগবদ্ আরাধনার নামে প্রতিদিন তমোগুণের অন্ধকারময়গর্ত্তে ডুবিয়া যাইতেছি, সে সময়েও তাহাই হইয়াছিল। অবশ্য সে সময়ে কেবল যে ভক্তিপথই আবর্জ্জনাময় হইয়া দূষিত হইয়াছিল তাহা নহে, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগের পথও তুল্যরূপে দূষিত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তিপথের বিশুদ্ধতা সাধন করিয়া কেবল ভক্তিপথ নহে, অন্যান্য সমুদয় পথকেই বিশুদ্ধ করিবার আশা করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম্মমত আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলে দেখিবেন যে এই মতে ভক্তের কথাই আলোচ্য—ভক্তকে না জানিলে ভগবানকে জানিবার উপায় নাই। কেবল তাহাই নহে, ভক্তের মধ্যেই ভগবান। ভগবানের অন্যরূপ প্রকাশ যে নাই এমন কথা ভক্তেরা বলেন না—তাঁহারা বিনীত ভাবে কেবল এইমাত্র বলেন যে আমরা মানুষ, আমাদিগকে যদ্যপি প্রকৃত প্রেমের সহিত—ভগবানকে সম্পূর্ণরূপে পাইতে হয়—তাহা হইলে ভক্তের মধ্যেই তাঁহাকে দেখিতে পাই। সুতরাং ভগবানের ঐশ্বর্য্য ও বৈভব যখন অবিচিন্ত্য, তখন তিনি ভক্ত ছাড়াও থাকিতে পারেন, কিন্তু সে থাকার সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। আমরা যখন তাঁহার আনন্দভাবের বা কৃপাশক্তি-অধিষ্ঠিত শ্রীভগবানের রসের ভিখারী হই, তখন ভক্তের মধ্যেই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করি। শ্রীচৈতন্য ভাগবতগ্রন্থ খুলিয়াই দেখিতে পাইবেন প্রারম্ভে ভক্তের মহিমাই বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমেই মানুষকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য বলা হইয়াছে—

"ভক্ত ভগবান দুই অবিজ্ঞেয় তত্ত্ব"

তাহার পর এই গ্রন্থে এমন কথাও বলা হইয়াছে

"আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।
যেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈলা দড়॥"

ভক্তিশাস্ত্রের আলোচনায় এই এক সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় যে ভগবানের পূজা অপেক্ষাও ভক্তের পূজা বড়।

ভক্তিশাস্ত্রের, বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক এই শাস্ত্র যে ভাবে প্রচারিত হইয়াছে, তাহার ইহাই প্রথম ও প্রধান কথা। শ্রীলঘুভাগবতামৃত গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশ, যাহার নাম ভক্তামৃত, তাহাতে এই বিষয়েরই আলোচনা হইয়াছে। সেই স্থানের কয়েকটি শ্লোক শুনিলেই বুঝিতে পারিবেন।

আরাধনং মুকুন্দস্য ভবেদাবশ্যকং যথা।
তথা তদীয় ভক্তানাং নোচেদ্ দোষোঽস্তি দুস্তরঃ॥

শ্রীভগবানের আরাধনা যেরূপ আবশ্যক তাঁহার ভক্তগণের আরাধনাও তদ্রূপ আবশ্যক। নতুবা দুস্তর দোষ ঘটে।

ভক্তকে বাদ দিয়া ভগবানের পূজা হয় না।

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চ্চয়ন্তি যে।
নতে বিষ্ণোঃ প্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিকা জনাঃ॥

যাঁহারা গোবিন্দের অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার ভক্তগণের অর্চ্চনা করেন না, তাঁহারা শ্রীভগবানের প্রসাদভাজন হয়েন না, তাঁহারা দাম্ভিক লোক।

যাঁহারা ভক্তকে বাদ দিয়া ভগবানের পূজা করেন তাঁহারা সত্য সত্য (in right spirit) ভগবানের পূজা করেন না, নিজেদের দম্ভের পূজা করেন। এই কথাই পুনরায় বলিতেছেন—

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চ্চয়েৎ তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥

এই কথাগুলি শাস্ত্র কেন বলিলেন? লঘুভাগবতামৃত গ্রন্থে ভক্তগণের নামোল্লেখ করিয়াছেন, এই সমুদয় ভক্তের মধ্যে কাঁহার কোথায় স্থান তাহাও নিরূপণ করিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে ব্রজগোপীগণই সকলের মধ্যে প্রধান—? আর সেই ব্রজগোপীগণের মধ্যে শ্রীরাধিকাই বরীয়সী।

ইহা হইল তত্ত্বরাজ্যের বা সাধন রাজ্যের কথা। বাস্তবজীবনে এই ভক্ত-পূজার আবশ্যকতা কি তাহা আমাদের বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। ভগবৎ-আরাধনা অনেক সময়েই একটা কল্পনামাত্র হইয়া পড়ে। এমন লোক আপনারা দেখিতে পাইবেন যাঁহারা ভগবানের প্রতি কর্ত্তব্য অর্থাৎ মুকুন্দের আরাধনার আবশ্যকতা স্বীকার করেন, কিন্তু ভগবানের প্রতি কর্ত্তব্য থাকিলেই যে মানবের প্রতি বা জগতের প্রতি কর্ত্তব্য আছে তাহা

স্বীকার করেন না। (ভক্তের সেবা, মানবের সেবা বা জগতের সেবা এ তিনটি কথাই এক।) অনেকে শাস্ত্র পড়িয়াও তাহা স্বীকার করেন না। এমন কি শাস্ত্রের দোহাই দিয়া এই মোটা সত্যটাকে উড়াইয়া দিতে চাহেন। সম্ভবতঃ ইহার সহিত তাঁহাদের ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দতার সম্বন্ধ আছে। তাঁহারা দেখাইতে চাহেন ভগবদারাধনা যেন এক exclusive concern. প্রেমধর্ম্ম অধ্যাত্মসাধনার এই যে আদর্শ,—ইহার প্রতিবাদ। মানবের ধর্ম্মজীবন যথার্থ করিতে হইলে ভক্তপূজার আবশ্যক—কারণ এস্থলে আর ফাঁকি দেওয়া চলে না। প্রাচীন গ্রন্থে এমন উক্তিও আছে যে,

"মম ভক্তা হি যে পার্থ! ন মে ভক্তাস্তু তে মতাঃ।
মদ্ভক্তস্য তু যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥

যাহারা কেবল আমাকে ভক্তি করে আমার মতে তাহারা ভক্ত নহে—যাহারা আমার ভক্তের ভক্ত তাহারাই আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত।

সুতরাং ভক্তকে পূজা করিতে হইবে, ইহাই প্রেমধর্ম্মের প্রধান শিক্ষা। এই জগতে ও সমাজে আমরা বাহ্য আড়ম্বরের পূজা করিতেছি। উচ্চ বর্ণের লোক, পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিপ্রাপ্ত লোক, ধনী লোক, ইহারাই যে জগতের সকলের পূজার অর্ঘ্য প্রাপ্ত হইতেছেন, প্রেমধর্ম্মের প্রবর্ত্তকগণ সেই জগতকে বলিলেন যে মানবের বা জগতের গতি যদি আড়ম্বর ও ঐশ্বর্য্যের দিকেই থাকে তাহা হইলে ভগবদারাধনা একেবারে মিথ্যা। এখন ভক্তের পূজা আরম্ভ হউক। তাহা হইলেই হৃদয়ের পবিত্রতা ও পরার্থপরতাই জগতে সমাদৃত হইবে। জাতি কুল বিদ্যা ধন নহে—চরিত্রই একমাত্র উপাস্য হইবে। ভক্তপূজার ইহাই সাধারণ অর্থ।—

আমরা ভক্তপূজা বলিতে প্রথমতঃ প্রাচীনকালের যে সমস্ত ভক্ত তাঁহাদের ধারণা, ধ্যান, স্মরণ এবং তাঁহাদের আদর্শে আমাদের হৃদয়বৃত্তি, মনোবৃত্তি ও চরিত্রগঠন বুঝি, আর দ্বিতীয়তঃ আমাদের এই প্রত্যক্ষ পরিচয়ের মধ্যে যাঁহারা ভক্ত তাঁহাদের অনুরক্ত হওয়া বুঝি। ভক্তপূজা বলিতে যে এই দুটি দিকই বুঝায় তাহা শাস্ত্র-সম্মত। প্রথমাংশের বর্ণনা আপনারা শ্রীলঘুভাগবতামৃত গ্রন্থে পাইবেন। আমি পূর্ব্বে তাহার আভাস দিয়াছি। দ্বিতীয়াংশের বর্ণনা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে দক্ষিণ বিভাগে পাইবেন। সেখানে বলা হইয়াছে—"তদ্ভাবভাবিতস্বান্তাঃ কৃষ্ণভক্তা ইতীরিতাঃ।" অর্থাৎ কৃষ্ণভাবে ভাবিত চিত্ত

ব্যক্তিকে কৃষ্ণভক্ত কহে। এখন আমাদের জানিতে হইবে কৃষ্ণভাবে ভাবিত চিত্ত ব্যক্তি কিরূপ ? এই গ্রন্থেই তাহার পরিচয় আছে।

"যে সত্যবাক্য ইত্যাদ্যা হ্রীমানিত্যন্তিমা গুণাঃ।
প্রোক্তাঃ কৃষ্ণেঽস্য ভক্তেষু তে বিজ্ঞেয়া মনীষিভিঃ ॥"

অর্থাৎ সত্যবাক্য আদি করিয়া হ্রীমান্ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের যে সকল গুণের উল্লেখ আছে, শাস্ত্রকারগণ কৃষ্ণভক্তও সেই সকল গুণসম্পন্ন এইরূপ বলিয়া থাকেন। ভক্ত কে, তাহা যদি সত্য সত্য জানিতে চাহেন এবং প্রকৃত ভক্তের পূজা করিয়া স্বয়ং ধন্য হইতে ও এই দেশ, এই জাতি এবং এই জগৎকে শ্রীচৈতন্য কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্মের অনুবর্ত্তী করিতে চাহেন, তাহা হইলে এই প্রথম কথাটি কিছুতেই বিস্মৃত হইবেন না। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে, ভক্তের পরিচয় দিবার জন্য পরে অন্যরূপ কথা বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু এইটিই প্রথম কথা। যেমন মূলকে অবজ্ঞা করিয়া শাখা প্রশাখায় জল সিঞ্চন করা নিরর্থক, সেইরূপ এই প্রাথমিক কথাটি বিস্মৃত হইয়া মধুর কীর্ত্তন, অশ্রু-বর্ষণ, কম্পন, নৃত্য, বেশভূষা প্রভৃতিকে ভক্তের চিহ্ন বলিয়া গ্রহণ করিলেও সেইরূপ হইবে। অতএব সাবধান হইবেন।

যে গুণ গুলির নাম বলা হইল ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণ বিভাগের প্রথম লহরীর বর্ণনানুসারে তাহা এইরূপ।

১। সত্যকথা ২। প্রিয়ম্বদ ৩। বাবদূক ৪। সুপাণ্ডিত্য ৫। বুদ্ধিমান ৬। প্রতিভান্বিত ৭। বিদগ্ধ ৮। চতুর ৯। দক্ষ ১০। কৃতজ্ঞ ১১। সুদৃঢ়ব্রত ১২। দেশকাল সুপাত্রজ্ঞ ১৩। শাস্ত্রচক্ষু ১৪। শুচি ১৫। বশী ১৬। স্থির ১৭। দান্ত ১৮। ক্ষমাশীল ১৯। গম্ভীর ২০। ধৃতিমান ২১। সম ২২। বদান্য ২৩। ধার্ম্মিক ২৪। শূর ২৫। করুণ ২৬। মান্যমানকৃৎ ২৭। দক্ষিণ ২৮। বিনয়ী ২৯। হ্রীমান্।

শ্রীরূপ গোস্বামী বলিতেছেন—ভক্তচরিত্রে প্রথমেই এই গুণ গুলির বিকাশ হওয়া চাই। এই গুণ সমূহ লইয়া আমাদিগকে পরে আলোচনা করিতে হইবে—এখন কেবল দু একটি কথা বলিয়া রাখি। 'চতুর' এই কথাটি শুনিয়া সন্দেহ হইতে পারে—চতুর কথার অর্থ শাস্ত্রানুসারে

"চতুরো যুগবহুরি সমাধান কৃদুচ্যতে"

অর্থাৎ এককালে অনেককার্য্যের সমাধানকারীকে চতুর বলে।

অন্যান্য গুণ গুলি লইয়া আপনারা আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন যে ভক্ত সামাজিক জীবন যাপন করেন। সকলের সুখ দুঃখের সহিত সংশ্লিষ্ট

থাকাই ভক্তিসাধনার প্রথম ও প্রধান কথা। সামাজিক জীবনে সকলের সুখ দুঃখের অংশী না হইয়া, এই সমস্ত সদ্‌গুণ যাহাতে বিকশিত হয় সেজন্য চেষ্টা না করিয়া, কেবল চোখের জল ফেলিয়া প্রথম দুএকজন বড়লোককে হাত করিয়া, শেষে তাহাদের সাহায্যে কতকগুলি মিথ্যাবাদী শিষ্য পুষিয়া যাহারা ভক্ত হইয়া দেশের নিকট পূজিত হইতেছে—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার তাহারাই অন্তরায়।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে যে সমস্ত সদ্‌গুণের কথা বলা হইল, ভগবদ্গীতাতেও দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তিযোগে ঠিক সেই সব কথাই বলা হইয়াছে। গীতার মর্ম্ম লইয়াই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুকার প্রেমধর্ম্মের সাধনার যাহা ভিত্তি তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। গীতার নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

"অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্র করুণ এবচ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখ সুখঃ ক্ষমী॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধির্যোমদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষ ভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ।
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভ পরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ সমে প্রিয়ঃ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণ সুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গ-বিবর্জ্জিতঃ॥
তুল্যনিন্দা স্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়োনরঃ॥

এই গেল ভগবদ্গীতার উক্তি। এই সকল গুণ-সম্পন্ন যিনি তিনিই ভক্ত। আমরা পরে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব।—

বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে ভক্তকে কেন বড় করা হইল—ভক্ত কে তাহা বুঝিলেই তাহা জানিতে পারা যাইবে। He is the perfect man—and He is Divine—Divinity ও Humanity শ্রীকৃষ্ণ লীলায় ও শ্রীচৈতন্য লীলায় একত্রে মিলিয়াছে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে 'স্বয়ং ভগবান' বলা হইয়া থাকে। ব্রহ্মের পর পরমাত্মা, তাহার পর ভগবান, তাহার পর স্বয়ং ভগবান। এই কথা শুনিয়া অনেকেই বিচলিত হইয়া উঠেন। কিন্তু "ভক্ত" কি তত্ত্ব ইহা যিনি জানেন তিনি মোটেই বিচলিত হইবেন না।

যাহা হউক "ভক্ত" সম্বন্ধে আজ আর অধিক কথা আলোচনার প্রয়োজন নাই। অদ্য আমাদের ইহাই প্রতিপাদ্য যে "ভক্তানুগ্রহ" ও "ভুতানুগ্রহ" একই কথা। 'ভক্ত' সকলের সহিত এক হইয়া আছেন। 'শ্রীগুরুচরণে' নামক আমার অনূদিত একখানি গ্রন্থে—মানবের একটি অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ বলা হইয়াছে—"যিনি সাধনার পথ গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি নিজের জন্য জীবন ধারণ করেন না—তাঁহার জীবন অপরের জন্য! তিনি নিজেকে ভুলিয়া গিয়াছেন, অন্যের সেবার জন্যই তিনি নিজেকে ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি যেন পরমেশ্বরের হস্তের একটি লেখনী, তাঁহার মধ্য দিয়া পরমেশ্বরের চিন্তা জগতে বাহির হইয়া আসিতেছে"—ভক্তে ও ভগবানে অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ।

এইবার প্রশ্ন এই যে এই ভক্ত কে? মানুষই এই ভক্ত। আপনি আমি ঠিক মানুষ না হইলেও ভবিষ্যতের মানুষ—man in the making এইবার খৃষ্টীয় শাস্ত্রের কথা স্মরণ করুন God made man in his own image এইবার মানুষ ও ভগবান এ দুইয়ের সম্বন্ধ বুঝিতে পারিবেন। পূর্ব্বে ভক্তের কথা বলা হইল। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীরাধার কথা বলিয়া শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শ্রীমুখে ভক্তের ভাব বর্ণনায় নিম্নরূপ কথা প্রচারিত হইয়াছে।

"আমি কৃষ্ণ পদদাসী, তিঁহো রস সুখরাশি,
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাত।
কিবা না দেন দরশন, জারেন আমার তনুমন,
তবু তিঁহো মোর প্রাণনাথ ॥
সখি হে শুন মোর মনের নিশ্চয়।
কিবা আলিঙ্গন করে, কিবা দুঃখ দিয়া মারে,
মোর প্রাণেশ কৃষ্ণ অন্যনয়।
ছাড়ি অন্য নারীগণ, মোর বশ তনু মন
মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া।
তা 'সবার দিয়া পীড়া, আমা সনে করে ক্রীড়া,
সেই নারীগণে দেখাইয়া ॥
কিবা তিঁহো লম্পট, শঠ ধৃষ্ট সুকপট,
অন্য নারীগণে করি সাথ।
মোরে দিতে মনঃপীড়া, মোর আগে করে ক্রীড়া,
তবু তিঁহো মোর প্রাণনাথ ॥
না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিলে দুঃখ, তার হয় মহাসুখ
সেই দুঃখ মোর সুখ-বর্য্য ॥"

শ্রীশ্রীভগবচ্চিন্তালহরী।

বন্দনা।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীশ্রীসীতানাথ
অদ্বৈতপ্রভু, শ্রীবাস ও গদাধর, এই পঞ্চতত্ত্বস্বরূপ
শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জয় হউক ;

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্‌ ।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্‌ ॥

শ্রীশ্রীগৌরচরণ গোস্বামী জয়যুক্ত হউন, যিনি কৃপা করিয়া জ্ঞানরূপ অঞ্জন-শলাকার দ্বারা অন্ধজীবের প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত নেত্রদ্বয় প্রকাশ করেন, অর্থাৎ উভয়-দৃষ্টিবিহীন জীবের দৃষ্টি-শক্তি দান করেন, সেই গুরুকে আমি বন্দনা করি।

যাঁহার স্বরূপ চিন্ময় হইলেও প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় প্রকাশ পাইয়া মানবোচিত দীক্ষা দান করেন এবং অন্তর্য্যামী আপন স্বরূপে জীবকে দীক্ষিত করেন, সেই শ্রীগুরুকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। পতিতজনগণের উদ্ধারের নিমিত্ত যিনি সর্ব্বদা সযত্নে চেষ্টা করিতেছেন, সেই গুরুকে নমস্কার করি। যাঁহার পাদপদ্মরূপতরী আশ্রয় করিয়া, জীব মহাপাতকী হইলেও ভবসিন্ধু পার হইতে সক্ষম হয় এবং যিনি ভব-অন্ধকূপে পতিত জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত শ্রীশ্রীহরিনামরূপ রজ্জু ধারণ করাইয়া কূপ হইতে টানিয়া তুলেন, যাঁহার কৃপায় অজ্ঞব্যক্তিও ভগবৎ তত্ত্ব অবগত হইতে এবং প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় সেই

শ্রীগুরু আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। যিনি নিত্য শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অনুসঙ্গী এবং ব্রজলোকে সখীরূপে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত আছেন সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার করি। যাঁহার কৃপায় শ্রীশ্রীভগবৎচরণারবিন্দ পাইবার বাসনা মনোমধ্যে জাত হইলে অচিরেই জীব সেই বাসনানুরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার করি।

ঈশ্বর ভক্ত ইত্যাদি।

ঈশ্বরের ভক্তগণকে নমস্কার করি। যাঁহারা উচ্চ, নীচ, অর্থাৎ দেবদেহ, মনুষ্যদেহ, ও পশু, বানর, রাক্ষস, অসুর, জীবজাতি, উচ্চজাতি ভগবানের ভক্ত অভক্তরূপে পরিচিত হইয়া অর্থাৎ দেবরূপে ভববিরিঞ্চি, মনুষ্যরূপে ধ্রুব, শুকদেব, ব্যাসদেব এবং ভরত, উদ্ধব, অক্রূর, রুহিদাস, হরিদাস ইত্যাদি, পশুরূপে গজেন্দ্রাদি, বানর ইত্যাদি রূপে হনুমান, বিভীষণ, প্রহ্লাদ, অভক্তরূপে শিশুপাল, দন্তবক্র ইত্যাদি, ভক্তরূপে যুধিষ্ঠির, ভীষ্মদেব, সুধন্বা, উগ্রসেন ইত্যাদি, ভগবৎ-লীলা বিস্তার করতঃ ভগবদ্ভক্তি পথে যাইতে জীবকে শিক্ষা দান করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার করি।

অনন্তস্বরূপ।

শ্রীশ্রীঅনন্তস্বরূপ ভগবানকে নমস্কার করি। যিনি সর্ব্ব-প্রকারে স্ব-প্রকাশ হইয়াও ভক্তগণের ঐকান্তিকী ভক্তির রস আস্বাদনের জন্য অতি গোপনে অবস্থান করিতেছেন, সেই শ্রীশ্রীগোবিন্দ দেবকে নমস্কার করি। যিনি আদিপুরুষ হইয়াও নিত্য কৈশোররূপে প্রকাশিত হইয়া ভক্তগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেছেন, যিনি সর্ব্বকারণের কারণ ও অনাদির আদি, মৎস্য কূর্ম্মাবতারাদিগণের এবং পুরুষাবতার, যুগাবতার, মন্বন্তরা-

বতার, শক্ত্যাবেশাবতার, ভক্তাবেশাবতারগণের বীজস্বরূপ সেই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি। যিনি প্রাকৃত অপ্রাকৃত অর্থাৎ মায়াবিরাচিত স্বর্গমর্ত্ত্যাদি ধামে বৈকুণ্ঠ, গোলোক, দ্বারকা, মথুরা, শ্রীবৃন্দাবনে ভক্তগণের ভক্তির অনুরূপ দেহ প্রকাশ ও লীলাবিস্তার করিতেছেন, সেই শ্রীনন্দনন্দন ভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। যিনি প্রত্যেক সাধককে তাহার ভজনানুরূপ, শক্তি দেহ ও সেবা দান করেন অর্থাৎ শান্তরসের ভক্তির অধিকারীকে ব্রহ্মা, নারদ, ধ্রুব, প্রহ্লাদের ও দাস্য,সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের ভক্তগণকে সেই সেই সেবার উপযুক্ত নিত্য বয়স ও দেহ দিয়া থাকেন এবং স্বীয় সেবা-কার্য্যে তাহাদিগকে অনন্তরূপে আনন্দিত করিয়া সংসারবাসনায় উন্মত্ত জীবসকলকে এই শিক্ষা দান করিতেছেন যে তোমরা যদি একান্ত মনে বিষয়-বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাকে ভজনা কর, তবে পূর্ব্বোক্ত ভক্তসকলের ন্যায় সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া নিত্যদেহ লাভ করতঃ অনাদিকাল পর্য্যন্ত, আমার নিত্যধাম সকলে বাস এবং আপনার ভজনমত আমার সেবায় এবং স্মরণ মননে নিত্য নিত্য জন্ম, মরণ, জরা, ব্যাধি রহিত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিতে পারিবে। সেই মহাকৃপাসিন্ধু সর্ব্বারাধ্য শ্রীশ্রীগোবিন্দকে নমস্কার করি।

অবতার।

ভগবানের অবতার সকল জয়যুক্ত হউন। পুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদকশায়ী, দুগ্ধাব্ধিশায়ী ; গুণাবতার ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ; লীলাবতার মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, শ্রীরাম, বলরাম, বৌদ্ধ, কল্কি, এতদ্ব্যতীত যুগাবতার-গণ প্রতিযুগধর্ম্মের উপযুক্ত দেহ ধারণ করিয়াছেন অর্থাৎ সত্যে

ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে পরিচর্য্যা, কলিতে শ্রীহরিনাম প্রচার করিয়াছেন। মন্বন্তর অবতার, বিশ্বক্সেন ইত্যাদি, ভক্তাবেশঅবতার, নারদ, পৃথু ইত্যাদি। এই অসংখ্য অবতারগণকে প্রণাম করি।

প্রকাশ।

যিনি ব্রজধামে শ্রীমহারাসে ও দ্বারকায় মহিষী-বিবাহে আপন স্বরূপে বহুমূর্ত্তি হইয়া রাসলীলা ও বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, সেই গোবিন্দদেবের প্রকাশ মূর্ত্তিকে নমস্কার করি।

অঙ্গ।

বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ইত্যাদি ভগবানের অঙ্গরূপ প্রভু সকলকে নমস্কার করি।

শক্তি।

শ্রীরাধা ব্রজলোকে, কমলা সরস্বতী বৈকুণ্ঠে এবং দ্বারকায় রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি শক্তিগণকে নমস্কার করি।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু।

এই সমস্তের বীজস্বরূপ শ্রীশ্রীমহাপ্রভু, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, যিনি হরিনাম-বিতরণে মহাপাপীগণকে ঘোর নরক হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, যিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী হইয়াও অতি দীনভাবে যুগধর্ম্ম হরিনাম প্রচারে ব্যগ্র হইয়াছিলেন, যিনি বাসুদেব ব্রাহ্মণের কুষ্ঠ ব্যাধি দূর করাইয়াছিলেন, যিনি ব্যাঘ্র হস্তী এবং পক্ষী সকলকে কৃষ্ণনাম করিতে উপদেশ করতঃ শক্তি সম্পন্ন করিয়া কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন করাইয়াছিলেন, যিনি শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভৃতিকে সংসার বিষ্ঠাগর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, যিনি সর্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ষড়ভুজ মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়াছিলেন ও কাশীনিবাসী সন্ন্যাসী-

অগ্রগণ্য মহাপণ্ডিত প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে কৃষ্ণনাম মাহাত্ম্য ও কৃষ্ণ-প্রাপ্তি পরমপুরুষার্থ জানাইয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানের অল্পত্ব অর্থাৎ তাহাকে নীরস বলিয়া সপ্রমাণ করতঃ মহাকৃষ্ণ-প্রেমভক্তি যোগ ও কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তিদান করিয়াছিলেন এবং যিনি মদ্যপানাসক্ত কুকর্ম্মান্বিত জগাই মাধাই নামক বিপ্র-দ্বয়কে কৃপাপরতন্ত্র হইয়া শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীহরিদাস ঠাকুর মহাশয়ের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণনামদানে তাহাদের মনোমধ্যে চৈতন্য ভাবের সঞ্চার করতঃ নিজকৃত মন্দকর্ম্ম সকলে ঘৃণা বোধ করাইয়া মহাসাধুভাব প্রদান করিয়াছিলেন, সেই মহা-কৃপাসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, সাঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র পারিষদগণের সহিত যদি এই নরাধম জীবসমূহের প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তবে আমরা সকলেই পরম কৃতার্থতা লাভ করিতে পারিব। সেই অনন্তকৃপাসমুদ্রস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-দেবকে প্রণাম করি।

ভবতাপ।

ভবতাপ কাহাকে বলে, সেই তাপ জীবের পক্ষে কিরূপ দুঃখপ্রদ অর্থাৎ কষ্টদায়ক তাহা না জানিতে পারিলে কিরূপে জ্ঞানান্ধজীবসকলে সেই ভীষণ তাপ-নিবারণে যত্ন করিতে সমর্থ হইবে? অতএব আলোচনার আবশ্যক। প্রাকৃত জগতে সূর্য্যের ও অগ্নিরদ্বারা ও দেহের রোগাদি, অর্থনাশ, বন্ধুবিচ্ছেদ পুত্র শোকাদি দ্বারা এবং অপমান ইত্যাদির দ্বারা যে অসহ্য তাপ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা সেই সকল ঘটনায় না পড়িলে অর্থাৎ বাহিরে এবং অগ্নির নিকট না গেলে এবং দেহের রোগ, পুত্রশোক, অর্থনাশ, অপমান ইত্যাদি উপস্থিত না হইলে হয় না, হইলেও দিনান্তরে এবং কার্য্যান্তরে এই সকল তাপের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু ভবতাপ বড়ই ভীষণ, কোন অবস্থার পরিবর্ত্তনে বা প্রাপ্ত অপ্রাপ্তে, নিকট কি দূরবর্ত্তী হইলে, এমন কি দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া অধোগতি অর্থাৎ পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ স্থাবরাদি দেহ প্রাপ্ত হইয়াও এই মর্ত্ত্যলোকে জীব সমূহ দুষ্কর ভবতাপের যন্ত্রণা হইতে বিমুক্ত হইতে পারে না। সম্রাট কি তদধীনের কার্য্যকারক, উচ্চ, নীচ পদ প্রাপ্ত ব্যক্তিগণও এই ভবতাপ নিবারণ করিতে সমর্থ নহেন। শয়নে, স্বপনে, জাগ্রতে, শীতগ্রীষ্মাদিকালে, ভোজনে, উপবাসে, জলে, স্থলে, গৃহে, বনে, প্রবাসে অর্থাৎ জীব যে কোন অবস্থায়ই থাকুক না কেন, এই তাপ অনিবার্য্য। এই ভবতাপ কেবলমাত্র প্রাকৃত দেহ অধিকার করে না; চিন্ময় যে জীব, যিনি চৈতন্যস্বরূপ সেই আত্মাকেও স্বর্গাদিধাম পর্য্যন্ত

তাপিত করিয়া থাকে। যাহা আমরা অজ্ঞানতাবশতঃ সুখের বলিয়া মনে করিতেছি, সেই সেই কার্য্যেই জ্ঞানস্বরূপ আত্মা যে তাপিত হইতেছে ইহা আমরা সংসারআসক্তিপ্রযুক্ত চৈতন্য-ভাবের অভাবে বুঝিতে পারিতেছি না। যদি সৌভাগ্যক্রমে কোন সৎসঙ্গে ভগবৎচরণারবিন্দ বা তাঁহার নির্ম্মল চৈতন্য-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণনাম মনোমধ্যে প্রকাশ হয় তবে তাহার প্রভাবে চৈতন্য-দেহের স্মৃতি প্রাকৃতদেহের স্মৃতিপথে উদিত হইয়া থাকে। তখন জীব আপনাকে চৈতন্যময় জানিতে পারিয়া সেই ভবতাপ নিবারণের চেষ্টা করিতে যত্নবান্ হয়। ভবতাপে কি কি রূপে কোন্ কোন্ প্রকার যন্ত্রণা উপস্থিত হয় তাহাই কিঞ্চিন্মাত্র দিগ্‌দর্শন করা আবশ্যক। দেখুন যদি আমরা অধিক সময় বসিয়া থাকি বা বেড়াই, উভয় অবস্থাতেই তাপ বোধ হয়, যদি হস্তী অশ্ব বা যানারোহণে অধিক সময় থাকিতে হয় তবে আত্মা তাপিত হইয়া বিশ্রাম করিতে চায়। চিরদিন নিজালয়ে থাকিলে প্রবাসে যাইতে সুখ বোধ হয়, আর প্রবাসে থাকিলে নিজালয়ে আসিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু উভয় স্থানেই তাপ প্রাপ্ত হয়; কেহবা পুত্রশোকে তাপিত হয়. কেহবা পুত্র জন্মিলে সেই পুত্রের সুখ বাসনায় নানাবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া চৈতন্যময় আত্মাকে তাপিত করে; রোগে দুঃখে আত্মাকে তাপিত করে, তাহা সহজেই আমরা অনুভব করি কিন্তু সুখের অবস্থায় সেই তাপ যে উপস্থিত হয় তাহা বুঝিতে হইলে চৈতন্যভাব অর্থাৎ নিজে যে জ্ঞানস্বরূপ তাহা বুঝিতে হয়। যাঁহারা রাজকর্ম্মচারী বা রাজা ও বিচারপতি তাঁহারা যথাসময়ে রাজাসনে উপবিষ্ট হইয়া বিচারকার্য্য অসম্পূর্ণ-অবস্থায় রাখিয়া কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া থাকেন; তৎপরে নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত রাজকার্য্যে রত থাকিয়া বাসায় বা বাড়ীতে

আসিয়া সুস্থ হইবার জন্য পদচালন কিংবা অন্য উপায় দ্বারা অর্থাৎ গোলাপ জল ধারণ কিংবা বায়ুসেবন করিয়া শ্রান্তি দূর করেন। পরেও যে পর্য্যন্ত জাগ্রত থাকেন, সে পর্য্যন্ত যাহা বিচার করিয়াছেন তাহা সুচারুমত হইয়াছে কি না এবং পরদিন যাহা করিতে হইবে সেই চিন্তায় আত্মাকে তাপিত করেন। সম্রাট সর্ব্বদা রাজ্যশাসন ও রক্ষা এবং পররাজ্য হস্তগত করিবার জন্য সৈন্য-সংগ্রহ ও সৈন্যক্ষয় জন্য অর্থনাশ এবং উপার্জ্জন জন্য সর্ব্বদা জীবিতকাল পর্য্যন্ত আত্মাকে তাপ দিতে থাকেন, এবং মৃত্যু হওয়ার পূর্ব্ব এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রাকৃত দেহের যে পর্য্যন্ত স্মৃতি থাকে সেই পর্য্যন্ত রাজসুখ হইতে বঞ্চিত হইতেছেন বলিয়া জ্ঞানময় আত্মাকে তাপিত করিতে থাকেন। আত্মা কেন ভবতাপে তাপিত হয়? তাহার কারণ এই যে তিনি চৈতন্যস্বরূপ। এই পার্থিব রাজ্যাদি সুখভোগ অতি অকিঞ্চিৎকর অথচ পরিণামে দুঃখদায়ক। যখন আত্মা আপনাকে চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞানময় নিত্যানন্দ-পূর্ণ জানিতে পারেন তখন এই সংসারের রাজ্য সুখাদি সমস্ত মিথ্যা জ্ঞানে পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই ভবতাপ-নিবারণকারী শ্রীশ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম আশ্রয় এবং তাঁহার সুধাপূর্ণ রস শ্রীকৃষ্ণনাম আশ্রয় করিয়া সেই অনন্ত অমৃতরসপ্রদায়ক হরিনামামৃত পান করতঃ আত্মাকে অনন্ত ভবতাপ হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়া জীবিতকাল পর্য্যন্ত কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন এবং নামবলে দেহান্তেও কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করতঃ অনন্তকাল পর্য্যন্ত মহা আনন্দ অনুভব করেন। স্বর্গলাভ করিবার জন্য কঠোর ব্রত যজ্ঞাদি করিয়া আত্মা তাপিত হয়। স্বর্গলাভ হইলে অন্যের ভোগাদির উৎকর্ষতা দেখিয়া এবং স্বর্গচ্যুত হইবার সময় উপস্থিত হইলে মহাতাপিত হইতে হয়। আহার না করিলে

ক্ষুধায় এবং করিলে আহার্য্য বস্তু সকলের ও আহারের ন্যূনাধিক্যে নানা রোগে তাপ প্রকাশ পাইয়া থাকে; নিদ্রায় দুঃস্বপ্নপ্রযুক্ত তাপ উপস্থিত হয়, নিদ্রা না হইলে তাপ উপস্থিত হয়, তাহা সহজেই অনুভব করা যায়। সুখের অবস্থায় আরও সুখ লাভ করিবার জন্য ও প্রাপ্তসুখ নষ্ট হইবে বলিয়া আত্মায় ভবতাপের প্রকাশ হয়। ইহাতেই যাহা যাহা ভ্রান্তি-জ্ঞানের দ্বারা সুখের বলিয়া স্থির করি সেই সেই সুখই আত্মাকে ভবতাপ প্রদান করে।

নদী।

নদীতে নৌকা জলমগ্ন হইলে আরোহী সকলও জলনিমগ্ন হইয়া থাকে। যাহারা পারে স্ব স্ব প্রাণ রক্ষার জন্য সন্তরণ পূর্ব্বক তীরে উঠিয়া প্রাণ রক্ষা করে এবং বল থাকিলে অন্যকেও তীরে লইয়া যায়। যদি পরিচিত কোন ব্যক্তির বাটীর নিকট কাহারও নৌকা ডুবিয়া যায়, তবে সে ঐ পরিচিত ব্যক্তিকে ডাকিয়া তাহার সাহায্যে কূল প্রাপ্ত হয়। এই ভবসমুদ্রে জ্ঞানরূপ দেহতরী আশ্রয় করিয়া চিন্ময় আত্মা কুবাসনাবশতঃ তরীর সহিত পাপজলে নিমগ্ন হইয়া সন্তরণে অক্ষম হইলে এই ভবসমুদ্রের তীরেই তাহার চির-পরিচিত চিরবন্ধু ভগবানের নিবাসস্থল আছে, তাহা জানিয়া শক্তিহীন অবস্থায় সেই চিরবন্ধুর হরি, কৃষ্ণ ইত্যাদি নাম উচ্চারণে যদি সকাতরে ডাকিতে থাকে, তবে তিনি কৃপা করিয়া তীরে উঠাইয়া লইয়া গিয়া তাঁহার অনন্ত সুখময়ধামে অনন্তকালের জন্য নিজসেবায় নিযুক্ত করিয়া রাখেন। যদি এই চিরবন্ধুর নাম ধাম স্মৃতিপথে উদিত না হয়, তবে জীব অনাদি কালের জন্য পাপজলে নিমগ্ন হইয়া জন্ম মৃত্যু ইত্যাদি নানারূপ যাতনা ভোগ করিতে বাধ্য হয়।

শ্রীহরিনাম যজ্ঞ।

অশ্বমেধাদি অন্যান্য যজ্ঞে একজন মাত্র যজ্ঞকর্ত্তা হয়। সেই যজ্ঞস্থলে অগ্নির উত্তাপে কেহ নিকটে থাকিতে পারে না। যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইলে যাহার ফল স্বর্গাদি অকিঞ্চিৎকর সুখ-ভোগ-মাত্র, তাহাও লাভ হইবে কিনা কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে সমর্থ নহে। এমনকি শতঅশ্বমেধযজ্ঞকর্ত্তা ইন্দ্রকেও কল্পান্তে ইন্দ্রপদ-ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হইতে হয়। ধর্ম্ম-পুত্র যুধিষ্ঠির মহারাজের যজ্ঞে ভগবান্ যজ্ঞেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজের স্বর্গাদি ভোগের ফ-ানুসন্ধান ও নিজে সর্ব্বপ্রধান মান্য রাজা এই অভিমান থাকায় তাঁহার যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয় নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যুধি-ষ্ঠির মহারাজের প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন, পরে তিনি কৃপা করিয়া ফলানুসন্ধান ও যুধিষ্ঠির মহারাজের আত্মাভিমান দূর করিবার নিমিত্ত মুচীকুলোদ্ভব বৈষ্ণব চূড়ামণি শ্রীরুহিদাসকে ভোজন করাইলে যজ্ঞ সম্পন্ন হইবে বলিয়া উপদেশ করেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন দেখিলেন যে, যজ্ঞেশ্বর ভগবান্ ও অন্যান্য যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্র ও দেবতাসকল হইতেও শ্রীরুহিদাস প্রধান, তখন তাঁহার সমস্ত অভিমান দূর হইয়া গেল। পরে শ্রীরুহিদাসের ভোজনান্তে আপনার কৃত যজ্ঞের সফলতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ধনুর্ম্ময় যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া কংস মহারাজ নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা সকলেই অবগত আছেন; কিন্তু হরিনাম যজ্ঞ এইপ্রকার নহে। অগ্নি প্রজ্বলিত করতঃ ঘৃতাহুতি-দানে অগ্নির তাপের আধিক্য জন্মাইয়া স্থান ও নিকটবর্ত্তী ব্যক্তিগণকে তাপিত করিতে হয় না; আর যজ্ঞকর্ত্তাও একজন

মাত্র নির্দ্দিষ্ট থাকে না এবং মন্ত্রের উচ্চারণ ও বর্ণাশুদ্ধির অপেক্ষায় যজ্ঞও পণ্ড হইয়া যায় না। শ্রীহরিনাম-যজ্ঞ অতি সুস্নিগ্ধ রসপূর্ণ, এই মহাযজ্ঞ, যত সংখ্যক যজ্ঞকর্ত্তা হউক না কেন একত্র বসিয়া যজ্ঞ করিতে থাকে এবং নিকটে অর্থাৎ এই যজ্ঞের ধ্বনি যতদূর যায় ততদূর পর্য্যন্ত স্থান ও মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, স্থাবরদেহধারী বৃক্ষাদি পর্য্যন্ত সুশীতল হইয়া থাকে। এমন কি বহুদূরে যদি এই মহাযজ্ঞের প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়, সেস্থানের সহিত তাহারা সুস্নিগ্ধ হইয়া থাকে। এই মহাযজ্ঞের ফলস্বরূপ যজ্ঞে যে প্রেমরস উৎপন্ন হয়, যজ্ঞকর্ত্তাগণ তাহা পান করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই লাভ করিতে সমর্থ হন এবং সংসার বাসনা বিদূরিত করতঃ সদেহে মুক্তিলাভ করেন। দেহান্তে শ্রীশ্রীভগবৎধামে ভগবানের পারিষদ সকলকে দর্শন করিয়া এবং ভগবানের সেবাসুখ লাভ করতঃ অনন্তকাল পর্য্যন্ত বাস করিতে থাকেন। তাঁহারা আর কখনও সংসারে আসিয়া জন্ম মৃত্যুরূপ অসংখ্য যাতনা ভোগ করিতে বাধ্য হন না। শ্রীহরিনাম যজ্ঞের সহিত গোমেধ, অশ্বমেধাদি কোন প্রকার যজ্ঞেরই সমানোর্দ্ধ বা কোন অংশেরই সঙ্গে তুলনা করিতে গেলে সেই কথা জনসমাজে হাস্যাস্পদ হইয়া উঠে; যেমন সম্রাটের সহিত সাধারণ ব্যক্তির কোন কথা তুলনা করিলে হাস্যাস্পদ হয়। মরুত রাজার যজ্ঞের কথা কে না জানে? সেই যজ্ঞে সর্ব্বভক্ষ্য হুতাশনেরও মন্দাগ্নি জন্মিয়াছিল; সেই মহারাজের অদ্য পর্য্যন্ত জগতে কোনরূপ চিরস্থায়ী কীর্ত্তি দৃষ্ট হয় না এবং তিনি তাদৃশ যজ্ঞ করিয়াও শ্রীবৈকুণ্ঠ কি ভগবানের কোন ধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। কিন্তু শ্রীহরিনাম-যজ্ঞকর্ত্তা ব্রহ্মা, মহাদেব, নারদ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ ইত্যাদি মহাপুরুষগণের মহতী কীর্ত্তি, আর তন্মধ্যে কেহ কেহ বা

ঈশ্বরসদৃশ, কেহ কেহ বা ভগবানের দাসানুদাসরূপে সত্য-লোকাদি স্থানে বাস করিতেছেন এবং ভগবৎচরণারবিন্দ যজ্ঞ-ফলে লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অদ্যাবধি সেই মহাপুরুষ-গণের মহাসংকীর্ত্তি গান করতঃ ভবতাপে তাপিত মহাপাপী জীব সকলও কৃষ্ণোন্মুখ হইয়া পরমশান্তি লাভ করিতেছে। অন্যান্য যজ্ঞে দেশ, কাল, পাত্র, শুচি, অশুচি, জাতি ইত্যাদির অপেক্ষা করে, অর্থাৎ কোন বিষয়ের ত্রুটি হইলে অর্থাৎ যজ্ঞ-স্থলে কুক্কুরাদি প্রবেশ করিলে যজ্ঞ নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু শ্রীহরিনাম মহাযজ্ঞে কিছুরই অপেক্ষা করে না, নীচ উচ্চ জাতি, পবিত্র অপবিত্র স্থান, দেশ কাল, রাত্রি কি দিবা, শুচি কি অশুচি, স্ত্রী, পুরুষ, বাল, বৃদ্ধ, যুবা, চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ সকলেই সকল অবস্থাতেই একত্র হইয়া কিম্বা পরস্পর পৃথক হইয়া মহাযজ্ঞ করিবার যোগ্য হয়। শুচি কি অশুচি দেহধারী কোন প্রকার জীবের প্রবেশে বা স্পর্শে এই মহাযজ্ঞ নষ্ট বা অপবিত্র হয় না। অথচ অন্যমন্ত্রের বা ক্রিয়ার অপেক্ষায় সম্পন্ন বা অসম্পন্ন হয় না; যেহেতু এই কৃষ্ণনাম সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন মহামন্ত্র স্বরূপ। অন্য যজ্ঞ-সকল তৎক্ষণাৎ ফলদানে সমর্থ হয় না, কিন্তু শ্রীহরিনামযজ্ঞ আরম্ভ করিবামাত্রই প্রেমামৃতরস যজ্ঞের ফলস্বরূপ উৎপন্ন হইয়া থাকে! সেই রস শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। তাহা পানও করিতে হয় না, যেহেতু আত্মাতেই উৎপন্ন হইয়া আত্মার সহিত মিলিত হইয়া মন, বুদ্ধি, চিত্ত, এবং ইন্দ্রিয়াদিকে চৈতন্যভাবে প্রবর্ত্ত করাইয়া দেয়। তখন ইহাদের চৈতন্যভাবের সাহায্য লাভ করিয়া জীব ভগবানের নিত্যধামে তাঁহার অভয় চরণারবিন্দ লাভ করতঃ মহাশান্তি লাভ করিয়া থাকে। এই যজ্ঞের মহিমার কথা ক্ষুদ্র হইয়া কে কি বলিবে? বেদবিধি পর্য্যন্ত বহুকাল অনুসন্ধান করিয়াও সীমাপ্রাপ্ত হয় না। এই

যজ্ঞের মহিমা অনন্ত! সৌভাগ্যক্রমে এই মহাযজ্ঞ যদি কোন জীব আরম্ভ করে তবে সেই যজ্ঞের মহিমা তিনি শ্রীহরিনামের কৃপায় জানিতে ও জানাইতে সমর্থ হয়েন।

জীবের সংসার বন্ধন।

সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ভগবানের নিজ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় যখন ক্রিয়া করিতে ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হইল, তখন তিনি জীবশক্তি ও মায়াশক্তির প্রতি দৃষ্টি করায়, সেই দুই শক্তি নিজ শরীর হইতে পৃথক হইল। মায়াশক্তি জড় বলিয়া তাহাতে বীর্য্যদান করিয়া মায়াকে অন্য বস্তু উৎপাদন করিতে শক্তিবতী করিলেন। জীবশক্তি চৈতন্যময় হইলেও কোন ক্রিয়া করিতে অসমর্থ দেখিয়া তাহাকে চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয় পঞ্চতন্মাত্রা ও সত্ব, রজঃ তমঃ এবং ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া ও মহৎতত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বে জীবকে ক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন করিলেন। উভয় শক্তিকে শক্তিসম্পন্ন করিয়া এই আদেশ করিলেন, তোমরা উভয়ে আমার ইচ্ছানুরূপ নিজ নিজ শক্তি-অনুসারে ক্রিয়া কর। ভগবানের ইচ্ছানুরূপ প্রিয়-কর্ম্মে স্বীয় স্বীয় শক্তিমতে উভয়েই যত্নবান্ হইলেন। অর্থাৎ মায়াশক্তি জীবের মোহ উৎপাদনের জন্য তাহার ইন্দ্রিয়সকলের যথাযোগ্য ভোগ্যবস্তু সকল অন্যপ্রকার উৎপাদন করতঃ আপনার শক্তির প্রাধান্য দেখাইবার জন্য যথাসাধ্য-মতে নিজশক্তির বিস্তার করিলেন, অর্থাৎ যাহা যাহা দেখিয়া শুনিয়া ভোগ করিয়া জীবশক্তি মোহপ্রাপ্ত হয় তাহারই ব্যবস্থা করিলেন। জীবশক্তিও ঈশ্বরদত্ত শক্তিতে শক্তিসম্পন্ন হইয়া অনন্তমূর্ত্তি ধারণ করতঃ ভ্রান্তিবশতঃ অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া মিথ্যাদেহে আপন স্বরূপ-জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে মায়াশক্তি হইতে যেসব বস্তু অর্থাৎ স্ত্রী, ফল, ফুলাদি, মধুর, অম্লাদি, উদ্যান, পর্ব্বত, নদী, সুমিষ্ট শব্দ ইত্যাদি ভোগ্যবস্তু সমূহকে

অনন্ত সুখের বোধ করতঃ ভোগে প্রবৃত্ত হইয়া একেবারে চৈতন্যভাবের স্মৃতি বিনষ্ট হইয়া ভোগ্যবস্তু লা- বাসনায় এবং ভোগে নানাপ্রকার পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া অনাদিকাল পর্য্যন্ত পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, স্থাবর ইত্যাদি দেহ ধারণ করতঃ রোগ, শোক, জন্ম,মৃত্যু ইত্যাদি অনন্ত দুঃখে অনন্তকাল পর্য্যন্ত কষ্টভোগ করিতে বাধ্য হইল। মায়াশক্তি ও জীবশক্তি পরস্পরে এইরূপ ভাবে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনের জন্য স্বীয় স্বীয় শক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল যে কেহ যেন কাহাকে পরাজয় করিতে না পারে। জীব যদিও মায়া নির্ম্মিত বস্তু সকল ভোগ করতঃ পাপাচরণ করিয়া নানাদেহ ধারণ করিতেছে কিন্তু নিজ শক্তিবলে দুঃখের সেই সেই অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছে, মায়াও পুনঃ পুনঃ তাহার অবস্থান্তর দেখিয়া তাহাকে বার বার নিজশক্তির প্রাধান্য দেখাইলে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন হইবে বলিয়া জীবকে যথাসাধ্যমতে আক্রমণ করিতেছে। মায়াশক্তি জড়রূপা বলিয়া তাহার অনন্তকাল এই কার্য্য করিতে কোন কষ্ট হইতেছে না। কিন্তু জীব শুদ্ধ চৈতন্যময় হইলেও বিপর্য্যয় জ্ঞান উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও নিজের দুঃখ অনুভব করিবার শক্তি হ্রাস হয় নাই।

যখন জীব দেখিতে পাইল ও বুঝিতে পারিল যে মায়ার আক্রমণ বড়ই ভীষণ কষ্টদায়ক, এবং মায়ার হাত হইতে নিজের শক্তিতে দুঃখ নিবারণ করিতে আমি শক্তিহীন, তখন সে আপনার উদ্ধারার্থে চিন্তা করিতে বাধ্য হইয়া পূর্ব্বস্মৃতি অর্থাৎ ঈশ্বরেচ্ছায় যে তাহারা নিজ নিজ বলের প্রাধান্য দেখাইবার জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়াছিল, পরে অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া চৈতন্যভাব হইতে বিচ্যুত হওয়াতেই মহাকষ্টের কারণ ঘটিয়াছে

জানিয়া সেই ভগবানের কৃপার সাহায্য লইয়া এই মায়ার হস্ত হইতে বিমুক্ত হইবার একমাত্র কারণ বুঝিতে পারিয়া শ্রীকৃষ্ণ-নাম-কীর্ত্তন এবং ভগবানের স্মরণ ও তাঁহার দাসের সঙ্গ করিয়া মায়ার হস্ত হইতে আপনাকে উদ্ধার করতঃ ভগবানের পাদপদ্ম লাভ করিয়া অনন্তসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিল। ভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় ও তাঁহার দাসের সঙ্গ, নামকীর্ত্তনাদি না করিলে এই মায়ার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে কেহই সমর্থ হয় না। মায়া-নির্ম্মিত অনন্ত প্রকার বস্তু ভোগের নিমিত্ত জীবশক্তি অনন্তভাগে বিভক্ত হইয়া যে ভোগে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহার কোন অংশ মনুষ্যশরীর প্রাপ্ত হওয়াতে পূর্ব্বস্মৃতি অর্থাৎ নিজে যে শুদ্ধসত্ত্ব চৈতন্যময় এবং ভগবানের পাদপদ্ম যে তাহার চির আশ্রয় ও পরমানন্দদায়ক তাহা নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়া এই মহাচৈতন্যময় স্মৃতি লাভ করতঃ মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া চৈতন্যভাবে অবস্থিতি করে। সেই মুক্তজীব স্বীয় অপরাংশ সকলকে এই শিক্ষা দান করে যে তোমরা যদি মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হইয়া ভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয়, স্মরণ ও মনন এবং তাঁহার শ্রীহরিনাম প্রেমভক্তিভাবে সংকীর্ত্তনাদি না কর, তবে অনন্তকাল নানাগতিকে দেহ ধারণ করিয়া বলবতী মায়ার প্রতারণায় বাধ্য হইয়া নানাপ্রকার যাতনা ভোগ করিতে হইবে। অতএব মনুষ্য শরীরে স্বীয় স্বীয় জ্ঞানের দ্বারা ভগবানের যে কোন বিষয়ই হউক অর্থাৎ অর্চ্চনা, বন্দনা, স্মরণ, পদসেবা, শ্রবণ, কীর্ত্তন, দাস্য, সখ্য, আত্মসমর্পণ, বৈষ্ণব সেবা, তুলসী সেবা ইত্যাদির মধ্যে যাহাতেই মনের অভিরুচি জন্মে তাহা প্রাণপণে সাধন করিয়া মায়াকর্ত্তৃক দুঃসহ যাতনা হইতে সকলেরই আত্মত্রাণের চেষ্টা করা উচিত।

সংসার অন্ধকূপ।

সংসার অন্ধকূপ, কথামাত্র শুনা যায়। তাহাতে কিরূপ দুঃখ ভোগ করিতে হয় ও কিরূপে তাহা হইতে মুক্তিলাভ করা যায় তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনার আবশ্যক। অন্ধকূপে দল, দাম, পানা ইত্যাদি জলকে দূষিত করে। তন্মধ্যে পতিত ব্যক্তির নিজের যত্নে তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার কোন উপায় নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে অসাবধানতাবশতঃ যে তাহাতে পতিত হয়, কেহ উপরে না তুলিলে সেই দূষিত জলে নানাকষ্টে থাকিয়া জীবনান্ত হইলে সেই যাতনা হইতে সে নিষ্কৃতি পায়। কিন্তু ভবকূপ সেইরূপ নহে, তাহাতে অহঙ্কার অভিমানাদির বশবর্ত্তী হইয়া ঈশ্বর-স্মৃতির অভাবে যদি পতন হয়, তবে জীব অনন্তকাল এইকূপে নানা যাতনা ভোগ করিতে থাকে। এই ভবকূপ মধ্যে যে দুঃখপ্রদায়ক মায়াকল্পিত ভোগ্যবস্তু সকল জলরূপে আছে তাহা প্রীতির সহিত ভোগ করিয়া সীমারহিত ভবকূপে জীব নানারূপ দেহ ধারণ করতঃ নানাপ্রকার রোগ, শোক, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি দুঃখের অনন্তকাল পর্য্যন্ত ভাগী হয়। তথাপি স্বয়ং উঠিয়া যাওয়ার কথা দূরে থাকুক উঠিবার চেষ্টা পর্য্যন্তও তাহার মনোমধ্যে উদয় হয় না। মনুষ্যশরীর পাইয়া সৌভাগ্যক্রমে যদি ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম মনে পড়ে অর্থাৎ নিজে যে কৃষ্ণের নিত্যদাস ইহা মনোমধ্যে উদয় হয় তবে এই ভবকূপস্থিত বস্তুসকলের ভোগের প্রতি অনাসক্তি জন্মিলে ভোগ্যবস্তু সকল তাহার অপ্রিয় ও দুঃখদায়ক বলিয়া বোধ হইতে থাকে। তথাপি সে স্বয়ং ভবকূপ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে না, তখন নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে! দুঃখে পড়িলেই ভগ-

বনের স্মৃতি মনোমধ্যে জাত হয়; সেই স্মৃতি দ্বারা ভগবানের কৃপা-দৃষ্টি ভবকূপে পতিত জীবের প্রতি পতিত হয়। তখন ভগবান্ কৃপাবশতঃ স্বয়ং বা গুরুরূপে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণনামরূপ রজ্জু তাহাতে নিক্ষেপ করেন, শক্তি থাকিলে এই রজ্জুকে দৃঢ়-রূপে ধারণ করিলে ভগবান্ তাহাকে দুঃখময় ভবকূপ হইতে উদ্ধার করিয়া আপনার অনন্ত সুখময় শ্রীপাদপদ্মের নিকট লইয়া যান। যদি কূপ-পতিত ব্যক্তি শক্তিহীনতা প্রযুক্ত এই হরিনাম-রূপ রজ্জুকে ধারণও না করিতে পারে তবে ভগবান্ তাঁহার কৃপারূপ আসনের চারিকোণে প্রথমতঃ শ্রীহরিনাম, দ্বিতীয়তঃ ভক্তি, তৃতীয় প্রেম, চতুর্থে তাঁহার সেবা এই চারি রজ্জু-বিশিষ্ট আসনে পতিত ব্যক্তিকে বসাইয়া উপরে তুলিয়া লন। ভগবান্ অনন্তপ্রকারে কৃপা প্রকাশ করিতেছেন ও করিবেন। আমরা বুঝিতে না পারিয়াই এই মহাকষ্টদায়ক ভবকূপে থাকিয়া নানাপ্রকার দুঃখ ভোগ করিতেছি। যদি তাঁহার পবিত্র লীলা, যশঃ, শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনাদি করিতে পারি তবে যে অনায়াসে এই ভবকূপ হইতে উদ্ধার হইতে পারিব, তাহাতে আর কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই।

কারাগার।

সাধারণ রাজার কারাগারে মনুষ্যসকল নানাবিধ কুকর্ম্ম অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্যের অধীন হইয়া নানা অন্যায় আচরণ করতঃ কেহবা নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত, কেহ বা জীবন পর্য্যন্ত বদ্ধ হয় ,কোন কোন ব্যক্তি বায়ু-গ্রস্ত হইয়া উন্মত্ত অবস্থায় বদ্ধ হয়। এই কারাগারে যথাসময়ে দ্বার রুদ্ধ ও মুক্ত হয়! রাজনিযুক্ত প্রহরীসকল সর্ব্বদা দণ্ডহস্তে দণ্ডায়মান থাকিয়া দিবারাত্রি এমন অবস্থায় থাকে যে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিসকল যেন পালাইয়া যাইতে না পারে। মহারাজেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই সংসার কারা-গার তাদৃশ নহে। সাধারণ রাজার কারাগারে বদ্ধ জনসমূহ আপনাদের কৃতকার্য্যের ফলস্বরূপে বদ্ধ হইয়া কষ্ট পাই-তেছে। কিন্তু কবে মুক্ত হইলে আর কষ্ট পাইতে হইবে না তাহা বুঝিতে পারে, কিন্তু ভগবানের কারাগারে বদ্ধ জীব সকল ইহার কিছুই বুঝিতে পারে না। এই কারাগারে যে বদ্ধ হইয়া নানাপ্রকার কষ্ট পাইতেছে ও কারাগারের দ্বার কোথায় এবং কতকাল এই কারাগারে বাস করিতে হইবে, দ্বার কি প্রকারে বদ্ধ থাকে এবং মুক্ত হয় ও প্রহরী কিরূপে রক্ষা করিতেছে তাহা কিছুতেই অবগত হইতে পারে না! সাধারণ রাজার কারাগারে বদ্ধ উন্মত্ত ব্যক্তি-সকলের ন্যায় সংসারকারাগারে বদ্ধ জীব সকল কোথায় ছিল, কোথায় আছে, কোথায় যাইবে, সুখে কি দুঃখে, বদ্ধ কি মুক্ত অবস্থায় আছে, মোহমদিরা পান করতঃ নিজে চৈতন্যভাবের স্মৃতিভ্রষ্ট হইয়া উন্মত্তের ন্যায় নানা কষ্টদায়ক কর্ম্ম ও ভোগ্য বস্তুসকল আনন্দের সহিত ভোগ

করিয়া কারাগারে বদ্ধ থাকিবার সময় পুনঃ পুনঃ নিজ কর্ম্ম ও ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতেছে। সাধারণ রাজার কারাগারে বদ্ধ মনুষ্য নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত কারাদণ্ড ভোগ করিলেই মুক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু দণ্ড-কর্ত্তার নাম কীর্ত্তন বা স্মরণ করিলে মুক্ত হইতে পারে না। ভগবান্ রাজরাজেশ্বরের কারাগারে মুক্তির সময় নির্দ্দিষ্ট না থাকিলেও অনায়াসে তাঁহার নাম কীর্ত্তন ও রাতুল পাদপদ্ম স্মরণের দ্বারা মুক্ত হওয়া যায়। অপত্তি হইতে পারে যে উন্মাদের স্থায় ব্যক্তিসকল সমস্ত স্মৃতি-ভ্রষ্ট হইয়া ভগবানের শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনও তাঁহার স্মরণ করিতে কিরূপে সমর্থ হইবে? সাধারণ নৃপ তাঁহার কারাবদ্ধ মনুষ্যের মুক্তির জন্য নিজে বা অন্তের দ্বারা কোন চেস্টাই করেন না। কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই সংসার-কারাগারের মহাকৃপালু অধীশ্বর। তিনি স্বয়ং গুরুরূপ ধারণ করিয়া কারারুদ্ধ জীবসকলকে কারামোচন হইবার মহামন্ত্র শ্রীকৃষ্ণনাম প্রদান করেন। এই মহামন্ত্র সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন। যত প্রকার আসক্তি বদ্ধাবস্থায় থাকুক না কেন, তাহা হইতে মুক্ত করতঃ ভবকারাগারে স্বীয় কৃত কার্য্যের দণ্ডভোগের সময় অনন্ত হইলেও জগতে নিজ শক্তি দেখাইবার নিমিত্ত ভবকারাগার হইতে জীব সকলকে মুক্ত-করিয়া তিনিই যাহার নাম তাহার নিকট লইয়া যান। পুনরায় সেই জীব সকল আর কস্মিন্‌কালেও অনন্ত দুঃখদায়ক ভব-কারাগারে বদ্ধ হয় না।

প্রেমরস।

জগতে যত প্রকার রস আছে সমস্তই মায়াকল্পিত। বৃক্ষের ফলফুল ও গো, মহিষাদি হইতে যে রস উৎপন্ন হইতেছে তাহা কেবলমাত্র জল। জল স্বীয় স্বভাবে থাকিয়া রসদান করিলে সেও মায়াকল্পিত। এই সকল রস-ভোগের আধিক্যে নানারূপ কষ্ট উপস্থিত হইয়া থাকে। এক রসে অন্য রসের তৃষ্ণা বাড়িয়া যায় অর্থাৎ অম্ল বা তিক্তরস আস্বাদন করিলে মিষ্টাদি রসের তৃষ্ণা বাড়িয়া যায়। কোন রসেই অন্য রসের আশা নিবৃত্তি করিতে পারে না। মায়িক জগতে কোন কোন রসে উত্তেজনা-শক্তির বৃদ্ধি করিয়া জীবকে কাম ক্রোধাদির বশীভূত করিয়া দেয়, কোন রস বা শরীরের বলহানি করতঃ মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটাইয়া থাকে। কিন্তু শ্রীশ্রীভগবৎপ্রেমরস সেইরূপ নহে; ইহা অতি সুশীতল ও চৈতন্যময়। সৌভাগ্যক্রমে যদি ভগবানের লীলা, গুণ, শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনাদি দ্বারা জীব ঐ প্রেমরস প্রাপ্ত হয় তবে তাহার আর কোনরূপ মায়িক জগতের রসের প্রতি তৃষ্ণা থাকে না। কেবলমাত্র শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-চরণারবিন্দ লাভ করিবার তৃষ্ণা বলবতী হইয়া উঠে। এই মহারস পান করিলে আর কখনও ভবতাপে তাপিত হইতে হয় না। এই রস প্রাকৃত দেহের জন্ম, মৃত্যু রূপ ভয় ইত্যাদি নানা কষ্টের কারণ সকলকে নষ্ট করিয়া থাকে; চৈতন্যময় যে জীব তাহাকে চৈতন্যকরতঃ ভগবৎ-চরণারবিন্দ লাভ করাইয়া অনাদিকালের জন্য পরমা শান্তি দান করে।

জগতে প্রণাম।

আমাদের এই বর্ত্তমান জ্ঞানের দ্বারা কেবলমাত্র এই পর্য্যন্তই বুঝিতে পারি যে ইনি ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উত্তম জাতি ও উচ্চপদপ্রাপ্ত ব্যক্তি, ইনি গুরুব্যক্তি, ইঁহাকে মান্য করা উচিত। কিন্তু যাহারা নীচজাতীয় বা লঘু-সম্পর্কীয় তাহাদিগকে মান্য করা উচিত নহে। পশু, পক্ষী, কীটাদিকে প্রণাম করার কথা তো মনেই উদ্দীপিত হয় না। কিন্তু দেব-দেব মহাদেব দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করিলে ব্রহ্মা মহাদেবকে বলিয়াছিলেন আপনার শ্বশুর আপনার মাননীয় পাত্র, তাঁহাকে অমান্য করা আপনার সঙ্গত হয় নাই। এই প্রশ্নের উত্তরে উমাপতি মহেশ্বর বলিয়াছিলেন যে আমি এই জগতে সমস্ত উচ্চ, নীচ, দেব, মনুষ্য, যক্ষ, রক্ষ, বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি দৃশ্যাদৃশ্য সকল প্রাণীকেই ভগবানের সত্ত্বা জ্ঞানে প্রণাম করিয়া থাকি। কিন্তু জীব সেই মহাজ্ঞান লাভে সমর্থ নহে। যেহেতু সে মায়ামুগ্ধ। বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে আমরা আপনা হইতে অন্যদেহধারী সকলকে নীচ মনে করি; কিন্তু তাহাদের মধ্যে সকলেরই শক্তি আমাঅপেক্ষা অধিক। ইহার কিঞ্চিম্মাত্র উল্লেখ করা যাইতেছে, তাহা হইলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে কেহই আমা হইতে নীচ নহে। পক্ষী সকল আকাশে উড়ে, কীটাদি মৃত্তিকা ও প্রস্তরগর্ভে বাস করিতে সমর্থ, জলচর সকল জলে বাস করিতেছে, পক্ষবিশিষ্ট কোন কীট অন্য কীটকে ধারণ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে স্বীয়রূপের অনুরূপ দেহ ধারণ করাইতেছে। বৃক্ষ সকল এই মৃত্তিকার রস গ্রহণ করতঃ মধুরাম্লাদি রস ও পুষ্পাদি প্রসব করিয়া অসীম সুখদান করিতেছে।

সকলেই ঈশ্বরের কৃপানুসারে একের অপেক্ষায় অন্যের শক্তির আধিক্য দেখাইতেছে। আমরা মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়াছি বলিয়া যে দেহাভিমানবশতঃ মনে করিতেছি আমরা সকল প্রাণী হইতেই উচ্চ, তাহা ভ্রম মাত্র। কারণ গীতাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন যে হে অর্জ্জুন! তুমি যাহা দেখিতেছ তৎসমস্তই আমি ও আমাতে সমস্তই আছে। যেহেতু এই দৃশ্যমান জগৎ আমারই একাংশমাত্রে স্থিত। আমরা দেহাভিমানে আমাদের মহাজ্ঞান ভ্রষ্ট হওয়াতে ভগবানের সেই মহা-উপদেশ বাক্যে বিশ্বাস না করিয়াই মোহবশতঃ ভেদ দৃষ্টে জগতের উচ্চ, নীচ সকলকে মান্য করিতে অসমর্থ হইতেছি। যখন চৈতন্যভাব প্রাপ্ত হওয়া যাইবে তখন এই জগতের কোন দেহধারীকেই উচ্চ, নীচ বলিয়া বোধ হইবেনা। কেবল মায়া-নির্ম্মিত দেহ সকলে একমাত্র ভগবান প্রাকৃত লোকের মন বুদ্ধির অগোচরে দেহীরূপে গোপনে বাস করিতেছেন, এই মহাতত্ত্ব জীবের চৈতন্যভাবেই গোচর হইয়া থাকে। তখন সেই জীব ভেদ দৃষ্টি না করিয়া সমভাবে উচ্চনীচ সকলকেই ঈশ্বরের অংশ জানিতে পারিয়া জগতের সমস্তকেই প্রণাম করিতে বাধ্য হন!

অতিথিশালা।

কাহারও অতিথিশালায় কেহ উপস্থিত হইয়া আতিথ্য স্বীকার করতঃ ভোগ্যবস্তু ও থাকিবার স্থান ও শয্যা উত্তমরূপে প্রাপ্ত হইয়া সুখে ভোজন ও নিদ্রা করতঃ সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করে। রজনীপ্রভাতে, স্বয়ং উপস্থিত হইয়াই কর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ কি নামাদি জিজ্ঞাসাকরতঃ সুখে রহিলাম বলিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে, পরে নিজ উদ্দেশ্যস্থানে চলিয়া যায়। নির্ব্বোধ অতিথি হইলে কর্ত্তার সহিত দেখা কি নাম পর্য্যন্ত জ্ঞাত না হইয়াই চলিয়া যায়। কিন্তু পরে স্থানান্তরে গিয়া তাঁহার নামকীর্ত্তন কি স্মরণে কোন ফলপ্রাপ্ত হয় না। আমরা সংসাররূপ ভগবানের অতিথিশালায় অজ্ঞানাবস্থায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার দত্ত জ্ঞানে জ্ঞানবান্ হইয়া যথাযোগ্য কালোচিত অর্থাৎ বাল্য, যৌবন, বৃদ্ধ অবস্থাতে যথাযোগ্য ভগবানের দেওয়া বস্তু সকল ইচ্ছানুরূপ ভোগ করিয়া এবং শুশ্রূষা পাইয়া অতিথিশালার কর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করার কথা দূরে থাকুক বাস করা কি যাওয়ার সময়ও তাঁহার নাম পর্য্যন্ত জানিতে ইচ্ছা করিলাম না। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইবার কথাতো মনেই হয় না। সাক্ষাৎ না করিয়াও তাঁহার পবিত্র শ্রীহরিনাম থাকার সময় কিংবা যাওয়ার সময়ও যদি অবগত হইয়া যাইতে পারি তবে কর্ম্মবশে যে স্থানেই যাই না কেন, তাঁহার মঙ্গলময় শ্রীকৃষ্ণনাম ইত্যাদি স্মরণ ও কীর্ত্তনের দ্বারা পরমশান্তি লাভ করিতে পারিতাম। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে তাঁহার দত্ত বস্তুসকল ইচ্ছানুরূপে যথাযোগ্য সময়ে ভোগ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে পরমানন্দে

কাল কাটাইলাম। অজ্ঞানবশতঃ কোন সময়েই মনোমধ্যে চিন্তা করিয়া দেখিলাম না যে ভগবান্ কৃপা করিয়া আমাদের সংসারে আসিবার পূর্ব্বেই মাতৃস্তনে দুগ্ধ, বাল্য, যৌবন এবং বৃদ্ধকালে তদুচিত ভোগ্যবস্তুসকল অর্থাৎ অন্ন, জল, ফল, ফুল ইত্যাদি ও ইন্দ্রিয়াদি ভোগের নিমিত্ত তদুপযুক্তস্থান ও বস্তু সকল প্রচুর পরিমাণে রাখিয়াছেন। এই সকল বস্তু ভোগের দ্বারা যদিও চৈতন্য না হউক ভোগ্যবস্তু সকল ভোগ করতঃ মনুষ্য মধ্যে যদি কেহ চিন্তা করিয়া দেখে যে তাহার আসিবার পূর্ব্বে কে এই সমস্ত সুখের বস্তু রাখিয়া দিয়াছেন। এই কথা জীবের মনে হইলেই সর্ব্বসুখদায়ক ঈশ্বর যে একমাত্র অতিথি-শালার কর্ত্তা ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ও নাম জানিতে জীবের ইচ্ছা হইবে। তাঁহার দর্শন কি নাম অবগত হইয়া স্মরণ, মনন ও কীর্ত্তনাদি দ্বারা জীবসকল ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তিনকালেই পরমশান্তিলাভ করিতে পারিবে। কিন্তু আমরা দেহাভিমানবশতঃ ভগবানের এই মহদুদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া কর্ম্মবশে স্থানান্তরিত হইয়া অনন্ত যাতনাময় সংসাররূপ অতিথিশালায় পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিয়া মহাকষ্ট ভোগ করিব। ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াও যদি তাঁহার মুক্তিপ্রদায়ক শ্রীকৃষ্ণনাম অবগত হইয়া কীর্ত্তন করিতাম তবে কোনও কালে কি কোন অবস্থায় কোন প্রকার কষ্টই পাইতাম না। হায়! কি মূর্খতা!

পিতা।

মায়াময় দেহধারী মাতাপিতার শুক্রশোণিত-সংযোগে আমাদের রক্ত, মাংস, অস্থি ও ক্লেদময় দেহ উৎপন্ন হইয়াছে। তাহাই আপনার স্বরূপজ্ঞানে দেহের সুখভোগ বাসনায় পরিণাম-দুঃখকর বস্তুসকল উৎকৃষ্ট ভোগ্য বিবেচনায় ও দেহের সুখের জন্য নানা কল্পিত বস্তু দ্বারা সুখে থাকিতে চেষ্টা করিয়া এবং কৃত্রিম দেহধারী জীবসকলের সঙ্গে সম্বন্ধ, শত্রুতা, মিত্রতা স্থাপন করতঃ মহাভ্রান্তি-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে আমাদের মূল পিতা, তাহা হইতে আমি যে শুদ্ধ-সত্ত্ব-চৈতন্যময় দেহবিশিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি তাহা বুঝিলে এই ভ্রান্তিময় জগতের সম্বন্ধ, অসম্বন্ধ, শত্রুতা, মিত্রতা, মিথ্যা ভোগ্য বস্তুতে আসক্ত হইয়া এই ভ্রান্তি-সাগরে কখনও নিপতিত হইতাম না। ভগবানে পিতৃসম্বন্ধ আছে বলিয়া যদি এখনও চৈতন্যময় দেহের স্মৃতিতে বুঝিতে সক্ষম হই তবে মায়াময় বস্তুর ভোগ ও মায়িক সম্বন্ধ মন হইতে একেবারে বিদূরিত হইয়া যাইবে। চৈতন্যময় দেহের স্মৃতি ক্রমে বৃদ্ধি ও বিশ্বাস মনোমধ্যে বদ্ধমূল হইলে এই মায়িক জগতে থাকিয়া বা পরে চিদানন্দময় ধাম প্রাপ্ত হইয়া চিন্ময়-দেহধারী ব্যক্তিসকলের সহিত কেবলমাত্র মিত্রতা স্থাপনপূর্ব্বক চিন্ময় রসপূর্ণ বস্তুসকল ভোগ করত চিন্ময় নিজদেহের পুষ্টি-সাধন করিয়া পরমানন্দে বাস করিতে সমর্থ হইব। আর কখনও কোনরূপ কালের প্রক্রিয়ায় কোনরূপ কষ্টভোগ করিতে হইবে না। যেহেতু সেই চিন্ময়রাজ্যে কালের স্বাতন্ত্র্য নাই।

সেই স্থানের অধিবাসীদিগের ইচ্ছামতে কাল ক্রিয়া করিতে বাধ্য হয়। শ্রীকৃষ্ণ জগতের পিতা, যে না ভজে বাপ পিতৃ-দ্রোহী পাতকীর জন্মে জন্মে তাপ। শ্রীচৈতন্যভাগবতে এই পদ্যটী আছে।

হরিনাম পথের সম্বল।

"হরিনাম পথের সম্বল" সকলেই কথায় বলে। কিন্তু হরিনামের গুণ ক্রিয়া জ্ঞাত না থাকিলে সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে না! অতএব স্বয়ং শ্রীহরি-নাম কৃপা করিয়া যদি কিঞ্চিৎ তাঁহার স্বীয় গুণ ও মাহাত্ম্য প্রকাশ করেন তবে এই স্থানে তাহাই প্রকাশিত হইবে। মৃত্যু হইলে শ্রীহরিনাম পথের সম্বল হইবে ইহাই সকলের চিরবিশ্বাস আছে, কিন্তু জীবিত সময়েও শ্রীহরিনাম পথের সম্বল হয় তাহার কোন কোন স্থলে কোন কোন অবস্থায় পরিচয় পাওয়া যায়। দেখুন অন্ধকার রাত্রে মধ্যমাঠে অসহায় অবস্থায় পড়িলে মহা ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে; সেই সময়ে সহায় ও সঙ্গীরূপে হরিনাম করিলে ভয় নিবারণ হইবে জানিয়া হরিনাম মনে মনে বা উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিলে সহায় ও সঙ্গীরূপ হইয়া শ্রীহরিনাম ভয়ার্ত্তজনের ভয় নিবারণ করিয়া দেয়। জলে নৌকায় চলিতে চলিতে যদি ঝড়[illegible] প্রবল বেগে উপস্থিত হয় তবে সেই বিপদ্ হইতে হরিনাম করিয়াই মুক্তি লাভ করা যায়। যদিও আমরা ভ্রান্তিবশতঃ এই জগতের চিরস্থায়ী বাসীন্দা বলিয়া মনে করিতেছি তথাপি এই স্থান আমাদের চিরবাস স্থান নহে। কারণ এই মিথ্যা সংসারপথে পথিকের তরুতলে বিশ্রামের ন্যায় অল্প সময়ের জন্য দেহ ধারণ করিয়া আসিয়াছি আবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও মৃত্যুযাতনা ভোগ করতঃ মিথ্যাশরীর পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। এই কথাদ্বারা জানিতে পারা যায় যে এই সংসাররূপতরু পথিকের পথশ্রান্তিদূর করিবার একমাত্র বৃক্ষ-

ছায়ার তুল্য কিয়ৎকাল বসিয়া শ্রান্তি দূর করে মাত্র। বৃক্ষমূল যেমন পথিকের পথশ্রম দূর করে, সেইরূপ সংসারপথের পথিক-জীবও কর্ম্মবশে নিজের অজ্ঞাতসারে সংসাররূপ তরুতলে পথশ্রমের শ্রান্তি দূর করিবার বাসনায় কিয়ৎকাল সুখে থাকে। এই সংসাররূপবৃক্ষ জীবের পক্ষে কিয়ৎকাল বিশ্রামের স্থান মাত্র। পথিক অন্য বৃক্ষছায়ায় বসিয়া স্বেচ্ছামতে থাকিতে ও যাইতে পারে কিন্তু এই তরুমূলে যদিও জীব অনাদিকালের পথশ্রম দূর করিতেছে, তথাপি আপন ইচ্ছামতে যাইতে ও থাকিতে পারিবে না। স্বীয় কৃতকর্ম্মের ভোগজন্য অনিচ্ছায় এই সুখের স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। এই কথায় সপ্রমাণ হইল যে মোহবশতঃ সংসারবৃক্ষের তলে সুখে আছি বলিয়া যে বিশ্বাস হইতেছে, তাহা ভ্রান্তিমাত্র। ইহা আমাদের যাতায়াতের পথেই প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব পথের সম্বল শ্রীহরিনাম পরিত্যাগ করিলে সম্বলহীন হইয়া অপরিচিত স্থানে বা দুর্গম পথে ভ্রমণ করিতে বিষম কষ্ট উপস্থিত হইবে। শ্রীহরিনাম যেমন কোন প্রকারে কোন অবস্থায় সঙ্গ ছাড়া না হয় অর্থাৎ চিত্ত, মন হইতে দূর না হয় সেই চেষ্টা করিয়া যত্নের সহিত সর্ব্বদা হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া চিত্ত ও মনের সহিত বদ্ধমূল করিয়া রাখা উচিত। পথের সম্বল নিয়ত পথিকের সঙ্গে থাকিলে পথভ্রমণে তাহার আর কোনরূপ কষ্ট উপস্থিত হয় না। দেহান্তে হরিনাম কিরূপে পথের সম্বল হয় তাহারও কিয়দংশ বলিবার আবশ্যক। মৃত্যু হইলে যে পথে সহায়-সম্পত্তি-বিহীন হইয়া চলিতে হইবে, পথের পরিমাণও পথ কিরূপ-কেহই অবগত নহে। সংসারপথ অনন্ত, অন্ধকারময় এবং জন্ম, মৃত্যু অসংখ্য ভয়ঙ্কর যাতনা ভোগ ও নানা প্রকার দেহ ধারণ করিয়া সংসারপথে চলিতে হয়। যে পর্য্যন্ত

জীব কৃষ্ণপাদপদ্ম তাহার নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান বলিয়া জানিতে না পারে ততকাল পর্য্যন্ত অজ্ঞাত অন্ধকারময় সংসারপথে চলিতে বাধ্য হয়। এ অবস্থায় পথে যদি পথের সম্বল সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন হরিনাম সঙ্গে থাকে তবে অন্ধকারে আলো, আর পথে যে কোনরূপ কষ্ট উপস্থিত হউক না কেন, তাহা নিবারণার্থে অবস্থানুরূপবস্তু সকল এবং স্বয়ং নানারূপে প্রকাশ হইয়া জীবের কষ্ট নিবারণ করিয়া থাকে। হরিনামের কৃপা হইলে দেহ বর্ত্তমানে বা দেহান্তর হওয়ামাত্রেই অজ্ঞান জীব চিন্ময়দেহে চৈতন্যভাবে অবস্থিতি করিয়া ভগবানের চিন্ময় ধামে তাহার শ্রীপাদপদ্ম সেবাদি লাভ করতঃ অনন্ত সুখানুভব করিতে সমর্থ হয় ও শ্রীহরি-পাদপদ্ম যে তাহার চির নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান তৎক্ষণাৎ তাহা জানিতে পারিয়া সংসারপথে ভ্রমণ করতঃ কষ্টভোগ না করিয়াই নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে পথের সম্বল হরিনামের কৃপায় উপস্থিত হইয়া পরমশান্তি লাভ করে।

সর্ব্বধর্ম্ম-পরিত্যাগ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবৎ গীতায় অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে হে অর্জ্জুন, যদি কেহ সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম অর্থাৎ বানপ্রস্থ, গৃহস্থধর্ম্ম ইত্যাদি রাজধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম, বেদের নিরূপিত যাগ যজ্ঞাদি যত কিছুরকম ধর্ম্ম আছে তাহা এমন কি মনোধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া আমার ভজন করে, তবে আমি তাহাকে সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত করতঃ অভিলষিত স্থান ইত্যাদি দান করিয়া থাকি। কিন্তু ভগবানের এই কথানুসারে কে কিরূপ ভক্তি করিয়াছে তদনুসন্ধান করিতে গেলে তদ্রূপ ভক্ত পাওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠে। কারণ লক্ষ্মী ইত্যাদি মহিষীগণ ও ভব, বিরিঞ্চি, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, শুক, নারদ, ভরত অম্বরীষাদিরাজগণ, হনুমান, বিভীষণ এবং ভীষ্মদেব, দ্রৌপদী ও বিদুর মহাশয় এবং যে শ্রীউদ্ধব মহাশয়কে ভগবান্ স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছিলেন যে হে উদ্ধব, ব্রহ্মা, শিব, লক্ষ্মী এবং আমার আত্মা আমার যেরূপ প্রিয় তুমি আমার সেই সকল হইতেও অধিক প্রিয়; রমাদেবী অবধি সেই শ্রীউদ্ধব মহাশয় পর্য্যন্ত ভগবানে ভক্তি করিবার সময় অভিলষিত স্থানসকল যার যার ভজনানুসারে প্রাপ্ত হইয়াও কেহ না কেহ কোন না কোন ধর্ম্মে আস্থা রাখিয়াই স্বীয় স্বীয় সাধনানুসারে স্থান সকল অর্থাৎ কেহ বৈকুণ্ঠে, কেহবা ব্রহ্মলোকাদি স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। কেহই সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া লক্ষিত হয় না। ভগবানের ঐরূপ কথানুসারে ভক্তিমান ভজনশীল পাত্র সংঘটন
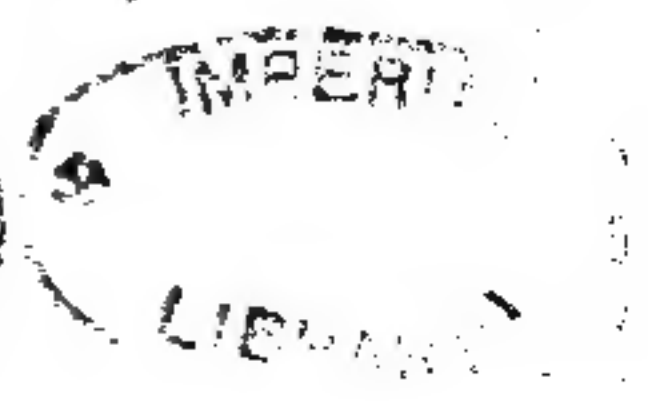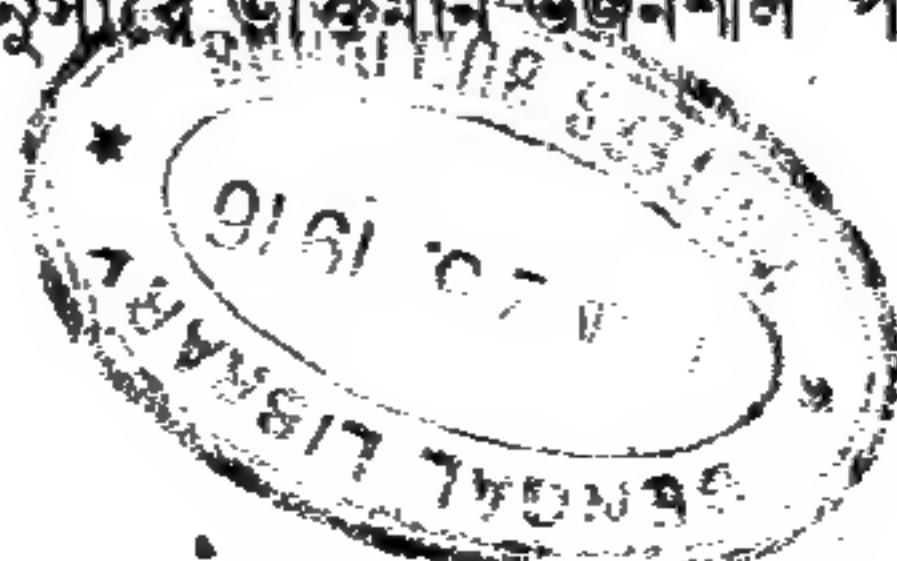
বিশেষ বিজ্ঞাপন।

বীরভূমি কার্য্যালয়, ২নং গড়বাড়ি লেন,
খিদিরপুরে স্থানান্তরিত হইল ও
শ্রীযুক্ত সুধীশচন্দ্র পাল ইহার
পরিচালনার ভার
লইলেন।

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক,
সম্পাদক।

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র
[illegible] মুদ্রিত।